বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদক
শ্রীগোপাল হালদার
সহযোগী সম্পাদক
ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন. কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীবিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮'৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
কুইক বাইণ্ডার্স
৩৮।১এ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

Vivekananda Rachana Samgraha
the Works of Swami Vivekanada
Volume VI

নিবেদন

কলকাতার দুটি নামী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে গুরুতর ত্রুটির দরুন ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশনার তারিখ তিনদিন এগিয়ে আনতে হল। ফলে এই খণ্ডটিতে প্রকাশিতব্য কয়েকটি প্রবন্ধ সপ্তম খণ্ডের জন্য রয়ে গেল। এজন্য দুঃখিত।

এই খণ্ডে থাকছে রাজযোগ ও পতঞ্জলির যোগসূত্র, অনেকগুলি প্রবন্ধ-বক্তৃতা এবং চিঠিপত্রের অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ করার জন্য অনুবাদকরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বা বক্তৃতার ব্যাখ্যার কোন চেষ্টা এক্ষেত্রে অনুবাদকরা করেন নি সঙ্গত কারণেই। আশা করি সুবিবেচক গ্রাহকরা এই ব্যবস্থা অনুমোদন করবেন।

এই খণ্ডের অনুবাদকর্মে সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী, সুকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন ঘোষ ও রাণা চট্টোপাধ্যায়। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পূজাবকাশের পর ছাপাখানার কাজ শুরু হয়েছে কার্যত ৩১শে অক্টোবর। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই খণ্ড ছাপার কাজ শেষ করা ছাপাখানার কর্মীদের সহযোগিতা-ব্যতিরেকে অসম্ভব ছিল। এই কর্মীবন্ধুদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এযাবৎ প্রকাশিত প্রতি খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বা বক্তৃতার বঙ্গানুবাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য একাধিক রচনা বা বক্তৃতার মূল ইংরাজীও প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে এর ব্যতিক্রম হল। প্রকাশনার তারিখ এগিয়ে আনার জন্যেই এই ব্যতিক্রম।

প্রকাশক-পক্ষে
বিকাশ ঘোষ

সূচীপত্র

রাজযোগ ১—৫৭

মুখবন্ধ। ভূমিকা। প্রথম সাধন-সোপান। প্রাণ। মানস-প্রাণ। অন্তঃপ্রাণের নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যাহার এবং ধারণা। ধ্যান ও সমাধি। সংক্ষিপ্ত রাজযোগ

পতঞ্জলির যোগসূত্র ৫৯—১৪১

উপক্রমণিকা। মনোযোগ: ইহার আধ্যাত্মিক প্রয়োগ। একাগ্রতা: অভ্যাস। শক্তি। স্বাধীনতা। পরিশিষ্ট

চিঠিপত্র ১৪৩—১৯১

প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ১—১৪৩

আমাদের কর্তব্য। কলকাতায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর। সাহসী তরুণদের প্রতি। ভারতে কাজের পরিকল্পনা। ভক্তি। হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি। কর্ম ও তার রহস্য। মনের শক্তি। আধ্যাত্মিক সাধনের কথা। ভক্তি বা ঈশ্বরানুরাগ। উন্মুক্ত রহস্য। দিব্য আনন্দের পথ। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী। আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনের আলোচনা। সাংখ্য ও বেদান্ত। ভারতবর্ষ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ। ভারতের কলা সম্পর্কে। আত্মিক বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি। ভারতীয় ধর্মীয় তত্ত্ব। মহাদূত খ্রীস্ট

চিত্রসূচী

বেলগাঁওয়ে বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দসহ শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অন্তিম শয়নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কাশীপুর বাগানবাড়ি। কাশ্মীরে গুরুভ্রাতা ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবেকানন্দ। কাশ্মীরে শ্রীমতী ম্যাকলিওড, শ্রীমতী ওলি বুল ও ভগিনী নিবেদিতাসহ বিবেকানন্দ।

রাজযোগ

বা

অন্তঃপ্রকৃতি আয়ত্তীকরণ

মুখবন্ধ

ইতিহাসের উদয়কাল থেকে মানবলোকে বহুরকম অসাধারণ ঘটনার নজির মেলে। এমন সব ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবার মতো লোক এই বর্তমান জগতেও রয়েছে—এবং এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রখর কিরণ-দীপ্ত সমাজেও। মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ভণ্ডদের কাছ থেকে এনে যখন এমন বহু বহু সাক্ষ্যপ্রমাণে জড়ো করা হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত দৈবী ঘটনা তো নকল অনুকরণ বিশেষ। কিন্তু তারা কিসের অনুকরণ? যথাযোগ্য অনুসন্ধান ছাড়াই সবকিছুকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত মনের পরিচয় নয়। অগভীর বৈজ্ঞানিকগণ বিচিত্রপ্রকার মানসকাণ্ডের ব্যাখ্যায় বিফল হন বলেই তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে সচেষ্ট হন। এবং সেজন্যেই, যারা ভাবে মেঘলোকের ঊর্ধ্ববাসী এক বা একাধিক কেউ তাদের প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছেন, বা যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের আবেদনে বিশ্বনিয়মগতিরই পরিবর্তন করে দেবে—এমন সব লোকের চেয়েও তো ওই ধরনের বৈজ্ঞানিকেরাই বরং বেশি সংস্কারের বশীভূত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঐ লোকদের পক্ষে অজ্ঞতা বা অন্ততপক্ষে ভ্রান্ত শিক্ষাপদ্ধতির অজুহাত রয়েছে—যার ফলে ঐ ঊর্ধ্বচারী ধরনের শক্তির উপরে তারা নির্ভর করতে শিখেছে এবং সেই নির্ভরতাটা তাদের বিকৃত প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রের পক্ষে তো এমন কোনো অজুহাত চলে না।

হাজার হাজার বছর ধরে অমন সব অপ্রাকৃত ঘটনাসমূহকে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও সাধারণীকরণ করা হয়েছে—মানবের ধর্মশক্তির সামগ্রিক মৌল ভিত্তিভূমিকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে—এবং কার্যত তারই ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে রাজযোগ। কিছু কিছু আধুনিক অক্ষম বৈজ্ঞানিকের রীতিমতো রাজযোগ দুরূহ ব্যাখ্যাসঙ্কুল ঘটনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না; বরং ভদ্রভাবে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাষায়ই রাজযোগ কুসংস্কারবাদীদের বলে—দৈবঘটনা বা প্রার্থনা ফলপ্রাপ্তি এবং বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার মতোই সত্য হলেও তাদেরকে মেঘলোকের ঊর্ধ্বচারী এক বা একাধিক সত্তার কারণ-জনিত বলে কুসংস্কার-মূলক ব্যাখ্যা দ্বারা বোধগম্য করে তোলা যায় না। রাজযোগ ঘোষণা করে প্রত্যেকটি মানুষই হল মানবলোকের পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান ও শক্তির অসীম মহাসমুদ্রে এক-একটি প্রবাহপথ। তা শিক্ষা দেয়—মানুষের মধ্যে কামনাবাসনা ও অভাবাদী আছে, মানুষের মধ্যে তা পূরণের শক্তি আছে; এবং যেখানেই এবং যখনই কোনো কামনা কোনো অভাব কোনো প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, তা হয়েছে এই অসীম অনন্ত শক্তির যোগান থেকেই—কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার কাছ থেকে নয়। অতিপ্রাকৃত সত্তাদির ধ্যানধারণা মানুষের মধ্যে কতকদূর পর্যন্ত কর্মবল জাগ্রত করতে পারে, তবে তা আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ও সৃষ্টি করে থাকে। তা পরনির্ভরতা আনে, আনে ভয়, আনে কুসংস্কার। তা এই ভয়াবহ বিশ্বাসের মধ্যে অধঃপতিত করে যে মানুষের পক্ষে দুর্বলতাটা স্বাভাবিক। যোগী বলেন—অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই, তবে প্রকৃতিতেই রয়েছে স্থূল প্রকাশ-রূপ ও সূক্ষ্ম প্রকাশ-রূপ। সূক্ষ্ম হল কারণ এবং স্থূল হল ফল।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহজেই দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মতে তেমনটা হয় না। রাজযোগ অভ্যাসের দ্বারা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দর্শন ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়।

ভারতীয় দর্শনের সমস্ত গোড়া প্রকারাদির লক্ষীভূত একটিই আদর্শ আছে এবং তা হল পূর্ণতার মাধ্যমে আত্মার মুক্তি। যোগ হল সেই পদ্ধতি। যোগ-শব্দ দ্বারা বিরাট ক্ষেত্রকে বোঝানো হয়, কিন্তু সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শন কোনো না কোনো আকারে যোগকেই নির্দেশিত করে থাকে।

এই গ্রন্থের বিষয়টি হল রাজযোগ নামক যোগ। রাজযোগের সর্বোচ্চ প্রাগধিকার রূপ শাস্ত্র হল পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যসূত্র—এবং এটাই রাজযোগের শাস্ত্রগ্রন্থ। অন্যান্য দার্শনিকগণ কখনো কখনো কোনো দার্শনিকসূত্রে ভিন্নমত হলেও রীতি-সম্মতভাবে তাঁর অভ্যাস-পদ্ধতিতে সুনিশ্চিত অনুমোদন জানিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রথমভাগে রয়েছে নিউ ইয়র্কে বর্তমান লেখককৃত কয়েকটি বক্তৃতা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পতঞ্জলি ভাষ্যসূত্রের কতকটা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে টীকা-আলোচনা। যতদূর সম্ভব বিশেষিত ধরনের দুর্বোধ্যতা এড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে—এবং কথোপকথনের অবাধ ও সহজ রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমভাগে কিছু সহজ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভ্যাসকামী শিক্ষার্থীদের জন্যে, কিন্তু বিশেষভাবে এবং সনির্বন্ধভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—কেবলমাত্র শিক্ষক সংস্পর্শেই নিরাপদভাবে যোগশিক্ষা সম্ভব। এই আলোচনার ফলে এবিষয়ে অধিকতরভাবে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হলে শিক্ষকের অভাব হবে না।

পতঞ্জলি দর্শন-পদ্ধতির ভিত্তি হল সাংখ্যপদ্ধতি, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল: এক, পতঞ্জলি-মতে প্রথম শিক্ষক গুরুরূপে একজন ব্যক্তিক ভগবানের স্থান আছে, কিন্তু সাংখ্য-গৃহীত একমাত্র ভগবান হল পূর্ণসত্ত—যিনি সাময়িকভাবেই সৃষ্টিচক্রের ভার গ্রহণকারী। দুই, যোগীদের মতে আত্মা বা পুরুষের মতোই মন সমভাবে সর্বাত্মক, কিন্তু সাংখ্যমতে তা নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—গ্রন্থকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

আমাদের সমস্ত জ্ঞানেরই ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা। আমরা যাকে জ্ঞান বলি, যেখানে আমরা সীমিত জ্ঞান থেকে সাধারণ জ্ঞানে পৌঁছাই তারও ভিত্তিতে রয়েছে অভিজ্ঞতা। যাকে যথার্থ বিজ্ঞান বলে থাকি সেখানে লোকে সত্যকে সহজেই খুঁজে পায়; কারণ, প্রত্যেক লোকের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার কাছে তা সাড়া জাগায়। বৈজ্ঞানিক তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলে না, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা-জাত ফলাফল ও তাদের উপরে যুক্তিশৃঙ্খলাকে সে উপসংহার সিদ্ধান্তরূপে বিশ্বাস করার কথা বলে, তখন তো মানবজগতের কোনো না কোনো সর্বজনীন অভিজ্ঞতার কাছে আবেদন পৌঁছায়। প্রত্যেকটি যথাযথ বিজ্ঞানেরই সমস্ত মানবসাধারণ-সম্মত একটা ভিত্তি আছে, এবং তাই ঐ বিজ্ঞান থেকেই সত্য বা মিথ্যাকে সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি। এখন প্রশ্ন হল ধর্মেরও অমন ভিত্তি আছে কি নেই? আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে দুদিক থেকেই—হাঁ-রূপে এবং না-রূপে।

সমস্ত পৃথিবীতেই যেভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় তাতে তার ভিত্তিতে বর্তমান থাকছে বিশ্বাস ও আস্থা এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের মত-বাদের দ্বারাই গঠিত এবং সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই এক এক ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। এসব মতবাদ আবার বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত। কোনো লোক বলছে মেঘলোকের ঊর্ধ্বে বসে এক মহাপুরুষ বিশ্ব শাসন করছে, আর সে লোক একমাত্র তার নজিরের উপর দাঁড়িয়েই আমাকে তা বিশ্বাস করতে বলছে। অনুরূপ-ভাবেই আমার থাকতে পারে আমারই স্বকীয় ধ্যান-ধারণা এবং আমি তাই অন্যকেও বিশ্বাস করতে বলছি, তারা যদি যুক্তিস্বরূপ কিছু জানতে চায় তো আমি কিছুই বলতে পারি না। এই কারণেই আজকাল ধর্ম ও আধিবিদ্যক দর্শনের দুর্নাম। প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোকই যেন বলতে চায়—"ওসব ধর্মের কথা, ও তো বোধবিচারশূন্য কতকগুলি মতবাদের সংগ্রহমাত্র—প্রত্যেকেই প্রচার করে চলেছে যার যা পোষা ভাবটি।" তা যাই হোক, ধর্মের রাজ্যে রয়েছে এমন এক সর্বজনীন বিশ্বাস—যা সমস্ত মতবাদেই নিহিত এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র ভাবধারায় বর্তমান। সকলের ভিত্তিতে পৌঁছে আমরা দেখি যে সে সবও সর্বজনীন বহু অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত, পৃথিবীর সবরকম ধর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে দু-রকম শ্রেণী বর্তমান: গ্রন্থ-সম্পর্কান্বিত ও গ্রন্থ-সম্পর্কান্বিত নয় এমন। গ্রন্থ-সম্পর্কান্বিত শ্রেণীই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বেশীসংখ্যক অনুগামী আছে তারই। গ্রন্থ-সম্পর্কান্বিত নয় এমনটা প্রায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সামান্য কিছু যা আছে তাদের অনুগামীও মুষ্টিমেয়। তবু, এই সকলের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই এই মতৈক্য যে তাদের শিক্ষাপ্রদত্ত সত্য হল সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি-দেরই অভিজ্ঞতার ফল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তোমাকে তার ধর্মে বিশ্বাস করতে বলছে, বলছে ঈশ্বরের অবতার রূপে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে—বিশ্বাস করতে বলছে ঈশ্বরকে, আত্মাকে এবং আত্মারই উন্নততর অবস্থাকে। কিন্তু তুমি যদি খ্রীষ্টধর্মেরই উৎসমুখে

যাও তো দেখবে তা অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্ট বলেছেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন; শিষ্যরা বলেছেন তারা ভগবানকে অনুভব করেছেন; এমনি ধারা ঘটেছে সব। অনুরূপভাবে বৌদ্ধধর্ম হল বুদ্ধেরই অভিজ্ঞতা। তিনি কতকগুলি সত্যকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লাভ করেছেন, তিনি দর্শন করেছেন, তাদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং পৃথিবীতে তা প্রচার করেছেন। এমনি হয়েছে হিন্দুধর্মেও। তাদের গ্রন্থাদিতে—এদের লেখকদের বলা হয় ঋষি বা সাধক—তারা ঘোষণা করেছেন তারা কতকগুলি বিশেষ সত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছেন এবং তারা তা প্রচার করেছেন। এইভাবে এটা স্পষ্ট হয় যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের এক সর্বজনীন এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর। শিক্ষকেরা (গুরুগণ) সকলেই ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন; তাঁরা তাঁদের আত্মাকে দর্শন করেছেন, তারা তাঁদের ভবিষ্যৎ দর্শন করেছেন, তাঁদের অনন্তরূপ দর্শন করেছেন —এবং তাঁরা যা দর্শন করেছেন তাই প্রচার করেছেন। একটা পার্থক্য আছে বৈকি, সমস্ত ধর্ম সম্পর্কেই, বিশেষত আধুনিককালে, এক অদ্ভুত ধরনের দাবি করা হয় অর্থাৎ কিনা ওসব অভিজ্ঞতার ব্যাপার বর্তমান কালে সম্ভব নয়, এক সময়ে দু-চার জন লোকের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁরা ছিলেন ঐসব ধর্মেরই প্রবর্তক।

ঐসব ধর্ম তাঁদের নামই ধারণ করে আছে। বর্তমানকালে ওইরূপ অভিজ্ঞতা অচল হয়ে গেছে, এবং তাই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এখন ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। আমি কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করছি। পৃথিবীতে যে কোনো জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট শাখায় যদি কোনো অভিজ্ঞতার ফল দেখা গিয়ে থাকে তো তা থেকে অনুসৃত হয় যে আগেই লক্ষ লক্ষ বার তেমন অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়েছে; এবং চিরকালই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। প্রকৃতির কঠিন নিয়ম হল ঐক্য —একবার যা ঘটেছে তা ঘটতে পারে সবসময়েই।

যোগবিজ্ঞানের শিক্ষকগণ তাই জোরের সঙ্গেই বলছেন—ধর্ম কেবল প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই রকম বোধ নিজেরই না হওয়া পর্যন্ত কেহই ধার্মিক হতে পারে না। যোগই হল সেই বিজ্ঞান যা আমাদের ঐ বোধ শেখায়। নিজেই উপলব্ধি না করলে ধর্ম সম্পর্কে কেবল কথা বলে বেশি কিছু কাজ হয় না। এক ঐশ্বরের নামেই কেন এত মারামারি আর কলহবিবাদ? ঈশ্বরের নামে যত রক্তপাত হয়েছে। তেমনটা আর কোনো কারণেই নয়, এরও কারণ লোকে ধর্মের উৎস-মূলে যায় নি—কেবলমাত্র পূর্বপুরুষদের প্রথমে একটা মানসিক সায় দিয়ে এসেছে, আর চেয়েছে অন্যেরাও যেন অনুরূপটাই করে। আত্মা আছে, ঈশ্বর আছে— একথা বলার কার অধিকার, নিজের মধ্যেই যদি আত্মাকে উপলব্ধি না করে, ঈশ্বরকে নিজেই যদি দর্শন না করে? ঈশ্বর যদি আছেন তো তাঁকে অবশ্যই আমরা দর্শন করতে পারব। আত্মা যদি থাকে তো আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব; তা নয় তো বিশ্বাস না করাই বরং ভালো। ভণ্ড হওয়ার চেয়ে স্পষ্টবাদী নিরীশ্বরবাদী হওয়াও ঢের ঢের ভালো। আধুনিক ধারণা একদিকে 'শিক্ষিত' শ্রেণীর মধ্যে যা বর্তমান তা হল ধর্ম দর্শনশাস্ত্র ও পরমপুরুষ প্রাসঙ্গিক সমস্ত অনুসন্ধানই বৃথা,

অন্যদিকে তথাকথিত শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতদের মধ্যে ধারণাটা হল ওসবের যথার্থ কোনো ভিত্তি নেই ; ওসবের একমাত্র সার্থকতা হল পৃথিবীর কল্যাণকর্ম সাধনে প্রবল প্রেরণা-শক্তি যোগায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে তারা সৎ হতে পারে, সাধু হতে পারে,—সৎ নাগরিক হতে পারে। এরকম ভাব থাকার জন্যে তাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ দেখছি তো এসব লোক যা শিক্ষা লাভ করে তা হল কতকগুলি চিরকালীন অসংলগ্ন শব্দাবলী, তার পশ্চাতে কোনো সারপদার্থ ছাড়াই। তাদের বলা হয় কথা মতো বাঁচতে, কিন্তু তা কি পারে তারা ? যদি পারত, তবেই মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত না। মানুষ সত্যকে চায়, সত্যকে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে চায় ; যখন সে তা অধিকারের মধ্যে পায়, উপলব্ধি করে, আর অন্তরের অন্তরতমলোকে অনুভব করে—তখনি, একমাত্র তখনি—বেদ বলে, নিশ্চিহ্ন হয় সমস্ত সন্দেহ, দূরীভূত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় অন্ধকার, সোজা হয় সরলবক্র যা কিছু। "হে অমৃতের সন্তানবৃন্দ, উর্ধ্বলোকবাসী, সম্মুখেই পথ ; এই সমস্ত অন্ধকার থেকে বহির্গমনের এক পথ বর্তমান, এবং তা হল সমস্ত অন্ধকারের অতীতে যিনি আছেন তাঁকে দর্শন করা ; আর কোন পথ নাই।"

রাজযোগের বিজ্ঞান এই সত্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে মানবসমাজের কাছে এক বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি তুলে ধরতে চায়। প্রথমত, প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই থাকতে হয় স্বকীয় অনুসন্ধান-পদ্ধতি। জ্যোতির্বিদ হতে চাইলে তুমি যদি বসে-বসে কেবল 'জোতির্বিজ্ঞান! জ্যোতির্বিজ্ঞান!' বলে চেঁচাও, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিশ্চয়ই তোমার কাছে নেমে আসবে না। রসায়নের বেলায়ও তাই। সুনির্দিষ্ট একটা পদ্ধতি নিশ্চয়ই অনুসরণ করতে হবে। তোমাকে রসায়নাগারে যেতে হবে, বিভিন্ন পদার্থ নিতে হবে। মিশ্রণ করতে হবে, সমন্বয় করতে হবে, তাই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে,—এবং তখনি তা থেকে আসবে তোমার রসায়ন জ্ঞান। জ্যোতির্বিদ হতে চাও তো মানমন্দিরে যাও, দূরবীন হাতে নাও, গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করো, তবে তো তুমি জ্যোতির্বিদ হবে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই রয়েছে তার স্বকীয় পদ্ধতি। আমি তোমাদের কাছে হাজার হাজার ধর্মবাণী প্রচার করতে পারি, কিন্তু তাতে তো তুমি ধার্মিক হয়ে যাবে না।—নিজেই পদ্ধতি মতো চর্চা অভ্যাস না করলে হবে না। এসব হল সত্য—সমস্ত দেশের ঋষিদের, সমস্ত কালের, সমস্ত পবিত্র ও নিঃস্বার্থ মানুষের সত্য—পৃথিবীর কল্যাণ, সাধন ছাড়া যাঁদের অন্য আর কোনোই উদ্দেশ্য ছিল না। তারা সকলেই জোরের সঙ্গে বলছেন, ঘোষণা করেছেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ সত্যের চেয়ে উচ্চতর কোনো সত্যের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, এবং তাঁরা সত্যতা নির্ধারণের জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁরা পদ্ধতি অনুসারে আমাদের সততায় সঙ্গে চর্চা করতে বলেছেন, এবং তখন যদি আমরা ঐ উচ্চতর সত্যেব সন্ধান না পাই তখনি আমাদের বলা সাজে যে ওসব দাবির মধ্যে কোনো সত্যতা নেই ; কিন্তু তা করার আগেই যদি আমরা তাঁদের সুনিশ্চিত সত্যবোধকে অস্বীকার করি তো আমরা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত কাজ করছি না। প্রদত্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে আমাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, জ্যোতি দেখা দেবেই।

জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণীকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি, এবং সাধারণীকরণের ভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ। প্রথমে আমরা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি, তারপরই সাধারণীকরণ, আর তারপরে পৌঁছাই উপসংহারে বা নীতি-নির্ধারণে। প্রথমেই ভিতরে যে কী হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের শক্তি না জন্মালে মন সম্পর্কে জ্ঞান, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান, মনন সম্পর্কে জ্ঞান কখনোই আসতে পারে না। বহির্জগতের ঘটনাদি পর্যবেক্ষণ অপেক্ষাকৃতভাবে সহজতর, কারণ সেই উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু অন্তর্জগৎ সম্পর্কে সাহায্য করার মতো কোনো যন্ত্রই আমাদের হাতে নেই। তবু তো আমরা জানি যথার্থ বিজ্ঞানকে লাভ করতে হলে পর্যবেক্ষণ করতে হবেই। যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়া যে কোনো বিজ্ঞানই হয়ে পড়ে নিষ্ফল—কেবল নীতির কচকচি। এবং সেজন্যেই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিকগণই সেই আদিকাল থেকে কেবল কলহ করেই চলেছেন—কেবলমাত্র দু-চারজনই পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছেন।

রাজযোগ নামক বিজ্ঞান প্রথমতই আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করার পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকে। যন্ত্রটি হল মন-ই। মনোযোগ-শক্তি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হলে মনকে বিশ্লেষিত করে দেখায় এবং ঘটনাকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। মনঃশক্তি হল অদৃশ্য আলোকরশ্মির মতো। কেন্দ্রীভূত হলেই তা উদ্ভাসিত হয়। এটাই একমাত্র জ্ঞানপন্থা। সকলেই তা গ্রহণ করছে—কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে; কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের বেলায় ঐ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকেই পরিচালিত করতে হয় অন্তরর্জগতে, বৈজ্ঞানিকেরা যেটাকে পরিচালিত করে বহির্জগতে। তবে এজন্য বহু অভ্যাস প্রয়োজন। শৈশব থেকেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় কেবলমাত্র বহির্বিষয়ে, কখনোই কিন্তু আভ্যন্তরিক বিষয়ে নয়, এবং তার ফলে আমরা আভ্যন্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণের শক্তি তো প্রায় হারিয়েই ফেলেছি। মনকে ভিতর দিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই যেন বাইরে যাবার দিকে বাধা দেওয়া আর কি; আর তারপর তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে মনের উপরেই নিক্ষিপ্ত করা—স্বপ্রকৃতিকেই জানবার জন্যে এবং নিজেকে বিশ্লেষণ করার জন্যে,—কিন্তু এ বড়ো কঠিন কাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এই বিষয়ে অগ্রসর হবার জন্যে এইটেই একমাত্র পথ।

এমন জ্ঞানের কি প্রয়োজন? প্রথমত, জ্ঞানই হল জ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার; দ্বিতীয়ত, এর উপযোগিতা রয়েছে। এতে আমাদের সর্বদুঃখ দূর হয়। নিজের মনই বিশ্লেষণ করে মুখোমুখিই যেন দেখতে পায় এমন কিছু কখনো যার বিনাশ নেই, যা স্বভাবতই চিরপবিত্র ও নিত্যপূর্ণ,—তখন সে আর দুঃখ পায় না, আর অসুখী হয় না। ভয় থেকেই, অতৃপ্ত বাসনা থেকেই তো সমস্ত দুঃখের উদ্ভব, মানুষ যখন বুঝতে পারে তার কখনোই মৃত্যু নাই, তখন তার আর মৃত্যুভয়ও থাকে না। যখন সে জানতে পারে সে হল পূর্ণ, তার আর মিথ্যা কামনাবাসনা থাকে না। এবং এই উভয় কারণের অনুপস্থিতিতে আর কোনো দুঃখও থাকবে না—থাকবে পরিপূর্ণ শান্তি, এমন কি এই দেহ ধারণ করেও।

এই জ্ঞানলাভের একমাত্র প্রণালীকে বলা হয় মনঃসংযোগ। রসায়নাগারে রাসায়নবিদ তার মনের সমস্ত শক্তিকে একটি দৃষ্টি-বৃত্তে কেন্দ্রীভূত করে, তার পরীক্ষণের উপাদানের উপর নিক্ষিপ্ত করে এবং তাদের গোপন রহস্যের সন্ধান পান। জ্যোতির্বিদ তার মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে দূরবীক্ষণ মাধ্যমে আকাশে সঞ্চালিত করেন, এবং তারকা সূর্য চন্দ্রও তাদের গোপন রহস্য তার কাছে উদ্ঘাটিত করে দেয়। বক্তব্য বিষয়ে আমার চিন্তাকে আমি যত বেশি কেন্দ্রীভূত করতে পারছি, ততই আমি সে বিষয়ে তোমাদের কাছে আলোকপাত করতে পারছি। তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শুনছ, তোমরা তোমাদের চিন্তাকে যতই কেন্দ্রীভূত করতে পারবে, আমার বক্তব্যকে ততই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

মনের এই একাগ্রতা-শক্তি ছাড়া জগতে সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার আর কিভাবেই বা লাভ করা যায়? সমস্ত জগৎ তার সমস্ত রহস্যভাণ্ডারই প্রকাশ করতে প্রস্তুত, কেবলমাত্র যদি আমরা জানি কেমন করে দরজায় ধাক্কা দিতে হয়, দরকার মতো ধাক্কাটা কেমন করে দিতে হয়! এই ধাক্কা দেওয়ার শক্তি ও বেগ আসে মনোনিবেশ থেকে। মানবমনের শক্তির কোনো সীমা নেই। মন যতই কেন্দ্রীভূত হবে, এক বিন্দুতে তত বেশী একাগ্র শক্তি জেগে উঠবে। এইটেই হল মনের গোপন রহস্য।

বহির্বিষয়ে মনোনিবেশ করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ, মন তো স্বতঃই বাইরে যেতে চায়; কিন্তু ধর্ম বা মনোবিজ্ঞান বা দর্শন প্রসঙ্গে তেমনটা হয় না, সেখানে কর্তা ও কর্ম (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) তো একই। কর্ম বা জ্ঞেয় হল আভ্যন্তরীণ বিষয়। মনই হল সেই বিষয়, এই মনকেই অনুধাবন করা দরকার—মন যেখানে মনকেই অনুধাবন করছে। আমরা জানি মনের এক শক্তি আছে, তা হল প্রতিবিম্ব। আমি এখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। আর এই সময়েই, এই আমি যে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেন এক দ্বিতীয় ব্যক্তি—জানছি এবং আমার কথাই শুনছি। তোমরা কাজ করতে করতেই তো চিন্তা করো, আর তখনি তোমাদের মনেরই একটা অংশ পাশে দাঁড়িয়ে দেখে তুমি কি চিন্তা করছ। মনের শক্তিগুলিকে একাগ্র করে মনের উপরই নিয়োগ করতে হবে। অন্তর্ভেদী সূর্যরশ্মির কাছে যেমন সবচেয়ে অন্ধকার স্থানও তার গোপন রূপ উদ্ঘাটিত করে দেয়, তেমনি এই একাগ্র মনই উদ্ঘাটিত করে দেবে তার অন্তরতম গোপন ভাণ্ডার। এইভাবেই আমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতে উপস্থিত হব—লাভ করব যথার্থ ও অকৃত্রিম ধর্মকে। আমরা তখন নিজেরাই দেখতে পাব আমাদের আত্মা আছে কিনা, জীবনটা দুদণ্ডের না নিত্যকালের, বিশ্বে ঈশ্বর আছেন বা নাই। আমাদের কাছেই সবই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। রাজযোগ আমাদের এটাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজযোগের সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—মনকে কিভাবে একাগ্র করা যায়, তারপর কিভাবে মনের গভীরতম ক্ষেত্র আবিষ্কার করা যায়, তারপরে কিভাবে সব উপাদানকে সাধারণীকরণ করা যায় ও তা থেকে আমাদের স্বকীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। কাজেই,

আমাদের ধর্ম কি, আমরা দ্বৈতবাদী না নিরীশ্বরবাদী, খ্রীষ্টান না ইহুদী, না বৌদ্ধ—রাজযোগে এসব প্রশ্ন কখনো ওঠেই না। আমরা মানুষ এবং তাই যথেষ্ট। ধর্ম-অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা-জনিত শক্তি রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই। প্রত্যেকটি মানুষের জিজ্ঞাসার অধিকার আছে—কেন ? এবং একটু কষ্ট স্বীকার করলে তার নিজেরই শক্তি রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার।

কাজেই এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম রাজযোগে কোনোরকম বিশ্বাস বা আস্থার প্রয়োজন নেই। নিজেই প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই বিশ্বাস করো না, রাজ-যোগ এটাই শিক্ষা দিয়ে থাকে। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনোরকম ঠেকারই দরকার করে না। আমাদের জাগ্রত দশাটা যে একটা সত্য তা প্রমাণ করবার জন্যে কি আর কোনোরকম স্বপ্ন বা কল্পনাদির প্রয়োজন হয় ? নিশ্চয়ই হয় না। এই রাজ-যোগের অধিকারের জন্য বহু সময় ও নিয়ত অভ্যাস চাই। রাজযোগ অভ্যাসের একটা অংশ হল শারীরিক, অথচ মুখ্যত তা মানসিক। অগ্রসর হতে হতে আমরা দেখতে পাব মন দেহের সঙ্গে কত'নিবিড়ভাবে, অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। আমরা যদি বিশ্বাস করি মন হল কেবল শরীরেরই একটা সূক্ষ্মতর অংশ এবং মনই শরীরের উপর কাজ করে, —তবে তো এটাও যুক্তিসঙ্গত যে শরীর মনের উপরে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। দেহ যদি অসুস্থ তো মনও অসুস্থ হয়। দেহ যদি সুস্থ তো মনও সুস্থ সবল। ক্রুদ্ধ হলে মনও উত্তেজিত হয়। অনুরূপভাবেই মন যখন উত্তেজিত হয় দেহও উত্তেজিত হয় বৈকি। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই মন দেহেরই নিয়ন্ত্রণে থাকে,—মনের সেখানে বড় একটা বৃদ্ধিই ঘটেনি। বৃহৎ মানবসমাজের অধিকাংশই প্রাণিকুল থেকে মোটেই দূরে নেই। কেবল তাই নয়, এমন কি বহু দৃষ্টান্তেই দেখা যায় তাদের সংযম-ক্ষমতা নিম্নজাতীয় প্রাণীদের চেয়ে সামান্যই উন্নত মাত্র। মনের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাটা বড়ই কম। এবং তাই সেই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় আনার জন্য, দেহ ও মনের উপর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আমাদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শারীরিক সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে। দেহ যখন পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণে আসবে, চিত্ত পরিচালনার কাজ তখনি সুরু করা যাবে। চিত্ত-পরিচালনা দ্বারা আমরা চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হব, যেমন খুশি তাকে কাজ করাতে পারব, আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হতে বাধ্য করতে পারব।

রাজযোগ মতে বহির্জগৎ হল অন্তরঙ্গ বা সূক্ষ্ম জগতেরই স্থূল রূপ। সূক্ষ্মটা হল কারণ, আর স্থূলটা হল কার্য। এবং তাই বহির্জগৎ হল কার্যরূপ, আর অন্তর্জগৎ হল কারণ। অনুরূপভাবেই অন্তঃশক্তি যেখানে সূক্ষ্মতর, বহিঃশক্তি সেখানে তারই স্থূলতর রূপ। অন্তঃশক্তির যে সন্ধান পেয়েছে এবং তাকে পরিচালনা করতে জানে, তার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে প্রকৃতি। যিনি যোগী তাঁর রয়েছে বৃহৎ দায়িত্ব—তিনি তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার করেন নিখিল প্রকৃতির উপর,—নিখিল প্রকৃতিকেই তাঁর স্ব-নিয়ন্ত্রণে এনে থাকেন।

তিনি এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌছাতে চান যেখানে আমাদের অভিহিত 'প্রাকৃতিক নিয়মাবলী' তার উপর কোনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—

তিনি চলে গেছেন ও সবের বাইরে। কি বহিরঙ্গ কি অন্তরঙ্গ সমস্ত প্রকৃতিরই তিনি সেখানে প্রভুত্ব করেন। মানবজাতির সমুন্নতি ও সভ্যতা সোজাসুজিই ব্যক্ত করে বোঝায় এই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণকে।

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকম প্রণালী অবলম্বন করে থাকে। একই সমাজে যেমন কিছু লোক চায় বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, কিছু চায় অন্তঃপ্রকৃতিকে; তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও, কোনো জাতি চায় বহিঃপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ, কোনো জাতি চায় অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ। কেউ কেউ বলেন, অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমরা সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করি। দুই দিককেই চরম প্রান্তে নিয়ে এলে দেখা যায় দুটোই সত্য, কারণ প্রকৃতিতে তো বহিরঙ্গ কি অন্তরঙ্গ বলে পৃথক কোনো স্বতন্ত্র বিভাগ নেই। উদ্ভট বিভাগ করা হয়, আসলে যা নেই। জ্ঞানসীমার প্রত্যন্ত প্রান্তে এসে পৌঁছলে, বহিরঙ্গবাদী ও অন্তরঙ্গবাদী—উভয়কেই একবিন্দুতে এসে মিলতেই হবে। পদার্থবিদ যেমন তাঁর জ্ঞানকে শেষসীমায় এনে দেখতে পান সব সীমারেখাই মিলিয়ে যাচ্ছে দর্শনের মধ্যে, তেমনি একজন দার্শনিকও দেখতে পাবেন যাকে মন ও পদার্থ বলা হয় তা হল আপাত-বিভেদ রূপ—সত্য একটিই।

সমস্ত বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ঐক্যসন্ধান, সেই এক—যা থেকে বহুর উৎপত্তি, সেই এক—যা বহুরূপে বিরাজমান তাকেই সন্ধান করা। রাজযোগ সুরু করতে চায় অন্তর্জগৎ থেকেই; আলোচনা করতে, অধ্যয়ন করতে চায় অন্তঃপ্রকৃতিকে, এবং তারই মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপের সমস্তকে। এ খুব প্রাচীন প্রয়াস। ভারতবর্ষই এর দুর্গবিশেষ, তবে অন্যদেশেও এর চর্চা হয়েছে। পাশ্চাত্যে একে মনে করা হত মরমীয়াবাদ—রহস্যবিদ্যা, এবং যারাই তার চর্চা করত তাদের ডাইনি বা যাদুকর নামে পোড়ানো হত বা মেরে ফেলা হত। ভারতবর্ষে, নানা কারণে, এই বিদ্যা যেসব লোকদের অধিকার এসেছিল তারা সেই জ্ঞানের নব্বই শতাংশই বিনাশ করেছে, বাকী যেটুকু আছে তাও তারা গুপ্তরহস্য করে রেখেছে। বর্তমানকালে পাশ্চাত্যে তথাকথিত শিক্ষকরূপে যারা দেখা দিয়েছে, তারা ঐরূপ ভারতীয় শিক্ষকদের চেয়ে ঢের ঢের বিশিষ্ট, কারণ ভারতীয়েরা বরং কিছু জানত কিন্তু ঐ আধুনিক প্রবক্তাগণ কিছুই জানে না।

যোগ-পদ্ধতিতে গুহ্য ও রহস্যজনক যা কিছু তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হল শক্তি। কি ধর্মে কি অন্যান্য ব্যাপারে, যা-ই তোমাকে দুর্বল করে, তাকে পরিত্যাগ করবে—এখানে তার কোন প্রয়োজন নেই। রহস্যজাল বিস্তার মানবমস্তিষ্ককে দুর্বল করে ফেলে। এসবই যোগ-কে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে—অথচ যোগই হল সর্ববিজ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। চার হাজার বৎসর পূর্বকালে এই বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে ভারতবর্ষে তা প্রণালীবদ্ধরূপে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। এটা একটা লক্ষ্য করবার মতো ব্যাপার—ভাষ্যকার যতই আধুনিক হয়ে উঠছেন ততই তিনি বেশী ভুল করছেন, অন্যপক্ষে তিনি যতই প্রাচীন, ততই সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমান কালের অধিকাংশ লেখকই বলে থাকেন নানা ধরনের রহস্য-কথা। এবং তাই তো

যোগবিদ্যা গিয়ে পড়েছে মুষ্টিমেয় লোকের অধিকারে, এবং তারা তাকে স্পষ্টোজ্জ্বল দিবালোকে যুক্তির উপর দাঁড় না করিয়ে করে তুলছে সংগুপ্ত ব্যাপার। যাতে সমস্ত শক্তিই তাদের কুক্ষিগত থাকতে পারে সেজন্যেই তারা এমনটা করেছে।

আমি যা শিক্ষা দিচ্ছি, প্রথমত সেখানে কোন গোপন কিছু বা রহস্য কিছু নেই। আমি যেটুকু জানি তোমাদের বলব। যুক্তি দিয়ে যতটা বোঝানো যায় আমি তার চেষ্টা করব; আর আমি যা জানি না সেখানে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি যা বলছে কেবলমাত্র তা-ই বলব। অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার বেলায় যেমনটা করতে হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই এই বিজ্ঞানকেও গ্রহণ করবে। এতে কোন রহস্যময়তাও নেই, শঙ্কাভয়ও নেই। এর মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাই স্পষ্ট দিবালোকে সদর সড়কেই প্রচার করবে। একে কোনোরকম রহস্যজালে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলে ভয়ানক বিপদ দেখা দেয়।

যে সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে রাজযোগ সম্পূর্ণতই প্রতিষ্ঠিত, এবারে আরো অগ্রসর হবার পূর্বে সে সম্পর্কে কিছুটা বলছি। সাংখ্যদর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞান হয় এইভাবে: বহির্বস্তুর সংঘাত বহির্যন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ মস্তিষ্ককেন্দ্রে যা ইন্দ্রিয়বাহী যন্ত্রে প্রেরিত হয়, ঐ যন্ত্র আবার সংঘাতগুলিকে পৌঁছে দেয় মনের কাছে, মন তা পৌঁছে দেয় নিশ্চয়াত্মক বোধের কাছে—এ থেকে পুরুষ বা আত্মা তাদের গ্রহণ করলেই হয় উপলব্ধি। এবার, ঐ পুরুষ বা আত্মা প্রয়োজনীয় কর্তব্য করবার জন্যে তাদের যেন ফিরিয়ে দেয় কর্মচেতনা কেন্দ্রে। কেবলমাত্র পুরুষ ছাড়া আর সমস্তই হল উপাদান, তবে বহির্যন্ত্রাদির চেয়ে মন হল বহু বেশি সূক্ষ্ম। মন যে উপাদানে গড়া, তাই আবার গড়ে তোলে তন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম বস্তু। এসবেই স্থূলাকার হয়ে পড়ে বহির্বস্তু। এটাই হল সাংখ্য মনোবিদ্যা। কাজেই ধী ও স্থূল পদার্থের মধ্যে তফাৎ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই হল পদার্থাতীত। মন যেন আত্মার হাতের এক যন্ত্র, আর এই যন্ত্রের মাধ্যমেই আত্মা বহির্বস্তুদের বা বাহ্য বিষয়কে গ্রহণ করে। মন তো অবিরতই পরিবর্তিত হচ্ছে, বিচলিত হচ্ছে, আর সিদ্ধ বা পূর্ণ অবস্থায় তা লগ্ন হয় কখনো সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিতে, কখনো বা একটিতে, কখনো বা কোনোটিতেই নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমি একটা ঘড়ির শব্দ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি, তখন আমার চোখ খোলা থাকলেও তো কিছুই হয়ত দেখছি না—এতে বোঝা যাচ্ছে আমার মন যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে লগ্ন ছিল তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে লগ্ন ছিল না। তবে সিদ্ধস্তরের মন একইকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়েই লগ্ন থাকতে পারে। নিজ অন্তরের গভীরের দিকে ফিরে দৃষ্টিপাত করবার মতো তার এক আত্মগত ক্ষমতা আছে। এই আত্মগত ক্ষমতাই যোগীরা লাভ করতে চান; মনের সমস্ত শক্তি একাগ্র এবং তাকে ভিতরের দিকে পরিচালিত করে তিনি জানতে চান ভিতরে কী হচ্ছে। এখানে নিছক বিশ্বাসের কোনো কথা নেই; কিছু কিছু দার্শনিকের এরূপ বিশ্লেষণ। আধুনিক শারীরবিদগণ বলেন প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় চোখ নয়, সেটা মস্তিষ্কের কোনো স্নায়ুকেন্দ্রেই অবস্থান করে। অনুরূপ অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও। ঐ শারীরবিদগণ আরো

বলেন ঐসব কেন্দ্র ঠিক মস্তিষ্কের গঠন উপাদানের মতো উপাদান দিয়েই গড়া। সাংখ্যও তাই বলে। প্রথম শারীরতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত হল শারীরিক দিক থেকে, আর সাংখ্যবিদদের হল মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে। তবুও দুটির কথা একই। আমাদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রটি এরও বাইরে।

যোগী এমন এক সূক্ষ্ম উপলব্ধির মধ্যে অবস্থান করতে চান যেখানে তিনি সমস্ত মানসিক অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সমস্ত রকমের মানস উপলব্ধিই তখন সম্ভব। অনুভবগুলি কিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে, কেমন করে মন তা গ্রহণ করছে, কী করে নিশ্চয়াত্মক কেন্দ্রে তা পৌঁছচ্ছে, এবং ঐ কেন্দ্রই বা কী করে পুরুষের কাছে উপস্থিত হচ্ছে—এসবই তখন প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের পক্ষেই প্রয়োজন কতকগুলি প্রস্তুতি এবং প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের রয়েছে যেমন বোধবাহী স্বকীয় প্রণালী—বর্তমান রয়েছে রাজযোগেও।

খাদ্য সম্পর্কে কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম রক্ষা প্রয়োজন; যে খাদ্য বিশেষ পবিত্র মন গঠনে সহায়তা করে তেমন খাদ্যই খেতে হবে। চিড়িয়াখানায় যাও তো সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবে। হাতিকে দেখেছ তো? প্রকাণ্ড একটা জীব। কিন্তু কী শান্ত ও নম্র। কিন্তু সিংহ বা বাঘের খাঁচার কাছে যাও, দেখবে কী অস্থির তারা। এতেই দেখা যাচ্ছে খাদ্য ওদের কতটা স্বতন্ত্র করে ফেলেছে। আমাদের এই শরীরে যে শক্তি কাজ করছে তার সবটাই সৃষ্টি করেছে খাদ্য, তা তো প্রতিদিনই বুঝতে পারছি। উপবাস করতে সুরু করেছ তো প্রথমটায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, শারীরিক শক্তি ব্যাহত হবে, দু-একদিনের মধ্যেই মানসিক শক্তিও হ্রাস পাবে। এবার স্মৃতিশক্তি চলে যাবে, তারপর এমন এক অবস্থা হবে যখন তুমি চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলবে—যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগের তো কথাই ওঠে না। কাজেই প্রথম অবস্থায় আমরা কি খাদ্য গ্রহণ করছি সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তারপর যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে—সাধন-অভ্যাস বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলে এ ব্যাপারে অত সতর্কতার আর প্রয়োজন হয় না। চারা অবস্থায় চারদিকে বেড়া দেওয়া দরকার পাছে কেউ ক্ষতি করে, তারপর গাছ হয়ে উঠলে বেড়া সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সে তো সমস্ত আঘাত ও আক্রমণ সহ্য করবার মতোই শক্তিমান।

যোগীকে বিলাস-ব্যসন ও কৃচ্ছ্রসাধন—এই দুদিকের চূড়ান্ত দিকটাকে বর্জন করতে হবে। সে উপবাস করবে না, দেহকে নির্যাতন দেবে না। এমনটা যে করে সে যোগী হতে পারে না। গীতায়ই বলা হয়েছে: যে উপবাস করে, যে ঘুমায় না বা বেশী ঘুমায়, যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বা কোনোই কাজ করে না—এদের কেউই যোগী হতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম সাধন-সোপান

রাজযোগে আটটি সোপান আছে। প্রথম সোপান হল যম অর্থাৎ অহিংসা, সততা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা)। তারপর নিয়ম—পরিচ্ছন্নতা, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ) এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। তারপরে আসন বা বসবার পদ্ধতি। তারপর প্রাণায়াম বা প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণ; তারপর প্রত্যাহার বা বিষয়াদি থেকে ইন্দ্রিয়কে সংযত করা; তারপর ধ্যান; তারপর সমাধি বা মহাচেতনা। দেখতেই পাচ্ছি যম ও নিয়ম হল নৈতিক শিক্ষার বিষয়; এ দুটির ভিত্তি ছাড়া কোনো রকম যোগাভ্যাসই সফল হবে না। এই দুটি স্থিত হলে যোগী তার যোগাভ্যাসের ফল হৃদয়ঙ্গম করতে থাকবেন। যোগী কখনো কাউকেই আঘাত দেবে না—চিন্তা দ্বারা নয়, বাক্য দ্বারা নয়, কার্য দ্বারা নয়। কেবলমাত্র মানবের জন্যই নয়, মানবসমাজ পেরিয়ে আলিঙ্গন করবে তা সমস্ত জগৎ।

দ্বিতীয় সোপান হল আসন—বসবার ভঙ্গী। উচ্চতর অবস্থায় না পৌছানো পর্যন্ত প্রত্যেকদিন নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক দুই জাতীয় প্রক্রিয়াই অভ্যাস করে যেতে হবে। এবং সেজন্যেই যে রকম আসনে বহুক্ষণ একনাগাড়ে বসে থাকা যায় এমন একটি আসনই গ্রহণ করতে হবে। যার যে আসন সবচেয়ে সহজ মনে হবে সেইটেই বেছে নিতে হবে। চিন্তা করার জন্য কারো নির্দিষ্ট একটি আসন খুব সহজ মনে হতে পারে, কারো বা সেইটে খুব কঠিন মনে হয়। পরে আমরা দেখতে পাব, এই মনস্তত্ত্বমূলক বিষয় অধ্যয়নকালে শরীরের মধ্যে বেশ একটা সংক্রিয়া চলতে থাকে। স্নায়ুর মধ্যে শক্তিপ্রবাহকে স্থান পরিবর্তন করিয়ে নতুন পথে পরিচালিত করতে হবে। নতুন রকমের স্পন্দন সুরু হবে,—সমগ্র দেহ-সংগঠনই যেন নতুন করে গঠিত হবে। কিন্তু এই সংক্রিয়ার প্রধান অংশই সংঘটিত হবে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে, তাই আসন-ভঙ্গীতে বিশেষ প্রয়োজন মেরুদণ্ড স্বাধীন অবস্থায় রাখা—সোজা উপবেশন করে, বুক, ঘাড় ও মাথা এই তিন দেহাংশকেই সরল রেখায় সন্নিবিষ্ট রাখতে হবে। বক্ষোদেশ কুঁচকে রেখে কোনো উচ্চচিন্তা করা সম্ভব নয়, সহজেই তা দেখতে পাবে। যোগের এই অংশটুকু হঠযোগের সঙ্গে মিলে যায়; হঠযোগ শারীরিক অস্তিত্ব নিয়েই সম্পূর্ণত ব্যস্ত, এর উদ্দেশ্য কেবল শরীরকে সবল করে তোলা। এই হঠযোগ সম্পর্কে এখানে আমাদের কোনোরকম সম্পর্ক নেই, কারণ হঠযোগের অভ্যাসাদি অত্যন্তই কঠিন, দু-একদিনে শেখাও যায় না, আর সর্বোপরি তা আধ্যাত্মিক সমুন্নতির দিকে বেশীদূর এগিয়েও দেয় না। ডেলসার্ট ও অন্যান্য দেহ-শিক্ষকগণের লেখায় অনেকটাই দেখতে পাবে ঐ অভ্যাসাদির কথা, যেমন দেহকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে স্থিত করার কথা। কিন্তু এ সবের লক্ষ্য হল শারীরিক—মনস্তাত্ত্বিক নয়। দেহে এমন কোনো মাংসপেশী নেই যা আমরা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের ইচ্ছামতোই হৃদযন্ত্র বন্ধ করা যায়, আবার সঞ্চালিত করতে পারি, ঠিক অনুরূপভাবেই দেহ-সংগঠনের যে কোনো অংশকেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়

যোগের এই শাখার ফল হল মানুষকে দীর্ঘজীবী করে তোলা,—হঠযোগের একমাত্র লক্ষ্যই হল স্বাস্থ্য। সে কিছুতেই রোগাক্রান্ত হবে না, রোগাক্রান্ত সে হয়ও না। জীবন ধারণ করে সে দীর্ঘকাল; শত বৎসর তো তার কাছে কিছুই নয়, দেড়শ বছর বয়সেও সে থাকে যুবকের মতো তাজা,—একগাছি চুলও তার শাদা হয় না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বটগাছ কখনো কখনো পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচে, কিন্তু তখনো তো বটগাছই, আর কিছু নয়। কোনো লোক দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করলেও সে হবে এক সুস্থ প্রাণীমাত্র। তবে, হঠযোগের দু-একটা পাঠ কিন্তু খুবই কার্যকরী। এই ধরো, কারো খুব মাথা ধরেছে,—সকলে ঘুম থেকে উঠেই নাক দিয়ে ঠাণ্ডা জল পান করবে, সারাটা দিন মাথাটি বেশ সুস্থ থাকবে, ঠাণ্ডা থাকবে—আর সর্দির ধাতও সেরে যাবে। এটা করাও খুবই সহজ। জলের মধ্যে নাকটি ডুবিয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে জল টেনে নাও, আর মুখ দিয়ে বার করে দাও।

দৃঢ় স্থির আসন করতে শিখে গেলে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মতে স্নায়ুশুদ্ধি অভ্যাস করতে হয়। এটা রাজযোগের মধ্যে পড়ে না বলে অনেকে এটাকে বর্জন করে থাকেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যের মতো মহান ভাষ্যকারই যখন এই ক্রিয়াসাধনের জন্য বিধান দিচ্ছেন, আমার পক্ষে তার উল্লেখ কর্তব্য বলেই মনে করি। এবং আমি তাঁর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের টীকা ভাষ্য থেকেই এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "যে মনের মালিন্য প্রাণায়াম দ্বারা দূর হয়েছে সেই মনই ব্রহ্মে সুস্থির হয়। এই জন্যেই প্রাণায়ামের কথা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। সুরুতেই স্নায়ুগুলি অমল অর্থাৎ মলমুক্ত রাখতে হবে। তবে তো প্রাণায়ামের শক্তি জন্মাবে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান নাসারন্ধ্র টিপে ধরে, বাম নাসারন্ধ্র পথে বায়ু টেনে নাও—সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব। এবার বিরাম না দিয়েই ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে বায়ু বার করে দাও—বাম নাসারন্ধ্র অনামিকা দিয়ে বন্ধ করে। আবার ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে বায়ু টেনে নিয়ে বাঁ দিকটা দিয়ে বার করে দাও,—যতটা সম্ভব। এভাবে ব্রাহ্মমুহূর্তে উষাগমের আগেই অভ্যাস করবে, দুপুরে করবে, সন্ধ্যায় করবে, এবং মধ্যরাত্রে করবে—দিনে রাত্রে তিন থেকে পাঁচবার। পক্ষকাল বা মাসকালের মধ্যেই স্নায়ু-শুদ্ধি ঘটবে; তারপরেই প্রাণায়াম।"

অভ্যাস ঐকান্তিকরূপেই প্রয়োজন। দিনের পর দিন বহুক্ষণ ধরে তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনে যেতে পারো। কিন্তু তুমি যদি অভ্যাস না করো তো এক পা-ও অগ্রসর হবে না। সবটাই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞতার মধ্যে না এলে আমরা এসব বুঝব না। আমাদের নিজেদেরই এসব প্রত্যক্ষ করতে হবে, অনুভব করতে হবে। কেবল ব্যাখ্যা ও মতামত শুনে কিছুই হয় না। অভ্যাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথম বাধা হল রুগ্নদেহ; দেহই যদি যোগ্য অবস্থায় না থাকে, অভ্যাস তো ব্যাহত হবে। আর সেজন্যেই দেহকে সুস্থ রাখতে হবে; আমাদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, এবং আমাদের কাজ সম্পর্কেও। দেহটাকে সবল রাখার জন্যে সর্বদাই একটা মানসিক প্রয়াস বজায় রাখবে—সাধারণভাবে যাকে বলা হয় খ্রীশ্চান সায়েন্স বা খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান। ব্যস্ এই পর্যন্তই, দেহ

প্রসঙ্গে এর চেয়েও বেশী কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই ভুললে চলবে না স্বাস্থ্য হল লক্ষ্যলাভের একটা উপায় মাত্র। স্বাস্থ্যই যদি লক্ষ্য হত, আমরা তো তবে জন্তু-জানোয়ার হয়ে যেতাম ; জানোয়ারেরা বড় একটা অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বাধা হল সন্দেহ। যা আমরা দেখতে পাই না, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমাদের সন্দেহ হয়।

যতই চেষ্টা করুক না কেন, মানুষ তো কথা নিয়েই বাঁচতে পারে না। তাই তার মনে জাগে এসব ব্যাপারে সত্য কিছু আছে কিনা ; এমনকি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনেরাও কখনো কখনো সন্দিহান হয়ে পড়ে। অভ্যাসের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই কিছু আভাস দেখা দেবে—আশা ও উৎসাহ জাগাতে তাই যথেষ্ট। যোগ দর্শনের কোনো এক ভাষ্যকার যেমন বলেছেন—"একটি প্রমাণ পেলেই, তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা-ই সমগ্র যোগশিক্ষার উপরে বিশ্বাস আনবে।" উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম কয়েক মাস যোগাভ্যাসের পরেই বুঝতে পারবে যে তুমি অন্যের চিন্তা বুঝতে পারছ ; তারা তোমার কাছে দেখা দেবে ছবির মতো। শুনবার ইচ্ছায়ই যদি তোমার মনকে একাগ্র করে রাখো, হয়ত বা বহুদূরে কী হচ্ছে তাও তুমি শুনতে পাবে।

এইসব আভাস প্রথমদিকে আসতে থাকবে একটু একটু করে, তবে তোমার মধ্যে বিশ্বাস, বল ও আশা জাগিয়ে রাখতে তাই যথেষ্ট। এই যেমন, তুমি যদি সব চিন্তা তোমার নাসিকাগ্রে কেন্দ্রীভূত করে রাখার অভ্যাস করো, কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি পেতে থাকবে কী এক আশ্চর্য মধুর গন্ধ, এবং তাই তোমাকে বেশ করে জানিয়ে দেবে : কোনো কোনো মানস উপলব্ধি, বহির্বস্তুর সংস্পর্শ ছাড়া সহজেই ঘটতে পারে। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে এসব হল পন্থা মাত্র। এই সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিণাম হল আত্মার মুক্তি। আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য হবে প্রকৃতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—তার চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু নয়। আমরা প্রকৃতির প্রভু হব, তার দাস নয় ; আমাদের প্রভু হবে না আমাদেরই দেহ কিংবা মন। আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে এই দেহটা আমার, আমি এই দেহের নয়।

এক বড় ঋষির কাছে এক দেবতা ও এক দানব গিয়েছিল আত্মতত্ত্ব জানতে। বহুকাল তারা ঋষির কাছে অধ্যয়ন করল। সবশেষে ঋষি তাদের বললেন —"যে আত্মার সত্তার সন্ধান করছ সে তুমিই নিজেই।" দু-জনেই ভাবল তাদের দেহটাই হল আত্মা। তারা সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ লোকদের মধ্যে ফিরে এসে বলল —"যা জানবার আমরা সব জেনে এসেছি ; খাও দাও, আনন্দ কর। আমরা নিজেরাই হলাম আত্মা ; এর অতীত কিছুই নেই।"

দানবেরা স্বভাবতই ছিল অজ্ঞ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই তাদের জিজ্ঞাসা আরো এগিয়ে গেল না, এই ভেবেই সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করল যে তারাই হল ঈশ্বর, এবং আত্মাই হল দেহ। দেবতা ছিল আরো বিশুদ্ধপ্রকৃতি। প্রথমটায় সে ভুল করে ভেবেছিল—"এই আমার দেহই হল ব্রহ্ম। কাজেই একে বলবান ও স্বাস্থ্যবান এবং সুসজ্জিত রাখতে হবে, এর জন্য সমস্ত রকম উপভোগের ব্যবস্থা করতে হবে।" কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারল, তার গুরু ঋষির কথার অর্থ ওরকম

হতেই পারে না, উন্নততর কিছু নিশ্চতই আছে। কাজেই সে ফিরে এসে বলল—"প্রভু, আপনি কি বলতে চেয়েছেন, এই দেহই হল আত্মা? তাই যদি হবে, সব দেহেরই তো দেখছি মৃত্যু আছে। কিন্তু আত্মার তো মৃত্যু নাই।" ঋষি বললেন—"নিজেই সন্ধান করে নাও, তুমিই তিনি।" দেবতা এবার ভাবল যে দেহের মধ্যে যে প্রাণশক্তি কাজ করছে তাই হল আত্মা,—ঋষি তাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সে দেখতে পেল খাদ্য গ্রহণ করলে এই মূলগত প্রাণশক্তি সবল থাকে, কিন্তু উপবাস করলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। দেবতা আবার ঋষির কাছে ফিরে এসে বলল—'আপনি কি বলতে চাইছেন—প্রাণশক্তিই আত্মা?" ঋষি বললেন—"নিজেই সন্ধান করে নাও; তুমিই তিনি।" দেবতাটি বাড়ি ফিরে এল, বুঝল—তবে বোধহয়, মনই আত্মা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখতে পেল—চিন্তার কত না বিভিন্নতা, কখনো তা ভালো, কখনো মন্দ; মন এত চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল যে তা কখনো আত্মা হতে পাবে না। ঋষির কাছে ফিরে এসে সে বলল—"প্রভু, মনই যে আত্মা আমার এমন বোধ হয় না, আপনি কি তাই বলতে চাইছেন?" "না, তুমিই তিনি, নিজেই বুঝে নাও।" দেবতা বাড়ি চলে গেল, এবং শেষ অবধি বুঝতে পারল যে সেই হল আত্মা। সমস্ত চিন্তা-জগতের অতীত সেই এক—যার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—যাকে অস্ত্র ভেদ করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না, যাকে বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, জল দ্রবীভূত করতে পারে না,—সেই অনাদি, অনন্ত, অচল, স্পর্শাতীত, প্রত্যক্ষাতীত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আত্মা। সে বুঝল যে আত্মা এই দেহ নয়, মনও নয়—দেহমনের অতীত কিছু। এবার তার তৃপ্তি হল; কিন্তু বেচারা দানব দেহাসক্তির জন্যই সত্যকে লাভ করতে পারল না।

এই পৃথিবীতে ঐরূপ বহু দানবীয় চরিত্র আছে, তবে কিছু দেবতাও আছে। ইন্দ্রিয়-উপভোগ বৃদ্ধির জন্য কেউ যদি কোন বিজ্ঞান শেখাতে চান, তেমন ছাত্র পাওয়া যাবে হাজার হাজার। কিন্তু কেউ যদি পরম লক্ষ্য কি জানাতে ব্রতী হয় তো তা শুনবার জন্যে বড় একটা লোক জুটবে না। উচ্চতর কিছু গ্রহণ করবার শক্তি খুব কম লোকেরই আছে, আরো কম লোকের আছে ওখানে পৌঁছবার মতো ধৈর্য। তবুও কেউ কেউ আছে যারা জানে এই দেহকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু পরিণামটা হবে একই রকম। যে শক্তিগুলি দেহকে অটুট রেখেছে সেগুলির বিলোপ ঘটলেই দেহেরও পতন হবে। এমন কেউই জন্মায়নি যে এক মুহূর্তের জন্যও দেহের পরিবর্তন রোধ করতে পারে। পরিবর্তনধারার নামই দেহ। নদীতে যেমন জলধারা প্রতি মুহূর্তেই আমার চোখের সামনেই পরবর্তিত হচ্ছে, নতুন জলধারা নেমে আসছে, অথচ একই আকার ধারণ করছে,—তেমনি ঘটছে এই দেহের ক্ষেত্রেও। তবুও এই দেহকে বলবান ও স্বাস্থ্যবান রাখতে হবে। আমাদের আয়ত্তে এর চেয়ে ভালো যন্ত্র আর নেই।

মানবদেহই বিশ্বসৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট দেহ। অন্য সব প্রাণীর চেয়ে মানুষই উচ্চতর,—সমস্ত দেবদূতদের চেয়েও—মানুষের চেয়ে মহান কেউই নয়। মানবদেহ ধারণ

করে মুক্তিলাভের জন্য এমন কি দেবতাদেরও ফিরে ফিরে আসতে হয়। একমাত্র মানুষই সিদ্ধি লাভ করতে পারে, দেবতারাও নয়। ইহুদীদের ও মুসলমানদের মতানুযায়ী দেখা যায়, দেবতাদের ও অন্য সবকিছু সৃষ্টির পরেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, এবং মানুষ সৃষ্টির পরেই তিনি দেবতাদের বললেন এগিয়ে এসে মানুষকে প্রণাম জানাতে। সকলেই তাই করল, এক ইব্লিশ ছাড়া। ঈশ্বরের অভিলাষে তাই সে হল শয়তান। এই রূপকের অন্তরালে নিহিত রয়েছে একটা বড় সত্য, এবং সেটা হল যতরকম জন্ম থাকতে পারে তার মধ্যে মানবজন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টি, যেমন পশুপ্রাণ—তা হল বুদ্ধিহীন এবং প্রায়শই তমঃশক্তিদ্বারা গঠিত। প্রাণিকুল কোনো রকম উচ্চচিন্তা করতে পারে না, দেবদূত ও দেবতারাও মানবজন্ম গ্রহণ না করেই সরাসরি মুক্তি লাভ করতে পারে না। অনুরূপভাবেই মানবসমাজেও মাত্রাধিক সম্পদ বা মাত্রাধিক দারিদ্র্য আত্মার উচ্চতর বিকাশের পক্ষে বড়ো রকমের বাধা। তাই মধ্যবিত্ত-শ্রেণী থেকেই এসে থাকে মহাপুরুষগণ। কারণ, এখানেই শক্তিসমূহ সামঞ্জস্য লাভ করে ভারসাম্য রক্ষা করে।

আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। এবারে প্রাণায়ামের অর্থাৎ শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের কথা। মনঃশক্তি একাগ্রকরণের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? এই দেহরূপ যন্ত্রের মূলচক্র যেন শ্বাস। বড় যন্ত্রে দেখবে, প্রথমে চলতে সুরু করে মূলচক্রটা, আর তার বেগ সঞ্চালিত হতে থাকে ছোট ছোট ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিতে, শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশও চলতে থাকে। এই দেহের সবকিছুতেই ইচ্ছাশক্তিকে যোগান দিতে ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে শ্বাস হল যেন সেই মূলচক্র।

বড় এক রাজার ছিল এক মন্ত্রী। মন্ত্রী খুব অপমানের মধ্যে পড়লেন। রাজা শাস্তিস্বরূপ আদেশ দিলেন খুব উঁচু এক স্তম্ভের মধ্যে তাকে বন্দী করে রাখতে। তা করা হলে মন্ত্রী সেখানেই পড়ে রইল মৃত্যুর অপেক্ষায়। তার ছিল এক সাধ্বী স্ত্রী। রাত্রে সে স্তম্ভের কাছে এসে জানতে চাইল স্বামীকে সাহায্য করবার জন্যে সে কী করতে পারে। মন্ত্রী তাকে বলল সে যেন পরের দিন রাত্রে সঙ্গে নিয়ে আসে একটা লম্বা কাছি, শক্ত এক গাছি দড়ি, একগুচ্ছ সুতো, রেশমী সুতো, একটা গুবরে পোকা এবং কিছুটা মধু। স্ত্রী তা শুনে বিস্মিত হলেও স্বামীর কথামতোই নিয়ে এল তার ঈপ্সিত জিনিসগুলো। স্বামী তাকে বলে দিল গুবরে পোকাটার সঙ্গে রেশমী সুতোটা বেশ শক্ত করে বাঁধতে, তারপর ওর শুঁড় দুটোতে বেশ করে মধু মাখিয়ে স্তম্ভের প্রাচীরে ছেড়ে দিতে—পোকাটার মাথাটা উপর দিকে রেখে। সব নির্দেশই সে পালন করল, এবার পোকাটাই তার দীর্ঘযাত্রা সুরু করে দিল। সামনের দিকে মধুর গন্ধ পেয়ে সে মধু পাবার আশায় সুড়সুড় করে উপরে উঠতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত স্তম্ভের উপরে উঠে এলো। মন্ত্রী তখন গুবরে পোকাটা ধরে ফেলল—রেশমী সুতোটাও পেয়ে গেল। সে তার স্ত্রীকে বলল সুতোর গাছিটার সঙ্গে রেশমী সুতোর গোড়ার দিকটা বেঁধে দিতে। মন্ত্রী এবার সুতোটা তুলে নিল। এবারে সে একইভাবে ভাবেই দড়িটা এবং তারপর কাছিটা উপরে তুলে আনল। এবারে বাকী কাজটা সহজ। মন্ত্রী কাছি বেয়ে নেমে এল সেই উঁচু

স্তম্ভ থেকে, এবং পালিয়ে চলে গেল। আমাদের এই দেহেও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হল ঐ 'রেশমী সুতো', ওটাকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে জানলেই আমরা স্নায়ুতন্ত্রী-প্রবাহকে আয়ত্তে আনতে পারব, এবং তারপর দৃঢ় চিন্তাসূত্রকে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণরজ্জুকে—যার নিয়ন্ত্রণেই লাভ করতে পারব মুক্তি।

আমরা আমাদের দেহ প্রসঙ্গে তো কিছুই জানি না, জানতে পারি না। বড জোর একটা মৃতদেহকে খণ্ড খণ্ড করতে পারি, অনেকে জীবন্ত প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করে ভেতরে কি কি আছে দেখতে পারেন। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই, আমাদের দেহের প্রসঙ্গে কিছুই বড়ো একটা জানতে পাই না। কেন জানতে পাই না? যেহেতু আমাদের মনোযোগ এত সূক্ষ্ম নয় যে আমাদের অভ্যন্তরে যেসব অতিসূক্ষ্ম গতি আছে তাই আলাদা করে ধরতে পারবে। মন যখন আরো সূক্ষ্ম হয়ে দেহের মধ্যে তার গভীরতর স্থান-গুলিতে প্রবেশ করে কেবলমাত্র তখনই আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব। সূক্ষ্ম দর্শন লাভের জন্য স্থূল দর্শন দিয়েই সুরু করতে হবে। যা সমস্ত যন্ত্রটাকে চালিত করছে তাকেই প্রথম অবলম্বন করতে হবে। এবং সেটিই হল প্রাণ, এবং সেই প্রাণের সুস্পষ্ট প্রকাশ হল শ্বাস। তাহলে এই শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে প্রবেশ করব, এই শ্বাসই আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে—স্নায়ু-প্রবাহকে। যখনই তাদের উপলব্ধি ও অনুভব করতে থাকব, তাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ—দেহের উপরে নিয়ন্ত্রণ সুরু হবে। ওইসব বিভিন্ন রকম স্নায়ু-প্রবাহ দ্বারা। মনেও গতি সঞ্চালিত হয়, এবং তাই শেষ পর্যন্ত আমরা দেহ ও মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে—দুটিকেই আমাদের দাস করে আমরা দেহের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থায় এসে পৌঁছব। জ্ঞানই শক্তি। আমাদের এই শক্তি লাভ করতে হবে। তাই একেবারে সুরুর সুরুতেই সুরু করতে হবে প্রাণায়ম দিয়ে—প্রাণ-সংযত করে। এই প্রাণায়াম এক সুদীর্ঘ বিষয়, ভালোভাবে বোঝাতে কয়েকটা পাঠ দরকার হবে। আমরা একে একে তাই করব।

ক্রমে ক্রমে আমরা দেখতে পাব প্রত্যেকটি সাধন-ক্রিয়ার হেতু কি, এবং দেহের অভ্যন্তরে কি কি শক্তি সঞ্চালিত হয়। এ সব কিছুই আমাদের অধিকারে আসবে, তবে সেজন্যে চাই নিত্য অভ্যাস, অভ্যাসের ফলই দেখা দেবে প্রমাণ রূপে। আমি যতই যুক্তি দিয়ে বোঝাই না কেন, তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষভাবে না জানা পর্যন্ত তোমাদের কাছে তা প্রমাণ হবে না। তোমাদের সর্বদেহে ঐসব প্রবাহ সঞ্চালিত হচ্ছে যেইমাত্র বুঝতে পারবে, দূর হয়ে যাবে সন্দেহ, তবে প্রত্যহই কঠিন অভ্যাস প্রয়োজন। প্রত্যহ কমপক্ষে দুবার অভ্যাস করবে, আর সবচেয়ে অনুকূল সময় হল সকাল ও সন্ধ্যা। রাত্রি যখন দিনের মধ্যে বিলীন হয়, বা দিন রাত্রির মধ্যে—তখন পারস্পারিক সম্পর্কে দেখা দেয় এক শান্ত অবস্থা। প্রত্যূষ ও সায়ংসন্ধ্যা হল এই দুই শান্ত সময়কাল। ঐ সময়ে দেহেও শান্ত ভাব আসে। ঐ স্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেই অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসের আগে খাবে না—এই

নিয়ম নির্দিষ্টরূপেই পালন করবে। যদি করো তো ক্ষুধার শক্তিই তোমার আলস্যের বাঁধ ভেঙে দেবে। ভারতবর্ষে ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়, অভ্যাসের আগে বা পুজোর আগে তারা কখনোই যেন খাবার না খায়, এবং কিছুদিন পরে এটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। স্নান ও অভ্যাসের আগে আর ক্ষুধাই পাবে না।

যাদের পক্ষে সম্ভব অভ্যাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকলে ভালো হয়। সে ঘরে ঘুমোবে না, ঘরটাকে পবিত্র রাখা চাই। স্নান করে এবং দেহে মনে সম্পূর্ণভাবেই পবিত্র হয়ে তবেই সে ঘরে প্রবেশ করবে। ঘরে সর্বদাই ফুল রাখবে। এসব হল যোগীর যোগ্য পরিবেশ; আনন্দদায়ক ছবিও। সকাল সন্ধ্যা ধূপধুনো জ্বালবে। ঐ ঘরে ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি বা কুচিন্তা করবে না। সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেবে কেবলমাত্র তোমার মতো ভাবের লোকদেরই। তবেই ক্রমে ক্রমে ঘরটিতে এক পবিত্রতার পরিবেশ বিরাজ করবে যে তোমার মনে দুঃখ বা বেদনা বা সংশয় জাগলে বা তুমি বিব্রত বোধ করলে সেই ঘরে প্রবেশমাত্র সেই ঘরই তোমার মনকে শান্ত করে তুলবে। মন্দির বা গীর্জার ভাবই ছিল এমনটা, আজকালও কোনো কোনো মন্দিরে বা গীর্জায় এমনটাই দেখতে পাবে, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই তা নষ্ট হয়ে গেছে। ভাবটা হল এইরকম : পবিত্র স্পন্দন বর্তমান থাকার জন্য ক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আলাদাভাবে একটা ঘর রাখা যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা যে কোনো জায়গায় বসেই অভ্যাস করবে। সোজা হয়ে বসবে। তারপর প্রথম কাজ হল সমস্ত সৃষ্টিতেই সৎচিন্তার প্রবাহ প্রেরণ করা। মনে মনে বারংবার আবৃত্তি করো : "সকলে সুখী হোক, সকলের শান্তি হোক, সকলেই আনন্দিত হোক।" এমনটা করবে পূর্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে, উত্তর দিকে, পশ্চিম দিকে। ঐরূপ যত করবে ততই তুমি ভালো বোধ করবে। শেষ অবধি বুঝতে পারবে আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল অন্যদের সুস্থ দেখা, নিজেদের সুখী করার সহজতম পন্থা হল অন্যদের সুখী দেখা। যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তারা এরপর প্রার্থনা করবে—ধন নয়, স্বাস্থ্য নয়, স্বর্গ ও নয়; প্রার্থনা করবে জ্ঞান ও জ্যোতি; অন্যসব প্রার্থনাই স্বার্থসন্ধী। আর একটা কর্তব্য হল নিজের দেহ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তা যেন সবল ও সুস্থ থাকে। কারণ এটাই তো আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র। ভাববে, দেহটা এত সবল যেন এক দুর্দান্ত শক্তি, এবং এই রকম দেহের সাহায্যেই জীবন-সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে। দুর্বলের কখনোই মুক্তির সন্ধান পায় না। দূর করো সমস্ত দুর্বলতা। দেহকে বলো—তুমি শক্তিমান; মনকে বলো—তুমি শক্তিমান; নিজের উপরে রাখো অসীম বিশ্বাস আর প্রত্যাশা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাণ

অনেকেই মনে করেন প্রাণ হল শ্বাসবায়ুরই কোনো ব্যাপার, কিন্তু তা নয়; শ্বাসবায়ুর সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। যে সব অনুশীলন মাধ্যমে যথার্থ প্রাণায়াম সাধন করা যায়, শ্বাস তাদের একটি মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ হল প্রাণকে সংযত করা। ভারতবর্ষের দার্শনিকদের মতে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে দুটি উপাদানের দ্বারা, তাদের মধ্যে একটি হল আকাশ। আকাশ হল সর্বত্রবিরাজমান সর্বাত্মক সত্তা। যা কিছুরই আকার আছে, যা কিছুই সমন্বয়ের পরিণতি, তা প্রকাশিত হয়েছে এই আকাশ থেকে। এই আকাশই হয় যা কিছু বায়বীয়, যা কিছু তরল, যাকিছু কঠিন। এই আকাশই হয় সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, তারকা, ধূমকেতু, এই আকাশই হয় মানবদেহ, প্রাণিদেহ, উদ্ভিদ, যা কিছুই সাকারে আমরা দেখি, যা কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা কিছুই আছে। এই আকাশকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না; এত সূক্ষ্ম যে তা সমস্ত সাধারণ অনুভবেরই অতীত। স্থূল হলেই, আকার পরিগ্রহ করলেই একমাত্র তা দেখা যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল এই আকাশ। চক্রশেষে এই কঠিন, বায়বীয় ও বাষ্পীয় সবকিছুই আবার বিলীন হবে আকাশে, পরবর্তী সৃষ্টি সুরু হবে এই আকাশ থেকেই।

কি মহাশক্তিতে এই আকাশ থেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি? প্রাণশক্তির দ্বারা। আকাশ যেমন অসীম, সর্ববিরাজমান বিশ্ব-উপাদান, তেমনি প্রাণও এই বিশ্বের অসীম ও সর্ববিরাজমান প্রকাশ-শক্তি। সৃষ্টিচক্রের প্রারম্ভে ও পরিণামে সমস্তই হয়ে যায় আকাশ; এবং বিশ্ব-নিহিত সমস্ত শক্তিই প্রাণে লীন হয়। পরবর্তী চক্রে এই প্রাণ থেকেই প্রকাশিত হয় সবকিছু—যাকে আমরা বলি গতি, বলি শক্তি। প্রাণই প্রকাশিত হয় গতিরূপে; প্রাণই প্রকাশিত হয় মাধ্যাকর্ষণ রূপে, চৌম্বকশক্তি-রূপে। প্রাণই প্রকাশিত করে দৈহিক কার্যকলাপ—স্নায়ুপ্রবাহ রূপে, চিন্তশক্তিরূপে। চিন্তাশক্তি থেকে নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সবকিছুই তো প্রাণেরই প্রকাশ। কি মানসিক, কি শারীরিক এই বিশ্বের সমস্ত শক্তির সমাহারই যখন তাদের প্রথম আদি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে এখনই তাকে বলে প্রাণ। "যখন 'হাঁ' বা 'না' কিছুই ছিল না, যখন সব অন্ধকারকে আবৃত করে রেখেছিল এক অন্ধকার, তখন কী ছিল? ছিল গতিহীন আকাশ।" তখন প্রাণের শারীরিক গতি রুদ্ধ ছিল, তবে তা বর্তমান ছিল ঠিকই। চক্রান্তে (কল্পান্তে) এই বর্তমান বিশ্বে প্রকাশিত সমস্ত শক্তিই শান্ত অবস্থা ধারণ করবে, হবে কার্যকর শক্তি। পরবর্তী চক্রে আবার তা জেগে উঠবে, আলোড়িত হবে, আঘাত করবে আকাশকে, এবং আকাশ থেকে দেখা দেবে এসব সাকার রূপ। আকাশে পরিবর্তন দেখা দিলে প্রাণও শক্তির এই সব পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। আমরা যাকে প্রাণায়াম বলি আসলে তা হল এই প্রাণের জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ।

এই প্রাণায়ামই খুলে দেয় অনন্ত-প্রায় শক্তির সিংহদ্বার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যিনি প্রাণকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, জগতের কোন্ শক্তিই বা তাঁর নয়? তিনি সূর্য-তারকাকে স্থানচ্যুত করতে পারেন, বিশ্বের সবকিছুকেই—পরমাণু থেকে সর্ববৃহৎ সূর্যদেব পর্যন্ত—নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কারণ তিনি প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এটাই হল প্রাণায়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যোগী যখন সিদ্ধিলাভ করেন তার নিয়ন্ত্রণাধীন নাই এমন কিছুই থাকতে পারে না। তাঁর আদেশ মাত্র দেবতারা বা বিগতদের আত্মারা এসে উপস্থিত হবে। প্রকৃতির শক্তি-সমূহ তাঁর আদেশ পালন করবে ভৃত্যের মতো। অজ্ঞেরা যোগীর মধ্যে এইসব শক্তি দেখে তাকে বলে অলৌকিক কাণ্ড। হিন্দুমানসের একটা বৈশিষ্ট্য হল—তা যতদূর সম্ভব শেষ সাধারণীকৃত ভাবেরই সন্ধান করে থাকে, তারপরেই গ্রহণ করে খুঁটিনাটি মীমাংসার প্রশ্ন। বেদে এই প্রশ্নই উচ্চারিত হয়েছে: 'যাকে জেনে আমরা সবই জানতে পাব তা কী?' তাই, যত সব গ্রন্থ, যত সব লিখিত দর্শন তো তাঁর উদ্দেশেই প্রমাণ উপস্থিত করছে—যাঁকে জানলে সবই জানা হয়ে যায়। এই বিশ্বকে কেউ যদি খণ্ড খণ্ড রূপে জানতে চায় তো তাকে জানতে হবে প্রত্যেকটি ধূলিকণাকেও, এবং তাতে তো প্রয়োজন হবে অনন্তকাল; আর সবটা সে জানতেও পারবে না।

তাহলে জ্ঞান কী করে সম্ভব? বিশেষকে জেনে মানুষ তবে কী করে সর্বজ্ঞ হবে? যোগী বলেন বিশেষের প্রকাশের পশ্চাতে রয়েছে সাধারণ সত্য। প্রত্যেকটি বিশেষ ভাবের পশ্চাতে রয়েছে সাধারণীকৃত, বিমূর্ত নীতি। তাকেই ধারণ করেছ তো সবকিছুকেই ধারণ করতে পেরেছ। এই নিখিল বিশ্বকেই যেমন বেদে সাধারণীকৃত ভাবে বলা হয়েছে এক পরম সত্তা, আর এই সত্তাকে যিনিই ধারণ করতে পেরেছেন তিনি সমস্ত বিশ্বকেই ধারণ করেছেন। তেমনিভাবেই এই প্রাণের মধ্যেই সাধারণী-কৃত রূপ পেয়েছে সমস্ত বিশ্বশক্তি, এবং যিনিই প্রাণকে ধারণ করতে পেরেছেন তিনি মানসিক ও দৈহিক সমস্ত বিশ্বশক্তিকেই ধারণ করেছেন। এই প্রাণ যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন নিজের সমস্ত মানসিক অস্তিত্বকে, সমস্ত দেহের অস্তিত্বকে; কারণ, প্রাণই হল শক্তির সাধারণীকৃত প্রকাশ।

প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ-পন্থাই প্রাণায়ামের একমাত্র বিষয়। এ প্রসঙ্গে অন্যসব শিক্ষা ও অনুশীলনও ঐ একমাত্র লক্ষ্যের অন্তর্গত। যে যেখানে আছো, সেখানে থেকেই সুরু করতে হবে, সবচেয়ে নিকটের যা তাকেই নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা করতে হবে। এই দেহ আমাদের সবচেয়ে নিকটের—বহির্জগতের যে কোনো কিছুর চেয়ে নিকট, এবং মন হল নিকটতম। এই মনে ও দেহে যে প্রাণ ক্রিয়াশীল সে-ই তো বিশ্বের সমস্ত প্রাণের চেয়ে নিকটতম। ছোট এক প্রাণতরঙ্গ যা আমাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তিকেই প্রকাশ করে, তাই তো অসীম প্রাণসমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গের চেয়েও নিকটতম। আমরা যদি ঐ ছোট তরঙ্গটি নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হই, তবেই তো সমস্ত প্রাণকে নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে পারে। যে যোগী তা পারেন তিনিই পূর্ণতা লাভ করেছেন; তিনি আর কোনো শক্তির অধীন হন না। তিনি হয়ে উঠেন প্রায় সর্বশক্তিমান, প্রায় সর্বজ্ঞ। এই প্রাণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এমন বহু শ্রেণী আমরা সবদেশে দেখতে পাই।

এদেশে আছে মনঃ-চিকিৎসক, বিশ্বাস-চিকিৎসক, প্রেতত্ত্বজ্ঞানী, খ্রীষ্টীয়-বিজ্ঞানী, সম্মোহনবিদ ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন দলকে যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি তো প্রত্যেকের পশ্চাতেই কাজ করছে এই প্রাণ-নিয়ন্ত্রণ—এ ব্যাপারে তারা সচেতন থাকুক বা নাই থাকুক। তাদের সমস্ত মতগুলিকে সিদ্ধ করলে শেষে পড়ে থাকবে এটিই। সেই এক শক্তিকেই তারা কাজে লাগাচ্ছে, তবে অচেতনভাবে। তারা চলতে গিয়ে যেন হুচোট খেয়ে পড়েই আবিষ্কার করে ফেলেছে এক শক্তিকেই এবং তার প্রকৃতি না জেনেই কাজে লাগাচ্ছে; ঐ শক্তিই যোগীও ব্যবহার করছেন, এবং ঐ প্রাণ থেকেই যা এসেছে।

প্রত্যেক অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমান রয়েছে প্রাণ। চিন্তা হল প্রাণেরই সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া। চিন্তার যতটুকু আমরা দেখি তাই সবটা নয়। আমরা যাকে প্রবৃত্তি বা অচেতন চিন্তা বলি—যা হল ক্রিয়ারই নিম্নতম স্তর বিশেষ—সেটিও রয়েছে। একটা মশা যদি কামড়ায় তো হাতখানা স্বতঃই এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানে আঘাত করবে। এটা হল চিন্তারই এক প্রকাশ। দেহের সমস্ত প্রতিক্রিয়াই চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত। অন্য স্তরের চিন্তাও আছে—তাহল সচেতন। আমি যুক্তি দিচ্ছি, বিচার করছি, চিন্তা করছি, কোনো জিনিসের অগ্র-পশ্চাৎ ভাবছি—এসবও সবটা নয়। আমরা জানি যুক্তি হল সীমাবদ্ধ; কতকটা দূর অবধিই তা যেতে পারে, তারপরে আর নয়। যে বৃত্তের মধ্যে তা ঘুরপাক খায় সত্যিই তা বড়ই সীমিত। তবু তো আমরা দেখি ঘটনাগুলি এই বৃত্তের মধ্যে সবেগে চলে আসছে। ধূমকেতুর আগমনের মতোই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় এই বৃত্তের মধ্যে এসে পড়ে; এটা সত্য, তারা গণ্ডির সীমারেখার বাইরে থেকেই এসে থাকে, আমাদের চিন্তা যদিও গণ্ডির সীমার বাইরে পেরিয়ে যেতে পারে না। এই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাইরের প্রাকৃতিক ঘটনার অনধিকার প্রবেশের কারণগুলি কিন্তু ঐ গণ্ডির বাইরেই বর্তমান। মন আরো উচ্চতর স্তরে স্থিতি লাভ করতে পারে—তাকে বলে অতি-চেতন। মন যখন এই স্তরে অবস্থান করে, যাকে বলে সমাধি বা পূর্ণ একাগ্রতা, পরম চেতনা—তখন তা যুক্তির সীমানা পেরিয়ে যায়, উপনীত হয় সত্যঘটনার মুখোমুখি—কোনো প্রবৃত্তি বা যুক্তিই যা কখনো জানতে পারে না। দেহের সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ সাধনার ফলে মনকে ঠেলে দেয়, উপরে তুলে ধরতে সহয়তা করে, হয়ে ওঠে পরম চেতনা, এবং সেখান থেকেই প্রাণ তখন ক্রিয়াশীল হয়।

এই বিশ্বের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরেই রয়েছে চলমান বস্তু। সাকাররূপে এই বিশ্ব তার একটি; সূর্য ও তুমি—এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বৈজ্ঞানিক বলবেন এর উল্টোটা বলা হল অলীক কল্পনা। একটা টেবিলে ও আমাতে সত্যিকার কোনো পার্থক্য নেই; বস্তুপিণ্ডের একটা দিকে টেবিল, একটা দিকে আমি। অসীম বস্তু-সমুদ্রে সব কিছুই যেন এক-একটা ঘূর্ণি, কোনোটাই স্থির নয়। একটা ধাবমান স্রোতে যেমন লক্ষ লক্ষ ঘূর্ণি থাকতে পারে, যেখানে জল প্রতি মুহূর্তে রূপ পাল্টাচ্ছে, পলকে পলকে ঘুরে ঘুরেই সরে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে নতুন জলধারা,—ঠিক তেমনি

নিখিল বিশ্বই হল এক সতত পরিবর্তনশীল বস্তুপিণ্ড এবং তার মধ্যে অস্তিত্বের সমস্ত আকারই যেন বহু বহু ঘূর্ণাবর্ত। এক বস্তুপিণ্ড মানবদেহরূপ এক ঘূর্ণিতে প্রবেশ করে কিছু নির্দিষ্টকাল অবস্থান করে, পরিবর্তিত হয়ে বেরিয়ে চলে যায়, এই রূপে এবার কোনো প্রাণিদেহে, এবং সেখান থেকে আবার কয়েকবৎসর পরে প্রবেশ করে আর এক ঘূর্ণাবর্তে, বলা যাক এক পিণ্ড খনিজ পদার্থে। এটা নিত্য পরিবর্তন। কোনো দেহই স্থির নয়। আমার দেহ তোমার দেহ বলে কিছুই নেই—আছে কেবল কথায়ই শুধু। অতিকায় বস্তুপিণ্ডের একটা বিন্দুকে বলা হল চাঁদ, একটা বিন্দু সূর্য, আর একটা বিন্দু মানুষ, আরেকটা ধাতু। কোনোটাই স্থির নয়, সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে, পদার্থ কেবলই সংশ্লিষ্ট হচ্ছে ও বিশ্লিষ্ট হচ্ছে। মনের ক্ষেত্রেও তাই। পদার্থের প্রতিরূপ হল 'ঈথার'; প্রাণের সবচেয়ে সূক্ষ্ম-রূপে স্পন্দনের সূক্ষ্মতর অবস্থায় এই 'ঈথার'-ই হয়ে উঠবে মন, এবং তখনো তা হবে এক অখণ্ড পিণ্ড। সরাসরি ঐ সূক্ষ্ম স্পন্দনে পৌছতে পারলে দেখবে ও অনুভব করবে যে নিখিল বিশ্ব সূক্ষ্ম কম্পনের দ্বারাই গঠিত। ইন্দ্রিয়চেতনা বজায় থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো ঔষধ ঐ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। স্যার হামফ্রি ডেভির বিখ্যাত পরীক্ষার কথা তোমাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে। হাস্যোদ্রেককারী বাষ্প দ্বারা অভিভূত অবস্থায় বক্তৃতাদানকালেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন অনড় এবং বিভ্রান্ত হয়ে, এবং তারপরে তিনি বলেছেন, সমস্ত বিশ্বই ভাবরাশি দিয়ে গড়া। কিছুক্ষণের জন্য যেন বিশ্বের স্থূল স্পন্দন থেমে গিয়েছিল, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলিই তার কাছে যেন উপস্থিত ছিল—যাকে তিনি বলেছেন ভাবরাশি। তাঁর চারদিকে তিনি দেখেছেন কেবল স্পন্দনমালা, সবকিছুই তাঁর কাছে হয়ে গেছে চিন্তারাশি; সমস্ত বিশ্বই হয়ে গেছে চিন্তাসাগর, সে নিজে এবং আর সকলেই হয়েছে এক-একটি ছোট ছোট ঘূর্ণি!

অনুরূপভাবেই, ভাবময় বিশ্বে আমরা দেখতে পাই এক ঐক্য, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের যখন আত্মপ্রাপ্তি ঘটে আমরা জানতে পারি যে সেই আত্মা হতে পারে এক-মাত্র। স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোনো বস্তু-স্পন্দনের বাইরে, গতির বাইরে আছে কেবল এক। এমনকি গতির প্রকাশেও আছে কেবল ঐক্য। এই সত্য আর অস্বীকৃত হবার নয়। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে বিশ্বের শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। এটাও প্রমাণিত হয়েছে এই সমস্ত শক্তির সমষ্টি দুই রূপে বর্তমান। তা কখনো থাকে নিহিত, স্তিমিত বা শান্ত; আবার তারপরেই দেখা দেয় এইসব বিভিন্ন প্রকার গতিবেগ রূপে; তারপরে আবার তা ফিরে যায় শান্ত অবস্থায়, তারপর আবার প্রকাশিত হয়। এই ভাবেই সংকোচন ও বিকাশ চলছে অনন্তকাল। পূর্বেই যেমন বর্ণিত হয়েছে, সেই প্রাণের নিয়ন্ত্রকেই বলা হয় প্রাণায়াম।

মানবদেহে এই প্রাণের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ হল ফুসফুসের সঞ্চালন গতি। ওটি যদি বন্ধ হয় তো, রীতিসম্মতভাবেই শরীরের অন্যান্য শক্তি ও গতি-প্রকাশক অন্য সব কিছুও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা ঐ গতি বন্ধ করেও বেঁচে থাকে। কেউ কেউ দিনের পর দিন মাটির তলায় থেকেও শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। সূক্ষ্মতে যেতে হলে স্থূলের সাহায্য নিতেই হবে, এবং সেজন্যে

লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত সবচেয়ে সূক্ষ্মের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। বস্তুত প্রাণায়াম হল ফুসফুসের গতিকে নিরুদ্ধ করা। শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণায়াম সৃষ্টি করছে না, বরং প্রাণায়ামই তা করছে। নিঃসরণ-প্রসরণ যন্ত্রের কার্যের মতো (পাম্পের মতো) সঞ্চালন গতিই বায়ু ভিতরে টেনে নিচ্ছে। কাজেই প্রণায়াম শ্বাসক্রিয়া নয়, বরং ফুসফুসকে যে পেশীগত শক্তি গতিশীল করে তাকেই নিয়ন্ত্রণ করা। যে পেশীগত শক্তি স্নায়ুপথে পেশীতে এবং পেশী থেকে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট নিয়মে তাকে সঞ্চালিত করে তা-ই হল প্রাণ, প্রাণায়াম অভ্যাসে এই প্রাণকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাব যে দেহে প্রাণের অন্যান্য ক্রিয়াও ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসবে। আমি নিজেই এমন অনেক লোক দেখেছি যারা তাদের দেহের প্রায় প্রত্যেকটি মাংসপেশীকেই আয়ত্তে এনেছে; কেন তা পারবে না? কোনো এক পেশীই যদি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে, দেহের প্রত্যেকটি পেশী ও স্নায়ুই নিয়ন্ত্রণে আসবে না কেন? তাতে এমনকি অসম্ভবতা থাকতে পারে? বর্তমানকালে নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে, গতি হয়ে পড়েছে স্বয়ংক্রিয়। আমরা ইচ্ছামতো কান নাড়াতে পারি না, জন্তুরা পারে। আমাদের সে শক্তি নাই, কারণ তার অনুশীলন নেই। এটাকেই বলে বংশার্জিত গুণ।

আবার, একথাও আমরা জানি, একটা সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা যায়। কঠিন কাজ ও অনুশীলনের দ্বারা দেহের সর্বাপেক্ষা সুপ্ত গতিকেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলে জাগ্রত করা যায়। এইভাবে যুক্তি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, অসম্ভব বলে কিছুই নেই, বরং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। প্রাণায়ামের মাধ্যমে যোগী তাই করেন। তোমরা জেনে থাকবে প্রাণায়ামে শ্বাস-গ্রহণের কালে প্রাণ দ্বারা তোমার সমস্ত শরীর পূর্ণ করে তুলতে হয়। ইংরেজী অনুবাদে প্রাণকে বলা হয়েছে শ্বাস, এবং তোমরা তাই জিজ্ঞেস করতে পারো তাহলে তা কী করে হবে। দোষটা হল অনুবাদকের। দেহের প্রত্যেকটি অংশকেই মূলশক্তিরূপী প্রাণ দ্বারা পূর্ণ করা যায়। আর সেটা করতে পারলেই সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। দেহের যত অসুস্থতা ও দুঃখকষ্ট তা পূর্ণরূপেই তখন নিয়ন্ত্রিত হবে; কেবল তাই নয়, তুমি অন্যের দেহকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। ভালো কি মন্দ এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই হল সংক্রামক। তোমার দেহ যদি একটা কঠিন অবস্থায় থাকে, তোমার প্রবণতা দেখা দেবে অমনটা অন্যের দেহেও সৃষ্টি করার। তুমি বলবান ও স্বাস্থ্যবান হলে তোমার ধারে-কাছে যারা বাস করে তাদেরও একটা আগ্রহ দেখা দেবে অমনটা হবার। কিন্তু তুমি যদি রুগ্ন ও দুর্বল হও তো, তোমার চারপাশের লোকেরও একটা প্রবণতা দেখা দেবে অমন রুগ্ন ও দুর্বল হবার জন্যে। একজন লোককে যদি আর কাউকে নিরাময় করতে হয় তো তার প্রথম ভাবটা এমন হবে—আমি নিজের স্বাস্থ্যকেই অন্যের উপরে সঞ্চারিত করে দেব। এটা হল নিরাময় করার আদিম পদ্ধতি। সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক, স্বাস্থ্য সঞ্চালিত করা যায়। একজন বিশেষ শক্তিমান এক দুর্বলের সঙ্গে বাস

করলে তাকে একটু না একটু বলবান করে তুলবেই—তা সে জানুক বা না জানুক। সচেতনভাবে হলে তাড়াতাড়ি এবং ফলও আরো ভালো হয়। এবার তার কথা আসছে যে নিজেই খুব স্বাস্থ্যবান নয়, তবু, আমরা জানি সেও অন্যকে সুস্থ করে তুলতে পারে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির প্রাণের উপর কিছুটা বেশী নিয়ন্ত্রণ আছে। এবং সে সাময়িকভাবে হলেও তার প্রাণশক্তিতে নিশ্চিতই কতকটা স্পন্দনের অবস্থা জাগ্রত করতে পেরেছে, এবং অন্যের উপর সঞ্চালিতও করতে পেরেছে।

অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া দূর থেকেও কাজ করেছে, তা তো ছেদ অর্থে দূর নয়। দূরত্বেই কি ছেদ হয়? তোমাতে ও সূর্যতে কি ছেদ আছে? এ তো এক অবিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জ, এক অংশ সূর্য, এক অংশ তুমি। নদীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কি ছেদ আছে? তাহলে গতি কেন সঞ্চরণ করতে পারবে না? এর বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। দূর থেকেই নিরাময় করার ঘটনা সম্পূর্ণই সত্য। প্রাণকে বহু বহু দূরেও সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রেই তেমনটা হয়, শত শত ঘটনা ভেল্কি শুধু। যতটা মনে করা হয়, নিরাময় প্রণালীটা অত সহজ নয়। অধিকাংশ সাধারণ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিরাময়কারীরা স্বভাবতই সুস্থ দেহেরই সুযোগ নিয়ে থাকে। একজন অ্যালোপ্যাথ এসে কলেরারোগীর চিকিৎসা করলেন—ঔষধপত্র দিলেন। একজন হোমিওপ্যাথ এসে ঔষধপত্র দিলেন, এবং সম্ভবত অ্যালোপ্যাথের চেয়েও ভালো-ভাবেই রোগ সারালেন, কারণ তিনি রোগীকে বিব্রত করেন না, বরং রোগীর প্রকৃতিকে তাদের সঙ্গে ক্রিয়া করতে দেন। বিশ্বাস-নিরাময়কারী আরো বেশী নিরাময় করতে পারেন, কারণ তিনি তাঁর মনের শক্তিকে প্রয়োগ করেন, এবং বিশ্বাসের শক্তিতে রোগীর মধ্যে সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করেন।

বিশ্বাস-নিরাময়কারীগণ প্রায়ই একটা ভুল করে থাকেন: তাঁরা মনে করেন বিশ্বাসই সরাসরি গিয়ে লোককে নিরাময় করে। কিন্তু একমাত্র বিশ্বাস দিয়েই সবটা হয় না। কতগুলি রোগ আছে যার সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ হল রোগী নিজেই কখনো ভাবে না যে তার সেই রোগ আছে। রোগীর এই প্রবল বিশ্বাসই হল তার রোগের একটা লক্ষণ, এবং এ দিয়েই বোঝা যায় যে সে অবিলম্বেই মারা যাবে। এখানে বিশ্বাসের মূল নিয়মটি খাটে না। একমাত্র বিশ্বাসেই যদি রোগ সারত, তবে তো এই রোগীরাও রোগমুক্ত হত। প্রাণ দিয়েই সত্যি সত্যি রোগমুক্ত করা যায়। যে পবিত্র ব্যক্তি তাঁর প্রাণকে নিয়ন্ত্রণে এনেছেন তাঁরই শক্তি আছে প্রাণকে স্পন্দিত অবস্থায় আনার, এবং তাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত করার—তাদের মধ্যে একই স্পন্দন জাগ্রত করার। প্রাত্যহিক কাজকর্মেই তোমরা এটা দেখো। আমি তোমাদের কাছে কথা বলছি। আমি কী করতে চেষ্টা করছি? বলা যায়, আমি আমার মনকে কোনো একটা স্পন্দিত অবস্থায় আনছি, এবং যতই তাতে আমি কৃতকার্য হব, ততই আমার কথার দ্বারা তোমরা প্রভাবিত হবে। তোমরা জানো, যেদিন আমি বেশী উৎসাহী হই, সেদিনই আমার ভাষণ তোমাদের বেশী ভালো লাগে; যখন আমার উৎসাহ কমে যায়, তোমাদেরও ঔৎসুক্যের অভাব ঘটে।

জগতের বিরাট ইচ্ছাশক্তি—জগৎ-চালক শক্তিই প্রাণকে সমুচ্চ স্পন্দিত স্তরে

তুলতে সক্ষম হয়, এবং এই শক্তি এত বড় ও শক্তিশালী যে অন্যদের তা মুহূর্তের মধ্যে স্পর্শ করে, এবং অসংখ্য লোক সেই অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, এবং অর্ধেক দুনিয়াই অনুরূপভাবে চিন্তা করে। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ আয়ত্ত করেছেন প্রাণের উপর এক আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ এবং লাভ করেছেন দুর্দম ইচ্ছাশক্তি, তাঁরা তাঁদের প্রাণকে সর্বোচ্চ স্তরে গতিবান করেছেন, এবং তার ফলেই দুনিয়াটাকে আন্দোলিত করবার শক্তি পেয়েছেন। সকল মানুষ এই রহস্য আয়ত্ত না করতে পারে, তবুও ব্যাখ্যা ঐ একটাই। কখনো বা এই প্রাণশক্তির সরবরাহ তোমার দেহের একটা অংশেই কম-বেশী সঞ্চালিত হতে পারে, তখন ভারসাম্য ব্যাহত হয়; আর প্রাণের ভারসাম্য ব্যাহত হলে আমরা যাকে রোগ বলি তাই সৃষ্টি হয়। প্রাণ থেকে অতিরিক্ত যা তাই সরিয়ে নিলে বা প্রাণের অভাব যেটুকু তা পূরণ করলে রোগ সারানো যায় এবং সেটাই ঐ প্রাণায়ামের ব্যাপার—দেহের কোনো অংশে যথাযথের চেয়ে কম কি বেশী প্রাণ আছে কিনা তাই জানা। উপলব্ধিগুলি এত সূক্ষ্ম হবে যে মনই অনুভব করে নেবে, পা কি হাতের আঙুলে প্রাণশক্তি যথোচিতের চেয়েও কম কিনা, এবং সেই অভাবটি পূরণ করতেও সক্ষম হবে। প্রাণায়ামের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রয়েছে এসবও। এসব ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে শিখতে হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, রাজযোগের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি হল প্রাণের বিভিন্ন স্তরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করারই শিক্ষাক্ষেত্র। কোনো লোক যখন তার সমস্ত শক্তিবেগ নিয়ন্ত্রিত করেছে, তখন সে দেহস্থিত প্রাণকেও আয়ত্ত করেছে, প্রাণের উপরেও প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। কেউ যখন সাধনা করছে তখনো সে প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

মহাসমুদ্রে আছে কত না প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ, ঠিক পর্বতের মতো; আছে ছোট ছোট তরঙ্গ, আরো ছোট, এমন কি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ পর্যন্ত; কিন্তু সবকিছুর পশ্চাতে রয়েছে তো সেই মহাসমুদ্রই। একদিকে বুদ্বুদের সঙ্গে যোগ রয়েছে অসীম সমুদ্রের, অন্যদিকে মহাতরঙ্গের সঙ্গে। অনুরূপভাবেই কেউ হতে পারে এক বিরাট ব্যক্তি, কেউ বা ক্ষুদ্র বুদ্বুদতুল্য; কিন্তু প্রত্যেকেই তো শক্তির অনন্ত মহাসমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং সৃষ্টির প্রত্যেকেরই তা জন্মগত অধিকারও বটে। যেখানে প্রাণ আছে, পিছনে রয়েছে অনন্ত শক্তির সঞ্চয়াগার। এক ছত্রাক থেকে সুরু করে, একটি মুহূর্ত থেকে সুরু করে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি বুদ্বুদ থেকে সুরু করে সবই ঐ অনন্ত সঞ্চয়াগার থেকে নিত্যনিয়ত শক্তি আহরণ করে—এক-একটা আকার ধীরে ধীরে স্থিরভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠে একটা চারাগাছ, তারপর একটা প্রাণী, তারপর এক মানুষ এবং শেষ পর্যন্ত ভগবান। এমনটা হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে, কিন্তু কাল বলতে কী বোঝায়? গতি বৃদ্ধি করলে, সাধনার সংগ্রাম বৃদ্ধি করলে কালের ব্যবধান ঘনিয়ে আসে। যোগী বলেন—যে কাজ করতে দীর্ঘকাল লাগে, কর্মের তীব্রতার দ্বারা তা সংক্ষিপ্ত করা যায়। এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত অনন্ত সঞ্চয় থেকে শ্লথভাবে যে লোক শক্তিবেগ আহরণ করবে, তার তো দেবতা হতে লাগবে সহস্র বৎসর, আর তারপর আরো উন্নত হতে হলে দরকার পাঁচশত সহস্র বৎসর, এবং একেবারে পূর্ণ হতে হলে চাই দশশত সহস্র বৎসর। তীব্রতর গতি দেখা

দিলে সময়ও সংক্ষিপ্ত হয়। ছ মাস বা এক বৎসর কালের মধ্যেই যথাসাধ্য চেষ্টায় ঐ পূর্ণতা লাভ সম্ভব নয় কেন? কোথাও তো বাধা নেই। যুক্তিই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা নিয়ে একটা বাষ্পযন্ত্র যদি প্রতি ঘণ্টায় দুইমাইল ছোটে, আরো বেশী পরিমাণ কয়লায় ঐ দূরত্ব আরো কম সময়ে অতিক্রম করবে। অনুরূপভাবে, আত্মা কেন তার ক্রিয়াকে তীব্রতর করে এই ইহজীবনেই পূর্ণতা লাভ করবে না? আমরা জানি, সমস্ত অস্তিত্বই শেষ পর্যন্ত পরিণামে সেই লক্ষ্য লাভ করবে। কিন্তু কে চায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের অপেক্ষা? কেন অবিলম্বেই তা হবে না—এমনকি এই দেহেই—এই মানুষ আকারেই? কেন, আমি এখুনি পাব না সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি?

যোগীর আদর্শ—সম্পূর্ণ যোগবিজ্ঞানের প্রয়োগের সীমা হল মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়ায়— এক সীমা থেকে আর এক সীমায় শ্লথগতিতে না চলে, সমস্ত মানবজাতিই যেকালে পূর্ণতা লাভ করবে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, সামঞ্জস্য-শক্তিকে তীব্রতর করে পূর্ণতালাভের সময় কিভাবে হ্রস্ব করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন। পৃথিবীর সমস্ত মহা-পুরুষগণ, সাধুসন্তগণ, দ্রষ্টাগণ—এঁরা কি করেছেন? একটিমাত্র জীবনসীমায়ই ধারণ করেছেন সমগ্র মানবজীবন, সাধারণ মানবসমাজকে পূর্ণতা লাভের জন্য যে দীর্ঘ সময় নিতে হবে তা অতিক্রম করে এসেছেন। এক জীবনেই তাঁরা পূর্ণতা লাভ করেছেন, তাদের আর কোনো ভাবনা ছিল না; অন্য কোনো ভাবের জন্য এক মুহূর্তও বাঁচবার ছিল না, তাই তো তাঁদের জন্য পথ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল একেই বলে মনঃসংযোগ—সামঞ্জস্যবিধানের শক্তির তীব্রতা বৃদ্ধি করে সময় সংক্ষেপ করা।

অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে প্রাণায়ামের কি সম্পর্ক? অধ্যাত্মবাদ প্রাণায়ামেরই একটা প্রকাশ। আত্মা আছে এ যদি সত্য হয়, কেবল আমরা তাদের দেখতেই পাচ্ছি না, তবে আমাদের চারিদিকে তারা আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, আমরা তাদের দেখতেও পাচ্ছি না, অনুভবও করতে পারছি না, স্পর্শও করতে পারছি না। আমরা অবিরতই তাদের দেহের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করছি, তারা আমাদের দেখছেও না, অনুভবও করছে না। একটা বৃত্তের মধ্যেই এ আর একটা বৃত্ত—এক বিশ্বের মধ্যে আর এক বিশ্ব। আমাদের আছে পঞ্চেন্দ্রিয়, আমরা হলাম এক বিশেষ স্পন্দিত অবস্থারই প্রাণের স্বরূপ। ঐ সম অবস্থায় সকলেই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পারে, কিন্তু প্রাণের উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থার মধ্যে যারা আছে তাদের তো দেখা যাবে না। আমরা একটা আলোর তীব্রতা ক্রমেই এতটা বাড়াতে পারি যে শেষ পর্যন্ত আমরা তা দেখতেই পাব না, কিন্তু এমন সত্তা থাকতে পারে যাদের চোখ এত শক্তিশালী যে ওরকম আলোও দেখতে পাবে। অন্য পক্ষে, আলোর স্পন্দন যদি একান্তই স্তিমিত হয় তো সে আলো আমরা দেখতেই পাই না, কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী আছে তা দেখতে পারে—যেমন বিড়াল বা পেঁচা। আমাদের দৃষ্টি-পরিধি হল এই প্রাণ-স্পন্দনেরই একটা স্তর মাত্র। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক; প্রাণকে স্তরের উপর স্তরে সাজানো হল, তখন মাটির কাছের স্তরটি হবে উপরের স্তরগুলির চেয়ে ঘনতর, আবার যতই উপরে উঠবে আবহাওয়া হয়ে

উঠবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। অথবা মহাসমুদ্রের কথাই ধরো না, যত গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করবে, জলের চাপও ক্রমেই বাড়বে। আর সমুদ্রতলে যেসব জীব বাস করে কখনোই তারা উপরে উঠে আসতে পারে না, এলে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে।

মনে কর বিশ্ব এক ঈথার-সমুদ্র, প্রাণ-ক্রিয়ার প্রভাবে স্তরে স্তরে তার বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন। কেন্দ্র থেকে যত দূরে স্পন্দন ততই কম, যত নিকটে ততই তা দ্রুত থেকে দ্রুততর। যে ধরনের স্পন্দন সেই ধরনের স্তরই তা সৃষ্টি করে থাকে। এবার মনে করো, স্পন্দনের এই পরিধিগুলিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হল, বহু লক্ষ মাইল এক ধরনের স্পন্দন-স্তর, তারপরে বহু বহু লক্ষ মাইলব্যাপী আর এক উচ্চতর ধরনের স্পন্দন-স্তর, এবং ক্রমান্বয়ে এমনি ধারা। কাজেই, নির্দিষ্ট এক স্পন্দনের-স্তরে যারা বাস করে তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে —এটাই সম্ভব, কিন্তু উচ্চস্তরের কাউকেই চিনতে পারবে না। কিন্তু দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ দিয়ে আমরা যেমন আমাদের দৃষ্টি-পরিধি বাড়াতে বা কমাতে পারি, তেমনি যোগদ্বারা আমরা অন্য স্তরের স্পন্দন-লোকে আমাদের নিয়ে যেতে পারি— সেখানে কী হচ্ছে তা নিজেরাই দেখতে সমর্থ হই। ধরো, এই ঘরটাতে এমন সব সত্তা আছে যাদের আমরা দেখতে পাই না। তারা হল প্রাণের নির্দিষ্ট এক স্পন্দন-স্তরের প্রতিনিধি, আর আমরা হলাম আর এক স্তরের। মনে করো, তারা হল দ্রুততর স্তরের, আমার হলাম তার বিপরীতটা। তারা প্রাণের উপাদানে গড়া, আমরাও যেমন। সকলেই প্রাণ-সমুদ্রের অংশ বিশেষ, তাদের মধ্যে কেবল স্পন্দন-হারেরই পার্থক্য। আমি যদি নিজেকেই দ্রুত স্পন্দনের অবস্থায় আনতে পারি, আমার এই স্তরই তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, আমি আর তোমাদের দেখতেই পাব না। তোমরা অদৃশ্য হয়ে যাবে, দেখা দেবে তারা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এটা সত্যি বলেই জানো। স্পন্দনের উচ্চতর অবস্থায় মনকে উন্নীত করাটাকেই যোগশাস্ত্রে এক কথায় বলা হয় সমাধি। উচ্চতর স্পন্দনের এই অবস্থাগুলি—মনের অতিচেতন স্পন্দনকে ঐ একটি শব্দ দিয়েই বোঝানো হয়ে থাকে, এবং নিম্নাবস্থার সমাধি এসব সত্তার দর্শন ঘটিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ স্তরের সমাধি হয় তখন, যখন সত্যি করে সব-কিছুই দেখতে পাই—যে সব উপাদান দিয়ে সমস্ত স্তরের অস্তিত্বই গঠিত তাদের যখন দেখতে পাই,—এক দলা মাটিকে জানলে যেমন পৃথিবীর সমস্ত মাটিকেই জানা যায়।

কাজেই আমরা দেখতে পেলাম প্রাণায়ামের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার যা কিছু সত্য তাও আছে। অনুরূপভাবেই দেখতে পাবে, যেখানেই কোনো শ্রেণী বা কোনো দল বিশেষ কোনো গুহ্য বা মরমী ধরনের বা গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান করতে চায়, তখন তারা সত্যি সত্যি যা করে থাকে তা হল এই যোগই—প্রাণকে নিয়ন্ত্রণের এই সাধনা। যেখানেই শক্তির অসাধারণ কোনো প্রকাশ দেখবে, তা হল এই প্রাণেরই প্রকাশ। এমনকি পদার্থবিজ্ঞানকেও প্রাণায়ামের মধ্যে ধরা যায়। বাষ্পযন্ত্র কিসে চলে? প্রাণশক্তিই বাষ্পের মধ্য দিয়ে কাজ করছে। এই যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকাশ, বা আরো কত কী, প্রাণ ছাড়া কী? পদার্থবিজ্ঞানটা কি? প্রাণায়ামই

বাহ্য উপায়ে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান। প্রাণায়ামের যে অংশ পার্থিব উপায়ে প্রাণেরই পার্থিব প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তাকেই বলে ভৌতবিজ্ঞান, এবং প্রাণায়ামের যে অংশ মনঃশক্তিরূপে প্রাণের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের সাধনা করে তাকেই বলে রাজযোগ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানস-প্রাণ

যোগীদের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি স্নায়ুপ্রবাহ এবং সুষুম্না নামে একটি শূন্যনালী আছে। এই শূন্যনালীর নিম্নপ্রান্তে রয়েছে যোগীরা যাকে বলেন 'কুণ্ডলিনী পদ্ম'। তারা একে বর্ণনা করেছেন ত্রিকোণাকার রূপে এবং তার মধ্যে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রয়েছেন, যোগীরা তাদের রূপক-ভাষায় যাকে বলেছেন কুণ্ডলিনী শক্তি। ঐ কুণ্ডলিনী যখন জাগ্রতা হন, শূন্যনালী পথে সবেগে উঠতে প্রয়াসী হন; এক একটি সোপান ধরেই যেন, যতই উঠতে থাকেন—ততই মন খুলে যায়, সব রকমের দর্শন ও বিস্ময়কর সব শক্তি যোগীর মধ্যে দেখা দেয়। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হয়, যোগী দেহ ও মন থেকে সম্পূর্ণরূপেই নিরাসক্ত হয়ে ওঠেন; আত্মা নিজেকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। আমরা জানি মেরুদণ্ড-গ্রন্থি অদ্ভুতভাবে সংগঠিত। আমরা যদি ৪ অক্ষরটি লম্বালম্বিভাবে (ꣷ) গ্রহণ করি তো, দেখতে পাব দুটো খণ্ড মাঝখানে সংযুক্ত রয়েছে। মনে করো, ঐরকম চারের পরে চার (ꣷ ꣷ ꣷ ꣷ) একটার উপর একটা স্থাপিত রয়েছে, এবং তখনি তা হবে মেরুদণ্ড গ্রন্থির সমরূপ। বাঁ দিকেরটা ইড়া আর ডানদিকে পিঙ্গলা, আর মেরুদণ্ডের মধ্যপথে লম্বিত যে গ্রন্থি তাই হল সুষুম্না। কটিদেশস্থ মেরু-অস্থিক্ষেত্রে মেরুগ্রন্থি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই নিচের দিকে নেমে গিয়েছে একটি সূক্ষ্ম তন্তু। সুষুম্না নালী ঐ তন্তুর মধ্য দিয়েও বিস্তৃত—তবে তা আরো সূক্ষ্ম। নালীমুখ নিচের দিকে সংবৃত থাকে, নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল অবস্থিত, —আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের মতে ত্রিকোণাকার। বিভিন্ন স্নায়ুজাল-কেন্দ্র ঐ সুষুম্না নালীর মধ্যে অবস্থিত,—ঐগুলিকেই যোগীদের বর্ণিত নানারকমের 'পদ্ম' বলা যায়।

যোগীদের ধারণায় সর্বনিম্নের মূলাধার বা ভিত্তি থেকে শুরু করে শেষস্থ সহস্রার অর্থাৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থ সহস্র পদ্ম বিশিষ্ট পথ পর্যন্ত বহু কেন্দ্র বর্তমান। আমরা যদি স্নায়ুজালকে ঐ পদ্ম বলে মনে করি, আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় সহজেই আমরা যোগীদের কথার ভাবটা বুঝতে পারি। আমরা জানি এই স্নায়ু-প্রবাহে দুই রকমের ক্রিয়া চলে, একটা হল অন্তর্মুখ, একটা বহির্মুখ—একটি সংবেদনবাদী, অন্যটি কর্মবাহী, একটি কেন্দ্রাভিগ (কেন্দ্রমুখী), একটি কেন্দ্রাতিগ (কেন্দ্রবহির্মুখী)। একটি মস্তিষ্কের মধ্যে বহন করে নিয়ে যায় সংবেদনগুলি, অন্যটি মস্তিষ্ক থেকে বহন করে নিয়ে আসে বাহিরে। এই সব স্পন্দনই শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে সংযুক্ত হয়। যে সব ব্যাখ্যার কথা তা বুঝবার পথ পরিষ্কার করবার জন্যে আমাদের কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে। মেরুগ্রন্থি মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে এসে শেষ হয়েছে medulla-য় এক বালব্-সদৃশ স্থানে—এবং সেই বালবৃটি মস্তিষ্ক-কন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে ভাসতে থাকে তরল মগজ-মজ্জার মধ্যে। তাই তো এমনটা ঘটে যে মাথায় একটা আঘাত লাগলে

সেই আঘাতের বেগ সঞ্চালিত হতে থাকবে ঐ তরল মজ্জার মধ্যে, কিন্তু তা ঐ বালবকে আঘাত দিতে পারবে না। এই ঘটনাটা একটু বিশেষভাবেই স্মরণ রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে বিশেষ তিনটি কেন্দ্রকে—তা হল মূলাধার (যা ভিত্তিস্বরূপ), সহস্রার (যা মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মস্বরূপ), এবং মণিপুর (যা নাভিদেশের পদ্মস্বরূপ)।

এবারে পদার্থবিজ্ঞান থেকে একটা ঘটনা গ্রহণ করব। বিদ্যুৎ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যসব শক্তি বিষয়ে আমরা শুনে থাকি। বিদ্যুৎ যে কী তা কেউ জানে না, যতদূর জানা গেছে তা হল একরকম গতি। বিশ্বে আরো বহুরকম গতি আছে; তাহলে তাদের থেকে বিদ্যুতের তফাৎটা কী? মনে করা যাক, টেবিলটা গতি লাভ করছে,—অর্থাৎ টেবিলটা যা সব পরমাণু দিয়ে গঠিত সেগুলি বিভিন্ন দিকে গতি লাভ করছে; পরমাণুগুলিকে যদি একদিকেই চালিত করতে হয় তো বিদ্যুতের মাধ্যমে করতে হবে। বৈদ্যুতিক গতি দেহের পরমাণুগুলিকে একদিকেই গতিশীল করে। একটা ঘরের সমস্ত বায়ু-পরমাণুগুলি যদি একদিকেই গতিশীল করা যায় তো ঘরে তৈরী হবে এক প্রকাণ্ড বিদ্যুতাধার-যন্ত্র। শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকেও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, যে কেন্দ্রটি শ্বাসপ্রশ্বাস-পদ্ধতিকে অর্থাৎ শ্বাস-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, স্নায়ু-প্রবাহ পদ্ধতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব থাকে।

এবারে আমরা দেখব, কেন শ্বাসপ্রক্রিয়া অভ্যাস করা হয়। প্রথমত, ছন্দিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে দেহের সমস্ত পরমাণুগুলির একই অভিমুখে সঞ্চালিত হবার মতো একটা ঝোঁক দেখা দেয়। মন যখন সঙ্কল্পে পরিণত হয়, স্নায়ুপ্রবাহ এমন এক গতি লাভ করে যেটা বিদ্যুতের মতোই; কারণ, বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রভাবে স্নায়ুগুলিকে অনিবার্যভাবেই কেন্দ্রমুখী হতে দেখা যায়। এতেই বোঝা যায় ইচ্ছাশক্তি যখন স্নায়ু-প্রবাহে রূপান্তরিত হয়, তখন তা বিদ্যুতের মতোই একটা-কিছুতে পরিবর্তিত হয়। দেহের সমস্ত গতিই যখন সম্পূর্ণরূপেই ছন্দোবদ্ধ হয়, দেহ হয়ে ওঠে যেন ইচ্ছাশক্তিরই এক বিরাট যন্ত্রাধার। যোগীরা চান ঠিক এইরকম এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। তাহলে এটাই হল শ্বাসব্যায়ামের শারীরতত্ত্বগত ব্যাখ্যা। এটা দেহের মধ্যে এক ছন্দোময় ক্রিয়া সৃষ্টি করে, শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এখানে প্রাণায়ামের লক্ষ্যই হল মূলাধারের কুণ্ডলীকৃত শক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা।

আমরা যা কিছুই দেখি বা কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি, তা দেখতে হয় ব্যাপ্তির মধ্যেই। এটা হল এক পরিব্যাপ্ত স্থান—যাকে বলা হয় মহাকাশ। যোগী যখন অন্যের চিন্তাধারা জানেন বা অতিচেতন কিছু দেখেন, তখন তিনি তো তাদের দেখেন চিত্তাকাশরূপ বা চিত্ত-ব্যাপ্তিরূপ আর একরকম ক্ষেত্রে। দর্শন বিষয়াশ্রয়-শূন্য হয় এবং আত্মা স্ব-প্রকৃতিতে দীপ্তি পায়, তখনই তাকে বলে চিত্তাকাশ বা জ্ঞান-পরিব্যাপ্ত আকাশ। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে যখন সুষুম্না-নালীতে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত দর্শনই ঘটে মানস-ব্যাপ্তিতে—মানসপরিব্যাপ্ত স্থানে। মস্তিষ্কের মধ্যে এসে মুখ খোলে যে নালী, সেই নালীর শেষপ্রান্তে যখন তিনি

এসে পৌছান, তখন বিষয়সম্পর্কহীন দর্শন ঘটে জ্ঞান-পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রে। বিদ্যুতের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাক। আমরা দেখতে পাই মানুষ কোনো বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যেই প্রবাহ প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু তার দুর্বার প্রবাহগুলিকে প্রেরণ করার জন্য প্রকৃতির কোনো তারের প্রয়োজন হয় না। এতেই প্রমাণ হয়, বস্তুতই তারের কোনো প্রয়োজন নেই, ওটা ছাড়া আমরা চলতে পারি না বলেই ওটা ব্যবহার করতে বাধ্য হই।

অনুরূপভাবেই, দেহের সমস্ত অনুভূতি ও গতিই সঞ্চালিত হয় মস্তিষ্কের মধ্যে এবং সেখান থেকে বাইরে—স্নায়ুতন্ত্রীরূপ তারের মাধ্যমে। মেরুগ্রন্থির অনুভূতিমূলক ও কর্মাত্মক তন্ত্রীগুলিই যোগীগণ-কথিত ইড়া ও পিঙ্গলা। ঐ দুটি প্রধান পথেই অন্তর্মুখ প্রবাহ বয়ে চলে। তাহলে, মন কেন তার ছাড়াই সংবাদ প্রেরণ করতে কিংবা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না? প্রকৃতিতে তো আমরা তাই দেখতে পাই, যোগী বলেন, তুমি যদি তাই পারো তো বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে। কীভাবে তা করা যায়? সুষুম্না পথে—মেরুদণ্ড-মধ্যস্থ নালীপথে তুমি যদি প্রবাহ সঞ্চালিত করতে পারো, তবেই ও সমস্যাটার সমাধান হল। মনই স্নায়ু-পদ্ধতি জাল সৃষ্টি করেছে, মনকেই তা ভাঙতে হবে, তাতে আর তার দিয়ে কাজ করতে হবে না। কেবলমাত্র তাহলেই আমাদের আয়ত্তে আসবে সমস্ত জ্ঞান—থাকবে না দেহবন্ধন; এই জন্যই তো সুষুম্নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা এত প্রয়োজন। যোগীরা বলেন—আমরা যদি কোনোরকম স্নায়ুতন্ত্রীরূপ কোনো তারের সাহায্য ছাড়াই ফাঁপা শূন্য নালী দিয়ে মনের প্রবাহ প্রেরণ করতে পারি তো সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল, এবং যোগীদের মতে তা করা যায়।

সাধারণ লোকের বেলায় এই সুষুম্নার নিম্নতম প্রান্ত থাকে বন্ধ, সে পথে কোনো কাজই হয় না। যোগী একটা অভ্যাসের কথা বলেন যার দ্বারা তা খোলা যায়—স্নায়ু-প্রবাহ তা দিয়ে সঞ্চারিত করা যায়। কোনো অনুভূতি-কেন্দ্রে বাহিত হলে কেন্দ্রটিতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রগুলিতে এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় গতিবেগ; সচেতন কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা দেয় দর্শন, পরে গতিবেগ। বাইরে থেকে কোনো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াই হল অনুভূতি। তাহলে স্বপ্নে অনুভূতি জাগে কেমন করে? তখন তো বাইরের কোনো ক্রিয়া থাকে না। কাজেই স্নায়ুবাহী গতি কোথাও কুণ্ডলীকৃত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক: আমি একটা শহর দেখছি; শহর নামক বহির্বিষয়াগত অনুভূতির প্রতিক্রিয়াই তো শহর দেখা। অর্থাৎ, মস্তিষ্কের পরমাণুগুলিতে কোনো একরকম গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্বাহী স্নায়ুর গতিবেগ দ্বারা, এবং তাই আবার শহরের বহির্বস্তুর দ্বারা গতিবেগ সঞ্চালিত করছে। এখন বহুদিন পরেও আমি ঐ শহরকে স্মরণ করতে পারছি। এই স্মরণ তো ঐ একই ঘটনাসদৃশ—যদিও কিছুটা স্তিমিত রূপে। কিন্তু স্তিমিত আকারে হলেও মস্তিষ্কে এই যে সমধর্মী কম্পন তার সৃষ্টি কাজটি হল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই প্রাথমিক অনুভূতি থেকে নয়। কাজেই অনুভূতিগুলি নিশ্চয়ই

কোথাও কুণ্ডলীকৃত ছিল, এবং তারা তাদের ক্রিয়া দ্বারাই মৃদু প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করেছে—যাকে আমরা বলি স্বপ্নদর্শন।

এখন, যে কেন্দ্রে এই সমস্ত অনুভূতি-অবশেষ সঞ্চিত রূপে থাকে, তাকেই বলে মূলাধার এবং ঐ কুণ্ডলীকৃত কর্মশক্তিই হল কুণ্ডলিনী। এটা সম্ভব যে ঐ গতিবেগ শক্তির অবশেষও ঐ একই কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে, যেমন দেখা যায় বহির্বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন বা ধ্যানের পরে মূলাধার কেন্দ্র-রূপ দেহাংশ (সম্ভবত ত্রিকাস্থি স্নায়ু-জাল) উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখন, এই কুণ্ডলীকৃত শক্তিকে যদি জাগ্রত ও সক্রিয় করা যায় —এবং সুষুম্না নালীপথে সঞ্চালিত করা যায় তবে কেন্দ্রের পর কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল হতে হতে শুরু হবে এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। শক্তির এক সূক্ষ্ম অংশ যদি স্নায়ুতন্ত্রীপথে সঞ্চরণ করে এবং কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তখন হয় স্বপ্নদর্শন বা কল্পনাদর্শন। আর, দীর্ঘকালীন অন্তর্ধ্যানের শক্তিতে যখন সঞ্চিত শক্তির মহাভাণ্ডার সুষুম্না পথ ধরে সঞ্চরণ করে—কেন্দ্রগুলিকে আঘাত করে, তখন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়—স্বপ্ন বা কল্পনার প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বহু বহু উচ্চ স্তরের, ইন্দ্রিয়-অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ঢের ঢের বেশী তীব্র। তা হল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। যখন তা সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয়, তখন মস্তিষ্ক—সমস্ত মস্তিষ্কেই যেন প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়, উদ্ভাসিত হয় পূর্ণ জ্যোতি, দেখা দেয় আত্মদর্শন। এই কুণ্ডলিনী নামক মহাশক্তি যেন মনের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে, স্তর থেকে স্তরে সঞ্চরণ করে—অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ততই যেন বিকশিত হতে থাকে, যোগী তখন বিশ্বকে দর্শন করেন তার সূক্ষ্ম আকারে—কারণ-রূপে। এবং কেবলমাত্র তখনি এই বিশ্বের কারণ রূপে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া এই উভয়কেই যথাযথ স্বরূপে জানা যায়, এবং দেখা দেয় সমস্ত জ্ঞান। কারণ জানা হলে জ্ঞানের ফল দেখা দেবেই।

এইভাবে দেখা গেল, কুণ্ডলিনীর জাগরণই হল দিব্যজ্ঞান লাভের অতিচেতন অনুভূতি এবং অধ্যাত্মবোধের এক এবং একমাত্র পন্থা। জাগরণ ঘটতে পারে নানা উপায়ে, তা হতে পারে ভগবৎপ্রেমে, সিদ্ধ ঋষিদের করুণায়, কিংবা দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক ইচ্ছাশক্তিতে। সাধারণত যাকে বলা হয় অতিপ্রাকৃত শক্তি বা অতিপ্রাকৃত জ্ঞান—তার প্রকাশ যেখানেই দেখা গেছে, সেখানেই কুণ্ডলিনীর কিছু শক্তিপ্রবাহ নিশ্চিতই সুষুম্না-পথে প্রবেশ করেছে। তবে, এমন ধরনের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় লোকে অচেতনভাবেই কোনো অভ্যাস সাধন করে ফেলেছে —এবং তাতেই কুণ্ডলীকৃত কুণ্ডলিনী শক্তির একটি কণাই (ক্ষুদ্র অংশই) বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়েছে। স্বজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক, সমস্ত উপাসনাই ঐ এক লক্ষ্যেরই অভিমুখে অগ্রসর করে দেয়। যেভাবে সে তার প্রার্থনায় সাড়া পেয়েছে, সেও জানে না যে সাফল্য এসেছে তার স্বপ্রকৃতি থেকেই, জানে না তার নিজের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত অনন্ত শক্তির একটি কণাকেই সে প্রার্থনার মনোবৃত্তির মাধ্যমে জাগ্রত করেই এই সাফল্য এনেছে। এইভাবে লোকে বিভিন্ন নামে ভয়ে বা দুঃখে অজ্ঞানভাবেই যাকে উপাসনা করে, যোগীরা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেন

তাই হল প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান সত্যিকার শক্তি এবং যদি তাকে আহ্বান করার পদ্ধতিটি জানা থাকে তবে তাই হল চিরসুখের জননী। এবং সর্বধর্মের, সমস্ত উপাসনা-আরাধনার, সমস্ত প্রার্থনার, সমস্ত আকার-প্রকারাদির, সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানের এবং সমস্ত অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞানই হল রাজযোগ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্তঃপ্রাণের নিয়ন্ত্রণ

এবারে প্রাণায়ামের ক্রিয়াদি সম্পর্কে আলোচনা। আমরা দেখেছি যোগীদের মতে প্রথম সোপান হল ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রণ। আমাদের কাজ হল আমাদের দেহের মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম গতি চলাচল করছে তা অনুভব করা। কিন্তু আমাদের মন বড়ই বহির্মুখী হয়ে পড়েছে, সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি আর ধরা দিচ্ছে না। তাদের অনুভব সুরু হলে নিয়ন্ত্রণও সুরু করা যায়। এসব স্নায়ু-প্রবাহগুলি আমাদের সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের প্রতিটি পেশীতে জীবন ও জীবনীশক্তি আনছে, কিন্তু আমরা তাদের অনুভব করি না। যোগী বলেন আমরা তাদের অনুভব করতে শিখতে পারি। কেমন করে? ফুসফুসের গতিকে আশ্রয় করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। দীর্ঘকাল তা করা হলে সূক্ষ্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য আসবে।

এবারে প্রাণায়াম অভ্যাসের কথা। সোজা হয়ে বসো; দেহকে সোজা রাখতে হবে। সুষুম্না-নালী মেরুদণ্ড-সংলগ্ন না হলেও তার মধ্যে রয়েছে। যদি বক্র হয়ে বসো তো মেরুগ্রন্থিকে ব্যাহত করছ, তাই তাকে স্বচ্ছন্দ সাবলীল রাখো। বক্র হয়ে বসে যদি ধ্যান করতে, গভীরভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করো তো, নিজেরই ক্ষতি সাধন করছ। বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক—এই তিনটি দেহাংশ একটি সরল রেখাকারে স্থাপন করবে। একটু অভ্যাস করলেই দেখবে তা করাটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ। দ্বিতীয় অভ্যাস হল স্নায়ু-নিয়ন্ত্রণ। আমরা জেনেছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য স্নায়ুর উপরেও তাদের একধরনের নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বর্তমান, এবং তাই ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রয়োজন। সাধারণত আমরা যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকে ব্যবহার করি তাকে শ্বাসক্রিয়া বলে না। এটা বড়ই অনিয়মাক্রান্ত। তারপর, নারী ও পুরুষের শ্বাসক্রিয়ায় পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম শিক্ষাপাঠ হল কেবলমাত্র পরিমিতরূপে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। এটাই পদ্ধতিটিতে সামঞ্জস্য আনবে। কিছুকাল এটা অভ্যাস করার পরে এর সঙ্গে যুক্ত করবে 'ওম্' জাতীয় কোনো শব্দ বা অন্য কোনো ধরনের পবিত্র শব্দ। ভারতবর্ষে আমরা এক দুই তিন বা চার না গুনে কোনো প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করি। তাই আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি প্রাণায়ামের সঙ্গে মনে মনে বারে বারে 'ওম্' আবৃত্তি করো, বা অন্য কোনো পবিত্র শব্দ। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটি ভিতরে বাহিরে প্রবাহিত হোক, তালে তালে ছন্দিত ভঙ্গীতে, সু-সমরূপে; তখন দেখবে সমস্ত শরীরই হয়ে উঠেছে ছন্দোময়। এবারে শিখতে হবে বিশ্রাম কাকে বলে। এই বিশ্রামের সঙ্গে তুলনায় নিদ্রা কিছুই নয়। একবার বিশ্রাম এলে সবচেয়ে ক্লান্ত স্নায়ুগুলিও শান্ত হয়ে উঠবে, বুঝবে আগে তো কখনো এমন সত্যিকার বিশ্রাম গ্রহণ করো নি।

এই অভ্যাসের প্রথম সুফল মুখের চেহারার পরিবর্তনেই ধরা পড়ে; রুক্ষ রেখা বলিরেখা অদৃশ্য হয়ে যায়; শান্ত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শান্তভাব ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত

মুখে। তারপরে মধুর কণ্ঠ এমন কোনো যোগীকেই আমি দেখিনি যার কণ্ঠস্বর কর্কশ, ভাঙা-ভাঙা। কয়েকমাসের অভ্যাসেই এসব লক্ষণ দেখা দেয়। কয়েকদিন উল্লিখিত শ্বাস-ক্রিয়া অভ্যাস করার পরে, এবারে উচ্চস্তরের কিছু ধরবে। ইড়া দিয়ে অর্থাৎ বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে সমস্ত ফুসফুসকে পরিপূর্ণ করো, এবং সেই সঙ্গেই স্নায়ুপ্রবাহের মধ্যে মনকে সংযত করো। তুমি যেন স্নায়ুপ্রবাহকে মেরুদণ্ড দিয়ে নিচে প্রেরণ করছ—সজোরে আঘাত করছ সর্বনিম্ন গ্রন্থিতে গিয়ে—যেটা হল ভিত্তিপদ্ম, ত্রিকোণাকার এবং কুণ্ডলিনীর আসন। স্নায়ুপ্রবাহকে সেখানেই কিছুক্ষণ ধরে রাখো। মনে মনে কল্পনা করো, তুমি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুপ্রবাহকে অপর দিকের পিঙ্গলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপরে টেনে তুলছ। এটা কিন্তু কঠিন মনে হবে। সবচেয়ে সহজ পন্থা হল বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান নাসারন্ধ্র বন্ধ করে বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাস টেনে নাও, তারপর দুই নাসারন্ধ্রই বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্ধ করো, এবং মনে মনে কল্পনা করো: তুমি ঐ স্নায়ুপ্রবাহ নিচে প্রেরণ করছ—সুষুম্নার ভিত্তিমূলে আঘাত করছ। এবার বুড়ো আঙুল সরিয়ে নাও, ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে নিশ্বাস বার করে দাও। তারপর আবার বাম নাসারন্ধ্র দিয়েই শ্বাস নাও, বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্য নাসারন্ধ্রটি বন্ধ করো, এবং দুটো নাসারন্ধ্র বন্ধ করো, আগের বারের মতোই। হিন্দুরা যেভাবে এর অভ্যাস করে থাকে তা এদেশে (আমেরিকায়) বেশ কঠিন হবে; কারণ হিন্দুরা বাল্যকাল থেকেই তা অভ্যাস করে থাকে এবং তাদের ফুসফুস-যন্ত্রও এজন্যে প্রস্তুত থাকে। এদেশে চার সেকেণ্ড থেকে অভ্যাস শুরু করে ক্রমে বাড়ালেই ভালো হয়, চার সেকেণ্ড-কাল টেনে নাও, ষোলো সেকেণ্ড কাল ধরে রাখো, তারপর আট সেকেণ্ডে ছেড়ে দাও। এতে প্রাণায়াম হবে। অবশ্য এই সঙ্গেই ত্রিকোণাকার সেই ভিত্তিপদ্মের কথা ভাবতে হবে; মনকে সেই কেন্দ্রে সংযত কর। এক্ষেত্রে কল্পনাশক্তি তোমাকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারে। এর পরেরটি হল ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া, এবং তারপর শ্বাস বন্ধ করা—ঠিক ঐ সংখ্যক সেকেণ্ড-কাল। একমাত্র পার্থক্য হল, প্রথমক্ষেত্রে শ্বাসকে ভিতরে টেনে নিয়ে রুদ্ধ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রুদ্ধ করা হয়েছে বাহিরে বার করে। দ্বিতীয়টিই সহজতর। যে অভ্যাসে শ্বাস ফুসফুসের ভিতরে রুদ্ধ করে রাখতে হয় সেই অভ্যাসটি খুব বেশি করা ঠিক নয়। সকালে চারবার করবে, সন্ধ্যায় চারবার। তারপর ক্রমে ক্রমে সংখ্যাটি বাড়াতে পারো। নিজেই দেখতে পাবে, সংখ্যা ক্রমেই বাড়াবার শক্তি অর্জন করছ, এবং তাতে আনন্দ পাচ্ছ। তাই তোমার শক্তি নিজেই অনুভব করে তবেই সাবধান হয়ে এবং সতর্কভাবে সংখ্যাটা অর্থাৎ সময়কাল বাড়াবে—তখন চার ছেড়ে ছয় থেকে শুরু কর। যদি অনিয়মিতভাবে অভ্যাস করো তাহলে কিন্তু ক্ষতিই হবে।

পূর্ববর্ণিত ক্ষেত্রের স্নায়ুশুদ্ধির তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ও শেষটি কঠিনও নয় বিপজ্জনকও নয়। প্রথমটি যত অভ্যাস করবে, ততই শান্তি পাবে। কেবলমাত্র 'ওম্' চিন্তা করো, এবং তা কাজ করতে করতেও করতে পারো। এতে ভালোই

হবে। কোনো একদিন কঠিন সাধনায় কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হবেন। যারা একবার কি দুবার অভ্যাস করবে, দেহে মনে একটু শান্তভাব দেখা দেবে, আর দেখা দেবে সুন্দর কণ্ঠস্বর। যারা এ নিয়ে আরো অগ্রসর হতে পারবে, কুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে পারবে, এবং তার সমস্ত প্রকৃতিই পালটাতে সুরু করবে—খুলে যাবে বিশ্বজ্ঞানের গ্রন্থমালা; জ্ঞানলাভের জন্য তোমাকে আর গ্রন্থের কাছে ছুটতে হবে না। তোমার নিজের মনই হবে তোমার গ্রন্থ—সেখানে থাকবে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। মেরুদণ্ডের দুপাশ দিয়ে প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা প্রবাহের কথা আমি আগেই তোমাদের বলেছি, বলেছি মেরুগ্রন্থির মধ্যবাহী পথ সুষুম্নার কথাও। প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই এই তিনটি বর্তমান, যারই মেরুদণ্ড আছে তারই আছে এই ত্রিধারা ক্রিয়া। কিন্তু যোগীরা বলেন, সাধারণ লোকের মধ্যে সুষুম্না সংবৃত বা বন্ধ আছে, তার ক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু অন্য দুইটির দেহের বিভিন্ন অংশে শক্তি বহন করে।

একমাত্র যোগীর সুষুম্নাই উন্মুক্ত থাকে। এই সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মুক্ত হলে ও উর্ধ্বগামী হতে থাকলে আমরা ইন্দ্রিয়চেতনার অতীতে চলে যাই, আমাদের মন হয় ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানাতীত, আমরা এমনকি বুদ্ধিরও অতীত এমন এক স্থানে চলে যাই যেখানে যুক্তিতর্ক পৌছয় না। যোগীর প্রধান লক্ষ্য হল এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করা। তাঁর মতে, এই সুষুম্না কেন্দ্রগুলি ধরেই অবস্থিত থাকে, অথবা আলঙ্কারিক ভাষায় যাদের বলা হয় 'পদ্ম'। মেরুগ্রন্থির নিম্নতর প্রান্তে থাকে সর্বনিম্নটি, তাকে বলা হয় মূলাধার, তার উপরের দ্বিতীয়টিকে বলা হয় স্বাধিষ্ঠান, তৃতীয়টিকে বলা হয় মণিপুর, চতুর্থটি অনাহত, পঞ্চমটি বিশুদ্ধ, ষষ্ঠটি আজ্ঞা, এবং সর্বোচ্চটি অবস্থিত থাকে মস্তিষ্কে—তা হল সহস্রার অর্থাৎ সহস্রদলবিশিষ্ট। এদের মধ্যে এখন আমাদের দুটি কেন্দ্র প্রসঙ্গে জানতে হবে—সর্বনিম্নটি মূলাধার, সর্বোচ্চটি সহস্রার। সমগ্র শক্তিকেই তার ভিত্তি মূলাধার থেকে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। যোগীরা দাবি করেন, মানবদেহের যতশক্তি আছে তার মধ্যে সর্বোচ্চটিকে বলা হয় ওজঃ। এখন, এই ওজঃ সঞ্চিত থাকে মস্তিষ্কে, মানুষের মাথার মধ্যে যত বেশী ওজঃ থাকে সে হয় তত বেশী শক্তিমান, তত বেশী ধীমান, তত বেশী আধ্যাত্মিক দিক থেকে বলবান। কেউ সুন্দর ভাষায় সুন্দর সুন্দর চিন্তার কথা বলতে পারে, কিন্তু লোকের উপর ছাপ ফেলতে পারে না: অন্য কারুর ভাষাও অমন সুন্দর নয়, ভাবও নয়, তবু তার কথা মুগ্ধ করে রাখে। তার প্রতিটি চালচলনই শক্তিপুষ্ট। ওটাই হল ওজঃশক্তি।

প্রত্যেক লোকের মধ্যেই কমবেশী এই ওজঃ সঞ্চিত থাকে। দেহে যতরকম শক্তি কাজ করে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চটিই হয় ওজঃ। মনে রাখা দরকার এটা হল কেবল রূপান্তরের ব্যাপার। যে শক্তিবেগ বহির্জগতে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তিরূপে কাজ করে, তাই পরিবর্তিত হয় আভ্যন্তরীণ শক্তিবেগ রূপে; পেশীগত শক্তিতে যে বেগ কাজ করে তাই পরিবর্তিত হয় ওজঃতে। যোগীরা বলেন, যৌন চিন্তায়, যৌন আবেগে মানুষের শক্তির যে অংশ প্রকাশিত হয়, তাই যদি রুদ্ধ ও সংযত করা যায়,—তবে তা অনায়াসেই ওজঃতে পরিবর্তিত হয়; এবং যেহেতু মূলাধার এগুলি পরিচালিত করে, যোগীরা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ঐ কেন্দ্রটির উপরে। যোগী তার সমস্ত যৌনশক্তিকে

গ্রহণ করে ওজঃতে রূপান্তরিত করেন। একমাত্র কামজয়ী নরনারীই ওজঃকে জাগ্রত করতে ও মস্তিষ্কে সঞ্চিত করতে সমর্থ হন, এবং এইজন্যই ব্রহ্মচর্যকে সর্বদাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুণ বলা হয়। কেউ কামাসক্ত হলে, আধ্যাত্মিক দিক দূরে সরে গেলে, বুঝতে পারে যে সে মানসিক তেজ ও নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলছে। এবং তাই পৃথিবীর যে সমস্ত ধর্মব্যবস্থা অধ্যাত্ম স্তরের মহাপুরুষদের সৃষ্টি করেছে, সে সব ক্ষেত্রে সবসময়েই দেখতে পাবে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্যেই চিরকুমার-চিরকুমারী সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা একান্তই প্রয়োজন; তা না করলে রাজযোগ অভ্যাস করাটা বিপজ্জনক এবং তার ফলে মস্তিষ্ক-বিকৃতিও ঘটতে পারে। রাজযোগও অভ্যাস করছে, অপবিত্র জীবনযাপনও চলছে—এমন হলে কী করে তারা যোগী হবার প্রত্যাশা রাখতে পারে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাহার এবং ধারণা

পরবর্তী সোপান হল প্রত্যাহার। এটা কী? তোমরা জানো কেমন করে অনুভব ঘটে। প্রথমে রয়েছে বহির্যন্ত্র, তারপরে অন্তর্যন্ত্র; দুটোই মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেহে কাজ করে; এবং তারপর আছে মন। এই সবগুলিই যখন একত্র হয়ে কোন বহির্বিষয়ে যুক্ত হয়, তখনই তার অনুভব ঘটে। সেই সঙ্গেই মনকে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়যন্ত্রেই সংযত রাখা ও সংযুক্ত করাটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ; মন তো দাস।

আমরা শুনে থাকি—'সৎ হও!' 'ভালো হও!' 'ভালো হও' এই কথা সারা জগতেই শেখানো হয়ে থাকে। পৃথিবীতে কোনো দেশেই এমন কোনো শিশু বড় একটা জন্মায়নি, যাকে শেখানো হয়নি—'চুরি করবে না', 'মিথ্যা কথা বলো না।' কিন্তু কেউই তো শেখায় না কী করে তা করতে পারবে। কথা বলাতেই তো তার কাজ হবে না। সে চোর হবে না কেন? চুরি না করার বিষয় আমরা তাকে শেখাই না, কেবলমাত্র বলি—'চুরি করো না।' যখন তার মনকে সংযত করতে শেখাই, তখনই তাকে সত্যি সত্যি সাহায্য করি। কি অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ সমস্ত রকম ক্রিয়াই ঘটে মন যখন ইন্দ্রিয়-নামক কোনো বিশেষ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বেচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, মন কেন্দ্রাদিতে আকৃষ্ট ও যুক্ত হয়; সেই জন্যেই তো লোকে বোকার মতো কাজ করে, দুঃখবোধ করে, কিন্তু মন নিয়ন্ত্রণে থাকলে তেমনটা হত না। মন নিয়ন্ত্রণে থাকলে কী হত? তখন তা অনুভব-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হত না, এবং স্বভাবতই অনুভূতি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকত। এ পর্যন্ত পরিষ্কার হল। তবে, তা কি সম্ভব? সম্পূর্ণতই সম্ভব। আধুনিক কালে দেখা যায়, বিশ্বাস-নিরাময়বাদীরা দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও অন্যায় শক্তিকে অস্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের দর্শন বরং ঘোরালো, কিন্তু যেভাবেই হোক তারাও এসে পড়েছে যোগের একটা দিকেই। কোনো লোকের দুঃখকষ্টকে তাঁদের অস্বীকৃতির মাধ্যমেই দূরে রাখার ব্যাপারে তাঁরা যখন সফলকাম হন, তখন তাঁরা প্রত্যাহারেরই কাজ অংশত করে থাকেন—কারণ তাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে উপেক্ষা করার মতোই লোকের মনকে যথেষ্ট সবল রাখেন। অনুরূপভাবেই সম্মোহনবিদগণ তাদের নির্দেশ মতো রোগীর মধ্যে সাময়িক একটা অস্বাভাবিক ধরনের প্রত্যাহার ভাব জাগ্রত করে রাখে। এই তথাকথিত সম্মোহন-নির্দেশনা কাজ করে কেবলমাত্র দুর্বল মনের উপর। এবং যে পর্যন্ত না সম্মোহনকারী স্থির দৃষ্টি বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে রোগীর মনকে এক ধরনের নিষ্ক্রিয় ও অস্বাভাবিক ধরনের রুগ্ন অবস্থায় আনতে পারে, তার নির্দেশনায় কোনো কাজ হয় না।

এখন, সম্মোহন-রোগী বা বিশ্বাস-নিরাময়-রোগীর মধ্যে কর্ম-নির্দেশক দ্বারা সাময়িকভাবে কেন্দ্রাদির যে নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়ে থাকে, সেই নিয়ন্ত্রণ নিন্দনীয়,

গর্হিত, কারণ তা শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ ডেকে আনে। বস্তুত তা তো রোগীর স্বেচ্ছাক্রমে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং অন্য কারো আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতেই যেন রোগীর মনকে অভিভূত করে, নিষ্ক্রিয় করে। এটা দুর্ধর্ষ গতির উন্মত্ততাকে লাগাম আর পেশীগত শক্তির দ্বারা দমন করা নয়, বরং যেন অভিভূত করেই শান্ত করার জন্য অন্য কাউকে অশ্বের মাথায় প্রচণ্ড ঘা দিতে আহ্বান করা। এইরকম প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় যার উপর সম্মোহন প্রয়োগ করা হয় সে তার মানসিক শক্তির একটা অংশ হারিয়ে ফেলে, এবং শেষ পর্যন্ত মন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণশক্তি লাভের স্থলে লাভ করে শক্তিহীন এক কিম্ভূতকিমাকার জড়পিণ্ডকে, এবং রোগীর শেষ আশ্রয় হয় পাগলা-গারদ।

যে নিয়ন্ত্রণই স্বেচ্ছাকৃত নয়—নিয়ন্ত্রকের মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তা কেবল বিপজ্জনক নয়, লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করে। প্রত্যেকটি আত্মার লক্ষ্য হল মুক্তি, প্রভুত্ব—বস্তু ও চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব। সেদিকে পরিচালিত না করে প্রত্যেকটি ইচ্ছাশক্তি-প্রবাহ, তা ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদির সরাসরি নিয়ন্ত্রণই হোক বা তাদের বিকৃত অবস্থায় জোর করে নিয়ন্ত্রণই হোক, পূর্বস্থিত অতীত চিন্তার গুরুভার বন্ধন-শৃঙ্খল রূপ অতীত কুসংস্কার। কাজেই, অন্যেরা তোমাকে দিয়ে কিভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছে সে সম্পর্কে সাবধান হয়ো। প্রবণতাগুলিকে নতুন পথে পরিচালিত করে অনেকেরই ভালো করা যায়, এটা সত্য কথা, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশও করা হচ্ছে—অজ্ঞাতসারে নির্দেশদানে মানুষের মধ্যে বিকৃত, নিষ্ক্রিয় ও সম্মোহিত অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাতে তারা প্রায় আত্মবোধহীনই হয়ে পড়ে। তাই, যারাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলে বা উচ্চতর ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লোকদের পিছু পিছু আকর্ষণ করে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও মানবসমাজেরই ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই নিজের মনকে কাজে লাগাও, নিজেই নিজের দেহ-মনকে নিয়ন্ত্রণ করো, মনে রাখো তুমি রোগী না হলে কোনো বহিঃশক্তিই তোমার উপর কাজ করতে পারবে না; যত ভালো বা মহৎ হোক না কেন, যে তোমাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলে তার সঙ্গ পরিহার করো। দুনিয়া জুড়েই আছে নৃত্য, লম্ফঝম্প ও চীৎকার করার মতো সম্প্রদায়—তারা যখন নাচগান ও প্রচার সুরু করে দেয়, সংক্রামক ব্যাধির মতোই তা ছড়িয়ে পড়ে, তারাও একধরনের সম্মোহনকারী। অনুভূতি-প্রধান লোকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, দুঃখের বিষয় যে প্রায়ই এমনটা হয়ে থাকে এবং তার ফলে সমস্ত জাতিগুলিকেই অধঃপতিত করে। এই-জাতীয় বিকৃত বহিঃনিয়ন্ত্রণের আপাত সৎ হওয়ার চেয়ে বরং কোনো ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে দুর্বৃত্ত হওয়াটাও আরো স্বাস্থ্যকর। এই-জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন অথচ শুভার্থী ধর্মোন্মাদেরা যে মানবসমাজের কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে তা ভাবলে মন দমে যায়। তারা বড়ো একটা জানেই না যে তাদের উপদেশ মতো সঙ্গীতে ও প্রার্থনায় মনে সহসা যে অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটে তা তাদের নিষ্ক্রিয়, বিকৃত ও দুর্বল করে ফেলে, এবং আরো নির্দেশ-উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে—তা যতই

খারাপ হোক না। এইসব মূর্খ, বিভ্রান্ত লোকেরা একটুও চিন্তা করে না—মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তিত করতে গিয়ে তাদের আশ্চর্যজনক শক্তিকে তারা মনে করে মেঘলোকের ঊর্ধ্ববাসী কোনো একজনই তাদের উপর বর্ষণ করেছেন—সেই শক্তিকে তারিফ করতে গিয়ে তারা তো ছড়াচ্ছে ধ্বংসের বীজ, পাপের বীজ, উন্মত্ততার বীজ, মৃত্যুবীজ। যা কিছুই আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে সেসব সম্পর্কে সাবধান। জেনে রাখো তা বিপজ্জনক, এবং তা সর্বপ্রকারে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরিহার করবে।

যে তার ইচ্ছাধীনরূপে মনকে কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বা তাদের থেকে বিযুক্ত করতে পেরেছে, সেই প্রত্যাহারে অর্থাৎ "অভিমুখীন আহরণ"-এ সমর্থ হয়েছে, —মনের বহির্মুখী শক্তিগুলিকে রুদ্ধ করে এবং ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মুক্ত করে। আমরা যখন তা করতে পারব, তখনই আমরা ঠিক-ঠিক চরিত্রবান হব। তখনই আমরা মুক্তির দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাব; তার আগে আমরা কেবল যন্ত্রমাত্র। মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্য কী কঠিন! উন্মত্ত বানরের সঙ্গে তার তুলনা ঠিকই হয়েছে। এক বানর ছিল স্বভাবতই পাগলা, সব বানরই যেমন হয়। কিন্তু তাতেও যেন সবটা হল না, তাকে যদৃচ্ছা মদ খেতে শেখানো হল, আর তার ফলে সে আরো অস্থির-প্রকৃতি হয়ে উঠলো। তারপর তাকে দংশন করল এক বিছা। বিছাতে কামড়ালে মানুষেই ছটফট করতে থাকে সারাটা দিন, আর বানরের অবস্থাটা সারাটা দিনই আরো বেশ খারাপ চলল। তার দুর্গতির চূড়ান্ত করতে এক দানবই যেন তার মধ্যে প্রবেশ করল। বানরটা যেরকম অস্থির উল্লম্ফন সুরু করল তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। মানুষের মনও ঠিক ঐ বানরেরই মতো, স্বভাবতই কর্মমুখী, তারপরে কামনার মদে মত্ত হয়ে ক্রমেই দুর্বার হয়ে ওঠে। কামনার দখলে আসার পরে অন্যের সৌভাগ্যে হিংসা-বিচ্ছু দংশন করতে থাকে, সবশেষে এবার দম্ভ-দানব মনের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যই কী কঠিন! প্রথম পাঠ তাই কিছুক্ষণ বসে মনকে ছুটতে দেওয়া। মন তো সবসময়েই বুদ্বুদ তুলে চলেছে। চারদিকে এ যেন বানরের লাফালাফির মতো। বানরটা যত পারে লাফাক না, তুমি শুধু অপেক্ষা করো, দেখে যাও। প্রবাদে বলে জ্ঞানই শক্তি, এবং সেটা সত্যি। মন কি করছে না জানা পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে কেমন করে? মনকেই বল্গাটা দাও, বহু কুৎসিত ভাবনা তার মধ্যে আসতে পারে, তুমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হবে এমন ভাব ভাবাও তোমার পক্ষে সম্ভব হল? তবু তুমি লক্ষ্য করবে, প্রতিদিনই মনের খামখেয়ালিপনা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে, প্রতিদিনই তা শান্ত হয়ে আসছে। কয়েকমাসের মধ্যেই দেখতে পাবে মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে কত না চিন্তা, তারপর দেখবে সে সব কতকটা কমে এসেছে, আর কয়েকমাসের মধ্যেই দেখবে তা আরো বেশ কমে গেছে, এবং শেষ পর্যন্ত মন তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে প্রতিদিনই অভ্যাস চাই। বাষ্পমুখ খুলে বাষ্প বার করলে, বাষ্পযন্ত্রটি চলবেই; যতক্ষণ সামনেই বিষয়াদি রয়েছে, তার অনুভূতি থাকবেই। মানুষ যে যন্ত্র নয়, তা প্রমাণ করবার জন্যে তাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে সে কিছুরই অধীন নয়। মনের

এই যে নিয়ন্ত্রণ—ইন্দ্রিয়কেন্দ্রাদির সঙ্গে তার যুক্ত না-হওয়াটাই হল প্রত্যাহার। কিভাবে এই প্রত্যাহার অভ্যাস করা যায়? এটা এক দুর্ধর্ষ কাজ—দু-একদিনে হবার নয়। বৎসরের পর বৎসর ধৈর্য ধরে সংগ্রাম করলেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব।

কিছুকাল প্রত্যাহার অভ্যাসের পর দ্বিতীয় সোপান হল ধারণা—মনকে কোনো এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে ধারণ করা। মনকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে ধারণ করাটা কি রকম? দেহের অন্য অংশাদি বাদ দিয়ে কোনো এক নির্দিষ্ট অংশকেই অনুভব করতে মনকে বাধ্য করা। এই ধরো, শুধু হাতখানির অস্তিত্বই অনুভব করো,—অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে। চিত্ত বা মনঃ-উপাদান যখন নির্দিষ্ট এক স্থানেই নিরুদ্ধ ও সীমাবদ্ধ হয় তখনই ধারণা ঘটে। ধারণা আছে বহু রকম, এবং তারই সঙ্গে কিছুটা কল্পনার খেলা থাকলে ভালো হয়। ধরো, মনকে হৃদয়ের একটি বিন্দুকে ভাবতে বাধ্য করা হল। এ বড়ো কঠিন কাজ, সহজতর উপায় হল সেখানে একটি পদ্ম আছে কল্পনা করে নেওয়া। পদ্মটি যেন জ্যোতির্ময়—স্বয়ংপূর্ণ জ্যোতিতে পূর্ণ। মনকে সেখানেই স্থাপন করো। অথবা, মস্তিষ্কের মধ্যস্থ পদ্মটিকে পূর্ণকিরণময় ভাবো, কিংবা সুষুম্নাস্থ পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন কেন্দ্রের কথা ভাবো।

যোগীকে সবসময়েই অভ্যাস করতে হবে। তার একা থাকতে হবে; নানা ধরনের লোকের সাহচর্য মনকে বিচ্ছিন্ন করে; তার নির্বাক থাকতে হবে, বেশী কথা বলা মনকে ভ্রষ্ট করে; বেশী কাজ করবে না কারণ কেবল কাজ করাটা মনকে ভ্রষ্ট করে; সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থাকে না। এইসব নিয়ম পালন করে যোগী হওয়া যায়। যোগীর এমন শক্তি যে ওসবের কণামাত্রও আনে বহু কল্যাণ। যোগীর শক্তি কাউকে আঘাত করে না, বরং সকলেরই উপকার করে। প্রথমত তা স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত করে, আনে শান্তি, সব জিনিসই আরো স্পষ্টরূপে দেখবার সামর্থ্য জোগায়। মেজাজ, স্বভাবচরিত্র আরো ভালো হয়, স্বাস্থ্যও আরো ভালো হবে। সর্বপ্রথম লক্ষণরূপে দেখা দেবে পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং মধুর কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরের দোষ সেরে যাবে। যে সব ফল দেখা দেবে তার মধ্যে এটাই প্রথম। যারা কঠিন অভ্যাস পালন করবে, তারা আরো অনেক লক্ষণ দেখবে। কখনো দূরে শুনতে পাবে ঘণ্টাধ্বনি—অবিরাম এক ধ্বনির মতো মিলেমিশে কানে এসে লাগবে। কখনো অনেক জিনিস দেখা দেবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু ভাসতে ভাসতে যেন ক্রমেই বড় হচ্ছে আর এসব যখন হবে, জানবে তুমি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছ।

যারা যোগী হবার জন্যে কঠোর অভ্যাসের পথ গ্রহণ করে, তাদের খাদ্য সম্পর্কে সর্বাগ্রে সাবধান হতে হবে। কিন্তু যারা ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে একটুখানি অভ্যাস মাত্র করতে চায়, তারা যেন বেশি না খায়,—এ ছাড়া তারা যা ইচ্ছে খেতে পারে। যারা দ্রুত উন্নতি চায় এবং কঠিন অভ্যাসও চায়, বাঁধাধরা খাদ্যই তাদের পক্ষে একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। কয়েক মাস কেবলমাত্র দুধ ও ছাতু খেয়ে জীবনধারণ করাই সবচেয়ে সহজ। দেহ-সংগঠন যতই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকবে, প্রথমটা সাধারণ অনিয়মেই বেসামাল হয়ে পড়তে হয়। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না আসা পর্যন্ত একটু-

খানি খাদ্যই সমস্ত দেহব্যবস্থায় বেশি কম গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে, আর তারপরে যা খুশি খেতে পারবে।

মনকে কেন্দ্রীভূত করার প্রথম অবস্থায় একটি আলপিনের শব্দেও মনে হবে যেন মাথার মধ্যে বজ্রপাত হল। ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম হতে থাকলে, অনুভূতিও সূক্ষ্ম হয়। এই সব স্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং যারা ধৈর্য ধরতে পারবে তারাই কৃতকার্য হবে। যুক্তি, তর্ক ও অন্যসব বিভ্রান্তিমূলক কাজ পরিত্যাগ করো। শুষ্ক বুদ্ধির কচকচিতে কী আছে? তা শুধু মনের ভারসাম্য নষ্ট করে, তার মধ্যে গণ্ডগোল বাধায়। সূক্ষ্মতর স্তরের বিষয়ের বোধ সৃষ্টি করতে হবে। কথা বলে কি তা হবে? কাজেই বাজে কথা ত্যাগ করো। যাঁদের বোধ হয়েছে কেবল তাঁদের লেখা গ্রন্থই পাঠ করবে।

মুক্তো শুক্তির মতো হও। সুন্দর একটি ভারতীয় নীতিগল্প আছে। তাতে আছে: স্বাতী নক্ষত্রের উদয়কালে যদি বর্ষণ হয় এবং সেই বর্ষণ-সলিলের একটি বিন্দু যদি শুক্তির মধ্যে পড়ে তো সেই বিন্দুটিই হয়ে উঠবে মুক্তো। শুক্তি তা জানে, তাই স্বাতীর উদয় কিরণ দেখা দিতেই সে সমুদ্রের উপরে উঠে আসে, ঐ অমূল্য এক বিন্দু ধারণ করবার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। একটি বিন্দু ভিতরে পড়তেই শুক্তিরা তাড়াতাড়ি তাদের খোলস বন্ধ করে ফেলেই নেমে আসে সমুদ্রের তলায়, সেই বিন্দুটিকে মুক্তো করে তুলবার জন্যে ধৈর্য ধরে অবস্থান করে। আমাদের হতে হবে ঐ মুক্তোর মতো। প্রথমে শুনতে হবে, এবং তারপর বুঝে দেখতে হবে; আর তারপর সমস্ত আকর্ষণ ছেড়ে বাইরের সমস্ত প্রভাবের কাছে মনের দরজা বন্ধ রেখে তোমায় ভিতরের সত্যকে বিকশিত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। কেবলমাত্র অভিনবত্বের জন্যেই কোনো ভাব অবলম্বন করলে, তারপর আবার সেটা ছেড়ে নতুনতর আর একটা গ্রহণ করলে, তোমার শক্তিগুলিকেই বিপথগামী করে ফেলার আশঙ্কা আছে। একটাকেই নাও, সেটা নিয়েই কাজ করো, শেষ পর্যন্ত দেখো; শেষটা না দেখা পর্যন্ত ত্যাগ করো না। যে এক ভাবেই পাগল হয়, সে-ই জ্যোতি দর্শন করে। যারা কেবল এটায় এক কামড়, ওটায় আর এক কামড় লাগাতে থাকে, সে কখনোই কিছু লাভ করতে পারে না। মুহূর্তের জন্য তাদের স্নায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে, কিন্তু ঐখানেই সব শেষ। তারা প্রকৃতির হাতের দাস হয়ে পড়বে, এবং ইন্দ্রিয়ের অধিকারের বাইরে কখনোই যেতে পারবে না।

যারা সত্যিই যোগী হতে চায়, তাদের চিরদিনের জন্যেই ত্যাগ করতে হবে এটা-সেটা চাখা। একটি মাত্র ভাবকে বরণ করো। সেই ভাবটিকেই করে তোলো তোমার জীবন—তার কথা ভাবো, স্বপ্ন দেখো, সেই ভাবের উপরেই বাঁচো। মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্রী—শরীরের প্রত্যেকটি অংশকে সেই ভাবেই পূর্ণ করো,—অন্যসব ভাবকে পরিত্যাগ করো। এটাই সাফল্যের পথ, এইভাবেই অধ্যাত্ম মহাপুরুষগণের সৃষ্টি ঘটেছে। অন্য সবাই তো রাগযন্ত্র বিশেষ। আমরা যদি সত্যি সত্যি শান্তি পেতে চাই, এবং অন্যকেও শান্তি দিতে চাই, আমাদের তবে আরো গভীরে যেতে হবে। প্রথম সোপানই হল মনকে বিব্রত, অশান্ত না করা, যাদের মন অশান্ত তাদের সংসর্গে

না থাকা। সবাই জানো কোনো কোনো লোক, কোনো কোনো শাস্ত্র, কোনো কোনো ক্ষেত্র বিতৃষ্ণাজনক। সে সব পরিত্যাগ করো; যারা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে চায় তাদের পরিত্যাগ করতে হবে সমস্ত সংসর্গ—তা ভালোই হোক বা মন্দই হোক। কঠিন অভ্যাস করো; তাতে বাঁচবে কি মরবে তা কিছুই নয়। তোমাকে ডুবে থাকতে হবে,—ডুবে থেকে কাজ করতে হবে ফলাফলের চিন্তা না করে। যদি সাহসী হও তো ছয় মাসেই পূর্ণ যোগী হতে পারবে। কিন্তু যারা এই যোগের একটু মাত্রই এবং সবকিছুরই কিছু কিছু গ্রহণ করে তাদের উন্নতি হয় না। কেবলমাত্র পাঠমালা গ্রহণ করে কিছুই হয় না। তামস শক্তিতে যারা পূর্ণ, অজ্ঞান ও মূর্খ, যাদের মন কোনো ভাবেই জড়িয়ে থাকে না, যারা কেবল বিনোদনের জন্যই কিছু কামনা করে, তাদের কাছে তো ধর্ম ও দর্শন কেবলমাত্র বিনোদনের বিষয়। এরাই হল ধৈর্যহীন প্রকৃতি। তারা কোনো কথা শুনল, বেশ মধুর লাগল, আর তারপর বাড়ি গিয়ে সব ভুলে থাকল। সাফল্য চাইলে প্রয়োজন প্রচণ্ড ধৈর্য, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। অধ্যবসায়ী আত্মা বলে—'আমি সমুদ্র শোষণ করব, আমার ইচ্ছায় পাহাড়-পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হবে।' এইরকম শক্তি চাই, এইরকম ইচ্ছাশক্তি চাই, এইরকম কঠিন কাজ চাই, তাহলেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়

ধ্যান ও সমাধি

রাজযোগের বিভিন্ন সোপানগুলি মোটামুটিভাবে আমরা দেখলাম। এবারে সূক্ষ্ম সোপানগুলির কথা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সাধন, এবং এই লক্ষ্যের দিকেই রাজযোগ আমাদের পরিচালিত করবে। আমরা দেখছি, মানুষরূপে আমাদের যতকিছু যুক্তি-নির্ভর জ্ঞান তা সবই হল চেতনা-অভিমুখীন। এই টেবিলটার এবং তোমার অস্তিত্বের উপস্থিতির চেতনা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে টেবিলটা এবং তুমি এখানে রয়েছ। আবার তখনই আমার অস্তিত্বের একটা বড় অংশ সম্পর্কেই আমি সচেতন নই। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলি সম্পর্কে তো কেউই সচেতন নয়।

আমি যখন খাবার খাই, সচেতনভাবেই খাই; সেই খাদ্যই যখন হজম করি, তা করি অচেতনভাবে। খাদ্য যখন রক্তে পরিণত হয়, তা হয় আমার অচেতনভাবেই। রক্ত থেকে যখন শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিলাভ করে, তা হয় অচেতনভাবেই। তবু তো এই আমিই এ সব করে যাচ্ছি; এই শরীরেই তো আর বিশটা লোক থাকতে পারে না। আমিই যে এসব করি, আর কেউ নয়—তা কেমন করে জানতে পারি? এ বিষয়ে জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে আমার কাজ হল খাওয়া ও খাদ্য হজম করা এবং ঐ খাদ্য দ্বারা আমার দেহকে শক্তিশালী করাটা আর কারো কাজ। তা তো হতে পারে না; কারণ, এটা প্রত্যক্ষই দেখানো যায় যে যেসব কাজে আমরা অচেতন থাকি, তাদের সচেতন স্তরে আনা যায়। হৃদ্‌যন্ত্র আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যেন স্পন্দিত হচ্ছে। আমরা কেউ হৃদ্‌স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তা নিজের গতিতেই চলছে। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা লোকে এই হৃদ্‌যন্ত্রকেও সংযত করতে পারে—তখন ইচ্ছাশক্তি মতোই তা ধীরে ধীরে বা তাড়াতাড়ি স্পন্দিত হবে, অথবা স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। দেহের প্রায় সব অংশকেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এতে কি বোঝা যায়? সচেতন অবস্থার অন্তঃস্থলে যে ক্রিয়া চলে সেগুলিরও কর্তা আমরাই, তবে কিনা আমরা তা করছি অচেতনভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানব-মন দুভাবে কাজ করে। প্রথমে সচেতন স্তরে—সেখানে সব কাজের সঙ্গে সদাসর্বদাই থাকে অহং-চেতনা। তারপরে অচেতন স্তর; এখানে কোনো কাজেই অহং-চেতনা থাকে না। অহং-চেতনা-শূন্য মানসক্রিয়ার অংশ হল অজ্ঞান অংশ, আর অহং-চেতনাপূর্ণ মানসক্রিয়ার অংশ হল সজ্ঞান অংশ। নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যের এই অচেতন ক্রিয়াকে বলা হয় প্রবৃত্তি। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাণী যে মানুষ তার মধ্যেই থাকে সচেতন ক্রিয়ার প্রাধান্য।

তবু এখানেই শেষ কথা নয়। আরো এক উচ্চস্তরে উঠে মানবমন কাজ করতে পারে। চেতনলোকের বাইরেও তা যেতে পারে। চেতনার নিম্নে যেমন অচেতন স্তর, তেমনি সচেতনের উপরে আছে আর এক ক্রিয়া এবং তাতেও থাকে না কোনো অহং-চেতনা। অহং-চেতনা থাকে শুধু মধ্যস্তরে। মন যখন বিভেদরেখার উপরে বা

নিচে থাকে, তখন 'আমি' থাকে না, মন তবু কাজ করে যায়। মন যখন এই আত্মচেতনার বাইরে চলে যায় তখন তাকে বলে সমাধি বা জ্ঞানাতীত চেতনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কেমন করে জানব যে সমাধিস্থ ব্যক্তি চেতনার নিম্নস্তরেই যায়নি—উচ্চস্তরে না গিয়ে অধঃস্তরেই রয়েছে? দুই ক্ষেত্রেই তো মানসক্রিয়ায় অহংবোধ থাকে না। উত্তর হল: পরিণাম বা ক্রিয়াফল দেখেই জানা যায় কোন্‌টা নিম্নস্তরের, কোন্‌টা বা উচ্চ। কেউ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, সে চেতনার নিম্নস্তরে চলে যায়। সমস্ত সময় তার দেহকে সে চালিত করে; ঘুমের মধ্যেই সে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়, দেহ সঞ্চালিত করে—অহংয়ের অনুষঙ্গ বোধ ছাড়াই; সে অচেতন থাকে, তারপর সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন তো সে ঐ একই লোক থাকে। ঘুমের আগেও তার জ্ঞান-সমষ্টি যা ছিল তখনো ঠিক তাই থাকে; তা তো একটুও বাড়ে না। কোনো জ্যোতিতেও তার মন উদ্ভাসিত হয় না। আর, সমাধিস্থ হলে, আগে যে ছিল মূর্খ সেই হয়ে ওঠে ঋষি।

কিসে তফাৎটা হয়? এক অবস্থার থেকে কেউ জেগে ওঠে সেই একই লোক, অন্য অবস্থা থেকে কেউ প্রত্যাগমন করে মহাজ্ঞানী হয়ে, ঋষি হয়ে, দ্রষ্টা হয়ে, সাধু হয়ে,—তার সমগ্র চরিত্রই পালটে গেল, তার সমস্ত জীবনই পরিবর্তিত হয়ে গেল, উদ্ভাসিত হল। এই হল দু-রকমের কার্যফল। কার্যফল যখন ভিন্ন প্রকার, কারণও নিশ্চয়ই ভিন্নপ্রকার। যে আলোক নিয়ে সমষ্টি থেকে কেউ প্রত্যাবর্তন করে তা অচেতন অবস্থা থেকে প্রাপ্তির চেয়ে বেশী উচ্চস্তরের, বা সচেতন অবস্থায় যুক্তি বিচার দিয়ে লভ্য কিছুর চেয়ে উচ্চস্তরের; কাজেই তাকে জ্ঞানাতীত অবস্থা বা অতিচেতন বলতেই হবে। সমাধিকে বলা অতিচেতন অবস্থা।

সংক্ষেপে সমাধি বলতে এই বোঝায়। এর প্রয়োগ কিরূপ? প্রয়োগ হল এই রকম: যুক্তি বুদ্ধির ক্ষেত্র বা মনের সচেতন ক্রিয়ার ক্ষেত্র হল সঙ্কীর্ণ এবং সীমিত। একটা সুনির্দিষ্ট চক্রের মধ্যে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধিকে ঘুরতে ফিরতে হবেই। তার বাইরে তা যেতে পারে না। বাইরে যাবার প্রত্যেকটি উদ্যোগই অসম্ভব হয়ে ওঠে, কিন্তু মানবজাতি যাকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করে তা ঐ চক্রেরই বাইরে থাকে। অমর আত্মা আছে কিনা, ঈশ্বর আছে কিনা, এই বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী কোনো পরম বুদ্ধি আছে কিনা এসব প্রসঙ্গ যুক্তিবিচারের বাইরের বিষয়। এসব প্রশ্নের কোনোটার উত্তরই তা কখনোই দিতে পারে না। তা বলে—"আমি হলাম অজ্ঞেয়বাদী; আমি 'হাঁ' বা 'না' জানি না।" তবু এসব প্রশ্ন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যথাযোগ্য উত্তর ছাড়া মানবজীবনই হয়ে ওঠে উদ্দেশ্য-হীন। আমাদের সমস্ত নৈতিক মত, সমস্ত নৈতিক দৃষ্টি, মনুষ্য-প্রকৃতির যা কিছু সৎ ও মহৎ তার সবই গঠিত হয় যুক্তি-চক্রের বহিরাগত উত্তরের দ্বারা। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এসবের উত্তর আমাদের পেতেই হবে। জীবন যদি ছোট্ট নাটক হয়, বিশ্ব যদি পরমাণুর আকস্মিক মিলন হয়, তবে কেন আমি অন্যের ভালো করব? কেন থাকবে দয়া, ন্যায়ধর্ম বা ভ্রাতৃত্ব? তবে তো সময় ও সুযোগ মতো যে যার নিজের জন্যেই শুধু কিছু করে নেওয়াটাই হত পৃথিবীর সবচেয়ে

ভালো কাজ। যদি কোনো আশাই না থাকে তো, আমি আমার ভাইকে ভালো-বাসব কেন, কেন তার গলাটা কাটব না? প্রত্যক্ষের বাইরেই যদি কিছু না থাকে, যদি মুক্তি না থাকে, কেবলমাত্র নির্মম কঠিন আইনকানুনই থাকে,—তবে তো এখানে ইহলোকে নিজেকেই শুধু সুখী করতে চেষ্টা করব। আজকাল লোককে প্রায়ই বলতে শুনবে, তাদের নৈতিকতার ভিত্তিই হল উপযোগিতাবোধ। ঐ ভিত্তিটি কিরূপ? সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লোকের কাছে সবচেয়ে বেশি সুখের উপাদান জুগিয়ে দেওয়া। আমি তা করব কেন? আমার উদ্দেশ্য সফল করতে সবচেয়ে অ-সুখের উপাদানই আমি সবচেয়ে বেশীসংখ্যকের কাছে কেন সৃষ্টি করব না? উপযোগিতাবাদীরা এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন? কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় কী করে জান তুমি? আমি সুখের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হয়েই তো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করি, এটা আমার স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। তার বাইরে আমি কিছুই জানি না। আমার এতসব আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং আমি তা পূরণ করব। তুমি তাতে বাধা দেবে কেন? নীতিবোধ, অমরাত্মা, ঈশ্বর, প্রেম এবং করুণা, সৎ হওয়া, এবং সর্বোপরি নিঃস্বার্থ হওয়া—মানবজীবন সম্পর্কে এসব সত্য কোথা থেকে এলো?

সমস্ত নীতিশাস্ত্র, সমস্ত মানবিক কর্ম, সমস্ত মানব-চিন্তারই একমাত্র ভিত্তিমূল হল এই নিঃস্বার্থপরতা। মানবজীবনের সমস্ত ভাবকেই যে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করা যায় সেই শব্দটিই হল নিঃস্বার্থপরতা। আমরা নিঃস্বার্থ হব কেন? নিঃস্বার্থ হবার আবশ্যকতা, শক্তি, আবেগ কোথায়? তুমি নিজেকে হিতবাদী, যুক্তিবাদী বলছ; কিন্তু তুমি যদি হিতবাদের পক্ষে আমাকে যুক্তি না দেখাতে পারো তো তোমাকেই বলব আমি যুক্তি-বিরোধী। আমি স্বার্থপর হব না কেন, তার যুক্তি দেখাও। কাউকে নিঃস্বার্থ হতে বলাটা ভালো কবিতার মতো শোনাতে পারে, কিন্তু কবিতা তো যুক্তি নয়। যুক্তি দেখাও। কেন নিঃস্বার্থপর হব, সৎ হব? শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী অমুক তমুক বলেছেন এ কথায় চলবে না। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার উপযোগিতাটা কোথায়? উপযোগিতার অর্থই যদি হয় সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ তবে তো স্বার্থপর হওয়াতেই উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী! এখানে উত্তর কোথায়? হিতবাদী অর্থাৎ উপযোগিতাবাদী অর্থাৎ হিতবাদীর দল এর কোনো উত্তর দিতে পারবে না। উত্তর হল, এই পৃথিবী হল অশান্ত সমুদ্রে এক ক্ষুদ্র বিন্দু, অখণ্ড শৃঙ্খলের একটি যোগসূত্রই শুধু। যাঁরা নিঃস্বার্থপরতা প্রচার করেছেন, মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন—তাঁরা এই ভাবটি কোথায় পেলেন? আমরা জানি এ তো প্রকৃতিজাত নয়; যেসব প্রাণীর প্রবৃত্তি আছে তারা তো এসব জানে না। এটাতো যুক্তিবিচার নয়, তাতে তো এসব ভাবের কোনো কথা নেই। তাহলে কোথা থেকে এলো এসব?

ইতিহাস পড়ে আমরা জানি, পৃথিবীতে যত মহান শিক্ষক জন্মেছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই একটা ব্যাপার সাধারণ সত্যরূপে গৃহীত হয়েছে। সকলেই দাবি করেন তাঁরা তা পেয়েছেন বাহির থেকে; তবে তাঁদের অনেকেই জানেন না ঠিক

কোথা থেকে তাঁরা তা পেয়েছেন। যেমন, কেউ বলতে চাইছেন—এক ডানাধারী দেবদূত এসেছিল মানুষের আকার ধরে, তাঁর কাছে বলেছেন—"শোনো হে মানব, এই বাণী শোনো!" কেউ বলেন, এক দেবতা—এক কিরণময় সত্তা তাঁর কাছে এসেছিল। আর একজন বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর এক পূর্বপুরুষ এসে তাঁকে কিছু বলে গেছেন। তার বাইরে তিনি আর কিছুই জানেন না। তবে তাঁদের প্রত্যেকের দাবির মধ্যেই একটা বিষয় থাকছে যে তাঁদের জ্ঞান এসেছে লোকাতীত জগৎ থেকে—যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়। যোগবিজ্ঞান কি শিক্ষা দিচ্ছে? শিক্ষা দিচ্ছে ঐ সব মহাপুরুষগণ যে বলছেন তাঁদের সমস্ত জ্ঞানই এসেছে যুক্তিবিচারের বাহির থেকে—তাঁদের এসব দাবি যথার্থই, তবে সবই এসেছে তাঁদের নিজেদেরই ভিতর থেকে।

যোগীরা এই শিক্ষা দেন যে যুক্তিবুদ্ধির বাইরে মনের স্বকীয় একটি উচ্চতর অবস্থা আছে,—তা এক অতিচেতন বা জ্ঞানাতীত অবস্থা; মন যখন উচ্চতর অবস্থায় চলে যায়, যুক্তিবুদ্ধির অতীত জ্ঞানই মানুষের কাছে দেখা দেয়। দার্শনিক ও উত্তরণশীল জ্ঞান আসে তার কাছে। এই যুক্তির বহির্ভূত অবস্থায় চলে যাওয়া—সাধারণ মানব-প্রকৃতিতে উত্তীর্ণ হওয়া, কখনো কখনো হঠাৎ এমন মানুষের কাছে আসতে পারে—যে এর বিজ্ঞানতত্ত্ব বোঝেই না। সে যেন হুঁচোট খেয়ে তার উপরেই এসে পড়ে। এবং তখন সে সাধারণ ব্যাখ্যায় বলে যে তা বাইরে থেকেই এসেছে। এতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন যে কোনো প্রেরণা বা উত্তরণশীল জ্ঞান সবদেশেই একরকম হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো কোনো দেশে আসে যেন দেবদূত মাধ্যমে, কোনো দেশে আসে যেন কোনো দেবতা মাধ্যমে। আবার কোনো দেশে আসে ঈশ্বর মাধ্যমে। এতে কি বোঝা গেল? বোঝা গেল যে মন স্বভাবগুণেই জ্ঞান বহন করে এনেছে, এবং যার মাধ্যমে এসেছে তার বিশ্বাস ও শিক্ষাদীক্ষা অনুসারেই জ্ঞান-সন্ধানকে ব্যাখ্যা করা হয়। সত্যিকার ঘটনা হল, এই নানা ধরনের লোক যেন হঠাৎ হুঁচোট খেয়ে পড়েছে এই জ্ঞানাতীত অবস্থায়।

যোগী বলেন, এইরকম অবস্থার উপরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ায় ভয়ানক বিপদ আছে। বেশ কিছু ঘটনায় দেখা যায় মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে গেছে, এবং সাধারণ নিয়মানুসারেই দেখতে পাবে এইসকল লোক, যতই মহৎ হোক না কেন, তার কোনো বোধ ছাড়াই এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় এসে পড়েছে এবং অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে। সাধারণত তাদের বোধের সঙ্গে থাকে কুসংস্কার। তারা ভ্রান্ত দর্শনেরই অনুগত হয়ে পড়ে। মহম্মদ দাবি করেছেন, গ্যাব্রিয়েল একদিন গুহার মধ্যে তাঁর কাছে এসে তাঁকে স্বর্গীয় অশ্বে করে নিয়ে গেছেন এবং তিনি স্বর্গলোক দেখে এলেন। মহম্মদ কয়েকটি আশ্চর্যজনক সত্য কথা বলেছেন। কোরান পড়লে দেখবে সেখানে রয়েছে কুসংস্কার মিশ্রিত আশ্চর্যতম সত্য। কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করবে? নিঃসন্দেহেই তিনি প্রেরণা পেয়ে থাকবেন, কিন্তু সেই প্রেরণায় এসে পড়েছেন হঠাৎই। তিনি যোগশিক্ষা করেন নি, তিনি যে কি করছেন নিজেই জানতেন না। মহম্মদ যে সব ভালো কাজ করেছেন একবার ভাবো, তারপর ভাবো তাঁর উন্মত্ততায়

কী সব ভয়ঙ্কর অন্যায় ঘটেছে! ভাবো, তাঁরই শিক্ষায় খুন হয়েছে কত লক্ষ লক্ষ লোক—কত মা হয়েছে সন্তানহারা, কত শিশু হয়েছে পিতৃমাতৃহীন, ধ্বংস হয়েছে সমস্ত দেশ, খুন হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মহম্মদ এবং তাঁর মতো বড় বড় অনেক শিক্ষাদাতার জীবন-বৃত্তান্ত অধ্যয়নে কী বিপদ দেখা দিতে পারে। তবু এটাও তো আমরা দেখছি, তাঁরা সকলেই উদ্বোধিত হয়েছিলেন। ভাবপ্রবণ স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই যখন কোনো ধর্মগুরু জ্ঞানাতীত অবস্থায় এসেছেন, তা থেকে তিনি কেবলমাত্র কিছু সত্যই আহরণ করেননি, কিছু উন্মাদনা আর কুসংস্কারও আহরণ করেছেন এবং তা পৃথিবীর বহু ক্ষতিসাধন করেছে, যেমন পৃথিবী উপকৃত হয়েছে তাঁদের মহান শিক্ষায়। যে সামঞ্জস্যহীন ঘটনাপুঞ্জকে আমরা মানবজীবন বলে থাকি তা থেকে যুক্তিসম্মত কোনো সত্য আহরণ করতে হলে আমাদের যেতে হবে যুক্তিরই বাইরে, কিন্তু তা করতে হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে, ধীরে ধীরে, নিয়মিত অভ্যাসে; এবং ত্যাগ করতে হবে সমস্ত রকমের কুসংস্কার। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই গ্রহণ করতে হবে জ্ঞানাতীত বা অতিচেতন অবস্থাকে। যুক্তির উপরেই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যুক্তি যতদূর পরিচালিত করতে পারে ততদূর যুক্তিকেই অনুসরণ করতে হবে; যুক্তি যখন হার মানবে, যুক্তিই দেখিয়ে দেবে সর্বোচ্চ স্তরের পথটি কোন দিকে। কোনো লোককে যখন বলতে শোনো—'আমি প্রেরণা পাচ্ছি' কিন্তু তারপরেই যখন সে আবোল তাবোল বকতে থাকে,—তখন তাকে বর্জন করবে। কেন? কারণ প্রবৃত্তি, যুক্তি, এবং অতিচেতনা—এই তিনটি একই মনের তিন অবস্থা। এক লোকের মধ্যেই তো তিনটি মন নেই, মনের এক অবস্থাই তিন রূপে প্রকাশিত হয়। প্রবৃত্তি উন্নীত হয় যুক্তিবুদ্ধিরূপে, যুক্তিবুদ্ধি উন্নীত হয় উত্তরণধর্মী মহাচেতনায়। কাজেই, এক অবস্থা অন্য অবস্থার বিরোধধর্মী নয়। যথার্থ প্রেরণা কখনোই যুক্তিবুদ্ধির বিরোধী হয় না, বরং তা পরিপূরক হয়ে থাকে। দেখবে, মহান ধর্মগুরুগণ যেমন বলে থাকেন—'আমার আগমন ধ্বংস করার জন্যে নয়, পরিপূর্ণ করার জন্যে।' তাই প্রেরণা সবসময়েই আসে যুক্তিকেই পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, এবং এর সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন সোপান আমাদের বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত করার জন্যই। অধিকন্তু, এবং এটা উপলব্ধি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, প্রেরণা প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই যতটা আছে, ততটাই ছিল প্রাচীনকালের ধর্মগুরুদের মধ্যে। এই অবতারগণ অনন্য কিছু ছিলেন না; তোমার আমার মতোই ছিলেন; তবে তাঁরা ছিলেন মহাযোগী। তাঁরা এই জ্ঞানাতীত চেতনা লাভ করেছিলেন, তুমি আমিও তা পারি। তাঁরা অদ্ভুত ধরনের লোক ছিলেন না। কারো ঐ অবস্থায় উপনীত হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে প্রতিটি লোকের পক্ষেই তা করা সম্ভব। কেবল সম্ভবই নয়, প্রত্যেক লোককেই ঘটনাক্রমে সেই অবস্থায় আসতেই হবে, এবং এটাই হল ধর্ম। আমাদের যে একমাত্র শিক্ষক আছে তা হল অভিজ্ঞতা। সারাটা জীবন আমরা কথা বলে, তর্ক করে

কাটাতে পারি, কিন্তু তাতেহ আমরা একটি কণা সত্যও বুঝতে পারব না, যে পর্যন্ত না আমরা নিজেরা তা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেতে পারি। কয়েকখানা বই দিয়েই কাউকে 'সার্জেন' করার আশা করতে পারো না। একটা মানচিত্র দেখিয়ে তুমি আমার কোনো দেশ দেখার ঔৎসুক্য পূরণ করতে পারো না। আমার নিজেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা চাই। কেউ পারে কেবল আরো পূর্ণতর জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের মধ্যে ঔৎসুকা সঞ্চার করতে। তার বাইরে আর কী মূল্য আছে তার? কেবলমাত্র পুঁথির প্রতি আসক্তি মানুষের মনেরই অধঃপতন ঘটায়। এই বই বা সেই বইতে ঈশ্বর সম্পর্কে সমগ্র জ্ঞান বন্দী হয়ে আছে—এমন কথা বলার মতো নিন্দনীয় বিষয় আর কী আছে? ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হচ্ছে, আবার ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থের দুটো মলাটের মধ্যে তাকে ঠেসে রাখা হচ্ছে—লোকে এটা কী করে পারে! গ্রন্থ যা বলছে তাই বিশ্বাস না করার জন্যেই, গ্রন্থের দুটি মলাটের মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ক সমগ্র জ্ঞান আছে তা মানতে সম্মত না হওয়ার জন্যেই, হত্যা করা হয়েছে কত লক্ষ লক্ষ লোককে। অবশ্য, এইরকম হত্যা ও খুনখারাবির দিন চলে গেছে, তবুও গ্রন্থের উপর বিশ্বাসেই এখনো আষ্টেপৃষ্টে বদ্ধ রয়েছে পৃথিবী।

বিজ্ঞানসম্মতভাবেই জ্ঞানাতীত অবস্থায় পৌঁছবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন রাজযোগের বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করা; তাই এখন বলছি। প্রত্যাহার ও ধারণার পরেই জ্ঞান বা তপস্যা। মনকে যখন বাহিরের বা ভিতরের কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্থির রাখার শিক্ষা লাভ করা যায়, তখন সেই বিন্দুর দিকে মনের শক্তি যেন অব্যাহত ধারায় আসতে থাকে। এই অবস্থাকেই বলে ধ্যান। অনুভূতির বহিরঙ্গ অংশ বর্জন করে কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ দিকটাতেই নিবদ্ধ রেখে অর্থটির দিকেই ধ্যানশক্তিকে যখন কেউ তীব্র করে তুলতে পেরেছে, তখনই তাকে বলে সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিকে একত্রে বলে সংযম। তার অর্থ, মন প্রথমটায় কোনো বিষয়ের উপরেই কেন্দ্রীভূত হয়, তারপর কিছুকাল পর্যন্ত সেই সংযত অবস্থায় থাকতে পারে, এবং তারপর অবিচ্ছিন্ন মনোযোগের দ্বারা অনুভূতির যে অন্তরঙ্গ অংশের ফল হল বিষয়টি একমাত্র সেই অন্তরঙ্গ অংশেই স্থিত থাকে—এরকম অবস্থা যদি ঘটে তবে সবকিছুই ঐরকম মনের অধীন হয়।

এইরূপ ধ্যানাবস্থাই হল সত্তার সর্বোচ্চ অবস্থা। যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষা আছে, সত্যিকার সুখ নেই। বিষয়াদির ধারণাত্মক, ভাবাত্মক এক সাক্ষ্যতুল্য পর্যবেক্ষণই কেবলমাত্র আমাদের যথার্থ উপভোগ ও সুখ দিতে পারে। জীবজন্তুদের সুখ হল ইন্দ্রিয়ে, মানুষের মননে, এবং দেবতার সুখ হল আধ্যাত্মিক ধ্যানে। যার আত্মা এই ধ্যানাবস্থায় উপনীত হয়েছে একমাত্র তার কাছেই জগৎ হয়ে ওঠে সুন্দর। যার কিছুই কামনা নেই, এবং কামনার সঙ্গে নিজেকে কখনো বিজড়িতও করে না, তার কাছে প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন হয়ে ওঠে সুন্দরের ও মহান গম্ভীরেরই অফুরন্ত লীলাচ্ছবি।

ধ্যান বা তপস্যায় এই ভাবগুলিকে বুঝে নিতে হবে। একটা শব্দ শুনলাম। প্রথমটায় হল বহিঃকম্পন; দ্বিতীয়ত স্নায়ুপ্রবাহ তা মনের কাছে পৌঁছে দিল;

তৃতীয়ত, মন থেকে যে প্রতিক্রিয়া হল তাতে সঙ্গে সঙ্গেই ঝলকে উঠল সেই বিষয়টির জ্ঞান—যে বিষয়টি ঈথারের কম্পন থেকে থেকে সুরু করে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত এই বিভিন্ন পরিবর্তনের বহিরঙ্গ কারণ। যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে বলা হয় শব্দ (ধ্বনি), অর্থ (প্রকাশ) এবং জ্ঞান (বোধ)। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের বলা হয় ঈথারীয় কম্পন—স্নায়ুতন্ত্রীতে ও মস্তিষ্কে তার গতি-ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। এইসব ক্রিয়া-পদ্ধতি স্পষ্ট হলেও এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বস্তুত, আমরা এগুলির কোনোটাকেই অনুভব করতে পারি না, কেবলমাত্র তাদের সম্মিলিত ফলটিই দেখতে পাই। প্রত্যেকটি অনুভূতির মধ্যেই এই তিনটি ব্যাপার থাকে, এবং সেগুলিকে পৃথকভাবে জানতে না পারার কোন কারণ নেই।

পূর্ব-প্রস্তুতির দ্বারা মন যখন দৃঢ় ও সংযত হয়, সূক্ষ্ম অনুভূতি ঘটে, মনকে ধ্যানে নিযুক্ত করা দরকার। এই ধ্যান অবশ্যই সুরু করতে হবে স্থূল বিষয় থেকে, তারপর ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে—যে পর্যন্ত না তা বিষয়বোধ শূন্য হয়ে পড়ে। মনকে প্রথমটায় অনুভূতির বহিঃকারণসমূহেই ব্যাপৃত রাখতে হবে, তারপরে আভ্যন্তরীণ গতিসঞ্চারের দিকে এবং তারপর তার স্বকীয় প্রতিক্রিয়ার দিকে। মন যখন স্বয়ংই অনুভূতির বহিঃকারণসমূহ অনুভব করতে কৃতকার্য হবে, মন সমস্ত সূক্ষ্ম বাস্তব অস্তিত্বকে—সমস্ত সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম আকারকে অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করবে। মন যখন নিজেই আভ্যন্তরীণ গতি-সঞ্চালন অনুভবে সক্ষম হবে, তখন তার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে সমস্ত মানস-তরঙ্গগুলি—কি নিজের, কি বাইরের—এমনকি সেসব প্রাকৃতিক শক্তিরূপে দেখা দেবার আগেই নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে। আর, মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করতে সক্ষম হলে যোগী অর্জন করবে সমস্ত কিছুরই জ্ঞান, যেহেতু প্রতিটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, প্রতিটি চিন্তাই হল ওই প্রতিক্রিয়ার ফল বিশেষ। তখন সে তার মনের ভিত্তিমূলটিই দেখতে পাবে এবং তা তারই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। যোগীর মধ্যে দেখা দেবে বহুরকম শক্তি, কিন্তু সেসবের কোনোটির দ্বারাই যদি সে প্রলুব্ধ হয় তো তার কাছে আরো অগ্রসর হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সুখ উপভোগের পশ্চাতে ছোটার এমনি বিষময় ফল। কিন্তু তার যদি এইসব অলৌকিক শক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকে, তবে সে পৌঁছতে পারবে যোগের শেষ লক্ষ্যে—মনঃসমুদ্রের তরঙ্গরাজিকে পরাভূত করার এক বিশেষ অবস্থায়। তখন মনের বিক্ষেপাদি বা দেহের গতিবিধি দ্বারা ব্যাহত না হয়ে পূর্ণ প্রকাশে দেখা দেবে আত্মার মহিমা; যোগী তখন তাঁকে প্রত্যক্ষ করবেন নিজে যেমন তিনি রয়েছেন এবং যেমন তিনি ছিলেন—নিজেকে প্রত্যক্ষ করবেন জ্ঞানসার রূপে, মৃত্যুহীন-রূপে, সর্বত্রবিরাজমান-রূপে।

সমাধিতে প্রতিটি মানবেরই—না, প্রত্যেকটি জীবেরই অধিকার। নিম্নতম প্রাণী থেকে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত প্রত্যেককেই কখনো না কখনো আসতে হবে ঐ পরমাবস্থায়, এবং কেবলমাত্র তখনই যথার্থই যা ধর্ম তা তার মধ্যে সুরু হবে। তার আগে আমরা কেবল সেই অবস্থায় পৌঁছবার জন্যে সংগ্রাম করছি। ধর্মের অভিজ্ঞতা না থাকলে আমাদের মধ্যে ও ধর্মহীনদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই অভিজ্ঞতায়

উপনীত করা ছাড়া মনোযোগের কি বা প্রয়োজন? সমাধি লাভের প্রত্যেকটি সোপানকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সমন্বিত করা হয়েছে যথাসঙ্গত-ভাবে, সংগঠিত করা হয়েছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে, এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সুনিশ্চিতভাবেই তা আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পরিচালিত করবে। তখন দূর হয়ে যাবে সমস্ত দুঃখকষ্ট, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যত যন্ত্রণা; ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমস্ত কর্ম-বীজ, আত্মা হবে চিরমুক্ত।

অষ্টম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত রাজযোগ

এখানে কূর্মপুরাণ থেকে রাজযোগের সংক্ষিপ্তসার অনুবাদ করে দিচ্ছি :

যোগাগ্নি মানুষের চারপাশের পাপপিঞ্জর দগ্ধ করে ফেলে। জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় এবং সরাসরি নির্বাণ লাভ করা যায়। যোগ থেকেই জন্ম নেয় জ্ঞান; আবার জ্ঞানই সহায়তা করে যোগীকে। যে নিজের মধ্যেই যোগের সঙ্গে জ্ঞানের মিলন ঘটিয়েছে, ঈশ্বর তার উপর প্রসন্ন হন। যাঁরা মহাযোগ অভ্যাস করেন—দিনে একবার বা দুইবার বা তিনবার বা সদা সর্বদাই, তাঁদের মহাপুরুষ বলে জানবে। যোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : একটিকে বলে অভাব, অন্যটি হল মহাযোগ। নিজেকেই শূন্যরূপে—নির্গুণ রূপে ধ্যান করলে তাকে বলা হয় অভাব; নিজেকে পরম শক্তিময়, সর্বকলুষমুক্ত ও ঈশ্বরে একাত্ম রূপে ধ্যান করলে তাকে বলা হয় মহাযোগ। এর যে কোনোটিকে দিয়েই যোগীর আত্মোপলব্ধি ঘটে। অন্যান্য যেসব যোগের কথা আমরা পড়ি বা শুনি তা অনুপম মহাযোগের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য নয়—ঐ মহাযোগে যোগী নিজেকে এবং নিখিল বিশ্বকে ঈশ্বররূপে দর্শন করেন। সমস্ত যোগের মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এসব হল রাজযোগের সোপান শ্রেণী। এদের মধ্যে অহিংসা, সত্যবাদিতা, লোভশূন্যতা, সততা, অন্যের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ না-করা এ সবকে বলা হয় যম, এরা চিত্তকে পবিত্র করে। কোনো জীবকে চিন্তা দ্বারা, বাক্য দ্বারা এবং কার্য দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেওয়াকে বলে অহিংসা। অহিংসার চেয়ে বড় ধর্ম নেই। এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে কারুর ক্ষতি না করার মতো মনোভাবটি থেকে যে আনন্দ লাভ হয় তার চেয়ে সুখ আর কিছুতেই নেই। সত্যের দ্বারাই সবকিছু লাভ করা যায়। সত্যের মধ্যেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। যা যথার্থ তা বর্ণনা করাটাই হল সত্য। কারো কিছু চুরি করে বা জোর করে না নেওয়াকে বলে অস্তেয়—লোভহীনতা। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে সততা—সমস্ত সময়েই এবং সব অবস্থায়ই সততাকে বলে ব্রহ্মচর্য। খুব দুঃখকষ্টের মধ্যেও কারো কাছ থেকে কোনো দান গ্রহণ না করাকে বলে অপরিগ্রহ। অর্থাৎ অন্য কারো কাছ থেকে কোনো দান গ্রহণ করার সময় তার প্রাণ অপবিত্র হয়ে যায়—সে দুর্বল হয়ে পড়ে, স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, বাধ্যবাধকতার মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং আসক্ত হয়ে পড়ে।

এখন যোগসহায়ক কিছু বলা হচ্ছে। যার নাম হল নিয়ম বা নিয়মিত অভ্যাস ও পালন; তপ বা কৃচ্ছ্রসাধনা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন; সন্তোষ শৌচ বা পবিত্রতা; ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বর-উপাসনা। উপবাস বা অন্য প্রকারে দেহকে নিয়ন্ত্রণ হল শারীরিক তপ; বেদমন্ত্র বা অন্য মন্ত্র আবৃত্তি—যার দ্বারা দেহের সত্ত্ব: উপাদানকে পবিত্র করা হয় তাকে বলে অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়। এ সব মন্ত্রের তিন রকম আবৃত্তি আছে। একটিকে বলা হয় মৌখিক, আর একটি আধা-মৌখিক, তৃতীয়টি মানসিক। মৌখিক-বা শ্রোতব্যটি

হল সর্বনিম্ন স্তরের, অশ্রুতটি হল সর্বোচ্চ। যে আবৃত্তিতে উচ্চস্বর থাকে তা হল মৌখিক; দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আধা-মৌখিকটিতে কেবলমাত্র ঠোঁট নড়ে—কোনো শব্দ শোনা যায় না। মন্ত্রের অশ্রুত আবৃত্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করাকে বলে "মানস-আবৃত্তি", এবং এটাই হল সর্বোচ্চ। ঋষিগণ বলেছেন—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুরকম বিশুদ্ধিকরণ আছে। জল দিয়ে, মাটি দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে দেহ-শুদ্ধি হল বহিরঙ্গ শুদ্ধিকরণ—যেমন স্নানাদি। সত্য বা অন্য গুণসমূহ দিয়ে মনের শুদ্ধিকরণকেই বলা হয় অন্তরঙ্গ শুদ্ধিকরণ। এই দুটোই দরকার। এটা তো যথেষ্ট নয় যে কোনো লোক অন্তরে পবিত্র থাকবে, বাইরে নোংরা। দুটোই লাভ করা না গেলে বরং অন্তর-শুদ্ধিই ভালো; কিন্তু যোগীর জন্যে দুটোই দরকার। ঈশ্বর-উপাসনা হল স্তুতিতে, চিন্তায়, ভক্তিতে।

যম ও নিয়ম সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এবার দ্বিতীয়টি হল আসন (দেহ-ভঙ্গী)। এ প্রসঙ্গে যে একটিমাত্র বিষয় বুঝবার মতো আছে তা হল বক্ষোদেশ, কাঁধ ও মাথা সোজা রেখে আসন দেহকেই স্বচ্ছন্দ রাখে। তারপর প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থ দেহের ভিতরেব মৌল শক্তিসমূহ। আয়ম অর্থ তাদের নিয়ন্ত্রণ। তিনরকম প্রাণায়াম আছে—খুব সরল, মধ্যম রকমের, এবং খুব উঁচু স্তরের। প্রাণায়াম তিনরকম: পূরণ (পূরক), নিরোধ (কুম্ভক), শূন্যকরণ (রেচক)। বারো সেকেণ্ড থেকে প্রাণায়াম সুরু করলে তা হল অধম প্রাণায়াম; চব্বিশ থেকে শুরু করলে মধ্যম রকমের; ছত্রিশ সেকেণ্ড থেকে শুরু হলে সর্বোত্তম প্রাণায়াম। নিম্নতম ধরনের প্রাণায়ামে স্বেদ দেখা দেয়, মধ্যম ধবনের প্রাণায়ামে দেহ-কম্পন, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণায়ামে দেহ লঘুভার হয়—উদয় হয় পরম আনন্দ। গায়ত্রী নামে এক মন্ত্র আছে। তা বেদের এক পবিত্র মন্ত্র। "যিনি এই বিশ্বকে প্রসব করেছেন আমরা তাঁর মহিমা ধ্যান কবি। তিনি আমাদের মানস-লোক প্রদীপ্ত করুন।"—এই মন্ত্রের সুরুতে ও শেষে 'ওম্' যুক্ত হয়। একটি প্রাণায়ামে তিনবার গায়ত্রী জপ করতে হয়। সমস্ত গ্রন্থেই বলে প্রাণায়ামের তিনটি ভাগ আছে: রেচক (শ্বাস নির্গমন), পূরক (শ্বাস গ্রহণ), কুম্ভক (শ্বাস ধারণ)। ইন্দ্রিয়াদি বহির্বিষয়ে কাজ করে। তাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন করাকে বলা হয় প্রত্যাহার বা নিজের মধ্যে আহরণ। হৃদয়-পদ্মের উপর বা মস্তিষ্কের কেন্দ্রে মন স্থির করাকে বলা হয় ধারণা। একটি নির্দিষ্ট স্থানকে ভিত্তিপীঠরূপে গ্রহণ করলে একরকমেব মানসতরঙ্গ জেগে ওঠে, অন্য ধরনের তরঙ্গ তা গ্রাস করে না, বরং ক্রমে ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে, এবং অন্য সবগুলি সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যায়। তারপর এই তরঙ্গগুলি মিলে এক হয়ে ওঠে—মনে থাকে শুধু একটিমাত্র তরঙ্গ। এটাই হল ধ্যান-তপস্যা। যখন কোনো ভিত্তিরই আর প্রয়োজন হয় না, যখন মনের সবটাই হয়ে ওঠে একটিমাত্র তরঙ্গ—একটি আকার মাত্র, তাকে বলা হয় সমাধি। সমস্ত স্থান ও কেন্দ্র শূন্য অবস্থায় থাকে। মন বারো সেকেণ্ড কাল কেন্দ্রে স্থির থাকলে তাকে বলা হয় ধারণা, এইরকম বারোটি ধারণায় হয় ধ্যান, বারোটি ধ্যানে হয় সমাধি।

অগ্নিময় স্থানে, জলে বা মাটিতে, যেখানে শুকনো পাতা ছড়ানো আছে, যেখানে বল্মীক স্তূপ আছে, যেখানে বন্য প্রাণী আছে বা বিষাদ আছে, যেখানে চৌরাস্তার

মোড়, যেখানে খুব বেশী সোরগোল, যেখানে দুষ্ট লোক—এমন কোনো স্থানেই যোগাভ্যাস চলবে না। এটা বিশেষ করে ভারতবর্ষের বেলায় প্রযোজ্য। দেহ যখন খুবই ক্লান্ত বা রুগ্ন মনে হয়, অথবা মন যখন খুবই দুঃখিত বা আর্ত থাকে তখন যোগাভ্যাস করবে না। তেমন সব জায়গায় যাও যা বেশ গোপন স্থান, যেখানে কেউই গণ্ডগোল করতে আসবে না। নোংরা জায়গা বেছে নেবে না। বরং সুন্দর দৃশ্যময় জায়গা বেছে নাও, বা তোমার বাড়ির কোনো সুন্দর ঘর। অভ্যাসের সময় নমস্কার করো সমস্ত প্রাচীন যোগীদের, তোমার গুরুকে, ঈশ্বরকে; তারপর আরম্ভ করো।

ধ্যান সম্পর্কে বলা হল, এবার ধ্যানের বিষয় সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। সোজা হয়ে বসে নাসিকাগ্রের দিকে তাকাও। পরে আমরা দেখতে পাব কিভাবে তা মনকে কেন্দ্রীভূত করে—সাধক কিভাবে দুটি চক্ষুতন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রতিক্রিয়াবৃত্তের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইভাবে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হতে পারে। এখন ধ্যানের কিছু নমুনা দেওয়া হচ্ছে। মনে করো, মাথার কয়েক ইঞ্চি উপরে একটি পদ্ম আছে, পদ্মের কেন্দ্র হল ধর্ম, বৃন্ত হল জ্ঞান; অষ্টদল হল যোগীর অষ্টশক্তি; বৈরাগ্য হল ঐ পথের পুংকেশর আর গর্ভকেশর। যোগী যদি বহিঃশক্তিকে স্বীকার না করে, সে মুক্তিলাভ করবে। এইজন্যই অষ্টদল হল অষ্টসিদ্ধি, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ পুংকেশর আর গর্ভকেশর হল পরম বৈরাগ্য—সমস্ত শক্তিকে বর্জন। পদ্মের অন্তরলোকে চিন্তা করো, হিরণ্ময়কে, সর্বশক্তিমানকে, স্পর্শাতীতকে; যাঁর নাম ওম্, যিনি অব্যক্ত। যিনি জ্যোতির্মণ্ডলে অধিষ্ঠিত তাঁর কথা ধ্যান করো। এবার আর একটি ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে। তোমার হৃদয় মধ্যে এক আকাশ আছে। মনে করো, সেই আকাশের মধ্যস্থলে একটি বহ্নিশিখা জ্বলছে। চিন্তা করো, সেই শিখাই তোমার আত্মা এবং তার মধ্যে রয়েছে আর এক স্বয়ংপূর্ণ জ্যোতি। তিনিই হলেন তোমার আত্মার আত্মা পরমেশ্বর। হৃদয় মধ্যে তাঁর কথা ধ্যান করো। সততা, অহিংসা, চরম শত্রুকেও ক্ষমা, সত্য, ঈশ্বর-বিশ্বাস—এসব হল বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি। এদের সবগুলিতেই যদি সিদ্ধ না হও তো ভয় নেই, সাধনা করো, ওসব ঠিকই চলে আসবে। সমস্ত আসক্তিই যে ত্যাগ করেছে—ত্যাগ করেছে সবরকম ভয়, সবরকম ক্রোধ, ঈশ্বরে আশ্রয় নিয়েছে, হৃদয় যার শুদ্ধ হয়েছে,—সে প্রভু ঈশ্বরের কাছে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আসুক না কেন, প্রভু তা পূরণ করবেন। তাই, তাঁকে আরাধনা করো জ্ঞানে, প্রেমে, ত্যাগে।

"যে কাউকেই ঘৃণা করে না, যে সকলেরই সুহৃদ, যে সকলের কাছেই দয়াময়, যার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, যে অহংবোধশূন্য, সুখ-দুঃখে যার সমজ্ঞান, যে সহনশীল, যে সদাসন্তুষ্ট, নিত্যনিয়তই যোগ-কর্মী, আত্ম-সংযত, যে দৃঢ়চিত্ত, যে তাঁর মন ও মনন আমাতেই সমর্পণ করেছে—এমন ব্যক্তিই আমার ভক্ত। যাঁর কাছ থেকে কোনোরকম ব্যাঘাত আসে না, যে সুখ, ক্রোধ, ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত—এমন ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যে সবরকমেই নির্ভর-মুক্ত, যে পবিত্র ও কর্মঠ, ভালোমন্দ সম্পর্কে যে উদাসীন, কখনোই দুঃখিত হয় না, যে নিজের জন্য সবরকম চেষ্টাই বর্জন করেছে; নিন্দা বা প্রশংসা সমান মনে করে যে শান্ত ও ভাবুক থাকে, যেটুকু

পায় তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করে, গৃহহারা হয়ে যে সমস্ত জগৎকেই মনে করে তার গৃহ এবং যে তার ভাবলোকে স্থির—এমন ব্যক্তিই আমার প্রিয় ভক্ত।" কেবলমাত্র এইরূপ ব্যক্তিগণই যোগী হন।

নারদ নামে এক দেবর্ষি ছিলেন। মানুষের মধ্যে যেমন ঋষি আছেন, দেবতাদের মধ্যেও তেমনি মহাযোগী আছেন। নারদ ছিলেন পরম যোগী, খুব বড় যোগী। তিনি সর্বত্র বিচরণ করতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে দেখতে পেলেন একজন লোক তপস্যা করছে, সে এতদিন ধরে তপস্যা করছে যে উইপোকারা তার দেহ ঘিরে তৈরি করে ফেলেছে প্রকাণ্ড এক উইঢিবি। সে নারদকে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' নারদ বললেন—'স্বর্গে যাচ্ছি।' 'তাহলে, ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন কখন তাঁর করুণা হবে, কবে আমি মুক্তিলাভ করব।' কিছুদূর গিয়ে নারদ আর একজন লোক দেখতে পেলেন। লোকটি লাফঝাঁপ মারছিল—নাচছিল, গাইছিল; সে বলল—'নারদ, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' তার কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গী ছিল পাশবিক। নারদ বললেন, 'আমি স্বর্গে যাচ্ছি।' 'তাহলে জানতে চাইবেন কবে আমি মুক্ত হব।' নারদ চলতে লাগল। কালক্রমে সে আবার ফিরে এল সেই পথে। উইঢিবির মাঝখানে যে তপস্যা করছে তার কাছে এলে সে জানতে চাইল—'ও হে নারদ, তুমি কি ঈশ্বরকে আমার কথাটা বলেছিলে?' 'হ্যাঁ, বলেছি।' 'তিনি কি বললেন?' 'প্রভু ঈশ্বর বললেন যে চার জন্মের মধ্যেই তুমি মুক্তিলাভ করবে।' এই কথা শুনে লোকটি আর্তনাদ করে বলতে লাগল—'তপস্যা করতে করতে আমার চারদিকে উইঢিবি তৈরী করে ফেলেছি, তবু আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরো চার জন্ম!' নারদ অন্য লোকটির কাছে এলে সে বলল—'তুমি কি আমার কথাটা বলেছিলে?' 'হ্যাঁ, বলেছি। এই তেঁতুল গাছটা দেখছ তো? ঐ তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে তত জন্ম।' লোকটি এই শুনেই আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগল—'এত তাড়াতাড়ি! এত তাড়াতাড়ি!' এক দৈববাণী শোনা গেল—'বৎস! এই মুহূর্তেই তুমি মুক্তি পাবে!' এ তার অধ্যবসায়ের পুরস্কার। সে জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করতে প্রস্তুত ছিল, কিছুই তাকে নিরাশ করেনি। কিন্তু ঐ প্রথম লোকটি মনে করেছে চার জন্মই বড় বেশী দীর্ঘকাল। যে লোকটি অযুত বৎসর কাল প্রতীক্ষা করতে চেয়েছে তার মতো অধ্যবসায়ই এনে দেয় সর্বোচ্চ ফল।

পতঞ্জলির যোগসূত্র

উপক্রমণিকা

যোগের ভাষ্যসূত্র ব্যাখ্যা করার আগে আমি আলোচনা করতে চেষ্টা করব একটি বড় রকমের প্রশ্ন—যার উপর সমস্ত যোগশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর মনীষীবৃন্দের সর্বসম্মত অভিমতে এবং পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রায় সর্বাংশেই দেখানো হয়েছে, আমরা হলাম আমাদের বর্তমানের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ অবস্থার পশ্চাৎবর্তী এক মুক্ত শুদ্ধ অবস্থারই পরিণাম ও প্রকাশ এবং আমরা আবার অগ্রসর হচ্ছি সেই মুক্ত শুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যেই। এটা গৃহীত হলে প্রশ্নটা থাকে: কোন্‌টা উন্নততর, ঐ মুক্তশুদ্ধ অবস্থা, না আমাদের এই বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নেই যারা মনে করে যে এই প্রকাশিত অবস্থাটাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা। মহাচিন্তাশীল-গণের অভিমত হল আমরা অভেদাত্মক একেরই প্রকাশ, এবং এই ভেদাত্মক রূপ অভেদাত্মক শুদ্ধরূপের চেয়ে উচ্চতর। তারা বলে শুদ্ধ অবস্থায় কোনো গুণ থাকতে পারে না, তা হবে অচৈতন্য, স্থবির ও জীবনরহিত; আর একমাত্র জীবনকেই উপভোগ করা যায়, কাজেই তাতেই যুক্ত থাকতে হবে। প্রথমত, আমাদের জীবন সম্পর্কে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি অনুসন্ধান করতে হবে। এক প্রাচীন সিদ্ধান্ত হল মানুষ মৃত্যুর পরেও একইরকম থাকে। আর কুশক্তি বাদ দিয়ে সুশক্তি-গুলির মৃত্যু হয় না—চিরকালই বর্তমান থাকে। যুক্তিসিদ্ধভাবে বললে দাঁড়ায়: মানুষের শেষ লক্ষ্য হল ইহলোক; ইহলোককেই উচ্চতর অবস্থায় তুললে, তার মধ্যের সমস্ত পাপশক্তিকে দূরীভূত করলে যে অবস্থা হয় তাকেই তারা নাম দিয়েছে স্বর্গ। এই মত প্রত্যক্ষরূপেই অসম্ভব এবং বালজনোচিত, কারণ তা হতেই পারে না। পাপ ছাড়া পুণ্য থাকতে পারে না, পুণ্য ছাড়া পাপ থাকতে পারে না। এমন এক জগতে বাস—যেখানে সবই ভালো, মন্দ বলে কিছুই নাই তাকে সংস্কৃত-তর্কবিজ্ঞানীরা বলেছেন—"আকাশ-কুসুম"। কয়েকটি সম্প্রদায় বর্তমান কালে আর একটি মত প্রকাশ করেছে, তারা বলে—মানুষের ভবিতব্য ক্রমান্বয়ে এবং সর্বদাই উন্নত হচ্ছে—সংগ্রামের মাধ্যমে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে; তবে কোনোদিনই তা শেষ লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। এই মতকে আপাতভাবে চমৎকার মনে হলেও তা অসম্ভব; কারণ এমন কোনো গতি নেই যা সরল রেখায় সঞ্চালিত। প্রত্যেক গতিই ঘটে বৃত্তাকারে। তুমি যদি একটা পাথর নিয়ে মহাশূন্যে সঞ্চালিত করো, যদি বহুকাল বেঁচে থাকো তো দেখবে ঐ পাথরটি ঠিক তোমার হাতেই ফিরে এসেছে। অবশ্য যদি কোনোরকম বাধা না পায়। একটি সরলরেখা অনন্ত অসীমরূপে বিস্তৃত করলে তা শেষ হবে এক বৃত্তাকারেই। কাজেই মানুষের ভাগ্য কেবলই অগ্রসর হচ্ছে সম্মুখের দিকে, আরো সম্মুখের দিকে, কখনোই তার বিরাম ঘটছে না,—এরকম মতও অসম্ভব। বিষয়প্রসঙ্গে একটু অবান্তর হলেও আমি মন্তব্য করতে পারি—উক্ত অভিমত প্রকাশ করছে এই নৈতিক মতকেই যে কাউকেই ঘৃণা করবে না, সকলকেই ভালোবাসবে। কারণ তড়িৎশক্তি সম্পর্কে আধুনিক

মত হল, শক্তি বিদ্যুতাধার-যন্ত্র (ডায়নামো) থেকে নির্গত হয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে আবার ফিরে আসে ঐ যন্ত্রের মধ্যেই—তেমনি ঘটে ঘৃণা বা প্রেমের ক্ষেত্রেও ; তাদেরকেও মূল উৎসে ফিরে আসতে হবেই। কাউকে ঘৃণা করো না, কারণ যে ঘৃণা তোমার থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে ফিরে আসবে। ভালোবাসলে, তোমার সেই ভালোবাসা বৃত্ত-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। যেটুকু ঘৃণাই কারুর প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসে তা আবার তার কাছেই ফিরে আসে বিষম বেগে—কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না ; অনুরূপ-ভাবেই প্রেমের প্রতিটি প্রেরণাও তারই কাছে ফিরে আসে। এ একেবারে সুনিশ্চিত ধারা।

অন্য বাস্তব যুক্তিতে আমরা দেখতে পাই অনন্ত উন্নাতর অভিমতও যুক্তিসম্মত নয়, কারণ পার্থিব সবকিছুই শেষ হয় ধ্বংসের মধ্যে। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত ভয় ও সুখ—কোথায় তারা নিয়ে যাবে ? সকলেরই তো শেষ হবে মৃত্যুতে। এর চেয়ে সুনিশ্চিত তো আর কিছুই নয়। তাহলে, সরলরেখার গতি কোথায়—ঐ অনন্ত উন্নতি কোথায় ? এ তো শুধু কিছুদূর পর্যন্ত চলে যাওয়া, আবার ফিরে আসা সেই যাত্রাস্থলেই। দেখো না, নীহারিকা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সূর্য চন্দ্র তারা ; তারপর তারা ধ্বংস হয়ে ফিরে যায় ঐ নীহারিকাতেই। সর্বত্রই এইরূপ ঘটছে। গাছের চারাটা মাটি থেকে উপাদান গ্রহণ করে মরে যায়, মাটিতেই ফিরিয়ে দেয় নিজেকে। এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু-আকারই জন্ম নেয় পারিপার্শ্বিক পরমাণু থেকে এবং আবার ফিরে যায় ঐ পরমাণুতেই। একই নিয়ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমে কাজ করে, তা তো হতে পারে না। নিয়ম তো একই রকম। তার চেয়ে নিশ্চিত কিছুই হতে পারে না। এই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয় তো, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। চিন্তারাশি ধ্বংস হয়ে ফিরে যাবে তার জন্ম-উৎসে। ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই উৎসে—আমরা যাকে বলি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। আমরা সকলেই ঈশ্বর থেকে এসেছি, ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে নিয়মবদ্ধ আমরা। সেই ঈশ্বরকে ব্রহ্মই বলো বা প্রকৃতিই বলো সত্য একই থাকছে। "যা থেকে এই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, যার মধ্যে সমস্ত জীব প্রাণ ধারণ করে, তার কাছেই ফিরে যায়।" এটা এক সুনিশ্চিত সত্য ঘটনা। প্রকৃতি একই পরিকল্পনা মতো কাজ করে। এক ক্ষেত্রে যা ঘটছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটে কোটি কোটি ক্ষেত্রে। গ্রহদের বেলায় যেমন, পৃথিবী, মানুষ এবং অন্য সব কিছুর বেলায়ও তেমনটাই দেখবে। অতিকায় তরঙ্গটা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের, হতে পারে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের সমাহার ; নিখিল পৃথিবীর জীবন হল কোটি কোটি জীবের সমাহার, আর তার মৃত্যুরূপ হল কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুর সমাহার।

এখন প্রশ্ন হল : ঈশ্বরের প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কি না, যোগ-দার্শনিকেরা জোর দিয়ে বলেন—'হ্যাঁ, উচ্চতর অবস্থা।' তাঁরা বলেন মানুষের বর্তমান অবস্থা হল এক অধঃপতন। পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে বলা হয়েছে মানুষ পূর্বাপেক্ষা উন্নত। ভাবটা হল—মানুষ তার আরম্ভে শুদ্ধ ও পবিত্র থাকে, তারপর

অধঃপতন হতে হতে এমন এক স্তরে পৌছায় যার থেকে আরো অধঃপতনে অগ্রসর হতে পারে না ; এবং তারপর এক এক সময় হবে যখন মানুষ আবার হঠাৎ উর্ধ্বগামী হবে ঐ বৃত্ত পূর্ণ করার জন্যেই। মানুষ যতই পতিত হোক না, তাকে উপর দিকে বেঁকে উর্ধ্বে উঠতেই হবে—ফিরে আসতে হবে তার মৌল উৎসে। সুরুতে মানুষ আসে ঈশ্বর থেকে, মধ্যস্তরে সে হয় মানুষ, পরিণামে সে প্রত্যাবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে। দ্বৈতবাদী পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে বিষয়টা হয় এমনটাই। অদ্বৈতবাদী পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে—মানুষই ঈশ্বর, মানুষই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে। আমাদের বর্তমান অবস্থাই যদি উচ্চতর হবে, তবে কেন এত ভয়াবহতা, এত দুঃখদুর্দশা, এবং কেনই বা তা আবার শেষ হয়? যা দূষিত করে, অধঃপতিত করে তা নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ অবস্থা হতে পারে না। তা এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন, এত অসন্তোষজনক হবে কেন? এই পথেই আমরা উচ্চস্তরে আরোহণ করছি এমন যুক্তি একটা অজুহাত-মাত্র। এর মধ্য দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে—আবার নবজীবন লাভ করার উদ্দেশ্যেই। মাটিতে বীজ পোঁতো, তা বিশ্লিষ্ট হবে, কিছুকাল পরে ধ্বংস হবে, আর ধ্বংসের মধ্য থেকেই জেগে উঠবে সুন্দর একটি গাছ। ঈশ্বর হবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাকেই বিভক্ত হতে হবে।

কাজেই এ থেকে বোঝা গেল যে আমরা এই অবস্থা থেকে যাকে আমরা 'মানুষ' বলি, তা থেকে যত শীঘ্র বেরিয়ে আসতে পারি, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। তবে কি আমরা আত্মহত্যা করে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসব? মোটেই তা নয়। তাতে তো আরো খারাপ হল। আত্মনির্যাতন বা পৃথিবীকে অভিশাপ দেওয়া—এ করে তো বেরিয়ে যাওয়া যায় না। নৈরাশ্যের জলাভূমির মধ্য দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, যত শীঘ্র তা পারি ততই ভালো। সর্বদাই স্মরণে রাখা কর্তব্য, মনুষ্য অবস্থাটা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়।

সবচেয়ে কঠিন অংশ হল সেই অবস্থাটার বোধ—যাকে বলে শুদ্ধমুক্ত, এবং সর্বোচ্চ ; তা কিন্তু অনেকেই যেমন সভয়ে ভাবেন তেমন একটা স্পন্দহীন বা প্রস্তরীভূত অবস্থার মতো নয়। তাদের মতে অস্তিত্বের কেবলমাত্র দুই রকম অবস্থা বিদ্যমান, একটা প্রস্তরীভূত অবস্থা, অপরটি মানস-অবস্থা। এই দুইটি ভাগেই সীমাবদ্ধ করার কী অধিকার তাদের? চিন্তার চেয়ে উচ্চতর কি কিছুই নেই? আলো যখন খুবই স্তিমিত থাকে, আমরা তার কম্পন দেখতে পাই না ; আর একটু তীব্র হলে আমাদের কাছে তা হয়ে ওঠে আলো ; আরো বেশী তীব্র হলেও আমরা দেখতে পাই না—সব অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথম বর্ণিত অন্ধকার ও শেষোক্ত অন্ধকার একই? নিশ্চয়ই নয়। দুই মেরুর মতোই তা পৃথক। প্রস্তরীভূতের চিন্তাশূন্যতা ও ঈশ্বরের চিন্তাশূন্যতা কি একই? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর চিন্তা করেন না, যুক্তিতর্ক করেন না। কেন করবেন? তাঁর কাছে কি অজানা কিছু আছে যে তিনি যুক্তিতর্কে জানতে চাইবেন? পাথর যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে না, ঈশ্বর করেন না। এখানেই পার্থক্য। ঐসব দার্শনিকেরা মনে করেন চিন্তালোকের বাইরে যাওয়াটা বড় ভয়াবহ ; চিন্তার বাইরে তারা কিছুই দেখে না।

যুক্তি-বিচার অবস্থার চেয়ে অনেক উন্নততর অস্তিত্ব বর্তমান; এবং তা ধর্মজীবনকে প্রথম যে ধীমান অবস্থায় দেখা যায় তা তার বাইরে। যখন চিন্তা, ধী ও সমস্ত যুক্তির বাইরে চলে যাবে, ঈশ্বরের দিকে প্রথম সোপান পার হবে এবং সেখানেই জীবন সুরু হল। সাধারণত যাকে জীবন বলা হয় তা প্রকৃত জীবনের ভ্রূণাবস্থা।

পরবর্তী প্রশ্ন হবে: চিন্তা ও যুক্তির বাইরের অবস্থাই যে উচ্চতর অবস্থা তার কী প্রমাণ? প্রথমত, যারা কেবল কথাই বলে, তাদের চেয়ে ঢের ঢের বড়ো জগতের যে মানবেরা—যাঁরা পৃথিবী আন্দোলিত করেছেন, যাঁরা কখনো কোনোরকমের আত্মস্বার্থই চিন্তা করেন নি, তাঁরা ঘোষণা করেছেন—সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পথে এই জীবন ক্ষুদ্র এক রঙ্গমঞ্চ মাত্র। দ্বিতীয়ত, যাঁরা শুধু এ কথাই বলেন নি, সকলেই যাতে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে তার জন্য প্রত্যেককে দেখিয়ে দিয়েছেন পথ, ব্যাখ্যা করেছেন তার ক্রিয়াপদ্ধতি। তৃতীয়ত, দেখিয়েছেন এ ছাড়া আর পথ নেই, আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ধরো উচ্চতর কোনো অবস্থা নেই, তবে আমরা কেন এই বৃত্তের মধ্যে নিত্য-নিয়তই চলাফেরা করছি; এই জগতেরই বা ব্যাখ্যাটা কি? আমরা যদি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে না যেতে পারি, আমরা যদি আর কিছুই না চাই, তবে তো এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। অজ্ঞেয়বাদীরা তাই বলে। কোন্ যুক্তিতে আমরা ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্বাস করব? যে লোক রাস্তায় স্থির অনড় দাঁড়িয়ে মরে, আমি বলব সেই যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী। যুক্তিই যদি সর্বেসর্বা তবে আমাদের নাস্তিক্যবাদের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়। কেউ যদি অর্থ, যশ ও নাম ছাড়া সবকিছুতেই নাস্তিক হয়, সে তো প্রতারক। কাণ্ট নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে যুক্তিরূপী দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের বাইরে আমরা কোথাও যেতে পারি না। কিন্তু এই প্রাথমিক ভাবটির ভিত্তিতেই তো সমস্ত ভারতীয় চিন্তা প্রতিষ্ঠিত, এবং যুক্তির চেয়ে উচ্চতর এমন কিছুর সন্ধানে সাহসী হয় এবং সন্ধান পায়ও—যেখানে মানুষের বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জগতের বাইরে নিয়ে যাবে এমন কিছু অধ্যয়নের এখানেই মূল্য। 'তুমি আমাদের পিতা, আমাদের এই অজ্ঞান সাগরের ওপারে নিয়ে চলো।' এটাই ধর্ম-বিজ্ঞান, অন্যকিছু নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোযোগ: ইহার আধ্যাত্মিক প্রয়োগ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১

১ ॥ এখন মনোযোগ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২

২ ॥ যোগ হল বিভিন্ন আকার অর্থাৎ বৃত্তি থেকে মনঃ-প্রকৃতি অর্থাৎ চিত্তকে নিরোধ।

এখানে বেশ কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার। আমাদের বুঝতে হবে চিত্ত কি, এবং বৃত্তিই বা কি। আমার চোখ আছে। চোখ তো দেখে না। মাথার মধ্যে যে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রটি আছে তা সরিয়ে নাও, তখনো তো চক্ষু ঠিক জায়গায়ই আছে, দর্শনেন্দ্রিয় আছে যথাযথ, তাদের উপরে দৃশ্যাদির চিত্রও আছে,—তবু তো চোখ দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই চোখ হল গৌণ যন্ত্র, দৃষ্টির মূল যন্ত্র নয়। দৃষ্টিযন্ত্রটি রয়েছে মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রে। চোখই যথেষ্ট নয়। কখনো কখনো লোকে চোখ মেলে ঘুমায়। আলোও আছে সেখানে, ছবিও আছে, কিন্তু তৃতীয় আর একটির প্রয়োজন—সেই যন্ত্রের সঙ্গে মনের যোগ। চোখ হল বহির্যন্ত্র; তার সঙ্গে দরকার মস্তিষ্ক-কেন্দ্র এবং মনের কর্ম-প্রতিনিধিত্ব। কত গাড়ি রাস্তা দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে, তার শব্দ শুনতে পাও না। কেন? যেহেতু তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। প্রথমে ইন্দ্রিয়যন্ত্র, তারপরে ইন্দ্রিয়কেন্দ্র, তারপরে উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মন। এই মন আবেদনগুলি আরো বহুদূরে নিয়ে যায়—নির্দেশাত্মক শক্তি বুদ্ধির কাছে উপস্থিত করে। এবং তা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে অহংভাব। তারপর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সব মিলেমিশে নিবেদিত হয় পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মার কাছে—এবং আত্মা ঐ মিশ্রণের মধ্যেই দেখতে পায় বিষয়কে। ইন্দ্রিয়াদি মনঃসংযোগে নির্দেশাত্মক শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি-সংযোগে এবং অহংকার অর্থাৎ আত্মবোধ সংযোগে গঠন করে একটি গুচ্ছরূপকে, নাম যার অন্তঃকরণ বা অন্তর্যন্ত্র। চিত্তে অর্থাৎ মানসিক পদার্থে কতকগুলি ক্রিয়াপদ্ধতি আছে। চিত্তের চিন্তাতরঙ্গকে বলে বৃত্তি (শব্দগত অর্থে ঘূর্ণি)। চিন্তা কি? চিন্তা হল শক্তিবেগ, যেমন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে চিত্ত নামক যন্ত্র কোনো কিছুকে ধারণ করে, আত্মস্থ করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ করে। খাদ্য মাধ্যমে আমাদের মধ্যে শক্তিবেগ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ খাদ্য থেকে আমাদের শরীর গতিবেগ প্রভৃতি লাভ করে। অন্যগুলিকে অর্থাৎ সূক্ষ্মতর সূত্রগুলিকেই বাহিরে প্রেরণ করে চিন্তারূপে। কাজেই আমরা দেখলাম মন ধীমান নয়; তবু তা ধীমানরূপে প্রতিভাত হয়। কেন? কারণ, তার পশ্চাতে রয়েছে ধীমান আত্মা। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময়—মন কেবল যন্ত্র, যার মাধ্যমে তুমি বহির্জগৎকে অনুভব কর। একটা বই নাও; বইরূপে বাহিরে সেটার অস্তিত্ব নেই, বাইরে যা আছে তা অজ্ঞাত

ও অজ্ঞেয়। অজ্ঞেয় উপস্থিত করে এক দ্যোতনা এবং তা তোমার মনে আঘাত হানে; মন সেই প্রতিক্রিয়াকে বইয়ের আকারে উপস্থিত করে। ঠিক তেমনি জলে একটা পাথর নিক্ষেপ করলে, জল পাথরের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয় ঢেউয়ের আকারে। প্রকৃত জগৎ হল মনেরই প্রতিক্রিয়ামূলক ঘটনা। বইয়ের আকার বা হাতির আকার বা মানুষের আকার কিছুই বাইরে নেই; আমরা যা জানি সবটাই তার বহিঃ-দ্যোতনা থেকে প্রতিক্রিয়া। "বস্তু হল অনুভূতির নিত্য সম্ভাবিত রূপ"—বলেছেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তা কেবল বাহিরের দ্যোতনা। একটা শুক্তি নাও। কেমন করে মুক্তো তৈরী হয় জানো? একটা বীজাণু খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, শুক্তি তখন তার চারদিকটা স্বকীয় এনামেল-আবরণে ঢেকে দেয়, এবং মুক্তো তৈরী হয়ে যায়। আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ হল যেন আমাদের এনামেল এবং প্রকৃত বিশ্বজগৎ হল ঐ বীজাণু-সৃষ্ট কেন্দ্র। সাধারণ লোকে কখনই তা বুঝবে না, কারণ বুঝতে গেলেই সে এনামেল আবরণ সৃষ্টি করে শুধু সেই এনামেল দেখবে! এবার আমরা বুঝলাম বৃত্তির কি অর্থ। প্রকৃত লোকটি রয়েছে মনের পিছনে; মন তার হাতের যন্ত্র; তার বুদ্ধিই মনের ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হয়। তুমি ঐ মনের পশ্চাতে অবস্থান করলেই বুদ্ধিমান হবে। মন যদি বর্জন কর তো তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। এবারে বোঝা গেল চিত্ত কি। চিত্ত হল মনঃ-উপাদন। বাহিরের কারণ যখন তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন মনের মধ্যে যে তরঙ্গ বা ছোট ছোট ঢেউ জেগে ওঠে তা হল বৃত্তি। এই বৃত্তিই আমাদের জগৎ।

সরোবরের তলদেশ আমরা দেখতে পাই না, কারণ তার উপরিভাগ ছোট-বড় ঢেউয়ে আবৃত। ঢেউ যখন থেমে যায়, জল যখন শান্ত হয়, আমরা তলদেশের এক ঝলক দেখতে পাই। কিন্তু জল যদি সব সময়েই ঘোলা বা বিক্ষুব্ধ থাকে, তলদেশ দেখা যাবে না। যদি তা পরিষ্কার থাকে, কোনো ঢেউ না থাকে, তলদেশ দেখা যাবে। ঐ সরোবরের তলদেশ হল আমাদের প্রকৃত স্বরূপ; সরোবর হল চিত্ত, ঢেউ হল বৃত্তি। এবারে, মনের আছে তিন অবস্থা: এক হল অন্ধকার, যাকে বলা হয় তমঃ—জন্তু-জানোয়ার বা মূর্খদের মধ্যে যেমনটা দেখা যায়, তা কেবল ক্ষতিসাধনের কাজেই ব্যবহৃত হয়। মনের ক্রিয়াশীল অবস্থার নাম হল রজঃ—এর প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতা ও উপভোগ। 'আমি ক্ষমতাশালী হব—অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করব।' আর একটি অবস্থার নাম হল সত্ত্ব—প্রশান্তি, স্থিরতা—সেখানে সব ঢেউ শান্ত হয়ে যায়, মানস-সরোবর স্বচ্ছ রূপ ধারণ করে। নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়, বরং আত্যন্তিকরূপে সক্রিয়। প্রশান্তি হল শক্তিরই সর্বোচ্চ প্রকাশ। সক্রিয় হওয়াটা সহজ। বল্গা ছেড়ে দাও, ঘোড়াগুলি তোমাকে নিয়েই ছুটতে থাকবে। তা যে কেউ করতে পারে, কিন্তু ঝাঁপিয়ে-পড়া অশ্বকে যে রুখতে পারে সে-ই শক্তিমান। ছেড়ে দেওয়া আর রোধ করা—এদের মধ্যে কোনটাতে বৃহত্তর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত প্রকৃতির লোক তো বোকা ধরনের লোক নয়। সত্ত্বকে বোকামি বা অলসতা বলে কখনো ভুল করবে না। মানস-তরঙ্গের উপর যার নিয়ন্ত্রণ আছে সেই শান্ত। কর্ম-চাঞ্চল্য নিম্নতর শক্তির প্রকাশ, এবং শান্তভাব উচ্চতর শক্তির।

চিত্ত নিত্যনিয়তই চেষ্টা করে তার স্বাভাবিক শুদ্ধাবস্থায় ফিরে যেতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি তাকে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। তার এই বহির্গতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংযত করে বুদ্ধির মৌল শক্তিতে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করিয়ে দেওয়া হল যোগের প্রথম সোপান, কারণ একমাত্র এই পথেই চিত্ত সঠিক পথে চলতে পারে।

নিম্নতম থেকে উচ্চতম প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই যদিও চিত্ত বর্তমান, তবু কেবলমাত্র মনুষ্যাকৃতির মধ্যেই পাই তা বুদ্ধিরূপে। মানস-উপাদান যে পর্যন্ত না বুদ্ধির আকার গ্রহণ করে, এত সব সোপান-পথে তার প্রত্যাবর্তন ও আত্মার মুক্তিসাধন সম্ভব নয়। আশু মুক্তি তো গোরু বা কুকুরের হতে পারে না—যদিও তাদের মন আছে; কারণ, আমরা যাকে বুদ্ধি বলি তাদের চিত্ত এখনো সেই রূপ লাভ করেনি।

চিত্ত এইসব রূপে প্রকাশিত হয়: বিক্ষিপ্ত, অন্ধ, সমাহৃত, একাগ্র ও কেন্দ্রীভূত। বিক্ষিপ্ত রূপ হল কর্মচাঞ্চল্য, এর প্রবণতা হল সুখ বা দুঃখ-রূপে প্রকাশিত হওয়া। অন্ধরূপ সবচেয়ে মূঢ় এবং তার স্বভাব হল ক্ষতিসাধন। ভাষ্যকার বলেন তৃতীয়টি দেবতাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টি দানবদের পক্ষে। সমাহৃত রূপ হল কেন্দ্রমুখী হবার চেষ্টা বিশেষ। একাগ্র হল যখন কেন্দ্রীভূত হবার সাধনা করা হয়; এবং কেন্দ্রীভূত রূপেই আমরা পাই সমাধি।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩

৩॥ তখন (এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) স্বীয় (অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকে।

সমস্ত তরঙ্গ থেমে গেলেই শান্ত হয় সরোবর, তার তলদেশ দেখা যায়। মনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। মন যখন শান্ত থাকে, আমরা বুঝতে পারি আমাদের স্বভাব কিরকম; আমরা এলোমেলো হয়ে যাই না, বরং আত্মস্থ থাকি।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪

৪॥ অন্যান্য সময়ে (নিয়ন্ত্রণের সময় ছাড়া) দ্রষ্টা পরিবর্তিত অবস্থাদির সমরূপ থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ: কেউ আমার নিন্দা করল; এতে বিকৃতি ঘটে। মনের মধ্যে বৃত্তি ও আমি একাত্ম হয়ে পড়ি, ফলত দেখা দেয় দুঃখ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫

৫॥ পাঁচ প্রকার বিকৃতি আছে, কোনো কোনোটা দুঃখজনক, কোনো কোনোটা দুঃখশূন্য।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতয়ঃ ॥ ৬

৬॥ (এসব হল) প্রমাণসহ জ্ঞান, অভেদাত্মকতা, বাক্‌ভ্রংশ, নিদ্রা ও স্মৃতি।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭

৭॥ প্রত্যক্ষ অনুভব, অনুমান, সুযোগ্য সাক্ষ্য হল প্রমাণ।

যখন দুরকম অনুভব একে অন্যের বিরোধিতা করে না, তখন আমরা তাকে বলি

প্রমাণ।' আমি কিছু শুনলাম, কিন্তু তা যদি পূর্ব-অনুভূত কোনো কিছুর বিরোধী হয় আমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে চাই—তাতে আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। প্রমাণ তিন প্রকার: সরাসরি অনুভব—প্রত্যক্ষ যা-কিছুই দেখি ও অনুভব করি তা প্রমাণ,—অবশ্য ইন্দ্রিয়-বিভ্রমের যদি কিছু না থাকে। আমি এই জগৎ দেখছি, এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে তা আছে। দ্বিতীয়ত, অনুমান—কোন চিহ্ন দেখলে, সেই চিহ্ন-সূচিত কোন জিনিস বুঝতে পারলে। তৃতীয়ত, আপ্ত বাক্য—সত্যদ্রষ্টা যোগীদের প্রত্যক্ষ-অনুভবজনিত সাক্ষ্য। আমরা সবাই জ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে বড় ক্লান্তিকর সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর যুক্তি-নির্ভর পন্থায় অগ্রসর হতে হয়, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এসব অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর মানসচক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে—তাঁর অধ্যয়নের জন্য সবই যেন একটিমাত্র গ্রন্থ। আমাদের মতো তাঁকে জ্ঞানলাভের জন্য বিরক্তিকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না; তাঁর বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি স্বমধ্যেই জ্ঞাতস্বরূপকে দর্শন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এঁরাই হলেন পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রণেতা; কাজেই শাস্ত্রাদিই হল প্রমাণ। ঐরূপ কোন ব্যক্তি যদি আজ বেঁচে থাকেন তো তাঁদের বাক্যই হবে প্রমাণ। অন্য দার্শনিকেরা আপ্তবাক্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় ব্যাপৃত হন, তারা বলেন—'ঐ শাস্ত্রকারদের কথা যে সত্য তার প্রমাণ কি?' প্রমাণ তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভব। কারণ আমি যা দেখি তাই প্রমাণ, তুমি যা দেখ তাই প্রমাণ—অবশ্য আমাদের অতীত জ্ঞান যদি উল্টোরকম না হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে জ্ঞান আছে, এবং তা যখন যুক্তি বা অতীতের মানব-অভিজ্ঞতার বিরোধী না হয়, সেই জ্ঞানই প্রমাণ। এক পাগল এই ঘরে এসে বলতে পারে তার চারদিকে সে দেবদূতদের দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তা তো আর প্রমাণ হবে না। প্রথমত, তা অভ্রান্ত জ্ঞান হতে হবে; দ্বিতীয়ত, তা অতীত জ্ঞানের বিরোধী হবে না; তৃতীয়ত, তাকে জ্ঞান-প্রকাশক ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আমি এরকম কথা বলতে শুনি যে লোকটির চরিত্রের কথা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ তার কথাই। অন্য অনেক ব্যাপারে এই সত্যও হতে পারে। লোকটা ধূর্ত হয়েও জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটা আবিষ্কার করে বসতে পারে। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ, কোনো অপবিত্র লোকই ধর্ম বিষয়ে সত্য লাভ করতে পারবে না। কাজেই আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে নিজেকে 'আপ্ত' বলে ঘোষণা করছে সে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা; দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে সে ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি লাভ করেছে কিনা; তৃতীয়ত, মানবজাতি-লব্ধ অতীত জ্ঞানের সে বিরোধিতা করছে কিনা। সত্যের নতুন আবিষ্কার তো অতীত সত্যের বিরোধিতা করে না, তার সঙ্গে মিলে যায়। এবং চতুর্থত, সেই সত্যদর্শনের আরো সম্ভাবনা থাকা দরকার। কোন লোক যদি এসে বলে—'আমি অলৌকিক কিছু দর্শন করেছি' এবং বলে আমার পক্ষে তা দেখার অধিকার নেই, তবে আমি তাকে বিশ্বাস করি না। নিজেই প্রত্যক্ষ করার অধিকার আছে প্রত্যেকেরই। যে-ই তার জ্ঞান বিক্রয় করে সে 'আপ্ত' হতে পারে না। আপ্তকে উল্লিখিত সব শর্ত পূরণ করতে হবেই। প্রথমে দেখবে লোকটি পবিত্র কিনা, এবং তার স্বার্থ-অভিসন্ধি এবং

কোনো লাভ বা যশের স্পৃহা আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, দেখবে, সে যে জ্ঞানাতীত অবস্থায় রয়েছে তা তাকে দেখাতে হবে। ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা যা আমরা লাভ করতে পারি না এবং জগতের পক্ষে যা কল্যাণকর তেমন কিছু তাকে দিতেই হবে। তৃতীয়ত, দেখতে হবে অন্যান্য সত্যের তা বিরোধী না হয়; যদি বিরোধী হয় তো তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ করবে। চতুর্থত, সে কখনো যেন (ঐ বিষয়ে) একক ব্যক্তি না হয়; সকলের পক্ষেই যা লাভ করা সম্ভব তাকে কেবল তারই প্রতিনিধিস্বরূপ দেখা যাবে। তাহলে, এইসব প্রমাণই হল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভব, অনুমান এবং আপ্তবাক্য। আপ্ত শব্দটা ইংরাজীতে অনুবাদ করা যাচ্ছে না। এটা ঠিক অনুপ্রেরণা নয়, কারণ অনুপ্রেরণাকে বলা হয় বহিরাগত, আর এই জ্ঞান আসে ভিতর থেকে। শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল 'যে প্রাপ্ত হইয়াছে' বা 'যার প্রাপ্তি ঘটিয়াছে'।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম ॥ ৮

৮॥ অভেদত্ব (বিপর্যয়) হল মিথ্যা জ্ঞান এবং প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

পরবর্তী বৃত্তি হল একটি বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভ্রান্তি; যেমন শুক্তিকে মনে করা হল রৌপ্যখণ্ড।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯

৯॥ বাক্য-বিভ্রান্তি ঘটে (অনুরূপ) অস্তিত্বশূন্য শব্দ থেকে।

আর একরকম বৃত্তি আছে—তাকে বলে বিকল্প। একটি শব্দ উচ্চারিত হল, আমরা তার অর্থ অনুধাবন করার জন্য অপেক্ষা না করেই তৎক্ষণাৎ একটি সিদ্ধান্ত করে বসলাম, এটা চিত্তের দুর্বলতার লক্ষণ। এবারে সংযম-বিষয়ক মতটি বুঝতে পারছ। যতই দুর্বল হবে ততই কম থাকবে তার সংযম। এই মানদণ্ড দ্বারা সর্বদা আত্মপরীক্ষা করবে। যখনই ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হচ্ছ, চিন্তা করে দেখো কোন একটি সংবাদ তোমার মনকে কিভাবে বৃত্তিতে নিক্ষেপ করছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০

১০॥ নিদ্রা হল এমন এক বৃত্তি যা শূন্যের অনুভূতিকে আশ্রয় করে।

পরবর্তী বৃত্তিকে বলে নিদ্রা ও স্বপ্ন। জেগে উঠলে আমরা জানি যে আমরা ঘুমোচ্ছিলাম। তখন কেবল অনুভবের স্মৃতিই বর্তমান থাকতে পারে। যা আমরা দেখিনি ও অনুভব করিনি তার কোন স্মৃতি থাকতে পারে না। প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই হল সরোবরের তরঙ্গ। ঘুমের মধ্যে মনে যদি কোনো তরঙ্গই না থাকে, তার অস্ত্যর্থক কি নঙর্থক কোনোরকম অনুভূতিই থাকবে না, এবং আমরা তা স্মরণে আনতে পারব না। নিদ্রিত অবস্থার কথা আমাদের স্মরণে থাকে—এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় নিদ্রাবস্থায় মনের মধ্যে একজাতীয় তরঙ্গ বর্তমান ছিল। বৃত্তিসমূহের মধ্যে স্মৃতি হল আর একরকমের বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১

১১॥ অনুভূত বিষয়সমূহে (বৃত্তি) যখন মন থেকে চলে যায় না (এবং ধারণা মাধ্যমে চেতনায় প্রত্যাবর্তন করে), তাকে স্মৃতি বলে।

স্মৃতি আসতে পারে প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে, মিথ্যা জ্ঞান থেকে, বাক্‌বিভ্রান্তি

থেকে এবং নিদ্রা থেকে। ধরো, তুমি একটা শব্দ শুনলে। শব্দটি হল তোমার চিত্ত-সরোবরে নিক্ষিপ্ত এক পাথরের মতো। তাতে একটি ছোট্ট তরঙ্গ সৃষ্টি হল, ঐ তরঙ্গটি আবার অনেকগুলি তরঙ্গমালা সৃষ্টি করল; এমনটা হল স্মৃতি। ঘুমের মধ্যেও ঘটে এমনটা। যখন নিদ্রা নামক অদ্ভুত ধরনের ঢেউ চিত্তকে স্মৃতির ঢেউয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন তাকে বলে স্বপ্ন। স্বপ্ন হল আর এক রকম ঢেউয়ের রূপ, জাগ্রত অবস্থায় তার নাম স্মৃতি।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২

১২ ॥ তাদের সংযম ঘটে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। নিরাসক্ত থাকতে হলে মনকে নির্মল, সৎ ও বিচারধর্মী হতে হবে। কেন আমরা অভ্যাস করব? কারণ, আমাদের প্রতিটি কর্মই হল সরোবরের উপরিভাগে কম্পমান স্পন্দনের মতো। স্পন্দন-গুলি মিলিয়ে যায়, কি থাকে? থাকে শুধু সংস্কার। যখন বহুসংখ্যক সংস্কার মনের উপর ছাপ ফেলে, তারা একত্রিত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়। বলা হয়েছে—'অভ্যাস হল দ্বিতীয় স্বভাব।' এটা প্রথম স্বভাবও বটে—সমস্ত মানব-স্বভাব। এতে আমরা সান্ত্বনা পাই; কারণ তা যদি অভ্যাসমাত্র হয় তো আমরা তা যে কোনো সময় গড়তে পারি, ভাঙতেও পারি। কম্পনগুলি মন থেকে চলে গেলেও তারা রেখে যায় সংস্কার-গুলিকে—প্রত্যেকটিই রেখে যায় তার এক-একটি ফলচিহ্ন। আমাদের চরিত্র হল এই সব চিহ্নের সমবেত রূপ, নির্দিষ্ট কোনো তরঙ্গের প্রাধান্য অনুসারে স্বভাব গড়ে ওঠে। যদি সৎ-এর প্রাধান্য তো সৎ হবে, যদি অসৎ-এর প্রাধান্য তো অসৎ হবে, যদি আনন্দের প্রাধান্য তো সুখী হবে। বদ অভ্যাসের প্রতিষেধক হল পাল্টা অভ্যাস; বদ অভ্যাসগুলি যে দাগ রেখে গেছে তাদের সৎ অভ্যাস দ্বারা সংযত করতে হয়। সৎ কাজ করে যাও,—সর্বদা পবিত্র চিন্তা করো; তাই মূলীভূত সংস্কারগুলিকে দমন করার একমাত্র পন্থা। কাউকেই বলো না—'তোমার কিছু হবে না।'—কারণ সে তো একটা চরিত্রের প্রতিনিধি, কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র এবং এসবই তো নতুন ও উন্নততর কিছু দিয়ে দমন করা যায়। চরিত্র হল অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি এবং একমাত্র অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিই চরিত্র সংশোধন করতে পারে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩

১৩ ॥ ঐগুলিকে (বৃত্তিগুলিকে) সম্পূর্ণরূপে দমন করার অব্যাহত সংগ্রামকে বলে অভ্যাস।

অভ্যাস কি রকম? মনঃস্থিত চিত্তকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা—তাকে তরঙ্গিত হতে না দেবার চেষ্টা।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪

১৪ ॥ (পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যে) শ্রমের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী অবিরাম প্রচেষ্টার দ্বারা। সংযম বা নিয়ন্ত্রণ দু-একদিনে হয় না, সুদীর্ঘ অব্যাহত প্রচেষ্টায়ই তা হয়ে থাকে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫

১৫ ॥ দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়াকাঙ্ক্ষা যিনি পরিত্যাগ করেছেন তার মধ্যে সমস্ত বিষয়বাসনা-দমনকারী যে ভাবের উদয় হয়, তাকে বলে বৈরাগ্য বা অনাসক্তি।

আমাদের সমস্ত কর্মের দুইটি উদ্দেশ্যসাধক শক্তি আছে : (১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা , (২) অন্যের অভিজ্ঞতা। এই দুই শক্তিই আমাদের মানস-রূপ সরোবরকে বহুরকম তরঙ্গে বিচলিত করে। বৈরাগ্য হল এইসব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি—মনকে সংযত রাখার শক্তি। আমাদের প্রয়োজন তাদের পরিত্যাগ করা। ধরো, কোনো রাস্তা ধরে চলছি, একটা লোক এসে আমার ঘড়িটা নিয়ে পালিয়ে গেল। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। আমি নিজেই তা দেখেছি এবং এটা আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধাকার এক তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করল। সেটাকে আসতে দিও না। যদি তাকে বাধা দিতে না পারো, তবে তুমি একটা কিছুই-না; যদি পারো, তুমি বৈরাগ্যের অধিকারী। আবার অন্যদিকে, বিষয়ী মনোভাবাপন্ন লোকের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে ইন্দ্রিয় উপভোগই হল সর্বোচ্চ আদর্শ। এ তো প্রচণ্ড প্রলোভনের কথা। তাদের অস্বীকার করার জন্য, তাদের প্রসঙ্গে মনকে তরঙ্গাকারে দেখা দিতে না দেবার জন্যই বৈরাগ্য। নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যের অভিজ্ঞতা—এই দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং চিত্তকে তাদের দ্বারা শাসিত হতে না দেবার জন্যই বৈরাগ্য। এসব আমিই নিয়ন্ত্রণ করব, আমি এসবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব না। এই ধরনের মানস শক্তির নামই বৈরাগ্য। বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র পথ।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু´ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬

১৬॥ গুণগুলি পর্যন্ত বর্জন করে এবং পুরুষ-এর জ্ঞান (প্রকৃত স্বভাবের জ্ঞান) থেকে যা জন্ম নেয় তাই হল বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য যখন গুণাবলীর প্রতি আমাদের আকর্ষণকে দূর করে, তখনই হয় বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ। আমাদের বুঝতে হবে কাকে বলে পুরুষ বা আত্মা, এবং গুণ বলতেই বা কি বোঝায়। যোগদর্শন অনুসারে নিখিল প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে : একটি রজঃ, অন্যটি তমঃ, তৃতীয়টি সত্ত্ব। এই তিনটি গুণই বাহ্যপ্রকৃতিতে প্রকাশিত হয় তমঃ বা জড়তা রূপে, আকর্ষণ বা বিকর্ষণরূপে, এবং দুইয়ের সামঞ্জস্য-রূপে। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, যতরকম প্রকাশ আছে তা এই শক্তিগুলিরই সমাহার বা পুনঃসমাহার। সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে বিভিন্ন মৌলরূপে বিভক্ত করা হয়েছে; মানবাত্মা হল এসবের বাইরের প্রকৃতি-সীমার বাইরে। তা দীপ্যমান, শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। আমরা প্রকৃতিতে যা কিছু বুদ্ধির পরিচয় দেখি তা প্রকৃতির উপরে আমাদের আত্মারই প্রতিফলন। প্রকৃতি নিজে অচেতন বা জড়। মনে রাখা দরকার প্রকৃতি বলতে মনও তার অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির মধ্যেই মন, চিন্তাও প্রকৃতির মধ্যে। চিন্তা থেকে শুরু করে বস্তুর স্থূলতম রূপ পর্যন্ত—প্রকৃতির সবকিছুই প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির অন্তর্গত মানুষের আত্মা, প্রকৃতি যখন আবরণ সরিয়ে নেয় আত্মা প্রকাশিত হয় আত্ম-মহিমায়। পঞ্চদশ ভাষ্যসূত্রে বর্ণিত (বস্তু বা বিষয়ের অথবা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ) অনাসক্তি বা বৈরাগ্য দ্বারা আত্মার প্রকাশে সর্বাপেক্ষা সাহায্য হয়। এবারে পরবর্তী ভাষ্যসূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সমাধি বা পূর্ণ একাগ্রতা—যা হল যোগীদের শেষ লক্ষ্য।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭

১৭ ॥ সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক একাগ্রতা ঘটে তখনই, যখন তাকে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুসরণ করে।

সমাধিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল সম্প্রজ্ঞাত, অন্যটি হল অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত শক্তিই চলে আসে। এটিও চার রকমের। প্রথমটিকে বলে সবিতর্ক, সমাধি—মন তখন অন্য বিষয় থেকে সরে এসে একটি বিষয়েই বারংবার ধ্যানস্থ হয়। সাংখ্যের চব্বিশটি মৌল উপাদানের মধ্যে দুই প্রকার বিষয় আছে: (১) প্রকৃতির চব্বিশ রকমের জড় উপাদান। (২) চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণতই সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা আগেই আমি বলেছি। তোমাদের মনে আছে অহঙ্কার, ইচ্ছা ও মন—এই তিনটির এক সাধারণ ভিত্তি আছে, তা হল চিত্ত। এই চিত্ত থেকে তাদের সকলের উৎপত্তি। চিত্ত প্রকৃতি থেকে শক্তি গ্রহণ করে ও তা সঞ্চালিত করে চিন্তারূপে। কিন্তু নিশ্চয়ই এগুলি আছে যেখানে শক্তি ও বস্তু এক হয়েছে। তাকেই বলে অব্যক্ত, সৃষ্টির প্রাক্কালের প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা; এবং যেখানে এক চক্রের কালান্তে সমস্ত প্রকৃতিই আবার ফিরে যাবে—আর এক পর্ব পরে আমাদের বাহিরে আসার জন্য। এসবের বাইরে রয়েছে পুরুষ—বুদ্ধির মূলীভূত শক্তি। জ্ঞানই শক্তি, যখন আমরা কিছু জানতে শুরু করি, আমরা তার উপর প্রভাব অর্জন করি; তখন মন বিভিন্ন প্রকার উপাদান সম্পর্কে ধ্যান করতে থাকে, তাদের উপরে প্রভাব অর্জন করে। যেরকম ধ্যানে বাহিরের স্থূল উপাদানগুলিই হল ধ্যানের বিষয় তাকে বলে সবিতর্ক। বিতর্ক অর্থ প্রশ্ন, 'সবিতর্ক' হল প্রশ্নসহ,—যেন উপাদানগুলিকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে—যাতে তারা সত্যকে ও শক্তিকে তাদের ধ্যানীর কাছেই দান করে। শক্তি লাভ করাতেই মুক্তি হয় না উপভোগের জন্য এখানে শুধু পার্থিব অনুসন্ধান, এই জীবনে কোনো উপভোগ-সুখ নেই। সুখের সমস্ত সন্ধানই বৃথা। মানুষের কাছে এই বহু সনাতন উপদেশ ধারণা করা বড় কষ্টকর। যখন তা আয়ত্ত করে সে পার হয়ে যায় এই জগৎ, মুক্ত হয়। যাকে গুহ্যশক্তি বলে তা কেবল জাগতিক বোধকে তীব্র করে এবং পরিণামে দুঃখকে তীব্র করে। বিজ্ঞানবাদীরূপে পতঞ্জলি এই বিজ্ঞানের সম্ভাব্য দিকগুলিকে উল্লেখ করলেও এইসব শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করবার কোনো সুযোগই তিনি ত্যাগ করেন নি।

আবার, ঐ এক ধ্যানেই মৌল উপাদানগুলিকে কেউ যখন স্থান ও কালের বাহিরে আনবার চেষ্টা করে এবং ওগুলিকে যথার্থ স্বরূপে চিন্তা করে, তখন তাকে বলে নির্বিতর্ক (সমাধি)। ধ্যান যখন আর এক স্তর উপরে উঠে তন্মাত্রকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে ও তাকে স্থানে ও কালে চিন্তা করে, তখন তাকে বলে সবিচার—ভেদ বিচারযুক্ত রূপ, কিন্তু ঐ এক ধ্যানই যখন স্থান ও কাল বর্জিত হয়ে কেবল সূক্ষ্ম অবস্থাকেই চিন্তা করে, তখন তা হয় নির্বিচার (সমাধি)। এর পরের অবস্থায় ঐ একই ধ্যানে স্থূল বা সূক্ষ্ম সমস্ত উপাদানই পরিত্যক্ত হয় এবং ধ্যানের বিষয় হয় অন্তঃকরণ। যখন কর্মশক্তি ও আলস্যের সমস্ত গুণরহিত অবস্থায় চিন্তা করা হয়, তখন

তা হয় সানন্দ অর্থাৎ শান্তি-সমাধি। মনই যখন ধ্যানের বিষয় হয়, ধ্যান যখন পরিপক্ক ও কেন্দ্রীভূত হয়, যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম সব রকম উপাদানের ভাবই পরিত্যক্ত হয়, যখন অহং-এর একমাত্র সত্ত্ব অবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে বলে অস্মিতা-সমাধি। এই অবস্থায় যে উপনীত হয়েছে সেই অবস্থাকে বেদে বলা হয়েছে 'বিদেহ'। সে স্থূল দেহশূন্য অবস্থায় নিজেকে ভাবতে পারে বটে, তবে তাকে ভাবতে হবে সূক্ষ্মদেহীরূপে। যারা শেষ লক্ষ্যে না পৌঁছে এই অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে যায় তাদের বলা হয় প্রকৃতিলয় বা প্রকৃতিলীন। আর ; যারা এখানেও না থামে তারা মুক্তিলক্ষ্যে পৌঁছয়।

বিরামপ্রত্যয়াভাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥ ১৮

১৮॥ আর একরকম সমাধি আছে, সমস্ত রকম মানসিক ক্রিয়া নিরোধের দ্বারা তা লাভ করা যায়, সেখানে চিত্তে থাকে শুধু অব্যক্ত সংস্কার।

এটি হল জ্ঞানাতীত বা অতিচেতন বিশুদ্ধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—যে অবস্থা আনে আমাদের বন্ধন-মুক্তি। প্রথম অবস্থাটা মুক্তি দেয় না—আত্মাকে মুক্ত করে না। কোনো লোক সমস্ত রকম শক্তি লাভ করতে পারে, তবুও আবার তার পতন হতে পারে। প্রকৃতির আওতার বাইরে না গেলে কোনো রক্ষাকবচ থাকে না। তা করা খুবই কঠিন, পদ্ধতিটি যদিও সহজ মনে হয়। পদ্ধতিটি হল—মনকেই ধ্যান করা, মনে কোন চিন্তা এলে তৎক্ষণাৎ তা দমন করো—কোনো চিন্তাকেই মনে ঢুকতে দিও না ; এভাবে মনকে করে তোলো এক সম্পূর্ণতই শূন্যস্থান। সত্যিই যখন তা করতে পারব সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি পাব। কোনো শিক্ষা বা প্রস্তুতি ছাড়াই কেউ মনকে শূন্য করতে চাইলে কেবল তমঃ-রূপ অজ্ঞান-উপাদান দ্বারাই তাদের মনকে আবৃত করতে পারবে এবং মন তাতে জড় ও মূঢ় হবে, তারা কিন্তু মনে করবে মন শূন্য করা হচ্ছে। যথার্থই মনকে শূন্য করতে সমর্থ হতে চাইলে প্রবলতম শক্তি প্রয়োজন—দরকার প্রবলতম সংযম। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থায় পৌঁছনো যায়, সমাধি নির্বীজ হয়ে যায়। তাতে কি বোঝাল ? যে একাগ্রতায় চেতনা থাকে, মন যেখানে কেবলমাত্র চিত্ততরঙ্গ শান্ত করতে ও সংযত রাখতে সমর্থ হয়, তরঙ্গগুলি থেকে যায় প্রবৃত্তিরূপে। এই সংস্কার আবার তরঙ্গ হয়ে ওঠে, সময় হলেই তা হবে। কিন্তু যখন এইসব সংস্কার ধ্বংস করে ফেলবে, মনকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলবে, তখনি সমাধি হয় নির্বীজ—মনে তখন এমন কোনো সংস্কারবীজ আর থাকে না যা থেকে হতে পারে বারংবার জীবন-বৃক্ষের জন্ম —বারংবার এই জন্মমৃত্যুচক্র।

জিজ্ঞেস করতে পারো, যেখানে মন নাই জ্ঞান নাই, সে আবার কি রকম অবস্থা ? আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা হল জ্ঞানাতীতের চেয়ে নিম্নতর অবস্থা। সব সময়ে মনে রাখবে দুই বিপরীত দিক প্রায় একইরকম দেখায়। খুব মৃদু ঈথার-কম্পনকে যদি অন্ধকার বলি, মধ্যবর্তী একটা অবস্থাকে বলি আলো, তবে খুবই উচ্চ কম্পনের অবস্থাটা হবে আবার সেই অন্ধকার। অনুরূপভাবেই, অজ্ঞতা হল সর্বনিম্ন অবস্থা,

এবং জ্ঞানাতীত হল সর্বোচ্চ অবস্থা,—এই দুই চরম বিপরীত অবস্থাকে একইরকম মনে হয়। জ্ঞান হল এক উৎপাদনবিশেষ—এক মিশ্ররূপ; তা প্রকৃত নয়।

এই উচ্চস্তর একাগ্রতার নিত্য অভ্যাসে কি হয়? অস্থিরতা ও জড়তার সমস্ত পূর্বেকার প্রবণতাগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে, সৎ প্রবণতাগুলিও—ময়লা ও খাদ থেকে সোনাকে আলাদা করার জন্য রাসায়নিক ব্যবহারে যেমনটা হয়। ধাতুকে যখন গলানো হয়, রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে খাদগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। তেমনি, নিয়ত নিয়ন্ত্রণশক্তি পূর্বেকার কু-প্রবণতাগুলিকে রুদ্ধ করে ফেলে, এবং সেই সঙ্গেই সু-প্রবণতাগুলিকেও। ঐ সু ও কু-প্রবণতাগুলি পরস্পর পরস্পরকে দমন করে ফেলবে, থেকে যাবে শুধু জ্যোতির্ময় আত্মা—ভালো বা মন্দ দ্বারা অনাবৃত সর্বত্রবিরাজমান, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আত্মা। তখন সেই সমাধিস্থ ব্যক্তি জানবেন তার কখনো জন্ম হয়নি, তাঁর মৃত্যু নাই, স্বর্গের বা মর্ত্যের তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি জানবেন তিনি কখনো আসেন নি, কখনো যান নি। প্রকৃতিই কেবল চলমান এবং আত্মার উপরে পড়ে তার চলন্ত ছায়া। আয়না থেকে প্রতিফলিত ছায়া দেয়ালে নড়ে, মূর্খের মতো দেয়াল ভাবছে আমি নড়ছি—এমনটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রেও। আমাদের চিত্ত সঞ্চালিত হতে হতে বহু আকার গ্রহণ করছে, এবং আমরা ভাবছি আমরাই ঐসব আকার। তখন এইসব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। মুক্ত আত্মা যখন আজ্ঞা করবে—প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ্ঞা করবে, তখন কামনামাত্রই তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ হবে, যা সে করতে চাইবে করতে পারবে। সাংখ্যদর্শন মতে ঈশ্বর নাই। তা বলে এই বিশ্বের কোনো ঈশ্বর থাকতে পারে না; কারণ, যদি থাকত তাকে আত্মা হতেই হবে। আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত হতেই হবে। কিন্তু যে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত তা কেমন করে বিশ্বসৃষ্টি করবে? সে নিজেই তো দাস। অন্যপক্ষে, যে আত্মা মুক্ত সে কেন সৃষ্টি করবে—এসব নিয়ন্ত্রিত করতে যাবে? তার কোনোই আকাঙ্ক্ষা নেই, কাজেই সৃষ্টির প্রয়োজনও নেই। দ্বিতীয়ত, সাংখ্যদর্শন বলে ঈশ্বর বিষয়ক কোনো মতের প্রয়োজন হয় না; প্রকৃতিই মন ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কিন্তু কপিল এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে বহুসংখ্যক আত্মা আছে, পূর্ণতার সবটা লাভ করেও কিছুটা তারা পারেনি, কারণ তারা সমস্তরকম শক্তিকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাদের মন সাময়িকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয় আবার তার প্রভুরূপে বহির্গত হবার জন্যেই। তারা দেবতাই। আমরা সকলেই হব এমন দেবতা; সাংখ্যমতে বেদ-কথিত দেবতার প্রকৃত অর্থ হল এইসব মুক্তাত্মা। তাদের ছাড়া বিশ্বের কোনো চিরমুক্ত ও আনন্দময় স্রষ্টা নেই। অন্যদিকে যোগীরা বলেন—'তা নয়, ঈশ্বর আছেন, সমস্ত আত্মা থেকে স্বতন্ত্র এক আত্মা আছে, সেই সমস্ত সৃষ্টির চিরনিয়ন্তা, চিরমুক্ত, সমস্ত গুরুর গুরু।' যোগীরা স্বীকার করেন, সাংখ্য যাকে 'প্রকৃতি-লীন' বলে তাও বর্তমান। অনেক যোগী আছেন তাঁদের পূর্ণ সিদ্ধি ঘটেনি, তবু সাময়িকভাবে তাঁরা শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারলেও বিশ্বসৃষ্টির অংশবিশেষের নিয়ন্তা থাকতে পারেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়নাম্ ॥ ১৯

১৯ ॥ (এই সমাধিতে চরম বৈরাগ্য না এলে) সমাধি হয় দেবতাদের পুনঃপ্রকাশের এবং প্রকৃতিলীনদের পুনরাবির্ভাবের কারণ।

ভারতীয় দর্শনে দেবতারা হল বহু উচ্চ পদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন আত্মা সেসব পদ ক্রমান্বয়ে অধিকার করে থাকে। তবে তারা কেউই পূর্ণ নয়।

শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০

২০ ॥ অন্যদের কাছে (এই সমাধি) ঘটে বিশ্বাস (শ্রদ্ধা), তেজ (বীর্য), স্মৃতি, একাগ্রতা (সমাধি), এবং সত্যের বিচারবুদ্ধি (ভেদাত্মক বুদ্ধি) থেকে।

এসব হল তাদের জন্যে যারা দেবতাদের পদ চায় না, এমন কি জীবচক্রের শাসক পদও চায় না। তারা মুক্তি লাভ করে।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১

২১ ॥ যারা অত্যন্ত উৎসাহী তাদেরই হয় দ্রুত সিদ্ধি।

মৃদুমধ্যাদিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ ॥২২

২২ ॥ (আবার) মৃদু প্রয়াস, মধ্যম প্রয়াস বা তীব্র প্রয়াস—এই পন্থাদির গ্রহণ অনুসারে যোগীদের সিদ্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটে।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩

২৩ ॥ অথবা ঈশ্বরভক্তি দ্বারা।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪

২৪ ॥ ঈশ্বর (পরমনিয়ন্তা) হল বিশেষ পুরুষ—দুঃখ, কর্ম, কর্মফল এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অস্পৃষ্ট।

আমাদের আবার এখানে স্মরণ করতে হবে পাতঞ্জল-যোগদর্শন হল সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই অথচ যোগীরা তার স্থান স্বীকার করেন। যোগীরা অবশ্য ঈশ্বরের সম্পর্কে বহুভাবের উল্লেখ করেন না। বিশ্বস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের কথা যোগীরা বলেন নি। বেদানুসারে ঈশ্বর হলেন বিশ্বস্রষ্টা; যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজেই তা ইচ্ছারই প্রকাশ হবে। যোগীরা এক ঈশ্বরকেই প্রতিষ্ঠা করতে চান, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের ধ্যানধারণা তাঁদেরই স্বকীয় এক বিচিত্র ধরনে গঠিত। তাঁরা বলেন:

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫

২৫ ॥ অন্যের ক্ষেত্রে যা বীজ (মাত্র), ঈশ্বরের মধ্যে তার সমস্ত জ্ঞানই হয় অনন্তরূপী।

মন সবসময়ে দুটি বিপরীত চরম প্রান্তের মধ্যে পরিভ্রমণ করে। সীমিত কোনো ক্ষেত্রের কথা তুমি চিন্তা করতে পারো, কিন্তু সেই ভাবই তোমার মধ্যে অসীম ক্ষেত্রের অনুভবও সৃষ্টি করে থাকে। চোখ বন্ধ করে ছোট একটি ক্ষেত্রের কথা ভাবো; তখনই অনুভব করবে তোমার ছোট্ট বৃত্তটির চারদিকে রয়েছে অসীম এক বৃত্ত। সময়

প্রসঙ্গেও ঐরূপ। একটি মুহূর্তের চিন্তা করো ; তুমি ঐ অনুভব-কালেই চিন্তা করবে অনন্ত সময়কে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। জ্ঞান হল মানুষের মধ্যে এক বীজসদৃশ, কিন্তু তোমাকে তার চারপাশে ভাবতে হবে অনন্ত জ্ঞান ; আমাদের মনের গঠনই দেখিয়ে দিচ্ছে অনন্ত. অসীম জ্ঞানকে। যোগীরা ঐ অনন্ত অসীম জ্ঞানকেই বলেন ঈশ্বর।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কলেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬

২৬॥ তিনি হলেন সনাতন গুরুদেরও গুরু—তিনি সময় দ্বারা বদ্ধ নন।

একথা সত্য যে সমস্ত জ্ঞানই আমাদের ভিতরে থাকে। কিন্তু এই জ্ঞানকেই বাহিরে জাগ্রত করতে হয় অন্য জ্ঞান দ্বারা। জ্ঞানের শক্তি যদিও আমাদের মধ্যেই আছে, তবুও তাকে বাহিরে জাগ্রত করতে হয় ; যোগীরা বলেন তা পারা সম্ভব একমাত্র অন্যরকমের জ্ঞান দ্বারা। মৃত জড়বস্তু কখনোই জ্ঞান জাগ্রত করে না, জ্ঞানের ক্রিয়াই জ্ঞান সৃষ্টি করে। আমাদের পক্ষে কিছু জানাটা হল আমাদের মধ্যে যা আছে তাকেই আহ্বান করা, কাজেই গুরুদের প্রয়োজন আছে সর্বকালেই। এ জগৎ কখনোই তাদের ছাড়া নয়, এবং তাদের ছাড়া কোনো জ্ঞানও হয় না। ঈশ্বর হলেন গুরুর গুরু। কারণ গুরুগণ, তাঁরা যতই বড় হন না—দেবতা বা অবতার হন না, সকলেই কালদ্বারা বদ্ধ ও সীমায়িত ; কিন্তু ঈশ্বর তা নন। যোগীদের কৃত দুটি অভিনব সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমটি হল : সীমার কথা ভাবতে গেলে অসীমের কথা ভাবতেই হবে, এবং অনুভবের একাংশ যদি সত্য হয় তো অন্য অংশও সত্য হবে, কারণ মনের বোধরূপে তাদের মূল্য সমান। মানুষের জ্ঞান কম এটাই প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের আছে অসীম জ্ঞান। একেকে গ্রহণ করবো তো অন্যকে নয় কেন ? যুক্তিই আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে দুটো গ্রহণ করো বা দুটোই বর্জন করো। আমি যদি বিশ্বাস করি কোনো লোকের জ্ঞান কম, আমার বিশ্বাস করতে হবে তার অন্তরালে কেউ আছে যার জ্ঞান অসীম। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল : গুরু (শিক্ষাদাতা) ছাড়া কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। আধুনিক কালের দার্শনিকরাও যেমন বলে থাকেন, এটা সত্য যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার মধ্য থেকে বিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত জ্ঞানই মানুষের মধ্যে নিহিত আছে কিন্তু তাকে জাগ্রত করতে হলে বিশেষ পরিবেশ প্রয়োজন। গুরু ছাড়া কোন জ্ঞানেরই সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু যদি মানুষ, দেবতা বা স্বর্গীয় দূতবিশেষ আমাদের গুরু হন তাহলে এঁরা সবাই তো সীমাবদ্ধ ; এঁদের আগে কে গুরু ছিলেন ? আমরা উপসংহারে স্বীকার করতে বাধ্য হই যে এক ও একক গুরু ছিলেন এবং তিনি কালের দ্বারা পরিমিত নন, তাঁর আরম্ভ ও শেষ নেই, এবং তিনিই ঈশ্বর।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭

২৭॥ তাঁর প্রকাশক শব্দই ওম্ (প্রণব)।

মনে যে ভাব থাকে তার প্রকাশক প্রতিশব্দও আছে, শব্দ ও চিন্তা অচ্ছেদ্য। একই বস্তুর বহিরঙ্গকে আমরা বলি শব্দ ; অন্তরঙ্গকে বলি ভাব (চিন্তা)।

কেউই বিশ্লেষণ দ্বারা শব্দ থেকে ভাবকে পৃথক করতে পারে না। কিছু মানুষ বসে বসে শব্দ স্থির করে ভাষা সৃষ্টি করেছে—এইরকম কথা যে ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। যতদিন থেকে মানুষের অস্তিত্ব আছে ততদিনথেকেই শব্দ আছে, ভাষা আছে। ভাবের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ কিরূপ ? যে কোনো ভাবের সঙ্গেই কোনো শব্দ থাকবেই তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই একই শব্দ যে সবসময়ে দরকার হয় তা নয়। বিশটা বিভিন্ন দেশে ভাব এক হতে পারে। তবু ভাষা তো বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেকটি ভাবের প্রকাশের জন্যই আমাদের এক-একটি শব্দ চাই। কিন্তু ঐসব শব্দের যে একইরকম ধ্বনি থাকতেই হবে তা নয়। বিভিন্ন দেশে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকবেই। আমাদের ভাষ্যকার বলেন—'ভাব ও শব্দের সম্পর্কটি যদিও স্বাভাবিক, তবু একই শব্দ ও একই ভাবের মধ্যকার সম্বন্ধটির বন্ধন খুব সুদৃঢ় নয়।' ধ্বনিগুলি নানাপ্রকারের, তবু শব্দ ও ভাবের সম্পর্কটি স্বাভাবিক। উদ্দিষ্ট বিষয় ও প্রতীকের মধ্যে সম্বন্ধটা যথার্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক সাধারণ ব্যবহারে কাজে আসে না। উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রকাশই হল প্রতীক, উদ্দিষ্ট বিষয়টির যদি পূর্বেই অস্তিত্ব থেকে থাকে এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা যদি জানি যে প্রতীকটি ঐ বিষয়কে বহুবার প্রকাশিত করেছে, তবেই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি যে উভয়ের মধ্যে সত্যকার এক সম্বন্ধ রয়েছে। বিষয়গুলি সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও শত-সহস্র লোকে ঐ প্রতীকের সাহায্যেই তাদের জানতে পারবে। প্রতীক ও উদ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা চাই, আর তখন প্রতীকটিকে উচ্চারণ করা মাত্রই তার উদ্দিষ্ট বিষয়টি জাগ্রত হয়। ভাষ্যকার বলেন, ঈশ্বরের স্বপ্রকাশক শব্দটি হল ওম্। এই শব্দটির উপরেই তিনি জোর দিচ্ছেন কেন ? ঈশ্বরকে বোঝাতে শব্দ আছে তো শত শত। একটা চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে শত সহস্র শব্দের ; ঈশ্বর ভাবটির সঙ্গেও সম্বন্ধ রয়েছে শত শত শব্দের, এবং প্রত্যেকটিই তো ঈশ্বরের প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান। বেশ কথা। এইসব শব্দেরই একটা সাধারণীকরণ প্রয়োজন—কোনোটা নিম্নতল ভিত্তি, কোনোটা বা এইসব প্রতীকেরই সাধারণ ভিত্তি ; এখন যেটা সাধারণ ভিত্তি সেগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট—সেগুলিসব শব্দেরই প্রতীক হবে। এক মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে আমরা কণ্ঠনালী এবং তালুকে শব্দাধাররূপে ব্যবহার করি। সমস্ত বাস্তব ধ্বনিরই প্রকাশক এবং সবচেয়ে স্বাভাবিক কোনো একটি শব্দ আছে কি ? ওম্ (অউম্) এমনই এক ধ্বনি—সমস্ত ধ্বনিরই ভিত্তি। প্রথম অক্ষর 'অ' হল মৌল ধ্বনি, জিহ্বা বা তালুর কোনো অংশ স্পর্শ না করেই উচ্চারিত ; 'ম' হল শেষ ধ্বনি—অধরোষ্ঠ বন্ধ করে উচ্চারিত ; 'উ' মুখগহ্বরের শব্দাধারের শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে উচ্চারিত। কাজেই ওম্ ধ্বনি-উচ্চারণের সমস্ত ঘটনারই প্রতীক ; এবং তাই এটা এক স্বাভাবিক প্রতীক—সমস্ত ধ্বনিরই গর্ভমূল। যত রকম শব্দ সৃষ্টিরই সম্ভাবনা আছে তার সমস্তই এটিতে বোঝায়। এসব গবেষণা বাদ দিয়েও আমরা দেখতে পাই ওম্ শব্দটির চারদিকে বিরাজমান ভারতবর্ষের সমস্ত রকম ধর্মভাবসমূহ ; বেদের সমস্ত রকম ধর্মভাব এই ওম্ শব্দটির চারদিকেই ঘনীভূত হয়েছে। তাহলে, আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে বা অন্য কোনো দেশে সেসবের কী করবার আছে ? এর উত্তর : ভারতবর্ষে ধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই শব্দটিকে রাখা হয়েছে

এবং ঈশ্বর সম্পর্কে নানাপ্রকার ধ্যানধারণা বোঝাবার ব্যাপারে শব্দটিকে কাজে লাগান হয়েছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এমনকি নিরীশ্বরবাদীরাও গ্রহণ করেছে এই ওম্ শব্দটিকে। জনসাধারণের অধিকাংশের ধর্ম-উদ্দীপনায় ওম্ হয়ে উঠেছে একমাত্র প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ইংরাজী 'God' শব্দটি। এতে বোঝায় কেবলমাত্র সীমিত ক্ষমতার রূপ, তার অতীত যদি কিছু বোঝাতে চাও তো আগে বিশেষণ বসিয়ে বলতে হবে ব্যক্তিক (সগুণ), নৈর্ব্যক্তিক (নির্গুণ) বা পরম বা পূর্ণ। তাই অন্য ভাষায়ও 'God' শব্দটিকে ঐভাবে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য বড়ই লঘু ধরনের। এক ওম্ শব্দই তার চারিদিকে ঘিরে রেখেছে সমস্ত রকমের বৈশিষ্ট্য। এবং তাই প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিত এই ওম্ শব্দটি।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮

২৮॥ এই (ওম্) বারংবার আবৃত্তি এবং তার অর্থ ধ্যান করাই (পথ)।

বারংবার আবৃত্তি করা হবে কেন ? আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি যে সংস্কার-মতে সমস্ত ছাপের ফলাফলই মনের মধ্যে থেকে যায়। সেসব ক্রমে ক্রমে সুপ্ত হয়ে পড়ে কিন্তু থেকে যায় ঠিকই এবং ঠিক উদ্দীপনা দেখা দিলেই বেরিয়ে আসে। আণবিক কম্পন কখনো থেমে যায় না। এই বিশ্ব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, সমস্ত পুঞ্জ পুঞ্জ কম্পন থেমে যাবে ; সূর্য চন্দ্র তারকা এবং পৃথিবী মিলিয়ে যাবে, কিন্তু পরমাণুর মধ্যে থেকে যাবে কম্পন। প্রকাণ্ড জগৎ যে কাজ করে, প্রত্যেক পরমাণুও তাই করে। তাই চিত্তের কম্পন থেমে গেলেও, তার পারমাণবিক কম্পন চলতেই থাকে, এবং প্রেরণা পেলেই আবার আত্মপ্রকাশ করে। এবারে আমরা বুঝতে পারলাম পুনরাবৃত্তি বলতে কি বোঝায়। আধ্যাত্মিক সংস্কারে এটাই আনতে পারে সর্বোচ্চ উদ্দীপনা। 'সাধুসঙ্গের একটি মুহূর্তই তরণীকে জীবনসমুদ্র পার করে দেয়।' সঙ্গের এমনই শক্তি। তাই ওম্-এর পুনরাবৃত্তি ও তার অর্থকে চিন্তা করাটা তোমার নিজের অন্তরেই সৎসঙ্গ লাভ করা। অধ্যয়ন করো এবং অধীত বিষয়ে ধ্যান করো। এইভাবেই জ্যোতি দেখা হবে, আত্মা প্রকাশিত হবে।

কিন্তু ওম্ চিন্তা করতে হবে, এবং তার অর্থও। কুসংসর্গ বর্জন করবে ; কারণ পুরানো ক্ষতের দাগ রয়েছে তোমার ভিতরে, এবং কুসংসর্গ তাদের আবার ঠিকই বার করে আনবে। অনুরূপভাবেই আমাদের শেখানো হয়েছে সৎ সংসর্গ আমাদের ভিতরের সমস্ত সুপ্ত সৎ-সংস্কারকে জাগ্রত করবে। সৎ সংসর্গের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই, কারণ তখন সৎ-সংস্কারগুলি উপরিভাগে আসবার জন্য অনুপ্রেরণা পাবে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯

২৯॥ এ থেকেই লাভ হয় (জ্ঞানবিষয়ক) অন্তর্দৃষ্টি, এবং (যোগের) বিঘ্নসমূহ নাশ হয়।

ওম্-এর পুনরাবৃত্তি ও ধ্যানের প্রথম প্রকাশরূপেই অন্তর্দৃষ্টিশক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে, মানসিক ও দৈহিক সমস্ত রকম বিঘ্ন অন্তর্হিত হতে শুরু করবে। যোগীর কাছে বিঘ্ন বা বাধাগুলি কি ?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০

৩০॥ রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উৎসাহের অভাব, আলস্য, ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতার অভাব, প্রাপ্ত অবস্থা থেকে পতন—এসব বাধা-বিঘ্নকর বিচ্যুতি।

ব্যাধি: এই দেহতরীতেই আমাদের জীবনসমুদ্রের ওপারে যেতে হবে। দেহের যত্ন নিতেই হবে। রুগ্নেরা কখনো যোগী হতে পারে না। মানসিক জড়তা: এটা কোনো বিষয়ে আমাদের সকল রকম প্রাণবন্ত ঔৎসুক্যই নষ্ট করে ফেলে—অথচ ঐ ঔৎসুক্য ছাড়া অভ্যাসের সংকল্প বা শক্তি কোনোটাই থাকে না।

সন্দেহ: দূর থেকে শোনা বা দেখার মতো কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত, কারো বুদ্ধিজাত প্রত্যয় যতই জোরালো হোক না, বিজ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে মনে সন্দেহাদি উপস্থিত হতে পারে। এই চকিত অনুভবগুলি শিক্ষার্থীর মনের জোর বাড়ায় এবং তাকে অধ্যবসায়ী করে তোলে। প্রাপ্ত অবস্থা থেকে পতন: কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করলেই মন হয়ে উঠবে শান্ত এবং সহজেই সংযত হবে। দেখবে, বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তারপর সহসা একদিন অগ্রগতি থেমে যাবে, দেখবে তুমি যেন আটকে পড়েছ। তবু লেগে থাকো। এমন উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়েই সমস্ত উন্নতি ঘটে।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১

৩১॥ শোক, মানসিক দুঃখদুর্দশা, দেহকম্পন, অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস—এগুলির সঙ্গে সঙ্গে থাকে একাগ্রতার অভাব।

একাগ্রতা: অভ্যাসের গুণে প্রত্যেকবারই একাগ্রতা এনে দেবে মনে পূর্ণ শান্তি। অভ্যাস যদি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয় বা পর্যাপ্তরূপে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবেই এইসব বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। ওম্ পুনরাবৃত্তি এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ মনকে শক্তিশালী করে, আনে নতুন উৎসাহ। প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা দেবে-কম্পন। এতে কিছু ভাববে না, অভ্যাস করে যাবে। অভ্যাসেই সব সেরে যাবে, আসনকেই দৃঢ় করবে।

তৎ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২

৩২॥ এটা নিবারণের উদ্দেশ্যে একক বিষয়ে অভ্যাস প্রয়োজন।

মনকে কিছুকালের জন্য একটিমাত্র বিষয়ে রূপ গ্রহণ করার অভ্যাসই এসব ধ্বংস করবে। এই উপদেশটি সাধারণভাবে দেওয়া হল। পরবর্তী ভাষ্যসূত্রে তা ব্যাখ্যাত ও বিশেষিত হবে। এক অভ্যাসই সকলের পক্ষে অনুকূল হয় না, তাই নানাপ্রকার পদ্ধতির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, এবং প্রত্যেকে অভিজ্ঞতার দ্বারাই বুঝে নেবে কোনটা তার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক।

মৈত্রী-করুণা মুদিতোপেক্ষণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥৩৩

৩৩॥ সুখী, অসুখী, সৎ, অসৎ এগুলির স্থলে যথাক্রমে সৌহার্দ্য, করুণা, আনন্দ এবং ঔদাসীন্য চিন্তা করলে চিত্ত শান্ত হয়।

আমাদের এই চার রকমের ভাবাদর্শ থাকতেই হবে। সকলের জন্য সোহার্দ্য চাই; যারা দুঃখী তাদের জন্য করুণা থাকা চাই; কেউ সুখী হলে আমাদের সুখী হতে হবে, দুর্বৃত্তজনের প্রসঙ্গে উদাসীন থাকতে হবে। আমাদের জীবনে উপস্থিত সব বিষয় প্রসঙ্গেই এমনটা হতে হবে। প্রসঙ্গটি যদি ভালো হয়, আমরা তার প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন হব; ভাবনার প্রসঙ্গটি যদি দুঃখজনক হয় তো তাদের জন্য আমাদের দুঃখী হতেই হবে। যদি ভালো হয় তো আমরা খুশিই হব; যদি খারাপ হয় তো আমরা উদাসীন থাকব। সম্মুখে উপস্থিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি এই যে মনোভঙ্গী এতেই মনকে শান্ত করে তুলবে। এইভাবে মনকে স্থির করতে অপারগ হবার জন্যেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ বিঘ্নগুলি দেখা দেয়। যেমন কেউ যদি আমাদের অনিষ্ট করে তো আমরাও অমনি পাল্টা তার অনিষ্ট করতে চাই; এবং প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিক্রিয়াই দেখিয়ে দেয় যে আমরা চিত্তকে সংযত রাখতে সমর্থ নই; বিষয়টির দিকে তা তরঙ্গাকারে বেরিয়ে আসে এবং আমরাও আমাদের শক্তি হারিয়ে ফেলি। ঘৃণা বা অনিষ্ট করার ইচ্ছারূপে প্রতিটি প্রতিক্রিয়ায়ই মনের বহু শক্তি ক্ষয় হয়। প্রত্যেকটি অসৎচিন্তা বা ঘৃণার ক্রিয়া বা যে কোনোরকম প্রতি-হিংসাকে যদি দমন করা যায় তো তাতে আমাদেরই ভালো হবে। এইভাবে সংযত হয়ে আমরা কিছু তো হারাবই না, বরং সন্দেহাতীতরূপেই আমরা লাভ করি বহু কিছু। যখনই আমরা ঘৃণাকে বা ক্রোধের ভাবকে দমন করি, তখন অনেক পরিমাণ সৎশক্তিকে আমরা আমাদের অনুকূলে সঞ্চিত রাখি; ঐ শক্তিটুকুই রূপান্তরিত হবে উচ্চতর শক্তিতে।

প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪

৩৪ ॥ শ্বাস বহির্গমনের ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।

এখানে প্রাণ-শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণ কিন্তু ঠিক শ্বাস নয়। তা হল বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত শক্তিরই নাম। জগতে যাই দেখো, যাই নড়েচড়ে বা কাজ করে বা যারই জীবন আছে—সে সব প্রাণেরই প্রকাশ। বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তির সমষ্টিকে প্রাণ বলে। কল্প (সৃষ্টিবৃত্ত) শুরু হবার আগে এই প্রাণ থাকে নিশ্চল-প্রায় অবস্থায়, কল্পারম্ভে শুরু হয় প্রাণের প্রকাশ। এই প্রাণই প্রকাশিত হয় গতিরূপে—মানুষ বা অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমন স্নায়বীয় গতি; ঐ একই প্রাণ প্রকাশিত হয় চিন্তারূপে, এবং এইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। নিখিল বিশ্ব এই প্রাণ ও আকাশের মিলনরূপ; মানবদেহও তেমনি। যা কিছুই আমরা দেখি ও অনুভব করি সেই বিভিন্ন রকমের উপাদান আমরা আকাশ থেকেই পাই; এবং প্রাণ থেকে পাই বিভিন্ন গতি। এখন এই প্রাণকেই বহির্গত করা ও নিয়ন্ত্রণ করাকেই বলে প্রাণায়াম। যোগদর্শনের পিতৃরূপী পতঞ্জলি প্রাণায়াম সম্পর্কে বেশী কিছু নির্দেশ দিয়ে যাননি, কিন্তু পরে অন্যান্য যোগীরা প্রাণায়ামে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কার করে তাকে এক মহাবিজ্ঞান করে তুলেছেন। পতঞ্জলির কাছে প্রাণায়াম বহু পথের মধ্যে একটি পথ, এর উপরে তিনি বিশেষ ধরনের কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি কেবল বলতে চেয়েছেন—বাইরে শ্বাস ছেড়ে দাও, ভেতরে শ্বাস টেনে নাও এবং কিছুক্ষণ ধারণ করো; এইটুকুই,

এতেই মন কিছুটা শান্ত হবে। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা যায় এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে প্রাণায়াম নামে এক বিশেষ বিজ্ঞান। এবারে আমরা শুনব পরবর্তী যোগীরা এ বিষয়ে কি বলেন।

এ বিষয়ে কিছু কিছু আমি আগেই বলেছি। কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলে তোমাদের মনে ধরবে। প্রথমত মনে রাখবে এই প্রাণ শ্বাসবায়ু নয়; শ্বাসগতির যা কারণ, শ্বাসের যা মৌলশক্তি তাই হল প্রাণ; আবার, প্রাণ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইন্দ্রিয়াদির ক্ষেত্রেও; তাদের বলা হয় প্রাণসমূহ, মনকেও বলা হয় প্রাণ; আমরা তাই দেখলাম প্রাণ হল গতি। তবু প্রাণকে গতি বলা যায় না, কারণ গতি কেবল প্রাণেরই প্রকাশ। গতিরূপে বা বেগের সমস্ত রকম প্রকাশেই যা দেখা দেয় তাই হল প্রাণ। চিত্ত অর্থাৎ মনঃ-পদার্থ যন্ত্ররূপে চারদিক থেকে প্রাণ আহরণ করে এবং প্রাণ থেকে সৃষ্টি করে বহু-প্রকার মৌলশক্তি—যা দেহকে রক্ষা করে এবং চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও অন্যান্য শক্তিসমূহ। উপরে বর্ণিত শ্বাসপ্রণালী দ্বারা আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্নপ্রকার গতিকে এবং দেহ সঞ্চরণশীল বহুরকম স্নায়ুতন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। প্রথমে আমরা তাদের চিনতে সুরু করি, পরে ধীরে ধীরে তাদের বশে আনতে পারি।

এখন, পতঞ্জলির পরবর্তী যোগীগণের মতে শরীরের মধ্যে প্রধান তিনটি প্রাণ-প্রবাহ আছে। তাঁরা একটিকে বলেছেন ইড়া, দ্বিতীয়টিকে পিঙ্গলা, এবং তৃতীয়টিকে সুষুম্না। তাঁদের মতে পিঙ্গলা অবস্থিত মেরুদণ্ডের ডানদিকে, ইড়া বামদিকে, এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে শূন্যনলরূপী সুষুম্না। তাঁদের মতে ইড়া ও পিঙ্গলারূপী শক্তিপ্রবাহ প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশীল, এবং ঐ প্রবাহপথেই আমরা জীবনের সব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করি। সুষুম্নাও সকলের মধ্যেই থাকার কথা, কিন্তু তা ক্রিয়াশীল একমাত্র যোগীদের ক্ষেত্রেই। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, যোগে দেহের পরিবর্তন হয়। অভ্যাস করতে করতে দেহে পরিবর্তন আসে, তখন তোমার আর অভ্যাস করার আগের দেহ থাকে না। এটা খুবই যুক্তিসম্মত এবং ব্যাখ্যা করাও সম্ভব, কারণ আমাদের প্রতিটি নতুন চিন্তাই আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যেন নতুন নতুন প্রবাহ-পথ তৈরী করে দেয়, এবং এতেই প্রমাণিত হয় মানুষ-প্রকৃতির মধ্যে আছে প্রকৃতিরই এক সংরক্ষিত ভাণ্ডার। মনুষ্যপ্রকৃতি পূর্ব-প্রবর্তিত পথেই পরিভ্রমণ করতে চায়, কারণ সেটাই সহজ। কেবলমাত্র উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি বলি—মন হল একটা সূঁচ, এবং মস্তিষ্ক হল একটা কোমল পিণ্ড, তাহলে দেখা যাবে আমাদের প্রতিটি চিন্তা মস্তিষ্কের ভিতরে যেন রাস্তা তৈরী করে নেয়; এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু (মস্তিষ্কের) ধূসর পদার্থ এসে রাস্তাটা আলাদা রাখার জন্যে একটা সীমারেখা তৈরী করে রাখে। যদি ঐরকম ধূসর পদার্থটি না থাকত তো স্মৃতিও থাকত না, কারণ স্মৃতির অর্থ হল ঐ পুরানো রাস্তা ধরে চলা—যেন চিন্তাকে আবার অনুসরণ করা। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, সকলের কাছে পরিচিত কোনো বিষয়ে কয়েকটি ভাব সম্পর্কে কেউ যখন কথা বলতে থাকে ঐ ভাবগুলিকে কেবলমাত্র হেরফের করেই কিছু বলে। তখন তা বোঝা খুবই সহজ হয়, কারণ ঐ পথ বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকের মস্তিষ্কের মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে, ওগুলিকে কেবলমাত্র আবার তাদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়,

কিন্তু বিষয়টি যদি নতুন হয়, নতুন পথ তৈরী করতে হবে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই তা বোধগম্য হয়ে উঠবে না। এইজন্যই মস্তিষ্ক (মস্তিষ্ক—মস্তিষ্কধারী ব্যক্তিটি নয়) নতুন নতুন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হতে অস্বীকার করে, প্রতিরোধ করে। প্রাণ নতুন নতুন পথ-প্রণালী সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মস্তিষ্ক তা চায় না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার বা রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী—এখানেই রয়েছে তার গোপন রহস্য-সূত্র। মস্তিষ্কে পথসংখ্যা যত কম, প্রাণরূপী সুঁচটি ততই কম পথ তৈরী করবে, এবং মস্তিষ্কও তদনুরূপ রক্ষণশীল বা স্থিতিশীল হয়ে উঠবে এবং নতুন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ততই সক্রিয় হবে। মানুষ যতই চিন্তাশীল হয়, মস্তিষ্কের পথগুলি ততই জটিল হয়, এবং নতুন নতুন ভাবধারা তত সহজে সে গ্রহণ করে এবং তাদের হৃদয়ঙ্গম করে। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ নতুন ভাব সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটে। মস্তিষ্কে আমরা নতুন রকম ছাপ ফেলি, মস্তিষ্কের নতুন পথ তৈরী করি; তাই যোগাভ্যাসে (যেটা একেবারেই অভিনব ধরনের চিন্তা ও উদ্দেশ্যাত্মক ক্রিয়া) আমরা শারীরিক বিরোধিতা উপলব্ধি করি। এবং সেজন্যেই ধর্মের যে অংশ প্রকৃতির জাগতিক দিকটার আলোচনায় ব্যাপৃত, তা-ই এত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে; অন্যদিকে দর্শনশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞান মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত বলে প্রায়শই অবহেলিত থাকে।

আমাদের এই জগতের সংজ্ঞাটি মনে রাখা উচিত। এ কেবল অনন্ত সত্তারই চেতন-স্তরে বহিঃপ্রকাশ। অনন্তের এক ক্ষুদ্র অংশই চেতনায় দেখা দেয়, এবং তাকেই আমরা বলি আমাদের এই জগৎ। কাজেই জগতের বাইরে অনন্ত বলে কিছু আছে; এবং ধর্মকে দুটো নিয়েই কাজ করতে হয়—একদিকে এই ছোট্ট পিণ্ডটি যাকে আমরা আমাদের জগৎ বলি এবং তার অতীত অনন্ত যে ধর্মই এদের মধ্যে একটিকে নিয়ে থাকবে তা ত্রুটিপূর্ণ হবেই। দুটো নিয়েই তার থাকতে হবে। অসীম অনন্তের যে অংশটি চেতন-স্তরে বিধৃত হয়েছে—স্থান-কাল-কারণরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েছে, তা আমাদের খুবই পরিচিত, কারণ আমরা তার মধ্যেই রয়েছি, এবং প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকেই এই জগতের ভাবও আমাদের মধ্যেই বর্তমান। ধর্মের যে অংশ অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণই নতুন, এবং তার সম্বন্ধে ধারণাসমূহ মস্তিষ্কে নতুন পথ রচনা করে—সমগ্র দেহব্যবস্থাতেই গণ্ডগোল সৃষ্টি করে; এবং তাই দেখা যায় যোগাভ্যাসের ব্যাপারে সাধারণ লোক প্রথমটায় চিরাভ্যস্ত পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এই রকম বাধাবিঘ্ন যতটা সম্ভব কম করার জন্য পতঞ্জলি এইসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন,—যাতে আমাদের পক্ষে অনুকূল যে কোনো একটিরই অভ্যাস আমরা করতে পারি।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃস্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫

৩৫ ॥ যে প্রকারের একাগ্রতায় অসামান্য ইন্দ্রিয়ানুভব ঘটে তা মনের অধ্যবসায়ের কারণ হয়

ধারণা বা একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে তা আসে। যোগীরা বলেন মন নাসিকাগ্রে স্থির হলে কয়েকদিনের মধ্যেই লোকে আশ্চর্য সুগন্ধ লাভ করতে থাকবে; মন জিহ্বামূলে

স্থির হলে শব্দ শুনতে থাকবে ; জিহ্বাগ্রে স্থির হলে সমস্ত সুস্বাদ অনুভূত হয়, আর জিহ্বার মধ্যভাগে স্থির হলে মনে হয় কিসের সঙ্গে যেন যোগ ঘটছে ; মন যদি তালুতে স্থির হয়ে থাকে তো অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখা সুরু হয়। কারো মন অশান্ত থাকলেও এইসব যোগাভ্যাসের কোনোটা যদি গ্রহণ করতে চায়, অথচ তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় থাকে, তবে কিছুটা অভ্যাসের পরই ঐসব অনুভূতি হলে সংশয় দূর হবে এবং সে অধ্যবসায়ে অগ্রসর হবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬

৩৬॥ অথবা যে স্ব-দীপ্যমান জ্যোতি সমস্ত দুঃখের অতীত (তার ধ্যানের) দ্বারা।

এ হল আর এক প্রকার একাগ্রতা। হৃদয়পদ্মের কথা চিন্তা করো—দলগুলি নিম্নাভিমুখী এবং সেই পদ্মের মধ্য দিয়ে সুষুম্না প্রবাহিত; শ্বাস নাও, এবং শ্বাস বহির্গত করতে করতে মনে মনে কল্পনা করো—পদ্মটি তার দলগুলিসহ ঊর্ধ্ব-মুখীন হল এবং পদ্মটির মধ্যে বিরাজমান এক দীপ্যমান জ্যোতি। এই জ্যোতির ধ্যান করো।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭

৩৭ ॥ অথবা যে হৃদয় সমস্ত ইন্দ্রিয়-বস্তুতে সবরকম আসক্তি ত্যাগ করেছে (তার ধ্যানের দ্বারা)।

কোনো পবিত্র ব্যক্তি—কোনো মহাপুরুষের কথা মনে করো, যাকে তুমি ভক্তি করো, কোনো সাধু ব্যক্তি যাঁকে তুমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত বলে জানো, তাঁর হৃদয়ের কথা চিন্তা করো। যাঁর হৃদয় নিরাসক্ত হয়েছে, তাঁর কথা চিন্তা করো, এতে মন শান্ত হবে। তা যদি না করতে পারো তো অন্য পথ আছে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮

৩৮॥ নিদ্রায় যে জ্ঞানের উদয় হয় তার ধ্যান দ্বারা।

কখনো কখনো কেউ স্বপ্ন দেখে, দেবদূত তার কাছে চলে এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, এবং তখন সে মহা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আকাশে বাতাসে সে সুমধুর সঙ্গীত শুনছে। সেই স্বপ্নে তখন তার বড় শান্তি, জেগে ওঠার পর ঘটনাটা তার উপর বেশ একটা ছাপ ফেলে। সেই স্বপ্নকে সত্য বলে ভাবো এবং এই বিষয়েই ধ্যান করো। এটা যদি না পারো তোমার কাছে তৃপ্তিকর এমন কোনো পবিত্র কিছুর ধ্যান করো।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯

৩৯॥ সৎ বলে মনে ধরে এমন যে কোনো কিছুর ধ্যান দ্বারা।

এর দ্বারা নিশ্চয়ই কোনো অসৎ বিষয় বোঝাচ্ছে না, বরং তোমার খুশিমতোই যে কোনো সৎ বিষয়, তোমার সর্বাপেক্ষা পছন্দমতো ক্ষেত্র, ভাব-ভাবনা—যেটা তোমার মনকে একাগ্র করবে তার চিন্তা করো।

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০

৪০ ॥ যোগীর মন এই ধ্যান দ্বারা বাধামুক্ত হয় পরমাণু থেকে অনন্ত অবধি।

এই অভ্যাসের দ্বারা মন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তম পর্যন্ত সহজেই চিন্তা করতে পারে। এইভাবে মনঃতরঙ্গগুলি স্তিমিত হয়ে আসে।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু
তৎস্থ-তদঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ ॥ ৪১

৪১ ॥ যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরকম শক্তিহীন (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তার চিত্ত তখন শুদ্ধ স্ফটিক যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর সামনে ঐ বর্ণ ও আকার ধারণ করে সেই রকম গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুতে (আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

নিত্য ধ্যানের ফলে কি হয়? আমাদের মনে রাখতে হবে পূর্বেকার এক ভাষ্য-সূত্রে পতঞ্জলি ধ্যানের বহুরকম অবস্থার কথা বলেছেন—কেমন করে প্রথমাবস্থা হয় স্থূল, দ্বিতীয় অবস্থা হয় সূক্ষ্ম, এবং তা থেকেই আরো সূক্ষ্মতর বিষয়ে অগ্রগতি ঘটে। এইরকম ধ্যানের ফল হল, আমরা যেমন স্থূল বিষয়ে, তেমনই সূক্ষ্ম বিষয়েও সহজেই ধ্যান করতে পারি। যোগী এখানে তিনটি জিনিসকে দেখেন—গ্রাহক, গ্রহীতা ও গ্রহণযন্ত্রকে, অর্থাৎ তাদের অনুরূপ আত্মা, বিষয় এবং মনকে। ধ্যানের এই তিন রকমের বিষয় আমাদের দেওয়া হয়েছে। প্রথম, দেহ বা পার্থিব বিষয়ের মতো স্থূল জিনিস; দ্বিতীয়, মন বা চিত্তরূপী সূক্ষ্ম জিনিস; তৃতীয় সগুণাত্মক পুরুষ—পুরুষ (আত্মা) স্বয়ং নয়, তার অহঙ্কার। অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই সবরকম ধ্যানেই স্থিত হন। ধ্যানের সময় যোগী অন্য সব ভাবনাকে দূরে রাখতে পারেন, তাঁর ধ্যানের বিষয়ের (পাত্রের) সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান। ধ্যানকালে তিনি হন যেন এক স্ফটিকতুল্য। ফুলের সম্মুখে স্ফটিক হয়ে ওঠে ফুলের সঙ্গে একাত্ম-প্রায়। ফুলটি যদি লাল হয় তো স্ফটিকটিও লাল, বা ফুলটি যদি নীল হয় তো স্ফটিকটিও নীল।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২

৪২ ॥ ধ্বনি, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান একাকার হওয়াকে সবিতর্ক সমাধি (বলা হয়)।

শব্দ অর্থ এখানে কম্পন—স্নায়ু-প্রবাহ যা শব্দকে পরিচালনা করে; আর জ্ঞান হল প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যতরকম ধ্যানের কথা বলেছি পতঞ্জলি তাদের নাম দিয়েছেন সবিতর্ক (সপ্রশ্ন ধ্যান)। পরে তিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর ধ্যানের কথা বলেছেন। সবিতর্ক ধ্যানের মধ্যে কর্তা ও কর্মের দ্বৈতসত্তা থেকে যাচ্ছে—শব্দের মধ্যে অর্থ ও জ্ঞানের সংমিশ্রণের ফলেই এমনটা হচ্ছে। প্রথমে বহির্মুখী কম্পন অর্থাৎ শব্দ। অর্থপ্রবাহ দ্বারা তা অন্তর্মুখী হলে দেখা দিচ্ছে অর্থ। তারপর চিত্তে দেখা দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া-তরঙ্গ এবং তাই হল জ্ঞান; কিন্তু ঐ তিনের সংমিশ্রণকেই আমরা জ্ঞান বলে থাকি। এ পর্যন্ত সমস্ত ধ্যানেই আমরা ধ্যানের বিষয়সমূহের সংমিশ্রণ পেয়েছি। পরবর্তী সমাধি হল উচ্চতর।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩

৪৩॥ নির্বিতর্ক (প্রশ্নের অতীত) নামক সমাধি ঘটে স্মৃতি যখন বিশুদ্ধ থাকে অথবা নির্গুণ থাকে—কেবলমাত্র (ধ্যানবিষয়ক) অর্থই যখন প্রকাশিত হয়।

এই তিনটি ধ্যানের অভ্যাসের দ্বারাই আমরা এমন অবস্থায় উপনীত হতে পারি যেখানে তিনটি আর মিশ্রিত হয়ে পড়ে না। আমরা তাদের থেকে মুক্তি পেতে পারি। প্রথমেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করব এই তিনটি কি? এই চিত্ত রয়েছে; সব সময়ে মনঃ-উপাদানের সঙ্গে সরোবরের উপমাটি মনে রাখবে, সরোবরের উপরে সঞ্চালিত স্পন্দনের মতো কম্পন, শব্দ, ধ্বনি তার উপর তরঙ্গের মতো আসছে। তোমার মধ্যে ঐরূপ শান্ত সরোবর আছে। আমি একটা শব্দ বললাম—যেমন 'গোরু', তোমার কানের মধ্য দিয়ে যেই তা প্রবেশ করল তার সঙ্গ ধরে তোমার চিত্তে এক তরঙ্গের সৃষ্টি হল। ঐ তরঙ্গ হল গোরু ভাবটির প্রতীক বা আকার বা অর্থ যাই বলি না কেন। যথার্থই প্রতীয়মান গোরু হল অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ধ্বনি-কম্পনের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন তরঙ্গবিশেষ। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ মিলিয়ে যায়, কোনো শব্দ ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জানতে চাইতে পারো, কি করে তা হয়। আমরা যখন শুধুমাত্র গোরুর কথাই চিন্তা করব, কোনো শব্দ শুনি না। তুমি নিজেই শব্দটা করছ। তুমি তোমার মনের মধ্যেই ক্ষীণভাবে 'গোরু' বলছ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গটি আসছে। ধ্বনির প্রেরণা ছাড়া কোনো তরঙ্গ উঠতে পারে না; এবং তা বাইরের দিক থেকে না হলে ভিতরের দিক থেকে হয়েছে; আর, শব্দটি যখন মিলিয়ে যায়, তরঙ্গও মিলিয়ে যায়। থাকে কি? প্রতিক্রিয়ার ফল এবং সেটাই জ্ঞান। আমাদের মনের মধ্যে এই তিনটি এত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে আমরা তাদের পৃথক করতে সমর্থ হই না। শব্দ এলেই ইন্দ্রিয়তন্ত্রী কম্পিত হয়, প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে তরঙ্গ; তারা একের উপর অন্যটি এত ঘন ঘন এসে পড়ে যে তাদের আর অন্য থেকে আলাদা করা যায় না। বর্ণিত ধ্যানটি যখন বেশ কিছুকাল অভ্যাস করা হবে, তখন সমস্ত সংস্কারের ধারকরূপ স্মৃতি বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, এবং আমরা তাদের এককে অন্য থেকে স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হব। একেই বলে নির্বিতর্ক বা প্রশ্নবিহীন একাগ্রতা।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪

৪৪॥ এই পদ্ধতিতে, (মনঃসংযোগাদি) বিচারাত্মক ও বিচারশূন্যভাবে, এবং বিষয়াদি যার সূক্ষ্ম (তাও) ব্যাখ্যা করা হল।

পূর্ববর্তীটির মতোই সেই একই পদ্ধতির আবার প্রয়োগ হল, কেবলমাত্র পূর্ববর্তী ধ্যানাদির ক্ষেত্রে বিষয়াদি ছিল স্থূল, এখানে তা সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ-পর্যবসানম্ ॥ ৪৫

৪৫॥ সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রধানে এসে শেষ হয়।

স্থূল বস্তুগুলি হল উপাদান মাত্র এবং সেগুলি থেকেই সবকিছু উৎপাদিত হয়। সূক্ষ্ম বস্তুগুলির শুরু হয় তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম অংশ থেকে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি, মন, অহঙ্কার, মনঃভিত্তি (সমস্ত প্রকাশের কারণ), সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ উপাদানসমূহ নামক প্রধান

(মুখ্য), প্রকৃতি, বা অব্যক্ত (অপ্রকাশ)—এসবই সূক্ষ্ম বস্তুর শ্রেণীবিশেষের মধ্যে পড়ে, এর মধ্যে একমাত্র বাদ পড়ে পুরুষ।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ॥ ৪৬

৪৬॥ এইসব একাগ্রতা হল সবীজ।

এসব বিগত কর্মের বীজ ধ্বংস করে না, কাজেই মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু যোগীর কাছে তা কি এনে দেয় তা বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী ভাষ্যসূত্রে।

নির্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ॥ ৪৭

৪৭॥ অভেদাত্মক একাগ্রতার বিশুদ্ধীকরণ ঘটলে চিত্ত দৃঢ়ভাবে স্থিত হয়।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা॥ ৪৮

৪৮॥ তার মধ্যের জ্ঞানকে বলা হয় ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যদ্বারা পূর্ণ।

পরবর্তী ভাষ্যসূত্রেই এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ॥ ৪৯

৪৯॥ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা লভ্য জ্ঞান হল সাধারণ বিষয়ক। সদ্য উল্লিখিত সমাধি থেকে তা হল অনেক উচ্চ স্তরের, কারণ যেখানে অনুমান এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৌঁছতে পারে না তা সেখানেও যেতে পারে।

ভাবটি হল আমাদের সাধারণ বিষয়াদির জ্ঞান আহরণ করতে হবে প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা, এবং তা থেকেই অনুমানের দ্বারা, এবং যোগ্য লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা। 'যোগ্য লোক' বলতে যোগীরা সবসময়েই বোঝাতে চেয়েছেন ঋষিদের বা বেদাদিরূপ শাস্ত্রাদি-গৃহীত চিন্তাচেতনার দ্রষ্টাদের। তাঁদের মতে শাস্ত্রাদির একমাত্র প্রমাণ হল যোগ্য লোকের প্রত্যক্ষানুভব, তবু তো তাঁরাই বলেন যে শাস্ত্রাদি আমাদের সত্য অনুভবে পৌঁছে দিতে পারে না। সমগ্র বেদ পাঠ করেও আমাদের কোনো বোধের উদয় না হতে পারে। কিন্তু তাদের শিক্ষার বিষয় অভ্যাস করলে আমরা শাস্ত্রবাক্য বুঝবার মতো অবস্থায় উপনীত হতে পারি—যেখানে যুক্তি বা অনুভব বা অনুমান যেতে পারে না, যেখানে অন্যদের অনুমানও কাজে আসে না। এই হল ভাষ্যসূত্রটির অর্থ।

বোধই যথার্থ ধর্ম, বাকী সবটাই কেবলমাত্র প্রস্তুতি। বক্তৃতা শোনা, গ্রন্থ পাঠ করা বা যুক্তিবিচার কেবলমাত্র জমি প্রস্তুত করা, তা ধর্ম নয়। বুদ্ধি দিয়ে সমর্থন বা বিরোধ ধর্ম নয়। আমরা ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসি, ধর্মও তেমনি আরো তীব্রতর রূপে প্রত্যক্ষ অনুভবে লাভ করা যায়—যোগীদের (বক্তব্যের) এটিই হল কেন্দ্রীয় ভাব। ধর্মনিহিত যে সত্য হল ঈশ্বর বা আত্মা তা বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না। ঈশ্বরকে আমি আমার চোখ দিয়ে দেখতে পারি না, আমার হাত দিয়েও স্পর্শ করতে পারি না; এবং এটাও আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থার বাইরে গিয়ে আমরা যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি না। যুক্তি আমাদের সম্পূর্ণরূপেই অনিশ্চিত একটা বিন্দুতে এনে ছেড়ে দেয়;

সারাটা জীবন ধরে আমরা যুক্তিতর্কেই ব্যস্ত থাকতে পারি, তেমনটাই অবশ্য হাজার হাজার বছর ধরে সারাটা দুনিয়াই তা করে যাচ্ছে এবং তার ফলে আমরা ধর্মবিষয়ক সত্যকে প্রমাণও করতে পারছি না, বাতিলও করতে পারছি না। আমরা প্রত্যক্ষই যা অনুভব করছি তাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে থাকি এবং ঐ ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েই আমরা যুক্তি প্রয়োগ করি। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে যুক্তিকে অনুভবের সীমার মধ্যেই ঘুরতে হয়। তার বাইরে তা যেতে পারে না। বোধের সমগ্র ক্ষেত্রই তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির বাইরে। যোগীরা বলেন— মানুষ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের এবং যুক্তির বাইরে যেতে পারে। মানুষের মধ্যে আছে তার বুদ্ধির অতীত এক মৌলশক্তি এবং সেই শক্তি প্রত্যেক প্রাণী এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে। যোগাভ্যাসের দ্বারা ঐ শক্তি জাগ্রত হয় এবং মানুষ তখন তার যুক্তির সাধারণ সীমা পার হয়ে যায়, প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করে যুক্তিবহির্ভূত বহুরকম বিষয়।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০

৫০ ॥ এই সমাধি-জাত সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধক হয়।

আমরা পূর্ব ভাষ্যসূত্রে দেখেছি, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় পৌঁছবার একমাত্র উপায় হল একাগ্রতা, এবং আরো দেখেছি পূর্ব সংস্কারগুলি ঐ রকম একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক ; এটাও লক্ষ্য করেছি, যখনই আমরা মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করি আমাদের মন ঘুরে বেড়ায়। ঈশ্বরকে চিন্তা করতে চাইছ, আর ঠিক তখনই ঐসব সংস্কার এসে দেখা দেয়। অন্য সব সময়ে তারা এতটা সক্রিয় হয় না, কিন্তু যখনই তাদের চাইছ না, তারা আসবেই—তোমার মনের মধ্যে ভিড় জমাতে চেষ্টা করবে। তেমনই হয় কেন ? একাগ্রতা অভ্যাসের সময়েই তারা এতই সক্রিয় হয় কেন ? যেহেতু তুমি তাদের দমন করতে চাইছ না তাই তারা তাদের সমস্ত বল প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। অন্য সময়ে এই প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। এইসব পূর্বসংস্কার অসংখ্য, তারা সবাই চিত্তের কোথাও না কোথাও অবস্থান করছে—প্রস্তুত হয়ে আছে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ! আমাদের মনের একটিমাত্র ভাবকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যেই অন্য আর সবকে দমন করতে হবে। তারা ঐ একই কালে উপরে উঠে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। মনের একাগ্রতায় বাধা দেওয়ায় ক্ষেত্রে এমন বহুপ্রকার সংস্কার আছে এবং তাই যে সমাধির কথা বলা হল সেটিই সংস্কার দমনের কাজে প্রতাপশালী বলে সেই সমাধি অভ্যাস করাই সর্বোত্তম। এই জাতীয় একাগ্রতায় যে (নতুন) সংস্কার জাগ্রত হবে তা এতটা শক্তিশালী হবে যে তা অন্যগুলির ক্রিয়া-কাণ্ডে বাধা দেবে—তাদের দমন করে রাখবে।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১

৫১ ॥ এমনকি তাকেও (যে সংস্কার অন্যান্য সব সংস্কারকে রোধ করে তাকেও) রোধ করলেই—সমস্ত নিরুদ্ধ হলেই আসে 'নির্বীজ' সমাধি।

তোমাদের স্মরণ আছে, আমাদের লক্ষ্য হল আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আত্মাকে আমরা অনুভব করতে পারি না, কারণ তা প্রকৃতি, মন ও দেহের

সঙ্গে বিজড়িত। অজ্ঞেরা ভাবে তার দেহই আত্মা। পণ্ডিতেরা মনে করে তার মনই আত্মা। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত। কিন্তু ঐসবের সঙ্গে আত্মা বিজড়িত হয় কেন? চিত্তে বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গ জেগে উঠে আত্মাকে আবৃত করে, তরঙ্গের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র তার প্রতিচ্ছায়াটুকুই আমরা দেখতে পাই। তরঙ্গ যদি ক্রোধের হয় তো আত্মাকে দেখি ক্রুদ্ধ; লোকে যেমন বলে—'আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি।' তরঙ্গ যদি প্রেমের হয় তো আত্মাকে তার মধ্যেই প্রতিফলিত দেখি; আমরা বলি—'আমরা ভালবাসি।' তরঙ্গটি যদি দুর্বলতার হয়, আত্মা তার মধ্যেই ছায়া ফেলে, এবং আমরা ভাবি আমরা দুর্বল। এই সমস্ত রকম ভাবই আসে সংস্কার থেকে—আত্মার আচ্ছাদনরূপী সংস্কারাদি থেকে। চিত্তে একটিমাত্র তরঙ্গ থাকলেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না; সমস্ত তরঙ্গ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হবে না। তাই পতঞ্জলি ঋষি প্রথমত শিক্ষা দিয়েছেন তরঙ্গগুলির অর্থ কি; দ্বিতীয়ত, তাদের দমন করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি; তৃতীয়ত, কোন একটি তরঙ্গকে এমন ভাবে শক্তিশালী করা যাতে তা অন্য সব তরঙ্গকেই শান্ত করতে পারে—এ যেন অগ্নিই অগ্নিকে গ্রাস করছে। যখন একটিমাত্র তরঙ্গই থাকে, তাকেও শান্ত করা সহজ; ঐ একটিও যখন চলে যায় সেই সমাধিকে বলা হয় নির্বীজ সমাধি। তখন আর কিছুই থাকে না—কেবলমাত্র আত্মাই স্ব-রূপে বিরাজ করবে স্ব-মহিমায়। একমাত্র তখনই আমরা জানি যে আত্মা হল অবিমিশ্র একক; বিশ্বে তা-ই নিত্যকালীন একমাত্র একক, এবং সেজন্যেই তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তা অমর, অবিনশ্বর, নিত্যস্থায়ী চৈতন্যঘন সত্তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
একাগ্রতাঃ অভ্যাস

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১

১ ॥ তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধনা, অধ্যয়ন ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ হল ক্রিয়াযোগ।

আগের অধ্যায়ে যেসকল সমাধির কথা বলা হয়েছে তা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, তাই ধীরে ধীরে তাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রথম সোপান—প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক সোপানকে বলা হয় ক্রিয়াযোগ। শব্দটির বাচ্যার্থ হল কর্ম, যোগের অভিমুখে কর্ম। ইন্দ্রিয়গুলি যেন ঘোড়া, মন হল বল্গা, বুদ্ধি হল সারথি, আত্মা রথী এবং দেহ রথ। মানবাত্মা গৃহস্বামীরূপে, রাজারূপে এই রথে অধিষ্ঠিত। ঘোড়াগুলি প্রবল হলে বল্গায় সংযত থাকতে চায় না এবং বুদ্ধিরূপ সারথি যদি অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে না জানে তো রথের দুর্গতি ঘটবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ ঘোড়াগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হলে এবং বল্গা অর্থাৎ মন সারথিরূপী বুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকলে, রথ তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। তাহলে দুর্গতি বলতে কি বোঝাচ্ছে? দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনা করবার সময় দৃঢ়ভাবে বল্গা ধারণ করা—তাদের যদৃচ্ছা চলতে না দিয়ে উভয়কেই যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা। অধ্যয়ন: অধ্যয়ন দ্বারা এক্ষেত্রে কি বোঝায়? গল্প বা উপন্যাস পড়া নয়, যে গ্রন্থ আত্মার মুক্তিবিষয়ক শিক্ষা দেয় তাই পাঠ করা। এখানেও কিন্তু বিতর্কমূলক গ্রন্থপাঠ বোঝানো হচ্ছে না। যোগী বিতর্কমূলক অবস্থাটা বহু আগেই পার হয়ে এসেছেন। তিনি তৃপ্ত, ওসবে আর তাঁর রুচি নেই। তিনি শুধু তাঁর প্রত্যয়কেই ঘনীভূত করার জন্য পাঠ করেন। বাদ ও সিদ্ধান্ত: এই হল দুই রকমের শাস্ত্রজ্ঞান; বাদ হল যুক্তিমূলক, সিদ্ধান্ত হল নিশ্চয়াত্মক। কেউ একেবারেই অজ্ঞ হলে প্রথমটা তর্ক-যুদ্ধ করে, স্বপক্ষ-বিপক্ষ বিচার করে। তা শেষ করে সে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত—নিশ্চয়াত্মক শাস্ত্রজ্ঞান, সে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। সোজ সিদ্ধান্তে এলেই হবে না, তাকে ঘনীভূত করতে হবে। গ্রন্থ আছে কত অসংখ্য, কিন্তু সময় আছে অল্প; কাজেই জ্ঞানলাভের সঙ্গোপন সূত্র হল তার সারভাগকে গ্রহণ করা। ঐ সারটুকু গ্রহণ করে সেই আদর্শে বাঁচতে চেষ্টা করো। পুরানো এক ভারতীয় উপকথায় আছে তুমি যদি রাজহংসের কাছে এক বাটি জল-মেশানো দুধ দিয়েছ তো সে সমস্ত দুধটুকু খেয়ে নেবে, পড়ে থাকবে জল। বুদ্ধির কসরৎ প্রথমটায়ই দরকার হয়। কারণ, নিশ্চিতই অন্ধভাবে কোনও কিছুতে প্রবেশ করলে চলবে না। যোগী যুক্তিতর্কের অবস্থা পার হয়ে এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যা প্রস্তরের মতো সুদৃঢ়। তাঁর কাজ এবার কেবলমাত্র তার সিদ্ধান্তকে ঘনীভূত করা। তিনি বলেন—যুক্তিতর্কের মধ্যে যেও না; কেউ যদি তোমার উপর যুক্তি-বিচার চাপাতে চায় তো শান্তভাবে দূরে সরে যাবে, কারণ যুক্তি-বিচার মনের ভিতর কেবল গণ্ডগোলই সৃষ্টি করে। ধী বা বুদ্ধিকে কেবলমাত্র শিক্ষাদান করাটাই প্রয়োজন, শুধু শুধু তার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করায় কী লাভ? বুদ্ধি হল এক দুর্বল যন্ত্রের মতো, ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমিত জ্ঞানই সে দিতে পারে। কিন্তু যোগী চান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপারে যেতে, তাই

বুদ্ধির প্রয়োজন তাঁর কাছে নেই। তিনি তা নিশ্চিতভাবেই জানেন, তাই নীরব থাকেন, যুক্তি প্রয়োগ করেন না। প্রতিটি যুক্তিই মনের ভারসাম্য নষ্ট করে—চিত্তে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ব্যাঘাত নিশ্চয়ই দোষাত্মক। যুক্তিদান ও কারণ অনুসন্ধান হল পথপার্শ্বের বিষয়। তাদের চেয়ে ঢের বড় বড় জিনিস আছে। সমস্ত জীবনটাই স্কুলের ছাত্রের মতো মারামারি তর্কাতর্কি করবার জন্যে নয়। 'ঈশ্বরের কাছে কর্মফল সমর্পণ'-এ আমাদের প্রসংসারও কিছু নেই, নিন্দারও নয়, দুটোকেই প্রভুর কাছে সমর্পণ করে শান্ত থাকা চাই।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশ-তনূকরণার্থশ্চ ॥ ২

২॥ (তা) সমাধি—অভ্যাস এবং বেদনাবাহী ব্যাঘাতের হ্রাস করার (জন্য)।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মনকে করে তোলে নষ্ট ছেলের মতো—তাকে যা খুশি করতে দিই। তাই মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যে এবং তার আধিপত্য বিস্তারের জন্যে নিত্যই ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করা উচিত। নিয়ন্ত্রণশক্তির অভাবে যোগের ব্যাঘাত ঘটে এবং যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। একমাত্র মনকে বশীভূত করে ক্রিয়াযোগ মাধ্যমে সংযত রাখলেই তা দূরীভূত করা যায়।

অবিদ্যাঽস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩

৩॥ বেদনাবাহী ব্যাঘাতগুলি হল অজ্ঞতা, অহঙ্কার, আসক্তি, অশ্রদ্ধা ও জীবনাকর্ষণ।

এ সব হল পাঁচপ্রকারের বেদনা—আমাদের বন্ধনকারী পঞ্চপ্রকার রজ্জু এবং এদের মধ্যে অজ্ঞতাই হল অন্য চারপ্রকারের কার্যরূপের কারণ। এটাই আমাদের সর্বদুঃখের একমাত্র কারণ। এ ছাড়া আর কি বা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আত্মার স্বভাবই হল নিত্য শান্তি। এককমাত্র অজ্ঞতা, মিথ্যা দর্শন (ভুল দেখা), বিভ্রম ছাড়া কিই বা তাকে দুঃখিত করতে পারে? আত্মার সমস্ত দুঃখই কেবলমাত্র বিভ্রান্তি।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪

৪॥ অজ্ঞতাই হল পরবর্তী এইসবের জন্মক্ষেত্র, তারা নিষ্ক্রিয় বা কৃশতাপ্রাপ্ত, কোনো শক্তিদ্বারা অভিভূত বা প্রসারিত হোক না।

অজ্ঞানতার কারণ হল অহঙ্কার, আসক্তি, অশ্রদ্ধা, জীবনাকর্ষণ। এইসব সংস্কার বর্তমান থাকে বিভিন্নপ্রকার অবস্থায়। কখনো থাকে তারা নিষ্ক্রিয়। 'শিশুর মত সরল'—এই কথাটা তোমরা শুনে থাকবে। তবু শিশুর মধ্যেই তো দানবের অবস্থা বা দেবতার অবস্থা বর্তমান থাকতে পারে এবং তা ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে। যোগীর মধ্যে এই সব ছাপ—অতীত কর্মদ্বারা গঠিত এইসব সংস্কার কৃশ থাকে, অর্থাৎ বর্তমান থাকে খুবই সূক্ষ্ম অবস্থায়, আর সেসব তিনি সংযত করতে প্যারেন—প্রকাশ হতে দেন না। অভিভূত অর্থ কখনো কখনো কোনো একদল সংস্কার আরো শক্তিধর ব্যক্তিদ্বারা দমিত থাকতে পারে, কিন্তু ঐ দমনকারী কারণ সরে গেলে আবার প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পরিণত অবস্থা হল 'সম্প্রসারিত', সংস্কার-

সমূহ যখন অনুকূল পরিবেশে ভালো বা মন্দ যেরূপেই হোক বিরাটভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫

৫॥ অজ্ঞতা গ্রহণ করছে অনিত্যকে, অশুদ্ধকে, দুঃখদায়ককে এবং আত্মলয়তা যথাক্রমে গ্রহণ করছে নিত্যকে, বিশুদ্ধকে, আনন্দময়কে এবং আত্মাকে।

সমস্ত প্রকার সংস্কারেরই একই উৎস ; এবং তা হল অজ্ঞতা। প্রথমেই জানতে হবে অজ্ঞতা কি। আমরা সবাই ভাবি—'আমি হলাম দেহ, পবিত্র দীপ্তিপূর্ণ ও চিরশান্তিময় আত্মা নয়' এবং এটাই হল অজ্ঞতা। আমরা মানুষকে যখন চিন্তা করি তাকে দেখি শরীরীরূপে। এটা এক মহা বিভ্রান্তি।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাহস্মিতা ॥ ৬

৬॥ দর্শক যখন দর্শনযন্ত্রকেই তার সঙ্গে একাত্ম দেখেন তখন তাকে বলে অহঙ্কার।

প্রকৃত দর্শক হল আত্মা—পবিত্র, চিরশুদ্ধ, অনন্ত এবং অমর। এ হল মানবাত্মা। যন্ত্রগুলি কি? চিত্ত বা মনঃভিত্তি, বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মক শক্তি, মানস (মন) এবং ইন্দ্রিয়াদি। এইগুলি হল বহির্জগৎকে দেখবার যন্ত্র, এবং যন্ত্রাদির সঙ্গেই নিজেকে একাত্ম করাকেই বলা হয় 'অহঙ্কারের অজ্ঞতা'। আমরা বলি—'আমিই মন', 'আমার মনে হয়', 'আমি ক্রুদ্ধ' বা 'আমি সুখী'। আমরা ক্রুদ্ধ হই কেন, ঘৃণা করি কেন? যে আত্মার পরিবর্তন নেই, তার সঙ্গে আমাদের একাত্ম হতে হবে। আত্মা যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তা কখনো সুখী বা কখনো অসুখী হয় কী করে? তার তো আকার নেই, সে অনন্ত, সর্বত্রবিরাজমান। কে তাকে পরিবর্তিত করবে? সে নিয়মাতীত। কিসে তাকে প্রভাবিত করবে? বিশ্বজগতে এমন কিছু নাই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবু অজ্ঞতার প্রভাবে আমরা মনোবৃত্তির সঙ্গে তাকে একাত্ম করে ফেলি এবং মনে করি আমরাই সুখ বা দুঃখ অনুভব করছি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭

৭॥ যা সুখে স্থিত তাকেই বলে আসক্তি।

নির্দিষ্ট কিছু জিনিসে আমরা সুখ পাই, মন তাদের দিকে স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়, এবং তা যেন সুখকেন্দ্রের দিকে ধাবমান হয় ; একেই বলে আসক্তি। যেখানে আমরা সুখ পাই না সেখানে আমরা আসক্ত হই না। কখনো কখনো অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসেও আমরা সুখ পাই, কিন্তু নীতিগতভাবে তা একই। যেখানেই সুখ পাই, সেখানেই আসক্ত হই।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮

৮॥ যা দুঃখবেদনায় স্থিত তাই দ্বেষ।

যা আমাদের দুঃখবেদনা দেয় আমরা তক্ষুনি তা থেকে দূরে থাকতে চাই।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢোঽভিনিবেশঃ ॥ ৯

৯॥ জীবনাসক্তি হল স্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রবহমান এবং পণ্ডিতদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত।

এই জীবনাসক্তি দেখতে পাবে প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই। এর ভিত্তিতেই পরকাল বিষয়ক মতবাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে ; কারণ মানুষ জীবনকে এত ভালোবাসে যে ভবিষ্যতেও সে আর একটা জীবন কামনা করে। বলা বাহুল্য যে এই মতবাদের বিশেষ কোনো মূল্য নেই বটে, কিন্তু এর মধ্যের সবচেয়ে মজার বিষয় হল পাশ্চাত্য দেশে এই যে পরকালের জীবন-প্রসঙ্গটি এটি কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়। ভারতবর্ষে এই জীবনাকর্ষণই অতীত জীবন ও তার অভিজ্ঞতাকে প্রমাণের অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিজ্ঞতা থেকেই সমস্ত রকম জ্ঞানের উদ্ভব একথা যদি সত্য হয়, তবে তো এটাও নিশ্চয় যে, যে বিষয়ে আমাদের কোনোই অভিজ্ঞতা নেই তা তো আমরা কল্পনা করতে পারি না, বুঝতে পারি না! মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়ে এলেই তাদের খাবার খেতে শুরু করে। অনেক সময়েই দেখা গেছে হাঁসের ডিম মুরগীর তা দিয়ে ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চা হাঁসেরা জলের দিকে ছুটে যায়, আর মা-মুরগী ভাবে বাচ্চা বুঝি ডুবে মরে। অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হয়, বাচ্চা মুরগীরা খাবার খুঁটে খেতে শিখল কোত্থেকে বা বাচ্চা হাঁসেরা জানল কী করে যে জলই হল তাদের স্বাভাবিক আদি কারণ। যদি বলো তা প্রবৃত্তি, তাতে তো কিছুই বোঝাল না—ওটা কেবলমাত্র একটা শব্দ, ব্যাখ্যা নয়। আমাদের মধ্যে কত রকমের প্রবৃত্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের মধ্যে অনেকেই পিয়ানো বাজিয়ে থাকো, প্রথম যখন শিখেছিলে শাদা ও কালো ঘাটের উপর কত বিবেচনায় একের পর এক আঙুল ফেলতে হয়েছে, কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যাসের পর এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যখন কথা বলছ, তোমার আঙুলগুলি যন্ত্রের মতোই বাজিয়ে যাচ্ছে। তা হয়ে উঠেছে প্রবৃত্তি। তেমনটা আমাদের প্রত্যেক কাজের বেলায়ও আমরা করে থাকি। অভ্যাসের গুণে তা প্রবৃত্তি হয়—স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, আমরা যাদের স্বতঃস্ফূর্ত মনে করি তা হল বিকৃত কারণ। যোগীর ভাষায় প্রবৃত্তি হল অন্তর্ভূত কারণ। বিচারবুদ্ধি অন্তর্ভূত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কারে পরিণত হয়। কাজেই এমন ভাবাটা একেবারেই যুক্তিসম্মত যে এ জগতে যা কিছুকে আমরা প্রবৃত্তি বলি, তা হল সোজাসুজি অন্তর্ভূত কারণ। অভিজ্ঞতা ছাড়া যেহেতু কারণ বোধ (যুক্তিবোধ) ঘটে না, সেই হেতুই হল অতীত অভিজ্ঞতার ফল। মুরগীর বাচ্চারা চিলকে ভয় পায়, হাঁসের বাচ্চারা জল ভালোবাসে—এসব হল অতীত অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্ন হল ঐ অভিজ্ঞতা কি নির্দিষ্ট এক আত্মারই অধিকারভুক্ত, না স্রেফ দেহের ; হাঁসের বাচ্চার ভিতরে যে অভিজ্ঞতা দেখা দেয় তা কি তার পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতা অথবা হাঁসের বাচ্চার নিজেরই অভিজ্ঞতা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরা এই মত পোষণ করেন যে এই অভিজ্ঞতার অধিকারী হল দেহ ; কিন্তু যোগীদের অভিমত হল মনের অভিজ্ঞতাই দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। একেই বলে পুনর্জন্মবাদ।

আমরা দেখেছি আমাদের সমস্ত জ্ঞানই—তাকে আমরা অনুভব, যুক্তি বা প্রবৃত্তিই বলি—সে সব অভিজ্ঞতার পথ ধরে আসতেই হবে ; এবং আমরা যাকে

এখন প্রবৃত্তি বলি তা হল পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরিণাম—বিকৃতরূপেই প্রবৃত্তি হয়েছে, ঐ প্রবৃত্তিই আবার বিকৃতরূপে হয়ে পড়ে যুক্তি। সমস্ত জগতেই এমনটা হচ্ছে; এবং এর উপরেই ভারতে পুনর্জন্মের এক প্রধান যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা প্রকার শঙ্কার বারংবার অভিজ্ঞতা কালক্রমে সৃষ্টি করে জীবনাকর্ষণ। সেই জন্যেই কোনো শিশু প্রবৃত্তিবশতই ভয় পায়, কারণ বেদনার অতীত অভিজ্ঞতা তার মধ্যে বর্তমান আছে। এমনকি যে মহা পণ্ডিত ব্যক্তি জানেন যে এই দেহ থাকবে না, যাঁরা বলেন—'ভাবনার কিছুই নাই, আমরা শত সহস্র দেহ ধারণ করব, কিন্তু আত্মা অমর'—এমন কি তাঁরাও তাঁদের সমস্ত বুদ্ধিসিদ্ধ প্রত্যয় নিয়েও জীবনের প্রতি বড় আকৃষ্ট। জীবনের প্রতি এত আকর্ষণ কেন? আমরা দেখছি তা হয়ে পড়েছে প্রবৃত্তিজাত। যোগীদের ভাষায় তা হয়েছে সংস্কার। সূক্ষ্ম ও সংগুপ্ত সংস্কার চিত্তে সুপ্ত থাকে। মৃত্যুবিষয়ক অতীত অভিজ্ঞতা—যা কিছুকেই আমরা প্রবৃত্তি বলি তা হল অবচেতন অভিজ্ঞতা। চিত্তে তা অবস্থান করে, নিষ্ক্রিয় থাকে না, তলে তলে কাজ করে।

চিত্তবৃত্তির—মনঃতরঙ্গাদির যা স্থূল আমরা বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি, সেসব সহজেই নিয়ন্ত্রণও করা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি? তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? যখন ক্রুদ্ধ হই, সমস্ত মন হয়ে ওঠে এক প্রকাণ্ড ক্রোধতরঙ্গ। আমি তা অনুভব করছি, দেখছি, অধিকারে আনছি, এবং তাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণও করতে পারি; কিন্তু যে পর্যন্ত না আমি অন্তর্নিহিত কারণের তলদেশে নামতে পারব, সংগ্রামে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারব না। কোনো লোক খুব কর্কশ কিছু আমাকে বলল, আমি অনুভব করছি যে আমি গরম হয়ে উঠছি—সেও চালিয়ে যাচ্ছে আমি যে পর্যন্ত না একেবারে রেগে উঠি, আত্মবিস্মৃত হই—ক্রোধের সঙ্গেই নিজেকে একাত্ম করে তুলি। লোকটি প্রথমটায় যখন ভর্ৎসনা শুরু করেছিল, আমি মনে করেছি "এবারে আমি রেগে উঠছি।" তখন রাগ (ক্রোধ) থাকে এক, আমি আর এক, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি, আমিই হয়ে পড়ি ক্রোধ। এসব অনুভবকে তাই বীজের মূলেই সূক্ষ্মরূপেই দমন করতে হয়—এমনকি তারা আমাদের উপর কাজ করছে সে প্রসঙ্গে সচেতন হবার আগেই। এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার কথা অর্থাৎ যে অবচেতন অবস্থা থেকে তারা বেরিয়ে আসে সে অবস্থা সম্পর্কে মানবজাতির অধিকাংশ লোকেরই কোনো জ্ঞান নেই। জলাশয়ের তলা থেকে যখন একটি বুদ্বুদ জেগে উঠতে থাকে আমরা তা দেখতে পাই না, এমনকি উপরিভাগের কাছাকাছি যখন আসে তখনো না; যখন ফেটে গিয়ে মৃদু এক ঢেউ সৃষ্টি করে কেবলমাত্র তখনি জানি যে ওখানে একটি বুদ্বুদ রয়েছে। সূক্ষ্ম কারণের অবস্থায় থাকা কালেই যদি তাদের ধরতে পারি কেবলমাত্র তখনি তাদের আয়ত্তে আনতে পারব, কিন্তু তাদের ধরতে না পারা পর্যন্ত, তারা স্থূলাকার গ্রহণ করবার আগেই দমন না করতে পারলে কোনো বৃত্তিকেই সম্পূর্ণভাবে জয় করার কোনোই আশা নেই। আমাদের বৃত্তি-সমূহকে দমন করতে হলে তাদের গোড়া থেকেই করতে হবে; একমাত্র তখনি আমরা তাদের বীজ ভস্মীভূত করতে সমর্থ হব। ভর্জিত বীজ যেমন মাটিতে ছড়ালেও কখনো গজিয়ে ওঠে না, তেমনি এই বৃত্তিগুলিও কখনোই আর জেগে উঠতে পারবে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০

১০ ॥ সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহকে জয় করতে হয় তাদের কারণাবস্থায়।

যে সকল সূক্ষ্ম ছাপ পরে স্থূলাকারে প্রকাশ পায় তারা হল সংস্কার। এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে কেমন করে দমন করতে হয়? ক্রিয়াফলকে কারণে রূপান্তরিত করে। চিত্ত হল ক্রিয়াফল, তা যখন অস্মিতা বা অহঙ্কাররূপী কারণে রূপান্তরিত হয়, কেবলমাত্র তখনি তার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিও মরে যায়। কেবল ধ্যানেই এসব ধ্বংস করতে পারে না।

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ॥ ১১

১১ ॥ ধ্যানদ্বারা তাদের স্থূল রূপান্তরকে বর্জন করা যায়।

তরঙ্গের উত্থানকে দমন করার এক মস্ত বড় উপায় হল ধ্যান। ধ্যানের দ্বারাই মা এসব তরঙ্গকে দমন করতে পারে; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধ্যানাভ্যাস করতে থাকো,—যে পর্যন্ত না ধ্যান তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিনে না ধ্যান নিরপেক্ষভাবে স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে আসে। তখন ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ন্ত্রিত ও দমিত হবে।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২

১২ ॥ 'কর্মাধার'-এর মূল নিহিত রয়েছে এই বেদনাবাহী বাধাগুলির মধ্যে এবং তাদের অভিজ্ঞতা এই দৃশ্যমান জীবনে বা অদৃশ্য জীবনে ফল প্রসব করে।

কর্মাধার বলতে বোঝায় সংস্কারগুলির যোগফল। যে কাজই আমরা করি, মন তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, কাজ শেষ হলেই আমরা ভাবি তরঙ্গটি চলে গেল। না, তুই কেবলমাত্র সূক্ষ্মাকার ধারণ করে সেখানেই থেকে যায়। কাজটার কথা চিন্তা করতেন তা আবার উপরে উঠে আসে তরঙ্গরূপে। কাজেই তা ঐখানেই ছিল, যদি না থাকত তো স্মৃতিও থাকত না। এইভাবেই প্রতিটি ক্রিয়া, প্রতিটি চিন্তা তা ভালোই হোক বা মন্দই হোক, নিচে তলিয়ে যায়, সূক্ষ্মরূপে সঞ্চিত থাকে। সুখের চিন্তা বা দুঃখের চিন্তা দুটোকেই বলা হয় বেদনাবাহী বাধা; কারণ যোগীদের মতে তারা পরিণামে দুঃখ-বেদনাই বহন করে। সমস্ত উপভোগই আমাদের মধ্যে আরো তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে, তার ফলে দুঃখ আসে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই; সে কেবলি আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। যখন কোনো এক ক্ষেত্রে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয়, দুঃখের সৃষ্টি হয়। ভালো-মন্দ সমস্ত সংস্কারের যোগফলকেই যোগীরা বলেছেন বেদনাবাহী বাধা—ওগুলি আত্মার মুক্তিপথে বাধা সৃষ্টি করে।

আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের সূক্ষ্মমূলরূপী সংস্কারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে; ওগুলি হল কারণ এবং ওগুলিই আবার কার্যফলরূপে দেখা দেবে, এজন্মেই হোক বা আগামী জন্মেই হোক। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে সংস্কার যেখানে বিশেষ প্রবল, তাড়াতাড়িই ফল দেখা দেয়; ব্যতিক্রমজনক পাপ বা পুণ্যের কাজ ইহজীবনেই ফল প্রসব করে। যোগীরা মনে করেন যারা সৎসংস্কারের মহাশক্তি অর্জনে সমর্থ তাদের মৃত্যু হয় না, বরংএমনকি এই জীবনেই তাদের দেহকে দেবদেহে রূপান্তরিত করতে পারেন। এমন কিছু দৃষ্টান্ত

যোগীরা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এঁরা তাঁদের দেহ-উপাদানকেই পরিবর্তিত করতে পারেন ; তাঁরা অণু-পরমাণুগুলিকে এমনধারা নতুন সন্নিবেশ ঘটাতে পারেন যে তাদের আর অসুস্থতা থাকে না এবং আমরা যাকে মৃত্যু বলি তাদের কাছে সেই মৃত্যু আসে না। তা হবে না কেন? খাদ্যের শারীরতাত্ত্বিক অর্থ হল সূর্যাগত শক্তির সমন্বয় বা সামঞ্জস্যীকরণ। শক্তি এসে পৌঁছেছে বৃক্ষলতায়, তারপর খেয়েছে কোনো প্রাণী, এবং সেই প্রাণীকে খেয়েছে মানুষ। এর বৈজ্ঞানিক দিকটা হল যে সূর্য থেকে এতটা শক্তি আহরণ করে তা আমাদেরই অংশীভূত করেছি। তাই যদি হয়, শক্তি সুসমসঞ্জসরূপে গ্রহণ করার একটিমাত্রই পথ থাকবে কেন? তরুলতার পন্থা তো ঠিক আমাদের পন্থা নয় ; পৃথিবীর ক্ষেত্রে শক্তি আহরণের.ও সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিটাও মানুষের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। তবে সকলেই শক্তি আহরণ করে কোনো না কোনো প্রকারে। যোগীরা বলেন তাঁরা একমাত্র মনের জোরেই শক্তি আহরণ করতে সক্ষম, সাধারণ ধরনের কোনোরকম পদ্ধতির সাহায্য ছাড়াই তাঁদের ইচ্ছামতো শক্তি আহরণ করতে পারেন। মাকড়শা নিজের দেহপদার্থ থেকেই তন্তুজাল সৃষ্টি করে এবং নিজেই তাতে আবদ্ধ হয়ে তন্তুজালের বাইরে আর কোথাও যেতে সক্ষম হয় না, আমরাও তেমনি আমাদের দেহপদার্থ থেকেই স্নায়ুরূপী তন্তুজাল সৃষ্টি করেছি এবং ঐ স্নায়ুপথ বাদ দিয়ে কোনো কাজই করতে পারি না। যোগীরা বলেন—আমাদের ঐ রকম বন্ধনের প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপভাবেই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে আমরা তড়িৎশক্তি পাঠাতে পারি তবে তারের মধ্যেই পাঠাতে হবে। প্রকৃতি কিন্তু প্রবল প্রচণ্ড তড়িৎ পাঠাতে পারে কোনো তারের সাহায্য ছাড়াই। আমরা অমনটা পারি না কেন? তা, আমরা মানস-তড়িৎ প্রেরণ করতে পারি। আমরা যাকে মন বলি তা তো এই তড়িতের মতোই। আমাদের স্নায়ুরসে যে কিছু পরিমাণ তড়িৎ আছে এটা তো স্পষ্ট, এককেন্দ্রমুখী করলেই তা সমস্ত তড়িৎ নির্দেশাদি দান করে থাকে। আমরা কেবলমাত্র এই স্নায়ুপ্রণালীর মধ্য দিয়েই তড়িৎ প্রেরণ করতে পারি। ঐ রকমের সহায়তা ছাড়াই মানস-তড়িৎ কেন পাঠাতে পারি না? যোগীরা বলেন তা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব এবং বাস্তব-সম্মত ; এবং তা যখন করতে পারবে, বিশ্ব জুড়ে তোমার ক্রিয়া চলবে। স্নায়ু-ব্যবস্থার সহায়তা ছাড়াই যে কোনো স্থানের যে কোনো লোকের সঙ্গেই কাজ করতে পারবে। এই প্রণালী মাধ্যমে আত্মা যখন কাজ করে, আমরা বলি সে বেঁচে আছে (বাঁচার মতো বেঁচে আছে)। যখন ঐ প্রণালীগুলি কাজ করে না, লোককে বলা হয় মৃত (বেঁচেও মরে আছে)। আর, ঐ প্রণালীগুলির সহায়তায় বা সহায়তা ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম হয়, তাঁর কাছে জন্ম ও মৃত্যুর কোনো অর্থই থাকে না। বিশ্বের সমস্ত দেহই তন্মাত্র দ্বারা গঠিত, তফাতটা কেবল তন্মাত্রের বিন্যাসে। তুমি যদি ব্যবস্থাপক হও তো একটা দেহকে এভাবে বা ওভাবে বিন্যস্ত করতে পারো। তুমি ছাড়া এই দেহকে কে আর গঠন করে? খাদ্যটা কে গ্রহণ করে? তোমার সপক্ষে অন্য কেউ যদি খাবারটা খেত, কদিন আর বেঁচে থাকতে? খাদ্য থেকে কে রক্ত তৈরী করে? নিশ্চয়ই তুমি। কে রক্তকে নির্মল করে শিরাপথে

সঞ্চালিত করে? তুমি। আমরাই আমাদের দেহের প্রভু এবং আমরা তার মধ্যে বাস করি। আমরা শুধু তাকে উচ্চারিত করতে জানি না। আমরা হয়ে পড়েছি ইচ্ছানিরপেক্ষ—বিকৃত। আমরা তার অণু-পরমাণুগুলিকে ঠিকমতো সাজাবার পদ্ধতিটা ভুলে গেছি। কাজেই আমরা যা ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে করে থাকি, তাকে সচেতনভাবে করতে হবে। আমরাই প্রভু, আমাদেরই ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; এবং যখনি তা করতে পারব, ইচ্ছামতোই দেহকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হব, তখনি আমাদের সুখও থাকবে না, মৃত্যুও নয়।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩

১৩॥ মূল সেখানে থাকার জন্যেই ফল দেখা দেয় প্রজাতি, জীবন ও সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা (আকারে)।

মূল অর্থাৎ কারণাদি অর্থাৎ সংস্কারাদি সেখানে থাকার জন্যে তারা প্রকাশিত হয় এবং ফলাকারে দেখা দেয়। কারণ মরে গিয়ে তা ফল হয়; ফল সূক্ষ্মতর হতে হতে পরবর্তী ফলে কারণ হয়। গাছ ফল বহন করে, সেই ফল অন্যগাছের কারণ হয়, এমনিভাবে চলতে থাকে। আমাদের এখনকার সব কর্মই হল অতীত সংস্কারের ফল; আবার এই কর্মই সংস্কারে পরিণত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মের কারণ হবে, এবং এমনিভাবেই চলতে থাকবে। সেজন্যেই উল্লিখিত ভাষ্যসূত্রে বলা হয়েছে—যেহেতু কারণ বর্তমান, কার্য (ফল) হবেই। এই কর্মফল প্রথমে দেখা দেবে প্রজাতিরূপে; কেউ হবে মানুষ, কেউ দেবতা, কেউ বা জানোয়ার, কেউ বা দানব। তারপর জীবনে কর্মের বহুরকম ফল থাকে। কেউ বাঁচে পঞ্চাশ বৎসর, কেউ শত বৎসর, কেউ বা দুই বৎসর মাত্র—পূর্ণ বয়স্কও হতে পারে না। এইসব পার্থক্য অতীত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেউ জন্ম নেয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে। সে যদি বনে গিয়ে লুকিয়েও থাকে, সুখ তার পিছুপিছু যাবে। আবার, অন্য কেউ যেখানেই যাক, দুঃখ তার সঙ্গ ছাড়বে না। এসব তাদের অতীত জীবনেরই কর্মফল। যোগদর্শন অনুসারে সমস্ত রকম পুণ্যকর্মই সুখ আনে, পাপকর্ম আনে দুঃখ। যে কেউই অপকর্ম করে তাকে দুঃখরূপ ফল পেতে হবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪

১৪॥ পুণ্য ও পাপ ওদের কারণ হওয়ার জন্যে ওদের ফলও যথাক্রমে হয় আনন্দ ও দুঃখ।

পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ
দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫

১৫॥ বিচারশীলের (বিবেকীর) কাছে সবই যেন দুঃখজনক হয়—পরিণামে দুঃখদায়ক হওয়ার কারণে বা সুখভোগ হ্রাসের আশঙ্কায় বা সুখ-সংস্কার জনিত নতুন তৃষ্ণা উৎপাদনের কারণে এবং গুণবৃত্তির প্রত্যাঘাতের কারণে।

যোগীরা বলেন, বিচারশক্তিশীল ব্যক্তি, সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের ভিতর দেখতে পারেন, তারা জানেন ওসব সকলের জীবনেই এসে থাকে, এক দেখা দিয়ে

অন্যের মধ্যে বিলীন হয়, এবং জানেন যে লোকে সর্বদা সর্বত্র সমভাবে জীবন চালিয়ে থাকে—কখনোই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার বলেছিলেন: প্রতিমুহূর্তেই আমাদের এই জগতের দিকে দিকে কতলোক মারা যাচ্ছে। তবু আমরা ভাবি আমরা কখনো মরব না—এটাই হল সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার। চতুর্দিকের মূর্খের মধ্যে বাস করে আমরা ভাবি আমরা হলাম একমাত্র ব্যতিক্রম—একমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তি। সমস্ত রকম চটুল অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে আমরা ভাবি আমাদের ভালোবাসাই একমাত্র ভালোবাসা। কিন্তু তা কি করে হবে? এমনকি ভালোবাসাও তো স্বার্থসন্ধী; যোগীরা তাই বলেন—এমনকি স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তানের জন্য ভালোবাসা, বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। অবক্ষয় এই জীবনের সবকিছুকেই গ্রাস করে। যখন সবকিছুই এমনকি ভালোবাসাও চকিতে বিফল হয়ে পড়ে, লোকে তখন বুঝতে পারে এই জগৎ কত ব্যর্থ, কী স্বপ্নবৎ! তখনই সে বৈরাগ্যের চকিত দর্শন পায়, লোকাতীতের চকিত আভাস পায়। কেবল এই জগৎ পরিবর্জন করলেই অন্য জগৎ দেখা দেয়, এই জগৎকে ধরে রেখে কখনোই নয়। এখন পর্যন্ত এমন কোন মহাপুরুষ নেই যাঁকে মহত্ত্বলাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ও উপভোগকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষই দুঃখের কারণ—একটা একদিকে আকর্ষণ করছে, অন্যটা অন্যদিকে এবং তাতে চিরসুখ অসম্ভব করে তুলছে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥১৬

১৬॥ যেসব দুঃখ এখনো দেখা দেয়নি, তাদের সরিয়ে রেখে চলতে হবে।

কতকগুলি ক্রিয়া আমরা আগেই করেছি, কিছু ক্রিয়া বর্তমানে করছি, কতকগুলি ভবিষ্যতে ফলরূপে দেখা দেবার অপেক্ষায় আছে। প্রথম প্রকার অতীত হয়ে গেছে—চলে গেছে। দ্বিতীয় প্রকার কাজে রূপ দিতে হচ্ছে; একমাত্র এটাই ভবিষ্যতে কর্ম ফলরূপে দেখা দেবার অপেক্ষায় আছে এবং এটির লক্ষ্যেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, জয় করতে হবে। সংস্কারসমূহকে দমন করে তাদের করুণাবস্থায় পরিণত করতে হবে—পতঞ্জলির অভীষ্ট অর্থ এমনটাই।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥১৭

১৭॥ যাকে এড়িয়ে চলতে হবে তার কারণ হল হল দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের সংযোগ।

দ্রষ্টা কে? মানবাত্মা—পুরুষ। দ্রষ্টব্য কি? মন থেকে শুরু করে স্থূল পদার্থ পর্যন্ত সমস্ত প্রকৃতি। এই পুরুষ ও মনের সংযোগ থেকেই উদ্ভূত হয় যত সুখ ও দুঃখ। নিশ্চয়ই মনে আছে, (প্রাসঙ্গিক) দর্শন অনুসারে পুরুষ হল পবিত্র, শুদ্ধ; প্রকৃতিতে যুক্ত ও প্রতিবিম্বিত হলেই সুখদুঃখ বোধ হয়।

প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮

১৮॥ অভিজ্ঞতা (অভিজ্ঞ ব্যক্তি) উপাদান (বস্তু) ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গঠিত, তার স্বভাব হল প্রকাশ, ক্রিয়া ও জড়তা; এবং এসব (অভিজ্ঞতা গ্রহণকারীর) অভিজ্ঞতার ও অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

অভিজ্ঞতার বিষয় হল নিখিল প্রকৃতি এবং তা উপাদান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত। উপাদান হল স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে যা সমস্ত প্রকৃতিকে গঠন করে, ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি হল ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদি এবং তার অভিব্যক্তি হল সত্ত্ব, ক্রিয়া হল রজঃ, জড়তা হল তমঃ। নিখিল প্রকৃতি কি উদ্দেশ্যে বর্তমান ? পুরুষ যাতে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। পুরুষ যেন তার দেবস্বভাব বিস্মৃত হয়েছে। একটি গল্পে আছে: দেবরাজ ইন্দ্র একবার শূকর হয়ে কাদা ঘাটছিলেন, তাঁর এক শূকরীও ছিল, বহু বাচ্চাকাচ্চাও; এবং (সবাইকে নিয়ে) তিনি বেশ সুখেই ছিলেন। তারপর কয়েকজন দেবতা তাঁর দুর্দশা দেখে তাঁর কাছে এসে বলল—'আপনি হলেন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, সমস্ত দেবতাই আপনার শাসনাধীন। আপনি এখানে কেন ?' ইন্দ্র কিন্তু জবাব দিলেন—'কিছু ভেবো না, এখানে আমি বেশ আছি; আমার যখন এই শূকরী রয়েছে আর বাচ্চাকাচ্চাগুলিও রয়েছে, স্বর্গের কী দরকারটা আমার ?' বেচারা দেবতারা তো হতবুদ্ধি। তারপর দেবতারা স্থির করল সমস্ত শূকরদেরই একে একে হত্যা করবে। সব শূকরগুলিই মারা গেলে (শূকররূপী) ইন্দ্র বড়ই শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। দেবতারা এবার তাঁর শূকরদেহ কেটে দুভাগ করে ফেলতেই ইন্দ্র বেরিয়ে এসে হাসতে লাগলেন—তিনি বুঝলেন, এক দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র—হয়েছিলেন শূকর, আর ভেবেছিলেন শূকর-জীবনই হল একমাত্র জীবন! কেবল তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেই শূকর-জন্ম হোক! পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লে সে বিস্মৃত হয় যে সে হল শুদ্ধ ও অনন্ত-অসীম। পুরুষ তো ভালবাসে না, সে নিজেই ভালোবাসা। সে জীবন ধারণ করে না, সেই হল জীবন—সত্তা। আত্মা জ্ঞান আহরণ করে না, আত্মাই হল জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা ভালবাসে, আত্মার অস্তিত্ব আছে, আত্মার জ্ঞান আছে—এমনটা বলা ভুল। ভালোবাসা (প্রেম), অস্তিত্ব, জ্ঞান এসব পুরুষের গুণ নয়, তার নিগূঢ় স্বরূপ। মহান আত্মা অনন্ত পুরুষ, জন্মমৃত্যুহীন, স্বরূপে স্বমহিমায় বিরাজমান। কিন্তু বিকৃতিটা এতদূর গেছে যে তাকে (কাউকে) গিয়ে বলো—'তুমি শূকর নও।' অমনি সে চিৎকার করতে করতে তোমাকে কামড়াতে থাকবে।

তেমনি মায়ায়, এই স্বপ্নজগতে আমাদের সকলেরই সেই অবস্থা: এখানে কেবল দুঃখ, ক্রন্দন, চীৎকার; যেখানেই দু-একটি স্বর্ণগোলক গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানেই তার জন্যে ছোটাছুটি কাড়াকাড়ি। তুমি তো (আসলে) নিয়মবদ্ধ নও, প্রকৃতির বন্ধন তো তোমার জন্যে কখনোই নয়। যোগীরা তাই বলেন। এসব জানবার জন্যে ধৈর্য ধরো। যোগীরা দেখিয়ে দিচ্ছেন পথ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বেরোয়। তোমাকে এই সবরকম অভিজ্ঞতাই লাভ করতে হবে, যত দ্রুত পারো শেষ করো। আমরা এই মায়া-জালে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছি, তা থেকে বেরুতে হবে। আমরা ফাঁদে আটকে পড়েছি, আমাদেরকেই মুক্ত হবার কাজ শেষ করতে হবে। তাই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করো—এই স্বামীরূপী, স্ত্রীরূপী, শিশুসন্তানরূপী যত অভিজ্ঞতা; যদি কখনোই বিস্মৃত না হও তুমি কে, তবে বিনা বিঘ্নেই পার হয়ে যাবে। কখনোই বিস্মৃত হয়ো না। এসব হল কেবলমাত্র ক্ষণকালীন অবস্থা এবং এসব পার হতে হবে। অভিজ্ঞতা—এই সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা হল মহা শিক্ষক, কিন্তু জানবে তা

অভিজ্ঞতা মাত্র। তা স্তরে স্তরে এমন ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়—যেখানে সবকিছুই ছোট হয়ে যায় এবং পুরুষ হয়ে ওঠে এত বিরাট যে সমস্ত বিশ্বজগৎকেই মনে হয় সমুদ্রে এক বিন্দুমাত্র এবং নিজের নগণ্যতার কারণেই তা বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের অবশ্যই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, কিন্তু কখনোই যেন আদর্শকে না ভুলি।

বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বানি ॥ ১৯

১৯ ॥ গুণের অবস্থাদি হল নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, চিহ্নমাত্র এবং অচিহ্নিত।

যোগব্যবস্থা সম্পূর্ণতই সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমাদের তা আগেই বলেছি; এখানে আবার সাংখ্যদর্শনের জগৎসৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে প্রকৃতি হল বিশ্বজগতের উপাদান ও প্রধান কারণ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—প্রকৃতিতে তিনপ্রকার উপাদান বর্তমান, তমঃ উপাদান হল যা অন্ধকার, যা জ্ঞাননিহিত, যা গুরু (ভারী)। রজঃ হল ক্রিয়াশীলতা। সত্ত্ব হল প্রশান্তি, দ্যুতি। সৃষ্টিকাণ্ডের পূর্বেকার প্রকৃতিকে সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন অব্যক্ত, অনির্দিষ্ট (অবিশেষ) বা আকস্মিক। অর্থাৎ যেখানে কোনোরকমেই আকারগত নামগত পার্থক্য নেই,—যেখানে তিনরকম (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) উপাদানই সুসমভাবে বর্তমান। তারপর ঐ সুসম ভাবৈক্য বিচলিত হয়ে তিনরকম উপাদান মিলিত মিশ্রিত হতে লাগল বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতিতে এবং তারই পরিণামে এই বিশ্বজগৎ। প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে কিন্তু এই তিন উপাদান বর্তমান। সত্ত্ব উপাদান প্রধান হলে জ্ঞান আসে, রজঃ প্রধান হলে কর্মক্ষমতা (বা ক্রিয়াশীলতা); আর তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয় জড়তা, অলসতা ও অজ্ঞানতা। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে এই ত্রি-উপাদানে গঠিত প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ হল—যাকে তাঁরা বলেন মহৎ বা বুদ্ধি অর্থাৎ সর্বজনীন বুদ্ধি, এবং প্রত্যেকটি মানববুদ্ধি হল তারই এক এক অংশবিশেষ। সাংখ্য মনোদর্শনে স্পষ্ট বিভেদ রাখা হয়েছে মানস অর্থাৎ মনঃ-ক্রিয়া এবং বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিজাত ক্রিয়ার মধ্যে। মনঃ-ক্রিয়ার কাজ হল সংস্কারগুলিকে সংগ্রহ করে বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যক্তিক মহতের কাছে উপস্থাপিত করা—ব্যক্তিক মহৎই তখন তাকে বিশেষিত করে তোলে। মহৎ থেকেই আসে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকেই আবার সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ। সূক্ষ্ম উপাদানগুলি সম্মিলিতরূপে হয় বাহিরের স্থূল উপাদান—বহির্বিশ্ব। সাংখ্যদর্শনের দাবি হল বুদ্ধি থেকে শুরু করে প্রস্তরখণ্ড পর্যন্ত সকলই একই পদার্থ থেকে উৎপাদিত হয়েছে—তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বা স্থূল অবস্থার অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম অবস্থা হল কারণ, স্থূল হল ফল। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী সমস্ত প্রকৃতির বাইরে রয়েছেন পুরুষ, তিনি কোনোরকমেই বাস্তবিক (অর্থাৎ বস্তু বা পদার্থ) নন। বুদ্ধি, মন বা তন্মাত্রা বা স্থূল পদার্থ—এমন কোনো কিছুরই সমরূপ তিনি নন। তিনি এদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নন, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্ব-ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এবং এ থেকেই সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি হল পুরুষ অবশ্যই অমর, কারণ তিনি সম্মিলনের ফল নন। এবং যা সম্মিলনের (সংমিশ্রণের) ফল নয় তার মৃত্যু হতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্মা সংখ্যায়ও অনন্ত।

বিভিন্ন অবস্থায় গুণাদি হল, নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট, চিহ্নিত এবং চিহ্নহীন। এই ভাষ্যসূত্রটি এবারে আমরা বুঝবার চেষ্টা করব। নির্দিষ্ট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে স্থূল উপাদানকে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অনির্দিষ্ট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে অতিসূক্ষ্ম উপাদান বা তন্মাত্রাকে—সাধারণ লোকে যা অনুভবই করতে পারবে না। পতঞ্জলি বলেন—যোগাভ্যাস করলে কিছুকালের মধ্যেই তোমার অনুভব এত সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে যে তুমি সত্যসত্যই তন্মাত্রাদের দেখতে পাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রত্যেক লোকেরই চারদিকে কোনো একই আলো রয়েছে, একথা শুনে থাকবে; প্রত্যেকেই একরকমের আলো বিকিরণ করে থাকে। পতঞ্জলি বলেন, এটা যোগীরা দেখতে পান। আমরা সবাই তা দেখি না, কিন্তু আমরাও এই তন্মাত্রাগুলি বহির্গত করে থাকি, ফুল যেমন অবিরত তার গন্ধকণা প্রেরণ করে আমাদের গন্ধ গ্রহণে সমর্থ করে। প্রতিদিনই আমরা সৎ বা অসৎ পদার্থের বিকিরণ ঘটিয়ে থাকি, আমরা যেখানেই যাই না কেন আবহাওয়া ওইসবের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এইভাবেই তো অচেতনভাবে হলেও মানুষের মনে জেগেছিল মন্দির বা গির্জা তৈরীর কথা। ঈশ্বরোপাসনার জন্যই গির্জা বা মন্দির তৈরী করা হবে কেন? অন্য কোনো জায়গায় তাঁর উপাসনা করলেই তো হয়। কারণটা না জেনেও মানুষ বুঝেছে—লোকে যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করে সে স্থান সৎ তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ। প্রত্যহ লোকে সেখানে যায়, আর যতই বেশীরকম যায়, ততই তারা পবিত্রতর হয়ে ওঠে, সেই ক্ষেত্রও পবিত্রতর হয়। যার মধ্যে খুব সত্ত্বগুণ নেই, সেও যদি ক্ষেত্রটির প্রভাবে পড়ে তার মধ্যে জাগ্রত হবে সত্ত্বগুণ। সমস্ত মন্দির বা পবিত্র স্থানের বৈশিষ্ট্য এইখানেই, তবে মনে রাখতে হবে সমবেত সকলের পবিত্রতার উপরেই নিভর করছে ঐ ক্ষেত্রাদির পবিত্রতা। মানুষের সঙ্কটটা হচ্ছে সে মূল অর্থটা বিস্মৃত হয়,—ঘোড়াকে ডিঙিয়ে গাড়িটা রাখে। মানুষই তো ক্ষেত্রগুলিকে পবিত্র করেছে, তারপর কর্মই হয়েছে কারণ এবং মানুষকে তা পবিত্র করে তুলেছে। কেবলমাত্র যদি বদলোকেরা সেখানে যেত, তাহলে তো অনেক জায়গার মতোই তা বদক্ষেত্র হত। ইমারতটা নয়, মানুষেই সৃষ্টি করেছে গির্জার বা মন্দিরের, আমরা কিন্তু সেই কথাটা সব সময়েই ভুলে যাই। এবার তাহলে বোঝা গেল, যথেষ্ট সত্ত্বগুণের অধিকারী ঋষি বা পবিত্র মানুষেরা তাদের সত্ত্বগুণ প্রেরণ করতে পারেন এবং পরিবেশের উপর দিবারাত্র এই প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। কোনো লোক এতই পবিত্র হতে পারে যে তার পবিত্রতা প্রত্যক্ষ দেখা যেতে পারে। তাঁর সংসর্গে যে আসে সেও পবিত্র হয়।

তারপর, 'একমাত্র চিহ্নিত' অর্থ বুদ্ধি। 'একমাত্র চিহ্নিত' হল প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ; তার থেকেই অন্যসব প্রকাশের উদ্ভব। সর্বশেষটি হল 'চিহ্নহীন বা চিহ্নশূন্য'। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও সমগ্র ধর্মের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি রয়েছে যে বিশ্বজগৎ চৈতন্য থেকে উদ্ভূত। ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব-রূপী কিনা সে বিচার বাদ দিয়ে, ঈশ্বর-বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অভিমতকে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশিষ্টতার দিক থেকে দেখলে দাঁড়ায় চৈতন্যই হল সৃষ্টিকাণ্ডের আদিতে, এবং ঐ চৈতন্য থেকেই এসেছে আমরা যাকে বলি স্থূল বস্তু। আধুনিক দার্শনিকবৃন্দ

বলেন চৈতন্য এসেছে সর্বশেষে। তাঁরা বলেন, চৈতন্যরহিত বস্তুই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে হতে প্রাণীর সৃষ্টি, এবং প্রাণী থেকে মানুষ। তাঁরা দাবি করেন চৈতন্য থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়নি, বরং চৈতন্যই সবশেষে সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক এই দুই মতই সত্য, যদিও আপাতভাবে তাদের সরাসরি বিপরীতমুখী বলেই মনে হয়। একটা অন্তহীন ধারাক্রম গ্রহণ করা যাকঃ ক-খ-ক-খ-ক-খ ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল কোনটা প্রথম—ক না খ? ক-খ ধারা গ্রহণ করলে বলবে ক প্রথম, খ-ক ধারা গ্রহণ করলে বলবে খ প্রথম। নির্ভর করছে কিভাবে দেখছ। চৈতন্য পরিবর্তিত হতে হতে স্থূল রূপ পায়, এটাই আবার চৈতন্যে লয় পায়—এইভাবেই ধারাক্রম চলতে থাকে। সাংখ্যেরা এবং অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ প্রথমেই স্থান দেন চৈতন্যকে, তারপর বস্তুকে। বৈজ্ঞানিক জড়কে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করে বলেন—'প্রথমে জড়, তারপরে চৈতন্য।' উভয়ে এক শৃঙ্খলকে নির্দিষ্ট করে থাকেন। ভারতীয় দর্শন অবশ্য চৈতন্য এবং বস্তু উভয়েরই অতীতে দর্শন করেন এক পুরুষ বা আত্মাকে এবং তা চৈতন্যের অতীত, চৈতন্যই সেখানে বরং প্রতিফলিত আলো।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০

২০ ॥ দ্রষ্টা কেবলমাত্র চৈতন্য, যদিও তা শুদ্ধ তবুও বুদ্ধির রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তা দর্শন করে থাকে।

এটাও সেই সাংখ্যদর্শন। ঐ দর্শনে আমরা দেখেছি নিম্নতম বস্তু থেকে চৈতন্য পর্যন্ত সমস্তই হল প্রকৃতি ; প্রকৃতির অতীত হল পুরুষেরা (আত্মারা)—তারা নির্গুণ। তাহলে আত্মা কি করে সুখী বা অসুখী হতে পারে ? প্রতিবিম্বিত হয়ে। বিশুদ্ধ স্ফটিকের কাছে একটি লাল ফুল রাখো, স্ফটিককেও লাল দেখাবে, অনুরূপভাবে আত্মার সুখ বা দুঃখের রূপ হল প্রতিবিম্ব মাত্র। আত্মার কোনো রঙ বা রূপ নেই, আত্মা প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতি হল এক, আত্মা আর এক—উভয় নিত্যকালই স্বতন্ত্র। সাংখ্যেরা বলেন, চৈতন্য হল মিশ্র অবস্থা, তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে ; তার স্বভাব হল প্রায় দেহের মতোই। আঙুলের নখ তো দেহেরই একটি অংশ, কিন্তু সেই নখ কত শতবার বিচ্ছিন্ন করা যায়, দেহ তো ঠিকই থাকে। অনুরূপভাবেই বুদ্ধি বা চৈতন্য জেগে থাকে কোটি কল্পকাল, কিন্তু এই দেহ 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে যায়—বর্জিত হয়। তবুও বুদ্ধি কখনো অমর হতে পারে না, কারণ তার পরিবর্তন আছে, তা বাড়ে-কমে। যা পরিবর্তনশীল তা অমর হতে পারে না। বুদ্ধি নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় এবং এটাই দেখিয়ে দেয় যে তাকে ছাড়িয়েই আর কিছু আছে। বুদ্ধি স্বাধীন হতে পারে না, যা কিছু বস্তুর সহিত সম্পর্কান্বিত তাই প্রকৃতির মধ্যে এবং তাই চিরবদ্ধ। কে মুক্ত ? যে মুক্ত তাকে নিশ্চয়ই কারণ ও কার্যের অতীত হতে হবে। যদি বলো মুক্তি কথাটাই ভ্রমাত্মক, আমি বলব বন্ধন কথাটাও ভ্রমাত্মক। দুটো ভাবই আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে এসে এক সঙ্গেই দাঁড়ায় বা ভূমিসাৎ হয়। এই হল আমাদের বন্ধন ও মুক্তির ধারণা। একটা দেওয়ালের মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে আমাদের মাথায় ধাক্কা লাগলে আমরা জানতে পারি আমরা সেই দেয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আবার

এটাও সত্য যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, আমরা মনে করি আমাদের ইচ্ছাকে সর্বত্র সঞ্চারিত পারি। প্রতি পদক্ষেপে এইসব বিরুদ্ধভাব আমাদের মনে জাগে। আমাদের বিশ্বাস করতে হয় আমরা মুক্ত, তবু প্রতি মুহূর্তেই তো দেখতে পাই আমরা মুক্ত নই। এদের একটা ভাব যদি বিভ্রান্তি হয় তো, অন্যটাও বিভ্রান্তি; একটা অভ্রান্ত হয় তো অন্যটাও অভ্রান্ত। কারণ, দুটোর ভিত্তি একই—অনুভব। যোগী বলেন—দুটোই সত্য; যতদূর বুদ্ধির সীমা সে পর্যন্ত আমরা বদ্ধ, আত্মার ক্ষেত্রে আমরা মুক্ত। আত্মা অর্থাৎ পুরুষই হল মানবের প্রকৃত স্বরূপ এবং তা সমস্ত বিধির কার্য-কারণ শৃঙ্খল অতীত। আত্মার মুক্তি বুদ্ধি মন ইত্যাদি বহুরূপে বস্তুর বহুস্তরের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে চলেছে। এই আত্মার জ্যোতিই সমস্ত কিছুর মধ্যে দীপ্যমান। বুদ্ধির স্বকীয় কোনো আলো নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রেরই এক-একটি কেন্দ্র আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রই পৃথক পৃথক তবু সমস্ত অনুভবই সামঞ্জস্যময় হয় কেন? তারা কোথায় পায় তাদের ঐক্য? তা যদি মস্তিষ্কেই থাকে তো চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়যন্ত্রেরই একটি মূল কেন্দ্র থাকা চাই, কিন্তু আমরা সুনিশ্চিতভাবেই জানি প্রত্যেকটিরই এক-একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র বর্তমান। তবু তো লোকে একই সময়ে দেখতে ও শুনতে পারে, কাজেই বুদ্ধির পিছনে নিশ্চয়ই একটি ঐক্যশক্তি আছে। বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক, তবু বুদ্ধির অন্তরালেও দাঁড়িয়ে আছে পুরুষ, সেই ঐক্য—যেখানে সমস্ত অনুভব ও উপলব্ধি এসে সম্মিলিত হয়—একত্ব লাভ করে। ঐ আত্মাই মুক্ত। কিন্তু ঐ মুক্তিকে তোমরা বুদ্ধি এবং মন ভেবে কেবলি ভুল করো। মুক্তিকে তোমরা বুদ্ধির গুণরূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো, অথচ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারো যে বুদ্ধি মোটেই মুক্ত নয়; তোমরা ঐ মুক্তিকে দেহের গুণ বলে ব্যাখ্যা করো, কিন্তু তখনি (দেহ) প্রকৃতি বলে দেয় যে তুমি আবার ভুল করছ। এই জন্যই মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত চেতনা একই সঙ্গে বর্তমান থাকে। যোগী বিশ্লেষণ করে জানেন কোনটা মুক্ত, কোনটা বা বদ্ধ; এবং তাঁর অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। তিনি জানেন পুরুষ হল মুক্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানঘন; কিন্তু বুদ্ধি থেকে আগত জ্ঞানরূপে তা হয় বদ্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১

২১ ॥ তার জন্যই অভিজ্ঞের প্রকৃতি।

প্রকৃতির নিজের কোনো জ্যোতি নেই। যতক্ষণ পুরুষ তার মধ্যে থাকে ততক্ষণই তা জ্যোতিরূপে দেখা দেয়। কিন্তু সে জ্যোতি তো ধার-করা, চাঁদের প্রতিবিম্বিত আলোসদৃশ। যোগীদের মতে প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশ প্রকৃতির নিজেরই সৃষ্টি, কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করা ছাড়া প্রকৃতির কোনো উদ্দেশ্যাত্মক লক্ষ্য নেই।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২

২২ ॥ যার লক্ষ্য লাভ হয়েছে তার পক্ষে ধ্বংসীভূত হলেও তা ধ্বংস হয় না। অন্যদের পক্ষে তা সাধারণভাবেই বর্তমান থাকে।

আত্মা যে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র তা জানানোই প্রকৃতির সমস্ত কাজের লক্ষ্য। আত্মা তা জানতে পেলেই প্রকৃতির আর সেদিকে কোনোই আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু

যিনি মুক্ত হয়েছেন, একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সমস্ত প্রকৃতি অদৃশ্য হয়ে যায় তবে, এমন অসংখ্য লোক থেকে যাবে যাদের উপর প্রকৃতি কাজ করে চলবেই।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩

২৩ ॥ অভিজ্ঞতা (অভিজ্ঞব্যক্তি) ও তার প্রভু—এই দুই শক্তির প্রকৃতি-বোধের কারণই হল উভয়ের সংযোগ।

এই ভাষ্যসূত্র অনুসারে দেখা যায়, আত্মা ও প্রকৃতি এই উভয়ের শক্তিই প্রকাশিত হয় যখন উভয়েরই সংযোগ ঘটে। তারপর সমস্ত রকম প্রকাশই বর্জিত হয়। অজ্ঞানতাই এই সংযোগের কারণ। আমরা প্রত্যহই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুঃখে বা সুখে আমরা আমাদেরকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলি। আমি যদি নিশ্চয়ই জানতাম যে আমি আমার এই দেহ নই, তবে শীত-গ্রীষ্ম বা অনুরূপ কিছুর দিকেই নজর দিতাম না। এই দেহ হল একটা সম্মিলন। আমি এক দেহ, তুমি আর এক, সূর্য হল আর এক—এমনটা বলা আষাঢ়ে গল্প। সমস্ত বিশ্বই এক বস্তু-সমুদ্র। তার এককণার নাম হল তুমি, আমি আর এক কণা, সূর্য আর এক কণা। আমরা জানি নিত্য পরিবর্তন ঘটছে। আজ যা সূর্যকে আকার দিচ্ছে, আর একদিন তা আমাদের দেহ-পদার্থের আকার ধারণ করবে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪

২৪ ॥ অজ্ঞতা এর কারণ।

বিশেষ কোনো দেহের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করা হয় অজ্ঞতাবশতই, এবং এর ফলে দুঃখ ঘটে। দেহভাব হল অন্ধ সংস্কার মাত্র। অন্ধ সংস্কারই আমাদের সুখী বা দুঃখী করে। অজ্ঞতা-প্রসূত সংস্কারই তাপ বা হিমের সুখ বা দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমাদের কাজ হল এই সংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠা; যোগীরা দেখিয়ে দেন কেমন করে আমরা তা করতে পারি। এটা প্রত্যক্ষভাবেই দেখা গেছে, কাউকে আগুনে পোড়ালেও বিশেষ কতকগুলি মানসিক অবস্থাধীনে সে কোনো যন্ত্রণাই অনুভব করবে না। কিন্তু মুশকিল হল মনের এই আকস্মিক উত্থান কয়েক পলক ঘূর্ণির মতো দেখা দিয়েই চলে যায়। তবে যোগ মাধ্যমে আমরা যদি তা লাভ করি তাহলে সবসময়ের জন্যেই দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত রাখতে পারব।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫

২৫ ॥ এই অজ্ঞতা থাকলেই সংযোগের অভাব ঘটে, এবং এই অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করতে হবে; এখানেই দ্রষ্টার মুক্তি।

যোগদর্শন অনুসারে অজ্ঞানতাবশতই আত্মা প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। লক্ষ্য হল, আমাদের উপরে প্রকৃতির আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য হল তাই। প্রত্যেক আত্মাই মূলত স্বর্গীয়। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরস্থ এই স্বর্গীয় শক্তিকে প্রকাশ করাই হল লক্ষ্য, সেটাই করো—কাজেই হোক বা উপাসনায়ই হোক, শারীরিক সংযমেই হোক বা দর্শন জ্ঞানেই হোক—এদের একটা দিয়েই হোক, একাধিক দিয়েই হোক বা সবকটা দিয়েই হোক, তা করো এবং মুক্ত

হও। এটাই হল ধর্মের সবকিছু। মতবাদ, মতামত, ধর্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রগ্রন্থ, মন্দির বা আকার-প্রকার হল গৌণ বিষয়। যোগীরা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেন মনঃ-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। প্রকৃতি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তো দাসমাত্র, প্রকৃতিদেবী যা আদেশ করবেন তাই আমাদের করতে হবে। যোগীরা দাবি করেন—যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে বস্তুকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্তরঙ্গ প্রকৃতি বহিরঙ্গ প্রকৃতির চেয়ে ঢের ঢের উচ্চতর এবং তাঁকে আয়ত্ত করাটাও আরো কঠিন। তাই, অন্তঃপ্রকৃতিকে যে জয় করেছে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকেই সে জয় করেছে; বিশ্বপ্রকৃতি তো তার দাসী হয়ে পড়ে। রাজযোগ এই নিয়ন্ত্রণ লাভের পদ্ধতিকেই প্রকাশ করে থাকে।

এই বাহ্যপ্রকৃতিতে যে শক্তি আছে বলে আমরা জানি তার উচ্চতর শক্তিকেও আমাদের সংযত করতে হবে। এই দেহ হল মনেরই এক কঠিন বহিরাবরণ। তারা স্বতন্ত্র দুটি নয়, ঠিক যেন শুক্তির খোল ও শুক্তি। তারা একই জিনিসের দুটো দিক, শুক্তির অন্তরঙ্গ পদার্থ বাহির থেকে উপাদান গ্রহণ করে, তৈরী করে খোল। অনুরূপভাবেই মন নামক অন্তরঙ্গ সূক্ষ্মশক্তি বাহির থেকে স্থূল উপাদান গ্রহণ করে এবং তা থেকে বহিরঙ্গ খোল-রূপী এই দেহকে সৃষ্টি করে। তাহলে, অন্তরঙ্গের নিয়ন্ত্রণ থাকলে বহিরঙ্গের নিয়ন্ত্রণও খুবই সহজ। তারপর আবার এই শক্তিগুলি পৃথক কিছু নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক, কতকগুলি মানসিক এমনটা নয়; শারীরিক শক্তিগুলি তো সূক্ষ্ম শক্তিগুলিরই স্থূল প্রকাশ—বাহ্যজগৎ যেমন সূক্ষ্ম জগতেরই স্থূল প্রকাশ।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬

২৬॥ নিয়ত এই বিবেকের (ভেদাত্মকতার) বুদ্ধিই অজ্ঞানতা ধ্বংস করার উপায়।

পুরুষ যে প্রকৃতির মধ্যে নেই, তা যে বস্তুও নয়, মনও নয়, এবং যেহেতু তা প্রকৃতি নয় তাই তার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই—এই জেনে সত্য ও মিথ্যার ভেদাত্মক বিচারবুদ্ধিই হল অভ্যাসের প্রকৃত লক্ষ্য। অবিরাম কেবল সংমিশ্রণে ও পুনঃ সংমিশ্রণে ও বিলয়ে তো কেবল প্রকৃতির পরিবর্তন। নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আমরা যখন বিভেদ-বিচার করতে শুরু করি, তখনই অজ্ঞানতা দূর হবে এবং প্রকৃতরূপে দীপ্তি পেতে থাকবে—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও সর্বত্রবিরাজমানরূপে।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭

২৭॥ তার জ্ঞানের উচ্চতম ভূমির সপ্তস্বর।

এই জ্ঞান এলে তা আসবে যেন সাতটি স্তরে—একের পর এক; এদের মধ্যে একটি যখন সুরু হয়, আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জ্ঞানের উদয় হচ্ছে। প্রথমে দেখা দেবে জ্ঞাতব্য যা জেনেছি। মনে আর অসন্তোষ থাকবে না। জ্ঞানের পিপাসা জেগেছে—এমনটা বোধ হলেই, আমরা এক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তার সন্ধান করতে থাকি—ভাবি সেখান থেকে কিছু সত্য লাভ করব; কিন্তু তা না পেলে অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য কোনো নতুন পথ ধরি। সমস্ত সন্ধান বিফল হলে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করি যে জ্ঞান রয়েছে আমাদের

ভিতরেই এবং এক্ষেত্রে অন্য কেউই আমাদের সহায়তা করতে পারে না—নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে হবে, আমাদেরই আত্মনির্ভর হতে হবে। বিবেক (ভেদবিচার) শক্তির অভ্যাস শুরু করলে আমরা যে সত্যের সমীপে উপনীত হচ্ছি তার প্রথম লক্ষণেই আমাদের অসন্তুষ্ট অবস্থাটা চলে যাবে। স্পষ্ট উপলব্ধি করব যে আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি এবং তা যথার্থই সত্য, অন্য কিছু নয়। তখন আমরা বুঝতে পারব আমাদের জন্য সূর্য উদিত হচ্ছে, রাত্রি ভোর হচ্ছে, আর মনে বল নিয়ে অগ্রসর হব লক্ষ্যে না পৌছনো পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হল সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার বোধশূন্য হওয়া। তখন এই বিশ্বের বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ কোনোকিছুরই এমন ক্ষমতা থাকবে না যে আমাদের ব্যথা দেবে। তৃতীয় স্তর হল পূর্ণজ্ঞান লাভ। আমরা হব তখন সর্বজ্ঞ। চতুর্থ স্তর হল বিবেক (ভেদবিচার) মাধ্যমে সমস্ত কর্তব্যের লক্ষ্য লাভ। তারপরে (পঞ্চম স্তরে) আসছে যাকে বলে চিত্তের মুক্তি। আমরা তখন বুঝব যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও সংগ্রাম, যত মানসচাঞ্চল্য সবই পরাভূত হয়েছে—ঠিক যেমন একটা পাথর পর্বতশিখর থেকে গড়িয়ে পড়ে প্রান্তরে, কখনোই তা আর উপরে উঠে আসে না। পরবর্তী অবস্থায় (ষষ্ঠ স্তরে) চিত্তেই এই বোধ জেগে উঠবে—চিত্তের যখনই ইচ্ছা তখনই তা বিলীন হয়ে যেতে পারে। সর্বশেষ স্তরে (সপ্তম স্তরে) আমরা দেখতে পাব যে আমরা স্বস্থিত হয়েছি, আমরা এই বিশ্বে সর্বত্রই একক একাকী, দেহ বা মনের সঙ্গে কখনোই আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, আমাদের সঙ্গে তার সংযোগও বড় একটা নয়। তারা তো স্বেচ্ছামতোই কাজ করে যাচ্ছিল, আমরাই অজ্ঞানতাবশত তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধযুক্ত করেছি। কিন্তু আমরা বরাবরই ছিলাম একাকী একক—সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান, চিরধন্য; আমাদের নিজেদের আত্মা এত বিশুদ্ধ, এত পরিপূর্ণ যে সেখানে তো আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। আমাদের সুখী করতে কারুরই দরকার নেই, কারণ আমরাই তো মূর্তিমান সুখ। আমরা দেখতে পাব এই জ্ঞান আর কিছুর উপরে নির্ভর করে না এবং এই বিশ্বজগতে এমন কিছুই নেই যা আমাদের জ্ঞানের সামনে বিদ্যমান হয়ে উঠবে না। এটাই হল শেষ স্তর এবং এই অবস্থায় যোগী হয়ে ওঠেন শান্ত স্থির শান্তিময়, কখনো আর ব্যথা বোধ থাকে না, কখনো আর বিভ্রান্ত হন না, কখনো আর দুঃখ-কষ্ট তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি জানতে পারেন—তিনি হলেন নিত্যানন্দ, নিত্য পূর্ণ, সর্বশক্তিমান।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮

২৮॥ যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অভ্যাসের ফলে দোষমুক্ত হলে জ্ঞান বিবেকে দীপ্যমান হয়।

এবারে আসছে ব্যবহারিক জ্ঞান। একটু আগেই যা বলা হয়েছে তা হল ঢের ঢের উচ্চতর জ্ঞান। তা ঊর্ধ্বচারী বটে কিন্তু আদর্শ। প্রথমেই প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক সংযম। তবেই আদর্শবোধ স্থির হবে। আদর্শকে জানা হলে যা বাকী থাকে তা হল সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পদ্ধতি-অভ্যাস।

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯

২৯ ॥ সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি হল যোগাঙ্গ (যোগের অঙ্গ)।

অহিংসা-সত্যাস্তেয-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০

৩০ ॥ অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অ পরিগ্রহ—এসব হল যম।

পূর্ণ যোগী হতে হলে কারুকে ঐ ছয়টি ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। আত্মার কোনো লিঙ্গ নাই ; লিঙ্গবিষয়ক ভাব দ্বারা আত্মা কেন অধঃপতিত হবে ? এরপরে আরো ভালো করে বোঝা যাবে কেন ঐসব ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। যে দান গ্রহণ করে তার মনের উপর কাজ করে দাতার মন, তাই গ্রহীতারও অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা। দান গ্রহণ মনের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চায় এবং দাসমনোভাব সৃষ্টি করে। তাই কোনোরকম দানই গ্রহণ করবে না।

এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১

৩১ ॥ কাল, দেশ, উদ্দেশ্য, জাতিবিধি এসব হল মহাব্রত।

অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না-করা, সততা, এবং দান গ্রহণ না করা—এসব প্রত্যেকটি নরনারী এবং শিশু এবং জাতি দেশ ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকটি আত্মা কর্তৃক অভ্যাস করতে হবে।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২

৩২ ॥ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিশুদ্ধীকরণ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরোপাসনা হল নিয়ম।

বাহ্য বিশুদ্ধীকরণ (শৌচ) হল দেহকে পবিত্র রাখা ; অশুচি লোক কখনো যোগী হতে পারে না। আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধিও থাকতে হবে। (৩৩ সূত্র, সমাধি-পাদে) উল্লিখিত ধর্মগুণদ্বারা তা লাভ করা যায়। তবে বাহিরের পবিত্রতার চেয়ে বেশী মূল্য বহন করে ভিতরের পবিত্রতা, কিন্তু দুটোরই দরকার আছে, আর ভিতরের পবিত্রতা ছাড়া বাহিরের পবিত্রতা কোনো কাজের নয়।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩

৩৩ ॥ যোগ-বিরোধী ভাবনাকে ব্যাহত করার জন্য তার বিপরীতকে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লিখিত ধর্মগুণাদি অভ্যাস করার এটাই পথ। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের এক মহাতরঙ্গ মনের মধ্যে উপস্থিত হলে কিভাবে তা দমন করতে হবে ? ঠিক বিপরীত তরঙ্গ জাগ্রত করে। প্রেমের কথাই ধরো। মা কখনো বা তাঁর স্বামীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন, তখন তাঁর শিশু এসে দাঁড়াল, মা শিশুকে চুমো খেলেন ; পূর্বের তরঙ্গটি বিলীন হল, শিশুপ্রেমে নতুন এক তরঙ্গ জেগে উঠল। তা অন্যটিকে সংযত করল। প্রেম হল ক্রোধ-বিরুদ্ধ। অনুরূপভাবেই চুরির ভাব মনে জাগলেই চুরি না করার

ভাবটি জাগিয়ে তুলতে হবে, কোনো দান গ্রহণের কথা ভাবলে তাকে সরিয়ে দাও বিপরীত কিছু চিন্তা করে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা
মৃদুমধ্যাধিমাত্র দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪

৩৪ ॥ যোগের বাধা হল হত্যা মিথ্যা ইত্যাদি, তা কৃতই হোক, কারণই হোক বা সমর্থিতই হোক---লোভলালসা, ক্রোধ বা অজ্ঞানতার জন্যই হোক; মৃদু, মধ্য বা প্রবলই হোক। এ সবের পরিণাম হল অন্তহীন অজ্ঞানতা ও দুঃখদুর্দশা। এগুলি (এই প্রণালীসমূহ) হল বিপরীত ভাবনা।

যদি মিথ্যা বলি বা অন্যকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করি বা তার মিথ্যাকে সমর্থন করি, তাতেও সমপরিমাণ পাপ হয়। খুব মৃদু মিথ্যা হলেও তো তা মিথ্যা। প্রত্যেকটি পাপচিন্তাতে আবার ফিরে আসবে, তোমার মনের প্রত্যেকটি ঘৃণার ভাবই তুমি কোনো গুহায় বসেই চিন্তা করো না, তা জমা হয়ে থাকবে এবং একদিন কোনো না কোনো দুঃখের আকারে প্রবল বেগে তোমাকে আক্রমণ করবে। তুমি যদি ঘৃণা ও ঈর্ষা বিস্তার করো, তোমার উপরে চক্রবৃদ্ধি হারে তা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনো শক্তিই তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। একবার তাদের চলতে দিয়েছ কি তাদের সহ্য করতে হবে। একথা মনে রাখলে পাপকাজ থেকে বিরত হতে পারবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫

৩৫ ॥ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলেই তার উপস্থিতিতে (অন্যদের প্রসঙ্গে) সমস্ত রকম শত্রুতাই বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যকে আঘাত না দেবার আদর্শ গ্রহণ করলে তার সম্মুখে যেসব প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র তারাও শান্ত হয়। ওই রকম যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেষ একসঙ্গে খেলা করবে। যখন ঐ অবস্থায় আসবে, কেবলমাত্র তখনই বুঝতে পারবে তুমি অহিংসায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬

৩৬ ॥ সত্যবাদিতার প্রতিষ্ঠার দ্বারা যোগী ক্রিয়া ছাড়াই ক্রিয়াফল লাভের শক্তি অর্জন করে—কেবল নিজের জন্যেই নয়, সকলের জন্যেই।

তোমার মধ্যে যখন সত্যের শক্তি অধিষ্ঠিত হবে, এমনকি স্বপ্নেও কখনো অসত্য উচ্চারণ করবে না। তুমি চিন্তায়, কথায় ও কর্মে সত্যবাদী হবে। (তখন) তুমি যা বলবে তা-ই সত্য হবে। তুমি যদি কাউকে বলো—'ধন্য হও', সে অমনি ধন্য হবে। কোনো লোক যদি রুগ্ন থাকে আর তুমি তাকে বলো—'তুমি সুস্থ হও', তৎক্ষণাৎ সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭

৩৭ ॥ অচৌর্য স্থায়ী হলে যোগীর আয়ত্তে আসে সমস্ত সম্পদ।

প্রকৃতি থেকে যতদূরেই ছুটে যেতে চাইবে প্রকৃতি ততই তোমাকে অনুসরণ করবে ; তুমি যদি তাকে কোনোরকম আমল না দাও তো সে তোমার দাসী হবে।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮

৩৮ ॥ ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শক্তি লাভ হয়।

সং মস্তিষ্কে থাকে প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রকাণ্ড ইচ্ছাশক্তি। সততা ছাড়া কোনো অধ্যাত্মশক্তির জন্ম হয় না। সংযম মানবজাতিকে দান করে বিস্ময়কর সংযমশক্তি। অধ্যাত্ম গুরুগণ হন ঐকান্তিকভাবে ব্রহ্মচারী এবং তাই ব্রহ্মচর্য তাঁদের শক্তি দান করে। যোগীকে তাই ব্রহ্মচারী হতে হবে।

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯

৩৯ ॥ অপরিগ্রহ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হবে।

দান গ্রহণ না করলে, অন্যের কাছে বাধ্যবাধকতা থাকে না। বরং স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। মন তার পবিত্র থাকে। প্রত্যেকটি দানের সঙ্গে সে দাতার অন্যায় শক্তিগুলিও গ্রহণ করে। দান গ্রহণ না করলে মন পবিত্র থাকে এবং প্রথম যে শক্তি দেখা যায় তা হল পূর্বজন্মের স্মৃতি। যোগী একমাত্র তখনই তাঁর আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেখতে পায়, আগে সে যাতায়াত করেছে কতশত বার। আর তাই সে এখন নিশ্চিত হয় যে এবার সে মুক্ত হবে—তাকে আর যাতায়াত করতে হবে না। প্রকৃতির দাস হতে হবে না।

শৌচাৎস্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০

৪০ ॥ ভিতরের ও বাহিরের শুদ্ধি ঘটলে নিজের দেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে এবং অন্যের সঙ্গে সংসর্গ থেকে মুক্তি।

দেহের ভিতরের ও বাইরের যথার্থ শুদ্ধি ঘটলে নিজের দেহের প্রতি অবহেলা জাগে, সুশ্রী রাখার ধারণাটা দূর হয়ে যায়। যে মুখখানিকে লোকে বড়ই সুন্দর দেখে যোগীর কাছে তাই মনে হবে একেবারেই জানোয়ারের মুখ—যদি ঐ মুখের অন্তরালে কোনো বুদ্ধি বর্তমান থাকে, আবার যে মুখমণ্ডলকে দুনিয়ার সবাই বলে অতি সাধারণ ধরনের, তার পিছনেই যদি জ্যোতি দেখা দেয় তো তাকেই যোগী দেখে স্বর্গীয়। দেহতৃষ্ণা মানবজীবনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কাজেই পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার প্রথম চিহ্ন হল তোমার দেহ সম্পর্কে সচেতন না থাকা। পবিত্রতা এলেই দেহভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১

৪১ ॥ সেখানে সত্ত্বের শুদ্ধি মনের প্রফুল্লতা, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়-জয়, আত্মবোধের যোগ্যতা—এসবের জাগৃতি ঘটে।

এই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস দ্বারা সত্ত্ব উপাদানের প্রভাব বাড়ে, মনও একাগ্র হয়, প্রফুল্ল হয়। তোমার মধ্যে ধর্মভাব উদয়ের প্রথম লক্ষণ হল তুমি প্রফুল্ল হচ্ছ। কেউ যখন বিষণ্ণ থাকে তা তার ধর্মভাবের লক্ষণ নয়, আমাশয় রোগের লক্ষণ।

সত্ত্বের স্বভাবই হল সুখকর অনুভব। সাত্ত্বিক ব্যক্তির কাছে সব সুখকর; যখন তেমনটা হবে বুঝবে তুমি যোগে অগ্রসর হচ্ছ। তমঃশক্তিদ্বারাই সমস্ত দুঃখের সৃষ্টি হয়, তাই তমঃশক্তি থেকে মুক্ত থাকবে; বিষণ্ণতা হল তমঃশক্তির পরিণাম। একমাত্র সবল, দৃঢ়বদ্ধ, যুবক, স্বাস্থ্যবান ও দুঃসাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হবার যোগ্যতা রাখে। যোগীর কাছে সমস্তই শান্তিময়, প্রতিটি মানুষের মুখ দেখেই সে আনন্দ পায়। এবং সেটা হল ধার্মিক লোকের লক্ষণ। পাপের দ্বারাই দুঃখের সৃষ্টি—অন্য কোনো কারণে নয়। মেঘাচ্ছন্ন মুখ দিয়ে হবেটা কী? তা তো ভয়ঙ্কর। মুখ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তো সেদিন আর বেরিও না, ঘরেই বন্ধ থাকো। এই জগতে সেই রোগ ছড়াবার কি অধিকার তোমার? মন যখন তোমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সমস্ত দেহের উপরেও তোমার নিয়ন্ত্রণ আছে; দেহযন্ত্রের দাস না হয়ে ঐ যন্ত্রকেই তোমার দাস করো। যন্ত্রের দ্বারা তোমার আত্মাকে নিম্নগামী হতে না দিয়ে তাকেই মস্ত বড়ো সহায় করে তোলো।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২

৪২ ॥ সন্তোষ থেকেই আসে সর্বোত্তম সুখ।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩

৪৩ ॥ তপস্যার ফলে অশুদ্ধি বিলয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ও দেহে শক্তি আনা হয়।

ফল অব্যবহিতকালেই দেখা দেয়—কখনো তীব্র দর্শনে, বহুদূরের ধ্বনি শ্রবণে বা এমন অনেক কিছু।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪

৪৪ ॥ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির (জপের) দ্বারা অভীষ্ট দেবতার উপলব্ধি ঘটে।

যত উচ্চস্তরের সত্তাকে লাভ করতে চাও, অভ্যাস ততই কঠিন হবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫

৪৫ ॥ সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করলে সমাধি হয়।

প্রভু (ঈশ্বর)-কে আত্মসমর্পণ করলে তবেই সমাধি পূর্ণতা লাভ করে।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬

৪৬ ॥ যা স্থির ও সুখকর তাকে আসন বলে।

এবারে আসনের কথা—দেহাবস্থানের কথা। দৃঢ় স্থির আসন লাভ না করা পর্যন্ত শ্বাস বা অন্য ব্যায়াম করতে সক্ষম হবে না। দৃঢ়-আসন হলে তোমার দেহবোধই থাকবে না। সাধারণভাবে দেখবে যেই কিছুক্ষণের জন্যও আসনে বসেছ তো নানারকম বাধা দেহের মধ্যে জাগ্রত হবে, কিন্তু স্থূল দেহবোধের বাইরে চলে গেলে, সমস্ত শারীরিক চেতনাই লুপ্ত হবে। তখন তুমি সুখ কি দুঃখ কিছুই অনুভব করবে না। আসন থেকে উঠলে খুবই বিশ্রাম ভাব মনে হবে। দেহজয়ে দেহকে দৃঢ় রাখতে সফল হলে তোমার অভ্যাসও দৃঢ় হবে, কিন্তু দেহ দ্বারাই যদি ব্যাহত হও তো তোমার স্নায়ুব্যবস্থাও বিঘ্নিত হবে—মনকে একাগ্র করতে পারবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭

৪৭ ॥ (চঞ্চলতার দিকে) স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হ্রাস করে এবং অসীম অনন্তকে ধ্যান করে আসন (দেহাবস্থান ভঙ্গী) দৃঢ় ও সুখকর হয়।

অনন্তের চিন্তা দ্বারা আমরা আসন দৃঢ় করতে পারি। অনন্ত ব্রহ্ম আমরা চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু অনন্ত আকাশ চিন্তা করতে পারি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮

৪৮ ॥ আসন জয় হলে দ্বন্দ্ব আর বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। ভালো ও মন্দ, উত্তাপ ও শৈত্য বা বিপরীত সবকিছুই তোমাকে আর ব্যাহত করবে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম ॥ ৪৯

৪৯ ॥ এরপরে আসে শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতিকে নিয়ন্ত্রণ। আসনভঙ্গী জয় করা হলে প্রাণগতি বিভক্ত ও বির্জিত হয়।

এইভাবে আমরা দেহের মৌলশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ-রূপে প্রাণায়ামে আসি। প্রাণকে শ্বাস রূপে অনুবাদ করা হলেও প্রাণ শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। প্রাণ হল সৃষ্টিব্যাপী শক্তির সামগ্রিক-রূপ। তা হল প্রত্যেকটি দেহের শক্তি এবং তার সবচেয়ে প্রতীয়মানরূপ হল ফুস-ফুস-যন্ত্রের গতি (স্ফীতি-সঙ্কোচ)। শ্বাসগ্রহণ দ্বারাই ঐ গতির সৃষ্টি এবং ঐ গতিকেই আমরা প্রাণায়ামে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। শ্বাসনিয়ন্ত্রণ থেকেই আমরা প্রাণায়াম শুরু করি, কারণ তা হল প্রাণ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায়।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০

৫০ ॥ এর পরিবর্তনগুলি হয় বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ বা নিশ্চল; দীর্ঘ বা হ্রস্বকাল স্থিতিশীল, সময় বা সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রাণায়ামে তিনরকম গতি বর্তমান : এক ক্রিয়া, যা দ্বারা আমরা শ্বাস গ্রহণ করি; দুই ক্রিয়া, যার দ্বারা শ্বাস ফেলি; তিন ক্রিয়া, যার দ্বারা আমরা ফুসফুসের মধ্যে শ্বাস ধারণ করি বা ফুসফুসে শ্বাসের প্রবেশকে বন্ধ করে রাখি। স্থান-কাল দ্বারা এদের বৈচিত্র্য ঘটে। স্থান দ্বারা বোঝানো হচ্ছে প্রাণকে দেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ধারণ করা। সময় দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রাণকে কতক্ষণ ধারণ করা হবে। এবং তাই আমাদের বলা হয় একটি প্রাণায়ামের গতিকে কয় সেকেণ্ড ধারণ করব, অন্য গতিকেই বা কয় সেকেণ্ড। এই প্রাণায়ামের ফল হল উদ্ঘাত অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১

৫১ ॥ চতুর্থটি হল বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক বস্তুর চিন্তাদ্বারা প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ। এই চতুর্থ প্রাণায়ামে দীর্ঘকালীন অভ্যাস ও তার সঙ্গে সঙ্গে মননের দ্বারা কুম্ভক ক্রিয়া ঘটানো হয়; পূর্বোক্ত তিনটিতে এসব থাকে না।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২

৫২ ॥ তা থেকে চিত্তদ্যুতির উপরস্থ আবরণ ক্ষীণ হয়ে যায়।

স্বভাবতই চিত্তে থাকে সমস্ত জ্ঞান। চিত্ত সত্ত্ব পদার্থ দিয়ে গঠিত, কিন্তু রজঃ ও তমঃ পদার্থ দ্বারা আবৃত; প্রাণায়াম দ্বারা এই আবরণ দূরীভূত হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩

৫৩ ॥ মন ধারণার জন্য যোগ্য হয়।

এই আবরণও দূর হলে আমরা মনকে একাগ্র করতে সমর্থ হই।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪

৫৪ ॥ যখন ইন্দ্রিয় তাদের স্ব-বিষয় পরিত্যাগ করে যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে তখন তাকে প্রত্যাহার বলে।

ইন্দ্রিয়াদি হল মনের বিভিন্ন অবস্থা। একটা বই দেখছি; আকারটা বইতে নেই, আমার মনে আছে। বাইরে এমন কিছু আছে যা ঐ আকারকে জাগিয়ে তোলে। চিত্তেই থাকে সত্যকার আকার। ইন্দ্রিয়গুলির সামনে যাই আসুক, তারা তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের আকার গ্রহণ করে। এসব আকার গ্রহণ করা থেকে মনকে যদি বিরত করতে পারো, মন শান্ত থাকবে। এর নামই প্রত্যাহার।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫

৫৫ ॥ তা থেকেই ইন্দ্রিয়াদির উপরে চরম নিয়ন্ত্রণ ঘটে।

যোগী যখন বহির্বস্তুর আকার গ্রহণে ইন্দ্রিয়যন্ত্রকে বিরত করতে এবং মনের সঙ্গে সেগুলিকে একাত্ম করতে কৃতকার্য হয়, তখনই ইন্দ্রিয়যন্ত্রের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ঘটে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রত্যেকটি মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রীও নিয়ন্ত্রণে থাকে; কারণ ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি তো সমস্ত অনুভূতির ও সমস্ত ক্রিয়াদির কেন্দ্র। ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদিকে ক্রিয়া-যন্ত্র ও অনুভূতি-যন্ত্র এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি নিয়ন্ত্রিত থাকলে যোগী সমস্ত ক্রিয়া ও অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। একমাত্র তখনই তো দেখা দেয় জন্মগ্রহণের আনন্দ; তখনই কেউ যথার্থই বলতে পারে—'আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এ আমার সৌভাগ্য!' ইন্দ্রিয়াদির সেই নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই দেহ সত্যই কি আশ্চর্য সৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শক্তি

এবারে এই পরিচ্ছেদে আমরা যোগশক্তিকে বর্ণনা করব।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১

১ ॥ বিশেষ কোনো বস্তুতে মনকে ধারণ করাই হল ধারণা।

মন যখন দেহের বাহিরের কোনো বস্তুতে বিধৃত হয় এবং সেই অবস্থায়ই বর্তমান থাকে, তখনি হয় ধারণা।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২

২ ॥ ঐ বস্তুতে (বিষয়ে) জ্ঞানের অব্যাহত ধারাই ধ্যান।

মন এক বিষয়ই ভাবতে, সুনির্দিষ্ট কোনো স্থানে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, ধরো মাথার তালু বা হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি কিছু। মন যদি অন্য কোনো দেহাংশ ছাড়া একমাত্র সেই দেহাংশ মাধ্যমেই অনুভূতি গ্রহণে সমর্থ হয়, তবেই ধারণা ঘটবে ; আর, মন যদি সেই অবস্থায়ই কিছুকাল স্থিত থাকতে পারে তবে তাকে বলা হয় ধ্যান (তপস্যা)।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩

৩ ॥ তা যখন সমস্ত (বাহ্য)আকার পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র অর্থকেই প্রকাশ করে তাকে বলে সমাধি।

তা (সমাধি) হয় ধ্যানে যখন আকার বা বাহ্যরূপ পরিত্যক্ত হয়। ধরো আমি একখানা বই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছি, ক্রমে ক্রমে তার উপরে আমার মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সমর্থ হচ্ছি—একমাত্র আভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলি কোনো রকম আকারশূন্য অবস্থায়ই উপলব্ধি করছি—ধ্যানের এহেন অবস্থাকে বলে সমাধি।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪

৪ ॥ (এই) তিনটি একত্রে অর্থাৎ একটি বস্তুতেই (বিষয়েই) অভ্যাস করলে হয় সংযম।

কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে মনকে চালিত করে সেখানেই স্থিত করতে পারলে এবং আভ্যন্তরীণ অংশ থেকে বস্তুকে পৃথক করে বহুসময় ধরে তা করতে পারলে তা হবে সংযম। একের অনুসরণকারী অন্যটির রূপে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এবং সব একাকার হয়ে একটিমাত্র। বস্তুর আকার অন্তর্হিত হয়ে গেছে, রয়েছে কেবলমাত্র তার অর্থ।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫

৫ ॥ তার বিজয় দ্বারাই আসে জ্ঞানালোক।

এই সংযম সাধনে কৃতকার্য হলে সমস্ত শক্তিই তার আয়ত্ত হয়। যোগীদের কাছে এটা হল বড়ো একটা যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয়বস্তু তো অনন্ত এবং তা স্থূল, স্থূলতর,

স্থূলতম এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত। প্রথমে সংযম প্রয়োগ করতে হবে স্থূল বিষয়ে, তারপব স্থূল-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে শুরু হলে ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে তা সূক্ষ্মতর বিষয়ে আনতে হবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬

৬ ॥ অতি দ্রুত কিছু করতে যেও না, এটা তারই সাবধানবাণী।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭

৭ ॥ এই তিনটি পূর্ববর্ণিতগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ (সাধন)।

এর আগে আমরা পেয়েছি প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, আসন, যম ও নিয়ম। এসবই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিরই বহিরঙ্গ।

কেউ যখন এসব লাভ করে সে হতে পারে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাকে মুক্তি বলে না। এই তিনটি মিলেও মনকে নির্বিকল্প অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় করবে না, আবার দেহধারণের (জন্মলাভের) জন্যে বীজ রেখে যাবে। যোগীদের ভাষায় যাকে 'ভাজা' বলে, বীজ তেমনি ভর্জিত হলে আর নতুন চারা উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮

৮ ॥ কিন্তু এমনকি তারাও নির্বীজ (সমাধি)-এর কাছে বাহিরের বিষয় (বহিরঙ্গ)।

অতএব, নির্বীজ সমাধির তুলনায় এরাও বহিরঙ্গ বিষয়। আমরা এখনো যথার্থ সর্বোচ্চ সমাধি পর্যন্ত পৌঁছাইনি, এই নিম্নতর স্তরে এখনো দেখতে পাচ্ছি এই বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ব রয়েছে—সেখানে এই সমস্ত শক্তি বিরাজমান থাকছে।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ-পরিণামঃ ॥ ৯

৯ ॥ মনের বিক্ষুব্ধ সংস্কার দমন দ্বারা এবং সংযমের সংস্কারের উত্থান দ্বারা, সংযম-কালেই নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তনাদি লাভ করে থাকে।

অর্থাৎ সমাধির প্রথমাবস্থায় মনে সংস্কার সংযত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণতই হয় না; কারণ তাহলে কোনো পরিবর্তনই হত না। যে পরিবর্তন মনকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে ধাবিত হবার প্রেরণা দান করে এবং যোগী যাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই নিয়ন্ত্রণই হয়ে পড়ত পরিবর্তন। এক তরঙ্গই অন্য তরঙ্গকে দমন করছে। নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র নিজেই একটা তরঙ্গ হয়ে উঠতে সমস্ত তরঙ্গই শান্ত হয়ে যায়, এমনটা যথাযথ সমাধি নয়। তবুও এই নিম্নতর সমাধিও বুদ্বুদায়িত মনের অবস্থার চেয়ে উচ্চতর সমাধির নিকটতর।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০

১০ ॥ অভ্যাসের ফলে এর প্রবাহ দৃঢ় হয়। দিনের পর দিন অভ্যাসের ফলে এবং মন নিয়ত একাগ্রতাশক্তি লাভ করলে মনের এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ধারায় স্থির থাকে।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ।। ১১

১১। সমস্ত প্রকার বস্তুকে গ্রহণ করে এবং একটি বস্তুকে একাগ্রমন হলে, এই দুই শক্তি পারস্পরিকভাবে ধ্বংস হলে ও প্রকাশিত হলে, চিত্তের যে রূপান্তর ঘটে তাকে বলে সমাধি।

মন বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করে, সবরকম সবকিছুর মধ্যেই ধাবিত হয়। এটা হল নিম্নতর অবস্থা। মনের একটা উচ্চতর অবস্থা আছে; তখন তা একটি বিষয়কে গ্রহণ করে অন্য বিষয়কে বর্জন করে এবং তার ফলেই ঘটে সমাধি।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ।। ১২

১২।। অতীত সংস্কার ও বর্তমান সংস্কার যখন সমান হয়ে যায় তখনি ঘটে চিত্তের একাগ্রতা।

মন যে একাগ্র হয়েছে তা কেমন করে বুঝব? তখন যেহেতু সময়ের ধারণা চলে যাবে। যতই অলক্ষ্যে সময় চলে যাবে ততই আমরা একাগ্র হব। সাধারণ জীবনেও আমরা দেখি কোনো বইতে নিমগ্ন থাকলে, কত সময় চলে যাচ্ছে সে খেয়ালও থাকে না; বই ছেড়ে উঠে বিস্মিত হয়ে ভাবি এত ঘণ্টা কেটে গেল। সমস্ত কালই এসে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে বর্তমানে। তাই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: অতীত ও বর্তমান যখন এসে এক হয়, মন তখন একাগ্র হয়।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ।। ১৩

১৩।। এর দ্বারা সূক্ষ্ম বা স্থূল ভূত এবং ইন্দ্রিয়ের ত্রিরূপী ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়।

মনে আকার, সময় ও অবস্থা-রূপ তিনরকম পরিবর্তন দ্বারাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয় যন্ত্রাদিতে অনুরূপ পরিবর্তনাদিকে ব্যাখ্যা করা হয়। ধরো এক স্বর্ণখণ্ড রয়েছে। তাকে বাজু অলঙ্কারে রূপান্তরিত করা হলো, তারপর আবার কর্ণালঙ্কারে। এসব হল আকারের পরিবর্তন। এই একই ঘটনাকে সময়ের দিক থেকে দেখলে সময়ের পরিবর্তন বোঝা যাবে। আবার ঐ বাজু বা দুল নিষ্প্রভ হতে পারে মোটা বা সরু বা এমনি কতরকম। এ হল অবস্থার পরিবর্তন। এবার ৯, ১১ ও ১২ ভাষ্য-সূত্র প্রসঙ্গ মনে রেখে বক্তব্য হল মন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং একে বলে আকারের পরিবর্তন। তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় বলে এ হল সময়ের পরিবর্তন। একই সময়ে, এই ধরো বর্তমানেই সংস্কারাদি তীব্রতা হেতু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং এটা হল অবস্থার পরিবর্তন। পূর্বোক্ত ভাষ্যসূত্রাদিতে যে একাগ্রতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা মনের রূপ-রূপান্তর ক্ষেত্রে যোগীকে স্বেচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণ দান করার জন্যই—একমাত্র যে নিয়ন্ত্রণ তাকে বর্ণিত সংযম রক্ষায় সক্ষম করতে পারে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী ।। ১৪

১৪ ।। রূপান্তরাদি দ্বারা প্রভাবিত অতীত, বর্তমান বা অনাগতের প্রকাশ হল গুণাত্মক।

তার অর্থ, যে পদার্থ সময় ও সংস্কারাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত ও নিত্য প্রকাশিত হয় তা হল সগুণ।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫

১৫ ॥ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনাদি হল বহুরূপ বিবর্তনের কারণ।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬

১৬ ॥ ত্রিজাতীয় পরিবর্তনে সংযম রক্ষা হলে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান আসে।

সংযমের প্রথম সংজ্ঞাটি আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বহিরঙ্গ সংস্কারকে বাদ দিয়ে অন্তরঙ্গ সংস্কারের সঙ্গেই মন যখন একাত্ম হয়, যখন দীর্ঘকালীন অভ্যাসের ফলে মন তা ধারণ করে রাখে এবং এক মুহূর্তেই সেই অবস্থায় উপনীত হতে পারে—তখনই তাকে কোনো লোক যদি সেই অবস্থায় অতীত ও ভবিষ্যৎকে জানতে চায় তো (৩।১৩ বর্ণিত) সংস্কারাদিতে সংযম রক্ষা করতে হবে। কেউ বর্তমানে (সংযম বিষয়ে) কাজ করছে, কেউ কাজ করেছে, কেউ বা কাজের প্রতীক্ষায় আছে। কাজেই এসবে সংযম অভ্যস্ত হলে সে জানতে পারে অতীত ও ভবিষ্যৎকে।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭

১৭ ॥ শব্দ, অর্থ ও মনের মধ্যে সাধারণত গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হয়—কিন্তু ওসবে সংযম সৃষ্টি হলে সমস্ত জীবের আওয়াজ সম্পর্কে জ্ঞান হয়।

শব্দ বলতে এখানে বাহিরের কারণ বোঝানো হয়েছে ; অর্থ বলতে আভ্যন্তরীণ স্পন্দনকে যা ইন্দ্রিয়াদির পথে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং বাহিরের সংস্কারকে মনের কাছে পৌঁছে দেয় ; জ্ঞান বলতে বোঝায় মনের প্রতিক্রিয়াকে, যার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি ঘটে। এই তিনটির বিশৃঙ্খল অবস্থায়ই অনুভূত বস্তুর সৃষ্টি হয়। মনে করো আমি একটা শব্দ শুনছি। প্রথমে হবে বাহিরের স্পন্দন, তারপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের কাছে প্রেরিত হবে আভ্যন্তরীণ অনুভূতি ; তারপরে মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং তখনই আমি শব্দটা কি জানতে পাব। সাধারণত ঐ তিনটি অবিচ্ছেদ্য থাকে ; কিন্তু অভ্যাস দ্বারা যোগী তাদের পৃথক করতে পারেন। কেউ সেই অবস্থায় উপনীত হলে, যে কোনো ধ্বনিতে যদি সে সংযম প্রয়োগ করে, তবে সেই ধ্বনির অভীষ্ট অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—সেই ধ্বনি মনুষ্যসৃষ্টই হোক বা অন্য কোনো জীবসৃষ্টই হোক।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮

১৮ ॥ সংস্কারগুলির উপলব্ধি থেকেই আসে পূর্বজন্ম-বিষয়ক জ্ঞান।

আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই চিত্তে তরঙ্গাকারে দেখা দেয় এবং শান্ত হয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে, কিন্তু কখনোই বিলুপ্ত হয় না। সেখানেই থেকে যায় একেবারে অণুর আকারে ; আমরা যদি তাকে আবার তরঙ্গরূপে জাগ্রত করতে

পারি তো তা হবে স্মৃতি। তাই যোগী যদি তার মনের অতীত সংস্কারাদির উপরে সংযম প্রয়োগ করতে পারেন, তিনি তার সমস্ত পূর্বজন্মই স্মরণে আনতে পারবেন।

প্রত্যয়স্য পরিচিত্তজ্ঞানম্ ॥১৯

১৯॥ অন্যের দেহচিহ্নগুলির উপরে সংযম প্রয়োগ করলে, সেই লোকের সম্পর্কে জ্ঞান উদিত হয়।

প্রত্যেক লোকের দেহেই কতকগুলি লক্ষণ থাকে এবং তা দিয়েই একেকে অন্য থেকে আলাদা করে চেনা যায়; যোগী এইসব লক্ষণে মনঃ-সংযম প্রয়োগ করে সেই লোকের মনের চেহারাটি কিরূপ তা জানতে পারেন।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০

২০॥ কিন্তু তার বিষয় উপাদান নয়, কারণ সংযমের তা লক্ষ্য নয়।

দেহের উপরে সংযম আরোপ করেই মনের উপাদানকে জানা সম্ভব নয়। এতে দু-রকমের সংযম দরকার হয়; প্রথমে দেহলক্ষণের উপর এবং তারপর মনেরই উপর। যোগী তখনই জানতে পারেন ঐ মনের ভিতর কি আছে।

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে
চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগেহন্তর্ধানম্ ॥ ২১

২১॥ দেহের আকারের উপর সংযম দ্বারা ঐ আকারের অনুভব ব্যাহত করে এবং চক্ষুর প্রকাশ শক্তিকে পৃথক করে যোগীদেহ অদৃশ্য হয়ে থাকে।

যোগী এই ঘরে দাঁড়িয়ে থেকেই আপাতভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। তিনি কিন্তু সত্যিই অদৃশ্য হন না, কেউ তাকে দেখতে পায় না। আকার ও দেহ যেন আলাদা হয়ে যায়।

যোগী যখন এমন একাগ্রতা-শক্তির অধিকারী হন যে আহার ও আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু উভয়ে আলাদা হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই তা সম্ভব হবে। একথা তোমাদের মনে রাখা দরকার। তখন সে তার উপরে সংযম প্রয়োগ করে এবং আকারদের অনুভূতি ব্যাহত করে, কারণ আকার অনুভব করার শক্তি আসে আকার ও আকৃতিধারকের সংযোগ থেকে।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥ ২২

২২॥ এর দ্বারা কথিত বা সমরূপ অন্যকিছু শব্দের অনুপস্থিতি বা সংগুপ্তি ব্যাখ্যা করা হয়।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদপরান্ত-জ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২৩

২৩॥ কর্ম দুই প্রকার—একটি শীঘ্রই ফল প্রসব করবে, অন্যটির ফল দেরিতে হবে। এসবের উপর সংযম প্রয়োগ করে বা অরিষ্ট নামক লক্ষণ দ্বারা যোগীরা তাদের দেহ থেকে পৃথক হবার সময়টি জানতে পারেন।

যোগী যখন নিজ কর্মের উপর সংযম করেন—তাঁর মনে যে সংস্কারাদি ক্রিয়াশীল এবং যেসব সক্রিয় হবার জন্য প্রতীক্ষমাণ তাদের উপর সংযম করেন। তখন ঐ...

প্রতীক্ষমাণ সংস্কারাদি দিয়েই জানতে পারেন কখন তার দেহপাত হবে। কখন তার মৃত্যু হবে তিনি জানতে পারেন, কখন কোন সময়, এমনকি কোন্ মুহূর্তে। হিন্দুরা মৃত্যুকাল সম্পর্কে, জ্ঞান বা চেতনা সম্পর্কে খুবই ভেবে থাকে, কারণ গীতায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পরজন্ম নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়াণ-মুহূর্তকালীন চিন্তার রয়েছে এক বিরাট শক্তি।

মৈত্র্যাদিষু বলানি॥ ২৪

২৪॥ মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির উপর (১।৩৩) সংযম করে যোগীব্যক্তি সংশ্লিষ্ট গুণাবলীতে উৎকর্ষ লাভ করে।

বলেষু হস্তিবলাদীনি॥ ২৫

২৫॥ হস্তী বা অন্যান্যদের উপর সংযম করে তাদের সংশ্লিষ্ট শক্তি যোগীদের কাছে দেখা দেয়।

যোগী এই সংযম লাভ করে এবং শক্তি চায়, সে হস্তীর শক্তির উপর সংযম করে এবং সেই শক্তি লাভ করে। প্রত্যেকেরই আয়ত্তাধীনে আছে অনন্ত শক্তি—কেবল-সে যদি তা জানতে পারে। যোগী তা লাভ করার বিজ্ঞান অধিকার করেছে।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্॥ ২৬

২৬। সর্বব্যাপী জ্যোতির উপর সংযম করলে দেখা দেয় সেই জ্ঞান যা সূক্ষ্ম, অব্যাহত এবং দূরবর্তী।

যোগী যখন হৃদয়স্থ দ্যুতির উপব সংযম করে, সে দেখতে পায় বহুদূরস্থ কিছু—যেমন বহুদূরে যা ঘটছে, যা পর্বতবাধার দ্বারা ব্যাহত এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুও।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ॥ ২৭

২৭॥ সূর্যের উপর সংযম দ্বারা জাগতিক জ্ঞান (লাভ হয়)।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্॥ ২৮

২৮॥ চন্দ্রের উপরে হলে তারাপুঞ্জের জ্ঞান (হয়)।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্॥ ২৯

২৯॥ ধ্রুবতারকার উপরে হলে, তারকাদের গতি সম্পর্কে জ্ঞান (আসে)।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্॥ ৩০

৩০॥ নাভিমূলে হলে দেহগঠন সম্পর্কে জ্ঞান (আসে)।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ॥ ৩১

৩১॥ কণ্ঠগহ্বরে হলে ক্ষুধাতৃষ্ণানিবৃত্তি (ঘটে)।

কেউ খুব ক্ষুধার্ত হলে সে যদি কণ্ঠগহ্বরে সংযম করে তার ক্ষুধা চলে যাবে।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম॥ ৩২

৩২॥ কূর্মনামক স্নায়ুতে হলে দেহস্থৈর্য (আসে)।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩

৩৩॥ মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বভাগ (তালু) থেকে বিকিরিত হতে থাকা আলোর উপর (সংযম হলে) সিদ্ধপুরুষদের দর্শন (ঘটে)।

সিদ্ধরা হল ভূতপ্রেতের চেয়ে কিছুটা উপরের স্তরে। যোগীরা মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বভাগে (তালুতে) মনকে একাগ্র করলে এইসব সিদ্ধদের দেখতে পাবে। সিদ্ধ শব্দ দ্বারা মুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয় না, যদিও সেই অর্থেই শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্ ॥ ৩৪

৩৪ ॥ অথবা প্রতিভার শক্তিদ্বারা সমস্ত জ্ঞান (হয়)।

যাঁদের এইরূপ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ প্রতিভার শক্তি আছে, তাঁরা (পূর্বোক্ত) কোনরূপ সংযম ছাড়াই এইসব জ্ঞান লাভ করেন। কেউ যখন উচ্চ প্রতিভাশক্তি লাভ করেন তখন তিনি মহাজ্যোতি প্রাপ্ত হন। সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে সহজ দর্শনগ্রাহ্য। তাঁর কাছে সবকিছুই সংযম ছাড়াই প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ে চিত্ত-সংবিৎ ॥ ৩৫

৩৫ ॥ হৃদয়ে (সংযম হলে) মনে সবরকমের জ্ঞান (হয়)।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্
ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬

৩৬ ॥ উপভোগ ঘটে আত্মার অভেদ-বিচার চেতনা থেকে এবং সত্ত্ব থেকে, এবং তারা সম্পূর্ণতই পৃথক, যেহেতু সত্ত্বের ক্রিয়াদি হয় অন্যটির জন্য। আত্ম-কেন্দ্রিত ব্যক্তির উপরে সংযম এনে দেয় পুরুষের (আত্মার) জ্ঞান।

সত্ত্বের সমস্ত ক্রিয়াই আলোক ও সুখ দ্বারা বিশেষিত প্রকৃতির এক রূপান্তর যে সত্ত্ব তার সমস্ত ক্রিয়াই ঘটে আত্মার জন্যে। সত্ত্ব যখন অহংবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয় এবং পুরুষের শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা দীপ্যমান হয়, তখন তাকে বলা হয় আত্মকেন্দ্রিত ; কারণ সেই অবস্থায় তা সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্তি পায়।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭

৩৭ ॥ তা থেকে প্রতিভাধীন জ্ঞান আসে এবং আসে (লোকাতীত) শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও গন্ধ গ্রহণ।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮

৩৮ ॥ এ সবই সমাধির বাধা, কিন্তু সেগুলিই জাগতিক অবস্থায় হয় শক্তিবিশেষ।

পুরুষ ও মনের সংযোগ থেকে জাগতিক উপভোগের জ্ঞান যোগীর নিকট আগত হয়। প্রকৃতি ও আত্মা এই দুই বিভিন্ন বিষয়ক—এই জ্ঞানের উপর তা থেকেই জন্ম নেয় বিবেক, ভেদবিচার বা ভেদাত্মক বুদ্ধি। ঐ বিবেক লাভ করলেই তিনি প্রতিভার অধিকারী হন—দিব্য শক্তির অধিকারী হন। এসব শক্তি অবশ্য সর্বোচ্চ আদর্শরূপ শুদ্ধাত্মা ও মুক্তিলাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। এসবের সঙ্গে যেন পথে সাক্ষাৎ

ঘটে থাকে, যোগী যদি তাদের প্রত্যাখ্যান করেন তো তিনি সর্বোচ্চকে লাভ করেন। যদি তিনি এসব আয়ত্ত করতে প্রলুব্ধ হন, তাঁর অধিকতর অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯

৩৯ ॥ চিত্তবন্ধনের কারণ যখন শিথিল হয়, যোগী চিত্তের কর্মপ্রণালীসমূহের জ্ঞান দ্বারা (স্নায়ুতন্ত্রী দ্বারা) অন্যের দেহে প্রবেশ করেন।

যোগী মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন—তাকে উত্থিত করতে পারেন, সচল করতে পারেন, এমনকি নিজে ঐ দেহেই অবস্থান করার সময়েই। অথবা, তিনি কোনো এক জীবন্ত দেহে প্রবেশ করে তার মন ও ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদি রুদ্ধ করে সাময়িকভাবে ঐ লোকটির দেহের সাহায্যেই কাজ করে যেতে পারেন। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদবিচার-শক্তির অধিকারী হলেই এমনটা ঘটে। অন্য কারো দেহে প্রবেশ করতে চাইলে সে ঐ দেহে মনঃসংযম করে তাতে প্রবেশ করে ; কারণ, তাঁর আত্মাই কেবল সর্বজ্ঞ নয়, তাঁর মনও। যোগীরা এমনটাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ওটা হল সর্বজনীন মনেরই একটি টুকরা মাত্র। তবে শরীরের স্নায়ুপ্রবাহের সাহায্যে তা ক্রিয়াশীল হতে পারে, যোগী এই স্নায়ুপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্য জিনিসের সাহায্যেও ক্রিয়া করতে পারেন।

উদান-জয়াজ্জল-পঙ্ক কণ্ঠকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০

৪০ ॥ উদান নামক (স্নায়ু) প্রবাহকে জয় করলে যোগী জলে বা জলকাদায় মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকাদির উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন এবং তাঁর ইচ্ছামৃত্যু হয়।

যে স্নায়ুতন্ত্রী-প্রবাহ ফুসফুস ও ঊর্ধ্বদেহস্থ প্রত্যঙ্গাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম উদান, তার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারলে তাঁর (যোগীর) দেহভার হাল্কা হয় (তিনি লঘুভার হন)। তিনি জলে ডুবে যান না, তিনি কাঁটার উপর দিয়ে বা তরবারির ধারালো দিকটার উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন, আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন এবং ইচ্ছামাত্র ইহজীবন ত্যাগ করতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১

৪১ ॥ সমান (নামক) প্রবাহ আয়ত্ত করলে তিনি জ্যোতিঃ-বেষ্টিত হন। ইচ্ছামাত্রই তাঁর দেহ থেকে জ্যোতি বার হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২

৪২ ॥ কান ও আকাশের সংযোগ সম্পর্কে সংযম করলে দিব্যশ্রবণ ঘটে।

আকাশ হল ঈশ্বর এবং যন্ত্র হল কান। এই দুটির উপর সংযম করলে যোগী লোকাতীত (দিব্য) ধ্বনি শ্রবণ করতে পারেন—তিনি সবই শুনতে পান, বহু মাইল দূর থেকেও যে কোনো কথা বা শব্দ শুনতে পারেন।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩

৪৩ ॥ আকাশ ও দেহের মধ্যকার সম্পর্কের উপরে সংযম করে, তুলা প্রভৃরিত

মতো ভারহীন হয়ে এবং তাদের ধ্যানের সাহায্যে যোগী আকাশপথে পরিভ্রমণ করতে পারেন।

আকাশ হল এই দেহের উপাদান, আকাশই কোনো এক নির্দিষ্ট আকার লাভ করে হয়েছে এই দেহ, যোগী যদি দেহের আকাশ-রূপ উপাদানের ভার সংযম করেন, তবে তিনি আকাশের ভারহীনতা অধিকার করেন এবং বায়ুর মধ্য দিয়ে তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। তেমনি অন্য ক্ষেত্রেও।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪

৪৪ ॥ দেহের বাহিরে মনের 'প্রকৃত পরিবর্তনগুলি'-র উপর অর্থাৎ মহাবিদেহ-রূপের উপর সংযম দ্বারা আলোর উপরকার আবরণ দূরীভূত হয়।

মন অজ্ঞতাহেতু ভাবে তা দেহের মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু মন যদি সর্বজ্ঞ হয় তো আমি কেন এক প্রকারের স্নায়ুর দ্বারা আবদ্ধ থাকব, কেন অহংকে শরীরের মধ্যে স্থাপন করব? যোগী তাঁর অহংকে অনুভব করতে চান যেখানেই তাঁর খুশি। দেহের অহংবুদ্ধির বিলয়ে যে মানসতরঙ্গগুলি উত্থিত হয়, তাকেই বলা হয়েছে 'প্রকৃত পরিবর্তনাদি' বা 'মহাবিদেহরূপ'। এইসব পরিবর্তিত রূপের উপর যোগী যখন সংযম প্রয়োগ করতে সফল হন, আলোকের উপরকার সব আবরণই দূর হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সমস্ত অন্ধকার ও অজ্ঞতা। সব কিছুই তাঁর কাছে হয়ে ওঠে জ্ঞানময়।

স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫

৪৫ ॥ উপাদানসমূহের স্থূল ও সূক্ষ্ম আকার, তাদের মূলীভূত বৃত্তি, তাদের অন্তর্নিহিত গুণাদি এবং আত্মার অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রে তাদের দান—এই সবের উপর সংযম দ্বারাই ঘটে উপাদানসমূহের উপরে প্রভুত্ব।

যোগী প্রথমে সংযম করেন স্থূল উপাদানগুলির উপরে, পরে তাদের সূক্ষ্ম অবস্থার উপরে। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণই এই সংযমকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে থাকেন। একদলা মাটি নিয়ে তাঁরা তার উপরেই সংযম করতে করতে ঐ মাটিরই সূক্ষ্মতর উপাদানগুলি দেখতে পান এবং তার সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানগুলিই জানা হলে ঐ উপাদানের উপর তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করেন। সমস্ত উপাদান সম্পর্কেই অনুরূপ (ঘটে)। যোগী ওই সবগুলিকেই জয় করতে পারেন।

ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬

৪৬ ॥ তা থেকে আসে সূক্ষ্মবোধ ও অন্যান্য শক্তিসমূহ, 'কায়সম্পদ' এবং দেহধর্মের অবিনশ্বরতা।

এতে বোঝা যায়, যোগী অষ্টশক্তি (অষ্টসিদ্ধি) লাভ করেছেন। তিনি তাঁকে করে তুলতে পারেন এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার মতো বা প্রকাণ্ড এক পর্বতের মতো, দুর্ভর পৃথিবীর মতো, কিংবা হাওয়ার মতো হাল্‌কা; তিনি পৌঁছতে পারেন যেখানেই তাঁর অভিরুচি, শাসন করতে পারেন যাকে ইচ্ছা, জয় করতে পারেন যাকেই

চান, এমনি ধারা সব কিছুকেই। সিংহ তাঁর পায়ের পাশে বসে থাকবে এক মেষের মতো, এবং ইচ্ছামাত্র তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭

৪৭ ॥ কায়ার (দেহর) গৌরব-সম্পদ হল সৌন্দর্য, বর্ণ, শক্তি ও বজ্রকাঠিন্য।

দেহই হয় অবিনাশী, কিছুই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। যোগীর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই তা ধ্বংস করতে পারে না। 'কালদণ্ড ভগ্ন করে তিনি এই বিশ্বে সশরীরে বাস করেন।' বেদে লিখিত আছে যে ঐ লোকের ক্ষেত্রে কোনোরকম পীড়া যন্ত্রণা বা মৃত্যু থাকে না।

গ্রহণ স্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮

৪৮ ॥ ইন্দ্রিয়াদির বহির্লক্ষ্যমুখিতা ও উদ্ভাবন শক্তির উপর এবং অহংবোধ ও ইন্দ্রিয়-অন্তর্গত গুণাদির উপর এবং আত্মার জ্ঞানবিষয়ে তাদের দান (প্রভাব)— এই সবের উপরে সংযমের ফলে ঘটে ইন্দ্রিয়-জয়।

বহির্বস্তুর অনুভবে ইন্দ্রিয়াদি মনের মধ্যস্থিত তাদের স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করে বস্তুর দিকে ধাবিত হয়; এবং তাতেই জ্ঞান হয়। এই প্রক্রিয়ায় অহংবোধও থেকে যায়। যোগী যখন (প্রথমে) এইগুলির উপর এবং ক্রমে অন্য দুটির উপরেও ক্রমান্বয়ে সংযম করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করেন। যা দেখছ বা অনুভব করছ তার মধ্য থেকে যে কোনো কিছুকে ধরো। একখানা গ্রন্থকে গ্রহণ করো। প্রথমে তার উপরেই মনকে একাগ্র করো, তারপরে গ্রন্থাকারে যে জ্ঞান আছে তার উপরে, তারপর যে অহং গ্রন্থকে দেখছ তার উপরে— এমনি ধারা। এই অভ্যাসের ফলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকেই জয় করা হবে।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯

৪৯ ॥ তা থেকে দেহে আসে মনসদৃশ দ্রুত গতিশক্তি, দেহ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়শক্তি এবং প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি।

উপাদানসমূহকে জয় করার ফলে যেমন গৌরবময় দেহ হয়, তেমনি ইন্দ্রিয় যন্ত্রসমূহ জয় করায় উল্লিখিত শক্তিগুলি দেখা দেয়।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০

৫০ ॥ সত্ত্ব ও পুরুষ—এই উভয়ের ভেদবিচারের উপর সংযম করলে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হওয়ার ক্ষমতা জন্মে।

প্রকৃতিকে জয় করা হলে এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্যবোধ ঘটলে অর্থাৎ পুরুষ (আত্মা) অবিনাশী, শুদ্ধ ও পূর্ণ এই বোধ হলে আসে সর্বশক্তিমানতা ও সর্বজ্ঞতা।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১

৫১ ॥ এমন কি এসব শক্তিকে পরিত্যাগ করলে পাপের বীজ ধ্বংস হয় এবং তার ফলেই ঘটে কৈবল্য।

সে লাভ করে কৈবল্য ও স্বাধীনতা এবং মুক্ত হয়। সর্বশক্তিমানতা ও সর্বজ্ঞতার ভাব ত্যাগ করলে আসে সম্পূর্ণ বর্জন—উপভোগের ও স্বর্গীয় প্রলোভনের। যোগী যখন এইসব বিস্ময়কর শক্তি প্রত্যক্ষ করেও প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, তিনি লক্ষ্যে উপনীত হন। এসব শক্তি কি রকম? সোজাসুজি যাকে বলা হয় বহিঃপ্রকাশ (বাহ্যরূপ)। এসব তো স্বপ্নের চেয়ে উন্নত কিছু নয়। এমন কি সর্বশক্তিমান-রূপও এক স্বপ্ন। তা মনের উপরেই নির্ভরশীল। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই তার বোধ জন্মে, কিন্তু (পরম) লক্ষ্য মনের বাইরে থাকে।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২

৫২ ॥ পুনঃপাপ ভয় কারণে দেবগণের (দিব্যশক্তিগণের) দ্বারা যোগী প্রলুব্ধ বা প্রশংসিত বোধ করবেন না।

এছাড়া আরো অনেক বিঘ্ন আছে। দেবতারা এবং অন্যান্য সত্তাদি যোগীকে প্রলুব্ধ করতে আসে। কারণ তারা চায় না কেউ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। আমাদের মতই তারা ঈর্ষাপরায়ণ, কখনো বা আমাদের চেয়েও খারাপ। তারা তাদের পদহানির আশঙ্কা করে। যে সব যোগী পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারাই দেবতা হয়,—তারা সোজা রাজপথ ছেড়ে গলিপথে চলে গিয়ে এইসব শক্তি লাভ করে। তাদের আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, যিনি এইসব প্রলোভন জয় করতে সক্ষম হয় এবং লক্ষ্যের দিকে গিয়ে উপনীত হয় তাঁরাই মুক্ত হয়।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩

৫৩ ॥ ক্ষণকাল এবং তার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযমে বিচারবোধ জন্মে।

আমরা এসব কিছু—এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তি—এদের কেমন করে এড়িয়ে চলব? ভেদবিচার দ্বারা—সৎ থেকে অসৎকে পৃথক জেনে। এবং সেইহেতু এসব সংযমের কথা বলা হল যার দ্বারা বিচারবোধ শক্তিশালী হয়। তা হল ক্ষণকালের এবং তার পূর্ব-পরকালের উপর সংযম করা।

জাতি-লক্ষণ-দেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪

৫৪ ॥ জাতি, লক্ষণ, স্থান (দেশ) দ্বারা যা পৃথক করা যায় না, পূর্ব উল্লিখিত সংযম দ্বারা এমন কি সেসব ক্ষেত্রেও বিচারবোধ জন্মাবে।

আমরা যে দুঃখকষ্ট পাই তা আসে অজ্ঞতা থেকে—সত্য ও অসত্যের বিচারবোধ শূন্যতা থেকে। খারাপকেই আমরা ভালো মনে করি, স্বপ্নকেই সত্য। আত্মাই যে একমাত্র সত্য তা আমরা ভুলে গেছি। দেহ হল এক অসত্য স্বপ্ন, আর আমরা ভাবি আমরা হলাম দেহসর্বস্ব। এই বিচারবোধ-শূন্যতাই আমাদের দুঃখকষ্টের কারণ। এসব অজ্ঞতার কারণেই ঘটে। বিচারবোধ এলে তার সঙ্গে শক্তি আসে এবং একমাত্র তখনি আমরা এই দেহ, স্বর্গ ও দেবতা সম্বন্ধে নানা প্রকার ভাবনাকে বর্জন করতে সক্ষম হই। জাতি (শ্রেণী), চিহ্ন ও স্থান দ্বারা পৃথকীকরণের ফলেই আসে অজ্ঞানতা। একটি গোরুর উদাহরণ নেওয়া যাক। জাতি দিয়েই কুকুর থেকে গোরুকে

পৃথক করা হয়। এমন কি গোরুর ক্ষেত্রেই এক গোরু থেকে অন্য গোরুকে কিভাবে আমরা পৃথক করে বুঝে নিই ? চিহ্ন দ্বারা। দুইটি বস্তু যদি সমরূপ হয় তো পৃথক স্থানে থাকলে তাদের পার্থক্যটা বোঝা যায়। বস্তুগুলি যদি এত সংমিশ্রিত থাকে যে তাদের ঐভাবে আলাদা করা যাচ্ছে না, তখন পূর্ববর্ণিত অভ্যাসে অর্জিত বিচার-শক্তিই তাদের মধ্যে পার্থক্যবোধ জন্মাতে সাহায্য করবে। যোগীদের সর্বোচ্চ দর্শন যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এই, পুরুষ হল শুদ্ধ ও পূর্ণ এবং এই বিশ্বে একমাত্র 'সরল'। দেহ ও মন হল যৌগিক বস্তু, অথচ আমরা কিনা তাদের সঙ্গেই আমাদের একাত্ম করে তুলি। পার্থক্যটা যে হারিয়ে যায় এটাই সর্বাপেক্ষা বড় বিভ্রান্তি। এই বিচারশক্তি লাভ করলে মানুষ দেখতে পায় এই পৃথিবীতে মানসিক ও বাহ্য জাগতিক সব কিছুই হল মিশ্রিত পদার্থ এবং সেজন্যেই তা পুরুষ হতে পারে না।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫

৫৫ ॥ যে বিবেকের জ্ঞান (ভেদজ্ঞান) সকল বস্তু ও বস্তুর সমস্ত রকম বৈচিত্র্যকে যুগপৎ গ্রহণ করতে পারে সেই জ্ঞানকেই বলে ত্রাণকারী (তারক) জ্ঞান।

তারক (রক্ষাকারী), যেহেতু এই জ্ঞানই যোগীকে নিয়ে যায় জন্মমৃত্যু- সাগরের ওপারে। প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম যত রকম অবস্থা আছে তা এই জ্ঞানেরই আয়ত্তে থাকে। এই জ্ঞানে অনুভূতির ক্রমপর্যায় থাকে না, একটিবার দৃষ্টিপাত মাত্র সমস্ত কিছুই একসঙ্গে উদ্ভাসিত হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬

সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি যখন সমরূপ হয় তখনই লাভ হয় কৈবল্য।

আত্মা যখন বুঝতে পারে যে দেবতা থেকে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত কোন কিছুর উপরেই সে নির্ভরশীল নয় তখনই সে লাভ করে কৈবল্য (শুদ্ধ) এবং পূর্ণতা। সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যখন শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মিশ্রণরূপী সত্ত্ব (ধী)-কে স্বয়ং পুরুষের মতোই শুদ্ধ করে তোলা হয়েছে ; সত্ত্ব তখন কেবলমাত্র নির্গুণ সত্তসারকে উদ্ভাসিত করে তোলে এবং তাই হল পুরুষ।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা

জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ।। ১

১ ।। জন্ম, রাসায়নিক পন্থা (ঔষধ), শব্দশক্তি (মন্ত্রশক্তি), তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন অথবা একাগ্রতা দ্বারাই সিদ্ধিসমূহ (শক্তিগুলি) লাভ হয়।

কখনো কখনো সিদ্ধিযুক্ত (সিদ্ধ) হয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, অবশ্য তা সে পূর্বজন্মসূত্রেই অর্জন করে থাকে। এবারে সে যেন জন্মগ্রহণ করেছে তার সেইসব সুফল ভোগ করার জন্যেই। সাংখ্যদর্শনের মহান পিতৃরূপী কপিল সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সিদ্ধ হয়ে, অর্থাৎ বাচ্যার্থে সিদ্ধ হল যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন।

যোগীরা দাবি করেন, এইসব শক্তি রাসায়নিক পন্থায় লাভ করা যায়। তোমরা সবাই জানো রসায়ন মূলত শুরু হয়েছিল মধ্যযুগীয় ধাতুরসায়নরূপে, লোকে পরশ-পাথর বা সঞ্জীবনী সুধার অন্বেষণ করত, বা এমনি আর কিছু। ভারতে 'রাসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাদের ধারণায় আদর্শ, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম এসবই খুবই ভালো, কিন্তু একমাত্র দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যেই ঐসব লাভ করা সম্ভব। যখন তখন যদি দেহের শেষ হয়ে যেত, তবে তো লক্ষ্যে পৌঁছতে আরো কত বিলম্ব ঘটত। যেমন, কোনো লোক যোগাভ্যাস করতে চায় বা আধ্যাত্মিক হতে চায়। কিন্তু বহুদূর অগ্রসর হবার আগেই সে মারা গেল। তারপর সে আবার দেহ ধারণ করে আবারও শুরু করল এবং মরে গেল; তেমনি চলতে লাগল। এতে জন্মাতে ও মরতেই তো বহুকাল নষ্ট হয়ে যাবে। দেহটি যদি শক্তিমান হয়, পূর্ণরূপ পায় এবং তার ফলে বারবার জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্তি ঘটে, তবে তো আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবার জন্যে আরো কত সময় পাওয়া যায়। তাই রাসায়নেরা বলেন—প্রথমেই দেহটাকে খুব শক্তিমান করে তোলো। তারা দাবি করেন এই দেহকে মৃত্যুঞ্জয়ী করা যায়। তাঁদের ভাবটা হল, মনই যদি দেহকে সৃষ্টি করে থাকে এবং এটাই যদি সত্য হয় যে মন হল অনন্ত শক্তি প্রকাশের একটি পথ মাত্র, প্রত্যেকটি পথেই বাহির থেকে যে কোনো পরিমাণ শক্তি আহরণের ব্যাপারে কোনো সীমাই থাকতে পারে না। দেহকে সর্বকালেই রক্ষা করা সম্ভব নয় কেন? যতরকম দেহ যতকাল আমাদের ছিল সবই আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। এই দেহের মৃত্যু ঘটলে নবকলেবর সৃষ্টি করতে হবে। আমরা তা যদি পারি এই দেহ থেকে বহিষ্কৃত না হয়ে এখনই এখনই তা আমরা পারব না কেন? এই মতটা সম্পূর্ণই ঠিক। আমরা মৃত্যুর পরেও থাকব এবং অন্য দেহ ধারণ করব, এটা যদি সম্ভব হয় তো এই দেহকে সম্পূর্ণতই লয় না করে, কেবলমাত্র অবিরাম রূপান্তরিত করে এখানেই নব নব কলেবর সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকা অসম্ভব হবে কেন? তাঁরা এটাও মনে করতেন যে পারদ ও গন্ধকের মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এক শক্তি এবং এদের

দ্বারা তৈরী একরকম ঔষধের সাহায্যে লোকে তার দেহকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করতে পারে। অন্যেরা বিশ্বাস করতেন যে কোনো কোনো ঔষধ শক্তিদান করে, যেমন আকাশে ওড়ার শক্তি। বর্তমান কালের আশ্চর্যতম ঔষধের জন্য আমরা রসায়নশাস্ত্রের কাছে ঋণী—বিশেষত উল্লেখ্য ঔষধে ধাতুর ব্যবহার।

কোনো শ্রেণীর যোগীরা দাবি করেন—তাদের প্রধান গুরুদের অনেকেই তাদের প্রাচীন দেহ ধারণ করেই এখনো বেঁচে আছেন। যোগশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ পতঞ্জলি তা অস্বীকার করেন না।

শব্দশক্তি (মন্ত্রশক্তি): কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শব্দ আছে তাকে বলা হয় মন্ত্র, যথোপযুক্ত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি দ্বারা তা অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। দিবারাত্রই আমরা এমন সব লোকাতীত অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে বাস করছি যে সেগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। মন্ত্রশক্তি এবং মনঃশক্তিরূপী মানবশক্তির কোনো সীমা নাই।

তপস্যা: তোমরা দেখবে প্রত্যেক ধর্মেই তপ ও কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করা হয়। এই ধর্মধারণায় হিন্দুরা একটু চরমপন্থী। কোনো লোককে দেখতে পাবে সারাজীবনই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বাহু শুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে যায়। কোনো কোনো লোক দিবারাত্র দাঁড়িয়েই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পা দুটো ফুলে ওঠে, এবং তাদের জীবনকালে পা দুটো সেই অবস্থায় থেকে থেকে এমন শক্ত হয়ে যায় যে তা আর ভাঁজ করতে পারে না—মৃত্যু পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। আমি একবার একজন লোককে দেখেছিলাম—তার হাত দুটো সে উপরে তুলে রেখেছে। জিজ্ঞেস করলাম প্রথম প্রথম এতে তার কি রকম লাগে। সে বলল—সে এক ভয়াবহ যন্ত্রণা। সে এমন যন্ত্রণা যে সে নদীতে গিয়ে জলে নেমে থাকত, এতে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণাটা কম মনে হত। মাসখানেকের পরে ততটা আর কষ্ট হত না। এমন অভ্যাসের দ্বারা শক্তি (সিদ্ধি) আসতে পারে।

একাগ্রতা: একাগ্রতা হল সমাধি এবং সেটাই যথাযথ যোগ; এই বিজ্ঞানের তা-ই হল মুখ্য বিষয়, এটা সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থাও। পূর্ব-উল্লিখিতগুলি হল কেবলমাত্র গৌণ, এবং তাদের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চকে লাভ করতে পারি না। সমাধি হল এমন এক পন্থা যার সাহায্যে আমরা মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোনো কিছুই এবং সর্বকিছুকেই লাভ করতে পারি।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২

২ ॥ প্রকৃতির মধ্যে স্থানপূরণের দ্বারা, একজাতি থেকে আর একজাতিতে পরিবর্তন ঘটে।

পতঞ্জলি এই মত উপস্থাপিত করেছেন যে এই শক্তিগুলি আসে জন্মগতসূত্রে, কখনো বা রাসায়নিক পন্থায় অথবা তপের মাধ্যমে। তিনি অবশ্য এটাও স্বীকার করেন যে এই দেহকেই যতকাল খুশি রক্ষা করা যায়। এবার তিনি বিবৃত করছেন এই দেহই

অন্য জাতের দেহে রূপান্তরিত হবার কারণ কি ? তিনি বলেন এটা হয় প্রকৃতিতে স্থান পূরণের ধারা। পরবর্তী ভাষ্যসূত্রেই তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩

৩॥ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ সৎ বা অসৎ কর্ম নয়, তবে তারা প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথে বাধাভঙ্গকারীরূপে কাজ করে থাকে,—কৃষক যেমন জলপ্রণালীর বাধা ভেঙে দিলে জলস্রোত স্বপ্রকৃতিতেই বয়ে চলে।

জলসেচের জল তো খালে আগেই রয়েছে, কেবলমাত্র দরজা বন্ধ অবস্থায় আছে। কৃষক এই দরজাগুলি খুলে দেয় এবং জলও নিজেই মাধ্যাকর্ষণ বলেই প্রবাহিত হয়। তেমনি সমস্ত উন্নতি ও শক্তি আগে থেকেই রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষেরই মধ্যে ; পূর্ণতা (লাভ) হল মানুষের প্রকৃতি—কেবলমাত্র তা প্রকৃত পথ অবলম্বনে ব্যাহত হচ্ছে, রুদ্ধ করা হচ্ছে। কেউ যদি বাধাটা সরিয়ে দেয় তো প্রকৃতি নিজেই সবেগে প্রবাহিত হয়। তখন তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় শক্তিই সে লাভ করে। তখন আমরা যাদের দুষ্ট বলি, তারাও হয়ে ওঠে সাধুসন্ত,—বাধা ভাঙলে ও প্রকৃতি প্রবাহিত হলেই এমনটা হয়। প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দেয় এবং ঘটনাক্রমে সে প্রত্যেককেই সেখানে নিয়ে আসবে। ধর্মকর্মের এতসব অভ্যাস ও সংগ্রাম নঞর্থক ক্রিয়া—কেবল বাধা অপসারণের জন্যই, যে পূর্ণতা আমাদের জন্মগত অধিকার আমাদেরই প্রকৃতি তার দিকে দরজা খুলে দেবার জন্যে।

আধুনিক গবেষণার আলোকে সনাতন যোগীদের বিবর্তন মত আজকাল আরো ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে। তবে কিনা যোগীদেব মত হল সুষ্ঠুতর ব্যাখ্যা। বিবর্তন সম্পর্কে আধুনিকদের প্রদত্ত যৌন-নির্বাচন ও যোগ্যতমের জীবন-জয় মত দুটি পর্যাপ্ত নয়। ধরা যাক, মানবজ্ঞান এতদূর উন্নত হয়েছে যে প্রতিযোগিতার সেখানে আর স্থান নেই—জীবিকা অর্জনের জন্যেও নয়, আসঙ্গলাভের জন্যেও নয়। তখন আধুনিকদের মতে তো মানব অগ্রগতি থেমে যাবে এবং মানবজাতির মৃত্যু ঘটবে। এই মতের পরিণাম হল পশ্চাতে একটি যুক্তি খাড়া করিয়ে প্রত্যেকটি নিপীড়ককেই তাদের বিবেকের ভৎ‍র্সনা থেকে মুক্তিদান। এমন লোক এখনো রয়েছে যারা দার্শনিকরূপে নিজেদের জাহির করে সমস্ত দুষ্ট ও অযোগ্য লোককেই হত্যা করতে চায় (তারাই যেন যোগ্যতা বিচারের একমাত্র অধিকারী) এবং এইভাবে মানবজাতিকে বাঁচাতে চায় ! কিন্তু প্রাচীনকালের মহান বিবর্তনবাদী পতঞ্জলি ঘোষণা করছেন—বিবর্তনের প্রকৃত রহস্য হল প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত পূর্ণতারই প্রকাশ ; এবং এই পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে, ফলে অন্তরালের অনন্ত প্রবাহ আত্মপ্রকাশের জন্যেই সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা আমাদেরই অজ্ঞানতার ফল ; কারণ, আমরা দরজাটি খুলে স্রোত প্রবাহিত করার প্রকৃত পন্থাটি জানি না। অন্তরালের এই অনন্ত প্রবাহকে প্রকাশিত হতে দিতে হবে ; এটিই তো সমস্ত প্রকাশের মূলীভূত কারণ। জীবিকার প্রতিযোগিতা ও যৌন উপভোগ তো ক্ষণিকের এবং তা অনিবার্য নয়। বহিরঙ্গ

পরিণামমূলক এবং অজ্ঞতাজনিত। সমস্ত প্রতিযোগিতা যখন বন্ধ হয়ে যাবে এমন কি তখনো আমাদের অন্তরস্থিত এই পূর্ণতাধর্মী প্রকৃতি প্রত্যেকেই পূর্ণ না হওয়া পর্যন্তই অগ্রসর হয়ে চলবে সম্মুখের দিকে। তাই এমন বিশ্বাসের কারণ নেই যে প্রগতির জন্যেই প্রতিযোগিতা প্রয়োজন। পশুর মধ্যে মানুষকে দমিত রাখা হয়েছে, কিন্তু দরজা খোলা মাত্রই মানুষ প্রবলবেগে বেরিয়ে আসে। তাই মানুষের মধ্যেই রয়েছে সম্ভাবিত দেবতা। দেবতার শক্তি, তা শুধু অজ্ঞানতার অর্গলে শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে রয়েছে। জ্ঞান যখন এই অর্গল শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলে তখন প্রকাশিত হয় দেবতা।

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪

৪ ॥ একমাত্র অহংবোধ থেকেই উদ্ভূত হয় বহুমনের রূপ (সৃষ্ট মনসমূহ)।

কর্মবাদ বলে আমরা আমাদের সৎ বা অসৎ কর্মেরই ফলভোগ করি এবং মানবিক মহিমায় উপনীত হওয়াটা হল সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্র। সমস্ত শাস্ত্রেই উদ্গীত হয়েছে মানবমহিমা, আত্মার মহিমা এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রচার করেছে কর্মকে। সৎ কর্ম সৎ ফল আনে, অসৎ কর্ম অসৎ ফল ; কিন্তু আত্মাকেই যদি সৎ বা অসৎ কর্মদ্বারা প্রভাবিত বা ক্রিয়াশীল করা যায় তবে তো আত্মা একটা কিছুই নয়। অসৎ কর্ম পুরুষকে (আত্মাকে) স্ব-প্রকৃতি প্রকাশে বাধা দেয় ; সৎকর্ম বাধাটা দূরীভূত করে দেয় এবং পুরুষ-মহিমা তখন প্রকাশিত হয়। পুরুষ স্বয়ং কখনো পরিবর্তিত হন না। তুমি যাই করো না কেন, তোমার মহিমা, তোমার প্রকৃতি তাতে কখনো ধ্বংস হয় না, কারণ কোনো কিছুই আত্মার উপরে কাজ করতে পারে না। কেবলমাত্র তার সম্মুখে একটা পর্দা ফেলে তার পূর্ণতাকে ঢেকে দিতে পারে।

যোগীরা তাদের কর্মকে (কর্মজীবনকে) তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করবার উদ্দেশ্যে কায়ব্যূহ বা বহুদেহের একটি দল সৃষ্টি করে থাকেন এবং সেখানে সমস্ত কর্মই সম্পাদন করে যান। এইসব দেহের জন্য তারা অহংভাব থেকে বসুধা সৃষ্টি করেন। এসবকেই বলা হয় 'নির্মাণচিত্ত' (সৃষ্ট মনসমূহ)।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫

৫ ॥ যদিও বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট মনের ক্রিয়াদি বিভিন্ন রকমের, এক মূলীভূত মন ঐ সকলেরই নিয়ন্ত্রক।

এই বিভিন্ন প্রকারের যে মনগুলি বিভিন্ন রকম দেহের উপর কাজ করে তাদের বলা হয় সৃষ্ট মন, আর দেহগুলিকে বলা হয় সৃষ্ট দেহ, অর্থাৎ কিনা নির্মাণদেহ ও মন। পদার্থ ও মন এরা দুটি হল দুটি অফুরন্ত সঞ্চয়ভাণ্ডার। যোগী হলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার গোপন সূত্রটিও জানতে পারবে। সব সময়েই তো তা তোমারই কিন্তু তুমি তা ভুলে গেছ। তুমি যোগী হও, সব মনে পড়বে। তখন তুমি তা দিয়ে যা খুশি করতে পারবে, তোমার যেমনভাবে খুশি চালনা করতে পারবে। যে উপাদান থেকে তৈরী মনের সৃষ্টি হয় সেই উপাদান দিয়েই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। মন এক ও পদার্থ আর এক নয় ; তারা একই জিনিসের দুটি দিকমাত্র। অস্মিতা অর্থাৎ অহংভাব। সেই উপাদান-

অস্তিত্বের সেই সূক্ষ্মসার, যা থেকে যোগীদের নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ জন্ম নেয়। তাই যোগী যখন প্রকৃতির শক্তিসমূহের গোপন রহস্যের সন্ধান পান, তিনি অহং-ভাবের (অস্মিতার) মূলবস্তু থেকে যত সংখ্যক খুশি দেহ বা মন তৈরী করতে পারেন।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥

৬॥ বহুরকম চিত্তের মধ্যে সমাধি-লব্ধ চিত্তই আকাঙ্ক্ষা-রহিত।

বহুরকম লোকের মধ্যে বহুরকম মন দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে মন সমাধি বা পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করেছে তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ। যে লোক ঔষধাদি, শব্দ বা তাপের সাহায্যে কতকগুলি শক্তি অর্জন করেছে, তার তখনও আকাঙ্ক্ষা থাকে; কিন্তু যে একাগ্রতার সাহায্যে সমাধি লাভ করেছে একমাত্র সে-ই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাদি থেকে মুক্ত।

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭

৭॥ যোগীদের কাছে কর্ম কৃষ্ণও নয় শুভ্রও নয়, অন্যদের কাছে তা তিনপ্রকার: কৃষ্ণ, শুভ্র ও মিশ্রবর্ণ।

যোগী যখন সিদ্ধিলাভ করেন, ক্রিয়া ও ক্রিয়াজাত কর্ম তাকে বদ্ধ করে না; কারণ তা তিনি তা চান না। তিনি কর্ম করে যান, তিনি কল্যাণের জন্যেই কাজ করেন; তিনি কল্যাণকর্ম করেন কিন্তু পরিণামের দিকে তাকান না, তাই কর্মফল তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু সাধারণ লোকের বেলায়, যারা ঐ সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয় নি তাদের জন্যে তিনরকমের কাজ বর্তমান থাকে: কৃষ্ণ (অসৎ কর্মাদ), শুভ্র (সৎ কর্মাদি) এবং মিশ্র।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮

৮॥ এই ত্রিরূপ কর্মাদি থেকে একমাত্র সেই আকাঙ্ক্ষাদিই প্রকাশিত হয়ে থাবে (যা) একমাত্র সেই অবস্থার পক্ষেই যথাযোগ্য। (অন্য সবগুলি সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকে।)

মনে করো, সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত এই তিনরকমের কর্মই করলাম এবং মনে করো আমি মরে স্বর্গে গিয়ে কোনো দেবতা হয়েছি। মানবদেহে যেমন যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে, দেবদেহে ঠিক সেইরকম থাকে না; দেবদেহ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে না। আমার অতীতের অসাধিত কর্ম—যা তাদের পরিণামস্বরূপ ক্ষুধাতৃষ্ণার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, তাদের কী হয়? আমি যখন দেবতা হলাম তখন আমার ঐসব কর্ম কোথায় যাবে? উত্তর হল: যথাযোগ্য পরিবেশেই আকাঙ্ক্ষাদি প্রকাশিত হতে পারে। যাদের যথাযোগ্য পরিবেশ রয়েছে, একমাত্র তেমন আকাঙ্ক্ষাগুলিই আত্মপ্রকাশ করে থাকে, বাকিগুলি সঞ্চিত থাকে। এই জীবনে আমাদের রয়েছে কত না দেবসম্ভব আকাঙ্ক্ষা, কতনা মানবসম্ভব আকাঙ্ক্ষা, কত না জান্তব আকাঙ্ক্ষা। যদি দেবদেহ ধারণ করি তো কেবলমাত্র সৎচিন্তাগুলিই দেখা দেবে, কারণ তাদের জন্য পরিবেশটি যথাযোগ্য। আমি যদি জন্তু-দেহ ধারণ করি তো কেবলমাত্র জান্তব চিন্তাগুলি দেখা দেবে। সৎচিন্তা (সঞ্চয়ভাণ্ডারে পিছনে) অপেক্ষা করবে। এতে কি বোঝা গেল?

দেখা গেল, পরিবেশের সাহায্যে আমরা এইসব আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে পারি। একমাত্র পরিবেশের পক্ষে যথাযোগ্য এবং যথোপযুক্ত কর্মই প্রকাশিত হয়। এতেই বোঝা গেল পরিবেশ-জাত শক্তিই এমন কি কর্মকেও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে এক মস্ত বড়ো অবরোধ বিশেষ।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯

৯॥ জাতি, দেশ (স্থান) ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলেও স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে সমরূপ থাকার জন্যে আকাঙ্ক্ষার ক্রমবাহিতা থাকে।

অভিজ্ঞতাই সূক্ষ্ম হয়ে সংস্কার রূপ ধারণ করে, সংস্কার পুনর্জাগ্রত হয়ে স্মৃতি হয়। স্মৃতি শব্দটির মধ্যে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অতীত অভিজ্ঞতাদির অচেতন সংযোগ থেকে উদ্ভূত সংস্কারের সঙ্গে বর্তমানের সচেতন ক্রিয়াদি। সমদেহে অর্জিত সংস্কার সমষ্টিই প্রত্যেক দেহে ঐ দেহের কর্মের কারণ হবে। অসম দেহের অভিজ্ঞতা তখন রুদ্ধ থাকে। প্রত্যেক দেহই তার অনুরূপ শরীরগুলির উত্তরাধিকারীরূপে ক্রিয়া করে; এইভাবে আকাঙ্ক্ষার ক্রমবাহিতা ভগ্ন হয় না।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০

১০॥ সুখের বাসনা চিরন্তন বলে বাসনারও আদি নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতার পূর্বে সুখাকাঙ্ক্ষা থাকে। অভিজ্ঞতার শুরু থাকে না, কারণ প্রত্যেকটি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পুরাতন অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রবণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত; অতএব আকঙ্ক্ষার আদি নেই।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১

১১॥ এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও বিষয় দ্বারা গ্রথিত থাকার দরুন এদের অভাব হলে বাসনারও অভাব হয়।

হেতু (কারণ) ও ফল দ্বারা আকাঙ্ক্ষাগুলি গ্রথিত থাকে; কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলে কোনো ফল না রেখে তা মরে যায় না। তারপর, মনপদার্থও আবার বিরাট এক সঞ্চয়ভাণ্ডার—সংস্কার আকারে পরিণত সমস্ত অতীত আকাঙ্ক্ষার পৃষ্ঠপোষক। তারা কর্মরূপে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত মরে যায় না। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যে পর্যন্ত বহির্বস্তুকে গ্রহণ করবে, নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। কার্য, কারণ, আধার ও বিষয়—এসব থেকে মুক্তি পাওয়া যদি সম্ভব হয় তো একমাত্র তখনই আকাঙ্ক্ষার বিনাশ হতে পারে।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥ ১২

১২॥ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্বপ্রকৃতিগতভাবেই স্বরূপেই বর্তমান থাকে, তাদের গুণাদিই বিভিন্ন রূপ পেয়ে থাকে।

তাৎপর্য হল অসৎ (অস্তিত্বহীনতা) থেকে কখনো সৎ (অস্তিত্ব বা সত্তা) উৎপন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রকাশরূপে না থাকলেও সূক্ষ্ম আকারে বর্তমান থাকে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩

১৩॥ সগুণ-প্রকৃতি হওয়ার জন্যে তারা প্রকাশিত হয়—(স্থূলরূপে) কিংবা সূক্ষ্মরূপে।

গুণ হল তিনরকমের—সত্ব, রজঃ, তমঃ; এদের স্থূলাবস্থাটাই হল এই অনুভবলব্ধ বিশ্বজগৎ। এইসব গুণের বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ থেকেই উদ্ভূত হয় অতীত ও বর্তমান।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪

১৪॥ বস্তুদের মধ্যে ঐক্য জন্মে রূপান্তরের ঐক্য থেকে।

সারবস্তু তিনরকমের হলেও তাদের মধ্যে সহযোগ থাকার জন্যেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে ঐক্য বর্তমান।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫

১৫॥ যেহেতু অনুভব ও আকাঙ্ক্ষা একই বিষয়েও বিভিন্ন হয়, মন ও বস্তুর প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়।

অর্থাৎ আমাদের মনগুলির অধিকারের বাইরে এক স্বাধীন বস্তুজগৎ আছে। এটা বৌদ্ধ আদর্শবাদ-খণ্ডনকারী বিরোধী তত্ত্ব। যেহেতু বিভিন্নরকমের লোক একই বস্তুকে বিভিন্নরকম দেখে, বস্তু তাই কোনো একটি ব্যক্তিরই কল্পনা হতে পারে না।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬

১৬॥ বস্তুসমূহ মনের উপর যে রঙে প্রতিফলিত হয় তারই উপরে নির্ভরশীল হয়ে ঐ বস্তুসমূহ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হয়ে থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৭

১৭॥ চিত্তবৃত্তিগুলির অবস্থাকে সর্বদাই জানা যায়; কারণ মনের প্রভু পুরুষ হল অপরিবর্তনীয়।

এই মতবাদের সারকথা হল যে বিশ্বজগৎ মানস-সৃষ্ট ও বস্তু-সৃষ্ট দুইই। উভয়ই রয়েছে এক নিত্য পরিবর্তনশীল প্রবাহের আকারে। এই বইখানা কী? এটা হল নিত্যপরিবর্তনশীল অণুগুলির যৌগিক রূপ। একদল বেরিয়ে যাচ্ছে, আর একদল প্রবেশ করছে; এ একটা ঘূর্ণি, কিন্তু ঐক্যটা কিসে? ঐ বইটি তৈরী হচ্ছে কিসে? পরিবর্তনগুলি ছন্দোময়; সুসমঞ্জস পদ্ধতিতে তারা মনের কাছে তাদের সাড়া পাঠাচ্ছে এবং এই টুকরো টুকরো সাড়াগুলি গ্রথিত হয়ে একটি অবিরাম চিত্র উপস্থিত করছে,—যদিও খণ্ডগুলি অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। মন নিজেই অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। মন ও দেহ যেন একই পদার্থের দুটি স্তর—দুই বিভিন্ন গতিতে চলছে। পারস্পরিকভাবে একটি শ্লথতর, অন্যটি দ্রুততর; দুটি গতিকে আমরা পৃথক করতে পারি। ধরো, একটা রেলগাড়ি চলছে, তার পাশাপাশি চলছে একটা গাড়ি। কতকটা দূর পর্যন্ত উভয়ের গতিই লক্ষ্য করা সম্ভব। তবুও আরো কিছু দরকার। গতি তখনই অনুভব করা যায়, যখন অন্যকিছু চলছে না। কিন্তু দুটো

তিনটে জিনিস যখন পারস্পরিকভাবে চলে, প্রথমত অনুভব করি. আমরা দ্রুততর গতিটা এবং তারপরেই শ্লথতরটা। মন কেমন করে তা অনুভব করে? তাও তো নিয়ত গতিশীল। কাজেই আর একটা জিনিসের দরকার যা আরো শ্লথগতিতে চলছে, এবং তারপর আর কিছু যা আরো শ্লথতর গতিতে চলছে এবং তারপর আরো আরো; এর আর যেন শেষ নেই। কাজেই যুক্তিবিজ্ঞানই তোমাকে কোথাও থামতে বলছে। এই ধারায় শেষপর্যন্ত তোমাকে এমনকিছু জানতে হবে যার কখনো পরিবর্তন হয় না। এই নিত্য বিরামহীন গতিশৃঙ্খলার পশ্চাতে রয়েছে পুরুষ—অপরিবর্তনীয়, বর্ণরহিত, বিশুদ্ধ। ম্যাজিক লণ্ঠনের আলো যেমন পর্দায় কোনোরূপেই মালিন্য সৃষ্টি ছাড়াই প্রতিমূর্তিগুলিকে নিক্ষিপ্ত করে,: তেমনি ঐসব সংস্কারগুলিও কেবলমাত্র প্রতিফলিতই হয়।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮

১৮॥ মন বস্তুবিশেষ বলেই তা স্ব-দীপ্যমান (স্বপ্রকাশ) নয়।

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তি প্রকাশমান, কিন্তু তা স্বপ্রকাশ নয়, এবং মূলত তা চৈতন্যময়ও (বুদ্ধিদীপ্তও) নয়। একমাত্র পুরুষই (স্বপ্রকাশ) স্বদীপ্যমান এবং তার স্বকীয় দীপ্তিই সে দান করে সবকিছুকে। সমস্ত বস্তুর ও বেগের মধ্য দিয়েই পুরুষের শক্তিই সঞ্চালিত হয়।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯

১৯॥ উভয়কে:একইকালে জানতে পারে না বলেই (মন স্বপ্রকাশ নয়)।

মন যদি স্ব-দীপ্তিমান হত, তাহলে একই সময়ে নিজেকেই এবং তার বিষয়বস্তুকেও জানতে পারত, কিন্তু তা সে পারে না। বস্তুকে যখন জানতে পারে তার- নিজের উপরে প্রতিফলিত:হতে পারে না। তাই পুরুষই স্বদীপ্তিমান (স্বপ্রকাশ), মন নয়।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ॥ ২০

২০॥ আর একটি জ্ঞাতা মনও ধরে নেওয়া গেলে অনুমানের আর শেষ থাকে না এবং তার ফলে ঘটবে স্মৃতি-বিভ্রান্তি।

মনে করা যাক, আর একপ্রকার মন সাধারণ মনকে জানছে; তাহলে আরো এক মন থাকবে যা জানছে ঐ আগের মনকেই এবং এইভাবে তার আর সমাপ্তি থাকবে না। ফলে ঘটবে স্মৃতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, স্মৃতির সঞ্চয়ভাণ্ডার বলতে কিছুই আর থাকবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিংসম্বেদনম্ ॥ ২১

২১॥ জ্ঞানের স্বরূপ (পুরুষ) অপরিবর্তনীয় হওয়ার কারণে মন তার আকার গ্রহণ কালে সচেতন হয়।

পতঞ্জলি বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবার জন্যে বলেন যে জ্ঞান পুরুষের গুণ নয়। মন পুরুষের কাছে এলে তা (পুরুষ) যেন মনের উপরেই প্রতিবিম্বিত হয়, এবং মনও সাময়িকভাবে জ্ঞাতা হয় এবং তাকেই যেন পুরুষ বলে মনে হয়।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২২

২২। মন দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এই উভয়ের দ্বারা রঞ্জিত হলে সকলই সে জানতে পারে।

মনের একদিকে রয়েছে বহির্জগৎ—দৃষ্ট সমস্ত সেখানে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে, অন্য দিকে দ্রষ্টাও প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। এইভাবে মনে সমস্ত জ্ঞানের শক্তি দেখা দেয়।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩

২৩॥ সেই মন অসংখ্য বাসনা দ্বারা চিত্রিত হলেও সংহতবলে পরের (পুরুষের) পক্ষে কাজ করে, কারণ তা সংযোগে কাজ করে।

মন হল বহু বস্তুর সংমিশ্রণ, কাজেই তা নিজের জন্যেই কাজ করতে সমর্থ হয় না। এই পৃথিবীতে যা কিছুই সংমিশ্রণ তাদের সেই সংমিশ্রণেরই কোনো লক্ষ্যবস্তু আছে,—কোনো তৃতীয় কিছু আছে যার জন্যেই চলছে এই সংমিশ্রণ। কাজেই মনের এই সংমিশ্রণ পুরুষের জন্যেই।

বিশেষদর্শিন্ আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪

২৪ ॥ ভেদ-বিচারশীলদের জন্যে আত্মারূপে মনের অনুভব থাকে না।

ভেদবিচার দ্বারাই যোগী জানতে পান যে পুরুষ মন নন।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং চিত্তম্ ॥ ২৫

২৫ ॥ তখন ভেদবিচারে মগ্ন থেকে মন কৈবল্যের (বিযুক্ত এককের) পূর্ববর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এইভাবে যোগাভ্যাস ভেদবিচার শক্তির স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির দিকে পৌঁছে দেয়। চোখ থেকে পর্দা সরে যায়, আমরা সবকিছুকে যথার্থরূপেই দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই প্রকৃতি হল যৌগিক বস্তু এবং পুরুষকে সাক্ষীরূপে রেখে তা এই বিচিত্র (প্রাকৃতিক) দৃশ্যাদি দেখায়; দেখায় যে প্রকৃতিই প্রভু নয়, দেখায় যে প্রকৃতির যত কিছু যৌগিক রূপ তা কেবল প্রাকৃতিক ঘটনাদি অভ্যন্তরস্থ পুরুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যেই। বহু অভ্যাসের ফলে ভেদবিচার এলে ভয় চলে যায়, মন বিচ্ছিন্নতা লাভ করে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬

২৬ ॥ তার বাধাস্বরূপ যে ভাবগুলি জাগ্রত হয় তা আসে সংস্কার থেকে।

যেসব ভাব জাগ্রত হয়ে আমাদের মনে প্রত্যয় জন্মায় যে আমাদের সুখের জন্য দরকার কিছু বহির্বস্তু—সেসব ভাবই পূর্ণতার পক্ষে বাধা। পুরুষ স্ব-ভাবেই সুখ ও শান্তি। কিন্তু সেই জ্ঞান অতীত সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৭

২৭ ॥ পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে (২।১০), অজ্ঞানতা, অহংভাব ইত্যাদির মতোই তাদের ধ্বংস ঘটে।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮

২৮ ॥ এমনকি সারভূত প্রসঙ্গে যথাযথ বিচারজ্ঞানে পৌঁছলেও যে (কর্ম) ফল ত্যাগ করে সেই পরিশুদ্ধ বিচারবোধের ফলস্বরূপ লাভ করে ধর্মমেঘস্বরূপ সমাধি।

যোগী যখন এই ভেদবিচারবোধে পৌঁছয়, পূর্ব-অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত শক্তিই তার মধ্যে দেখা দেয়; প্রকৃত যোগী কিন্তু ওই সবই প্রত্যাখ্যান করে। তার কাছে

আসে এক বিচিত্র ধরনের জ্ঞান, কোনো এক জ্যোতি—যার নাম ধর্মমেঘ। জগতের যেসব ধর্মগুরুর কথা ইতিহাসে লিখিত আছে তাঁরা সকলেই এর অধিকারী ছিলেন। তাঁরা সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তির সন্ধান পেয়েছেন নিজেদের মধ্যেই। তাঁদের কাছে সত্যই হয়েছে বাস্তব। মিথ্যা অহংকারের যত শক্তি সবই পরিবর্জন করার পর শান্তি স্থিরতা এবং পূর্ণশুদ্ধি হয়েছে তাঁদের স্ব-ভাব।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ॥ ২৯

২৯॥ তা থেকেই আসে কষ্ট ও কর্মের নিবৃত্তি।

ঐ ধর্মমেঘ যখন দেখা দেয়, তখন আর পতনের ভয় থাকে না, কোনোকিছুই আর যোগীকে নিচে টেনে নামাতে পারে না। তাঁর কাছে আর কোনো পাপই আসতে পারে না, কোনো বেদনাও নয়।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্॥ ৩০

৩০॥ তখন আবরণশূন্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অনন্ত অসীম হয়, জ্ঞেয় বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।

জ্ঞান (ভিতরেই) রয়েছে, (এবারে) আবরণও দূর হল। এক বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত হয়েছে 'বুদ্ধ' (এক অবস্থার নাম) বলতে বোঝায় অনন্ত জ্ঞানকে—আকাশের মতো যা অসীম। যীশু তাই লাভ করে হয়েছিলেন খ্রীষ্ট। আমরা সকলেই সেই অবস্থা লাভ করব। জ্ঞান যতই অনন্ত হয়, জ্ঞেয় ততই ছোট হয়। সমস্ত জ্ঞানবস্তু নিয়ে সমগ্র বিশ্বজগৎই পুরুষের কাছে শূন্যপ্রায় হয়ে যায়। সাধারণ লোকে নিজেকে ছোট ভাবে কেন, যেহেতু জ্ঞেয়কে (জ্ঞানের বস্তুকে) তার কাছে মনে হয় অসীম অনন্ত।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগু'ণানাম্॥ ৩১

৩১॥ তখন পরিণাম প্রাপ্তিহেতু গুণের পর্যায়ক্রম রূপান্তর শেষ হয়ে যায়।

তখন এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে পরিবর্তনশীল সব গুণের সবরকম রূপান্তর চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রা'হ্যঃ ক্রমঃ॥ ৩২

৩২॥ যে পরিবর্তনগুলি প্রতিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং যাদের (পর্যায় শেষে) অন্য প্রান্ত থেকে অনুভব করা যায় তারা হল ক্রমশ (ক্রমবাহিতা)।

পতঞ্জলি এখানে 'ক্রম' শব্দের সংজ্ঞা দিচ্ছেন। তা হল প্রতিটি মুহূর্তের (ক্ষণের) পরিবর্তনাদি। আমি যখন ভাবছি বহুক্ষণ চলে যাচ্ছে, তখন প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু একটি ক্রমের (পর্যায়ক্রমের) প্রান্তেই আমি তা অনুভব করতে পারছি। একেই বলে ক্রম (ক্রমপর্যায়), কিন্তু যে মন সর্বত্রবিরাজমান সেখানে কোনো ক্রম নেই। সমস্তটাই (একসঙ্গে) তার কাছে বিরাজমান; কেবলমাত্র বর্তমানই (বর্তমানরূপেই) তার কাছে তা উপস্থিত থাকে—অতীত ও ভবিষ্যৎ হারিয়ে যায়। কাল নিয়ন্ত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এক মুহূর্তেই সমগ্র জ্ঞান এসে দেখা দেয়। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একঝলকে সমস্ত কিছুই জানা হয়ে যায়।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ
কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩

৩৩ ॥ গুণসমূহের বিপরীতমুখী ক্রমে বিলয় হলে—পুরুষের উদ্দেশ্যে কোনোপ্রকার কর্মের অভীপ্সাশূন্য হলে কৈবল্য ঘটে অথবা তাকে বলে স্বপ্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠান।

প্রকৃতির কাজ সমাধা হয়েছে, শেষ হয়েছে মনোরমা ধাত্রীরূপিনী প্রকৃতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নিঃস্বার্থ ব্রত। সে হাত ধরেই যেন নিয়ে এসেছে আত্মবিস্মৃত আত্মাকে, এক এক করে দেখিয়েছে বিশ্বজগতের সমস্তরকম অভিজ্ঞতা-রাজ্য, সমস্ত প্রকাশবৈচিত্র্য। তার হারানো সব মহিমা ফিরে না আসা পর্যন্ত, তার স্ব-প্রকৃতি স্মৃতিপথে জাগরূক না হওয়া পর্যন্ত সে বহু দেহের মাধ্যমে তাকে ধীরে ধীরে তুলে এনেছে উচ্চতর থেকে উচ্চতম স্তরে। তারপর সেই ধাত্রীমাতা ফিরে গেছে যে পথ ধরে সে এসেছিল, ফিরে গেছে তাদের জন্যে যারা পথহীন জীবনমরুতে ঘুরে মরছে। এবং এইভাবেই সে কাজ করে যাচ্ছে অনাদি অনন্তকাল। এইভাবেই সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে, ভালো-মন্দের মধ্যে দিয়ে আত্মার অনন্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে পূর্ণতার মহাসমুদ্রে, আত্মোপলব্ধির অনন্ত সাগরে।

যাঁরা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তাঁদের মহিমা ঘোষিত হোক। তাঁদের আশীর্বাদ যেন আমাদের উপর বর্ষিত হয়।

পরিশিষ্ট

যোগ-বিষয়ক সম্বন্ধ-সূত্র
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥ ৬

৬॥ যেখানে অগ্নিকে মর্দন করা হয়, বায়ুকে নিরোধ করা হয়, যেখানে সোম-রসের প্লাবন দেখা দেয়—সেখানেই সিদ্ধ মনের উৎপত্তি (ঘটে)।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮

৮॥ বক্ষ, গ্রীবা এবং শিরকে উন্নত করে দেহকে খাড়াভাবে রেখে, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের ভিতর প্রবেশ করিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতরণীর সাহায্যে সমস্ত ভয়াবহ প্রবাহ পার হয়।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯

৯॥ সুনিয়মিত সপ্রচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করে; এবং তা শান্ত হলে নাসিকারন্ধ্র-পথে বহির্গত করে। চঞ্চল অশ্বকে সারথি যেমন ধারণ করেন, অধ্যবসায়ী জ্ঞানীও তেমনি তাঁর মনকে সংযত রাখেন।

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥ ১০

১০॥ পর্বতগুহার মতো (নির্জন) স্থানে যেখানে ভূমি সমতল, প্রস্তরখণ্ডশূন্য, অগ্নি বা বালুকাশূন্য, যেখানে মানুষের বা জলপ্রপাতের গণ্ডগোল নেই এবং মনের সহায়ক ও নয়নের প্রীতিকর তেমন কল্যাণক্ষেত্রেই যোগাভ্যাস করতে হবে (মনকে সংযুক্ত করতে হবে)।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১

১১ ॥ তুষারপাত, ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোৎ, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, চন্দ্র—এই আকারগুলি সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যোগে ব্রহ্মকে ক্রমশ ব্যক্ত করে।

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২

১২ ॥ যখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত থেকে যোগের অনুভূতি ঘটে তখনই যোগ শুরু হয়। যে যোগী তার দেহকে যোগাগ্নি দিয়ে গঠন করেছে তার কাছে ব্যাধি, বার্ধক্য বা মৃত্যু আসে না।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩

১৩। যোগ-প্রবেশের প্রথম লক্ষণ হল লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশূন্যতা, স্বচ্ছবর্ণ, মধুর স্বর, দেহে রুচিকর গন্ধ এবং মলমূত্রের স্বল্পত্ব।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্‌।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

১৪ ॥ স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত থাকে তারপরে পরিষ্কৃত হলেই আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি দেহধারী ব্যক্তিও আত্মতত্ত্বে একতে দর্শন করে লক্ষ্য লাভ করে ও দুঃখমুক্ত হয়।

শঙ্কর-উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য

'আসনানি সমভ্যস্য বাঞ্ছিতানি যথাবিধি।
প্রাণায়ামং ততো গার্গি জিতাসনগতোঽভ্যসেৎ
মৃদ্বাসনে কুশান্ সম্যগাস্তীর্যাজিনমেব চ।
লম্বোদরং চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ।।
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
অতিভুক্তমভুক্তং চ বর্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥
নাড়ীসংশোধনং কুর্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশো ভবেত্তস্য তচ্ছোধনমকুর্বতঃ॥

নাসাগ্রে শশভৃদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্॥
বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহ্যং দ্বাদশমাত্রকৈঃ॥
ততোঽগ্নিং পূর্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্জ্বালাবলীযুতম্।
রুষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংস্থিতম্॥
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য ঘ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ॥
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।
ত্রিচতুর্বৎসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা॥
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেবং সমভ্যসেৎ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা ষটকৃত্ব আচরেৎ॥
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেঽপি নিত্যশঃ।
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক॥
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিনিবর্ধনম্।

নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচকম॥
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্যাদ্রেচকপূরককুম্ভকৈঃ।
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ॥

* * *

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্।
মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ॥
সম্পূর্ণ কুম্ভবদ্বায়োর্নিশ্চলং মূর্দ্ধি দেশতঃ।
কুম্ভকং ধারণং গার্গি চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া॥

ঋষয়স্তু বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
পবিত্রীভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ॥
তত্রাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈর্ন্যাসেনৈকেন সুন্দরি॥
তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥

হে গার্গী! বাঞ্ছিত আসনগুলি যথাবিধি অভ্যাস করার পরে সমস্ত আসন-পদ্ধতি-জয়কারী অভ্যাস করবে প্রাণায়াম। কুশের উপর (হরিণ বা ব্যাঘ্রের) চর্ম পেতে তার উপর সহজ ভঙ্গীতে বসবে, ফল ও মিষ্টি নৈবেদ্য রেখে গণপতিকে (গণেশের) উপাসনা করবে। ডান হাত বাম হাতের তালুতে রাখবে, গ্রীবা ও মাথা সরলরেখায় সোজা রাখবে, ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ থাকবে, পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হবে, চোখের দৃষ্টি স্থির থাকবে নাসিকাগ্রে; অতি আহার বর্জন বা উপবাস করবে। নাড়ী শুদ্ধ রাখবে। তা না হলে অভ্যাসে কোনো ফল হবে না। পিঙ্গলা ও ইড়ার (ডান ও বাম নাসারন্ধ্রের) সঙ্গমে হুম্ (বীজমন্ত্র) চিন্তা করতে করতে বারোমাত্রা কাল (বারো সেকেণ্ড) ইড়াকে বহির্বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করবে; তারপর যোগী ঐ একই স্থান (সঙ্গমস্থল) 'রং' বীজমন্ত্রসহ ধ্যান করবে এবং এইভাবে ধ্যান করতে করতে পিঙ্গলা (ডান নাসারন্ধ্র) পথে ধীরে ধীরে শ্বাস-বায়ু নির্গমন করবে। আবার ঐ পিঙ্গলা দিয়ে বায়ু টেনে পূর্ণ করে ঐ অনুরূপভাবেই ধীরে ধীরে ছাড়বে। এটা গোপনে (একা) অভ্যাস করবে তিন-চার বছর ধরে বা তিন-চার মাস কাল—গুরুর নির্দেশ যেমন; সকালে, দুপুরে বা সন্ধ্যায় বা মধ্যরাতে যে পর্যন্ত না নাড়ীশুদ্ধি ঘটে। হালকা দেহ, স্বচ্ছবর্ণ (উজ্জ্বল বর্ণ), স্বাভাবিক (ভালো) ক্ষুধাবোধ, নাদশ্রবণ—এসব হল নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ। এ সবের পরেই রেচক (শ্বাসত্যাগ), কুম্ভক (শ্বাস রুদ্ধকরণ) পূরক (শ্বাসগ্রহণ)—এই তিনের দ্বারা গঠিত প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে। প্রাণের সঙ্গে অপানের সংযোগ হল প্রাণায়াম।' দেহকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ষোলো মাত্রাকাল পূর্ণ করে, বত্রিশ মাত্রা প্রাণকে বহির্গত করতে হবে এবং কুম্ভক করতে হবে চৌষট্টি মাত্রাকাল। আর এক প্রাণায়াম আছে, তাতে প্রথমে কুম্ভক করতে হবে চৌষট্টি মাত্রাকাল, তারপর প্রাণকে বহির্গত করতে হবে ষোলো মাত্রা কাল, তারপর দেহকে পূর্ণ করতে হবে ষোলো মাত্রাকাল।

"প্রাণায়াম দ্বারা দেহের কলুষ দূর করে দেওয়া হয়; ধারণাতে দূর হয় মনের কলুষ; প্রত্যাহারে দূরীভূত হয় আসক্তির কলুষ, সমাধিতে দূর হয় যা কিছুই আত্মার প্রভুত্বকে আবৃত করে।"

সাংখ্য

তৃতীয় অধ্যায়

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯

২৯ ॥ ধ্যানলাভে শুদ্ধের (পুরুষের) কাছে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিই আয়ত্ত হয়।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০

৩০ ॥ আশক্তির বিনাশকে ধ্যান বলে।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৩১

৩১ ॥ সমুদয় বৃত্তির নিরোধে সিদ্ধিলাভ ঘটে।

ধারণাসনস্বকর্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২

৩২ ॥ ধারণা, আসন ও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধি ঘটে।

নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩৩

৩৩ ॥ শ্বাসবায়ু ত্যাগ ও ধারণ দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ ঘটে।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৪

৩৪ ॥ (যেভাবে বসলে) স্থিরসুখ হয় (তাকে বলে) আসন।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬

৩৬ ॥ অনাসক্তি ও অভ্যাসের দ্বারাও ধ্যান পূর্ণরূপ পায়।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪

৭৪ ॥ প্রকৃতির মূল নিয়ম গভীরভাবে চিন্তা করলে এবং 'এটা নয়, এটা নয়' বলে তাদের পরিত্যাগ করলে বিবেক (বিচারবোধ) সিদ্ধরূপ লাভ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩

৩ ॥ উপদেশের পুনরাবৃত্তি দরকার।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫

৫ ॥ খাদ্য কেড়ে নিলে বাজপাখি যেমন অসুখী হয়, কিন্তু সে নিজেই তা পরিত্যাগ করলে সুখী থাকে (তেমনি যে স্বেচ্ছায় সবকিছুই পরিত্যাগ করে সে-ই সুখী)।

অহিনির্ল্বয়নীবৎ ॥ ৬

৬ ॥ সাপ যেমন তার পুরনো খোলস ত্যাগ করলে সুখী হয়।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮

৮ ॥ যা মুক্তির উপায় নয় তা চিন্তনীয় নয়; তা বন্ধনের কারণ হয়, যেমন হয়েছিল ভরতের।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯

৯ ॥ বহুরকম বস্তুর সহিত সংযোগহেতু ধ্যানে বাধাবন্ধ দেখা দেয় কামনা, বিতৃষ্ণা ইত্যাদির মাধ্যমে—কুমারী হস্তের শঙ্খবলয়ের মতো।

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০

১০ ॥ দুইটি থাকলেও ঐ একরকমই হয়।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১

১১ ॥ আশা ত্যাগে (নৈরাশ্যে) সুখী (হওয়া যায়)—পিঙ্গলার মতো। (যেমন, পিঙ্গলা নাম্নী বারবনিতার মতো)।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ১৩

১৩ ॥ বহু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষককে যদিও শ্রদ্ধা অর্পণ করা কর্তব্য, তাদের সকলের নিকট থেকে সারবস্তুটুকুই গ্রহণ করতে হবে—মধুকর যেমন বহু পুষ্প থেকে মধু সংগ্রহ করে।

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪

১৪ ॥ শরনির্মাতার শরের মতোই যার মন একাগ্র হয়েছে তার ধ্যানে কখনো বাধাবিঘ্ন ঘটে না।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫

১৫ ॥ মৌলনিয়মের লঙ্ঘনের ফলে যেমন লক্ষ্যলাভ হয় না, তেমনি অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারেও।

প্রণতিব্রহ্মচর্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাত্তদ্বৎ ॥ ১৯

১৯ ॥ সংযম, শ্রদ্ধা ও গুরুভক্তি দ্বারা দীর্ঘকাল পরে সাফল্য (সিদ্ধি) আসে (ইন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন)।

ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০

২০ ॥ কাল সম্পর্কে কোনো নিয়ম নেই, যেমন বামদেব (নামক মুনির) ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪

২৪ ॥ অথবা, যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর সংসর্গে।

ন ভোগাদ্ রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭

২৭ ॥ উপভোগের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা শান্ত হয় না—এমনকি মহাজ্ঞানীদের (ক্ষেত্রেও, যাঁরা বহুকাল যোগভ্যাস করেছেন)।

পঞ্চম অধ্যায়

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮

১২৮ ॥ ঔষধাদির সাহায্যে আরোগ্যের মতো যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভকে অস্বীকার করবার নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থির সুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪

২৪ ॥ যে পদ্ধতি সহজ ও স্থির তাই হল আসন ; এছাড়া আর কোনো নিয়ম নেই।

ব্যাস-সূত্রাদি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। প্রথম পাদ

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭

৭ ॥ উপবেশনের ভঙ্গীতে উপাসনা করা সম্ভব।

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮

৮ ॥ ধ্যানের জন্যও।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯

৯ ॥ কারণ ধ্যানস্থ (ব্যক্তিকে) নিশ্চল পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

স্মরন্তি চ ॥ ১০

১০ ॥ কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপই বলে থাকে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১

১১ ॥ স্থান সম্পর্কে কোনো বিধি নেই ; যেখানেই মন একাগ্র হবে সেখানেই উপাসনা করতে হবে।

যোগ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন কি বলে সে সম্পর্কে এই উদ্ধৃতাংশগুলিই একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

চিঠিপত্র

[১]

(অধ্যাপক জন হেনরি রাইটকে লেখা)

সালেম (আমেরিকা)
৩০ অগস্ট, ১৮৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আজ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আশা করি, চিকাগো থেকে কিছু একটা জবাব পেয়েছেন। মিঃ স্যানবর্নের কাছ থেকে আমি এক আমন্ত্রণ পেয়েছি, তাতে পথ-নির্দেশিকাও দেওয়া আছে। তাই সোমবারে যাচ্ছি সারাটোগায়। মিসেস রাইটকে নমস্কার জানাই। অস্টিন ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের আমার ভালোবাসা। আপনি একজন সত্যিকারের মহাত্মা এবং মিসেস রাইট অতুলনীয়া।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[২]

সালেম
শনিবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনি যে পরিচয়জ্ঞাপক চিঠিগুলি দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চিকাগোর মিঃ থেলেসের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম; তাতে তিনি কয়েকজন প্রতিনিধির নাম এবং কংগ্রেস সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় জানিয়েছেন।

মিস স্যানবর্নের কাছে আপনার সংস্কৃতের অধ্যাপক যে পত্রটি দিয়েছেন তাতে ভুল করে আমাকে বলা হয়েছে পুরুষোত্তম যোশী; ঐ পত্রেই তিনি বলছেন যে বোস্টনে এমন একটি সংস্কৃত গ্রন্থাগার আছে যার তুল্য গ্রন্থাগার ভারতেও দুর্লভ। সেই গ্রন্থাগারটি দেখতে পেলে আমি অত্যন্ত সুখী হব।

মিঃ স্যানবর্ন আমাকে সোমবার সারাটোগায় যেতে লিখেছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি। সেখানে আমি থাকব স্যানাটোরিয়াম নামে এক বোর্ডিং হাউসে। যদি ইতিমধ্যে চিকাগো থেকে কোনো সংবাদাদি আসে তাহলে তা স্যানাটোরিয়াম, সারাটোগা—এই ঠিকানায় দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন আশা করি।

আপনি, আপনার মহীয়সী পত্নী এবং মধুর স্বভাবের ছেলেমেয়েরা আমার মস্তিষ্কে যে ছাপ ফেলেছেন তা মুছে যাবার নয়; আপনাদের সঙ্গে বাস করার সময় নিজেকে স্বর্গেরই নিকটবর্তী বলে মনে হয়েছে সকল দানের অধীশ্বর দয়াময় আপনার মস্তকে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন!

কাব্যরচনার প্রয়াস হিসাবে এই কয়েকটি লাইন লেখা হল। আশা করি আপনার ভালোবাসার দৌলতেই আমার এই অনধিকার চর্চা মার্জনা লাভ করবে।

আপনার চির সুহৃদ
বিবেকানন্দ

তোমারে খুঁজেছি আমি
পর্বতে পাহাড়ে আর উপত্যকা মাঝে,
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়
বেদ, বাইবেল, কোরানের
পাতায় পাতায়.
তবু হায় বৃথা যে সকলি।
শিশুসম হারাইনু পথ
গভীর অরণ্য মাঝে
কাঁদিয়া ফিরেছি একা
"কোথা তুমি হে ঈশ্বর,
প্রেমের আকর?"
প্রতিধ্বনি দিল সে উত্তর:
"নাই সে ত, গেছে চলি।"

রাত্রি গেল, গেল দিন
বছর ফুরায়ে গেল—
মস্তিষ্ক মাঝারে যেন
আগুন জ্বলিল;
জানিতে নারিনু রাত্রি
আসে কোন ক্ষণে
দিবসের অবসানে,
দুই প্রান্তে টানাটানি—
হৃদয় ছিঁড়িল।
গঙ্গাতট—করিনু শয়ন
রৌদ্রের দাহন সেথা
বারি অকৃপণ—
আমি বিনা আবরণে;
তপ্ত অশ্রু শুকায় বালুতে
মিশিল বিলাপ মোর
জলের গর্জনে।
শুদ্ধ নাম যত
দেশ-কাল-মত

না করি বিভেদ
ডাকিনু সবারে,
"ওগো দয়া কর,
তোমরা মহৎপ্রাণ
অর্জন করেছ লক্ষ্য
আমারে দেখাও পথ
এই ভিক্ষা
মাগি বারে বারে।"

বর্ষে বর্ষে কেটে গেল কাল
তবু তিক্ত রোদনের নাহি অবসান ;
মুহূর্তেরে মনে হয় এক যুগসম,
আমার ক্রন্দন মাঝে
আর্তনাদ ভেদ করি অবশেষে একদিন
না জানি কাহার কণ্ঠ কর্ণে পশে মম।

শান্ত নম্র মিষ্টভাবে হৃদয় জুড়াল,
"বৎস মোর" সেই কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল ;
ঝঙ্কারিত তন্ত্রী মোর শিহরণ শিরায় শিরায়
সেই কণ্ঠ সেই স্বর সুরে সুরে জগৎ মাতায়।

উঠিনু দাঁড়ায়ে, কণ্ঠস্বর কোথা
হতে আসে! খোঁজা হেথা হোথা ;
খুঁজি তারে খুঁজি এখানে ওখানে
সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিক পানে।
আবার সে মধুকণ্ঠ যেন কথা কয়
দিব্য কণ্ঠ মোর লাগি নাহি সংশয়।
আনন্দ পরম, মুগ্ধ আত্মা মোহবশে
আপন ইচ্ছায় বন্দী অসীম হরষে।

ঝলকি উঠিল আলো
আত্মা আলোকিত ;
খুলিল হৃদয়দ্বার
মুক্ত অবারিত।
কী দেখিনু আহা!
পুলক হরষ মোর নাহি মানে সীমা!
তুমি হেথা ওগো মোর প্রেমময়
আমার সমুখে তুমি হে আমার

প্রেম, আমার সর্বস্ব সে তো
তোমারই মহিমা !

তোমাকেই খুঁজে খুঁজে সারা !
তবু তোমার অস্তিত্ব সেথা
অনাদি অনন্তকাল, সমাসীন
সিংহাসনে, বিস্ময় তাহার সীমাহীন,
আর আমি বাক্যহারা !

জগৎসংসার মাঝে যেথানেই
ভ্রমি, সেইদিন হতে সেখানেই
তাঁহার অস্তিত্ব আছে ছেয়ে
অনুভব করি, উপত্যকা বেয়ে,
পাহাড় চূড়াতে, পর্বতশিখরে,
কাছে, দূরে, সুউচ্চ আসরে।

চন্দ্রের কোমল আলো, দ্যুতি মাঝে
নক্ষত্ররাজির, দিবসের দীপ্ত সাজে
মহিমা অপার, সবে জানি
তাঁহারই বিকীর্ণ জ্যোতি ; জানি
সে তো তাঁহারই সৌন্দর্যসুধা
আর পরাক্রম, নিত্য যে বসুধা
তাঁর আলো পেয়ে আলোকিত।
প্রভাতের ঐশ্বর্যের মাঝে, অস্তমিত
সন্ধ্যারাগে, সীমাহীন তরঙ্গিত সাগর
গভীরে, নিসর্গ সৌন্দর্য আর জাগর
বিহঙ্গ-গানে—তাঁহারে হেরিনু আমি,
সবাতেই তাঁরই রূপ, তিনি অন্তর্যামী।

বিপদসাগরে যবে একা
দুর্বল হৃদয় ভয়ে কাঁপে
ভীষণা প্রকৃতি দেন দেখা
যেন আমারে ফেলিতে চাপে,
কোথা পরিত্রাণ হায়—
বিধি না বাঁকানো যায়।

সেই ক্ষণে যেন শুনি মধুর
তোমার কণ্ঠ, আমার বঁধুর
স্বর, "আমি তো এখানে আছি।"

হৃদয় উঠিল তাই নাচি
শক্তির প্রবাহে হাজার মৃত্যুরে নাই
লেশমাত্র ভয়
তোমার নিকটে যবে পাই ঠাঁই
ওগো প্রেমময়।
মায়ের কোলে শিশু ঘুমায়
শুনে যে গানখানি
সে তোমারই বাণী;
পাপশূন্য বালক-বালিকা যেথা
ক্রীড়ায় হাসিতে মাতে
তুমি তারও সাথে,
তোমাকেই আমি তো দেখিনু সেথা।

মৈত্রী যবে পূত শুদ্ধ মিলায়
হাতেতে হাত, তাহার মাঝেও
তাঁহারই মূর্তি যে দাঁড়ায়;
জননী অধরে অমৃতের ধারা
তিনিই ঢালেন,
শিশুর মধুর 'মা' 'মা' সাড়া
তিনিই পালেন।
প্রাচীনকালের ধর্মগুরুর কথায় যেমন
তুমি আমার দেবাদিদেব আছ তেমন;
তোমা হতেই সকল মতের জনম
বেদ কোরান আর বাইবেলেতে
একই সুরে তোমার স্মরণ।

আত্মা মাঝে আত্মা হয়ে
আছ তুমি, চলছে বয়ে
জীবনেরই প্রবাহ যেই
ওম তৎ সৎ ওম সেই
আমার তুমি ভগবান, আমি
তোমার, প্রেম, তোমারই যে আমি।

[৩]

চিকাগো
২ অক্টোবর, ১৮৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আমার দীর্ঘ নীরবতা সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন জানি না। প্রথমতঃ আমি কংগ্রেসে গিয়ে হাজির হলাম একেবারে শেষ সময়ে, তাও সম্পূর্ণ অ-প্রস্তুত হয়ে; সেই কারণে বেশ কিছু সময় আমাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হল। দ্বিতীয়তঃ এই মহা-সম্মেলনে প্রায় প্রতিদিনই আমার বক্তৃতা করতে হয়েছে, কাজেই লিখবার সময় পাইনি; আর সব থেকে বড় কারণ এই—আপনি আমার প্রিয় বন্ধু, আপনার কাছে আমি এতই ঋণী যে সাত তাড়াতাড়ি দুটো কাজের কথা দিয়ে আপনাকে চিঠি দিলে তাতে আপনার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের প্রতি অপমান করা হত। মহাসম্মেলন এখন সমাপ্ত হয়েছে।

সারা পৃথিবী থেকে সমাগত সুবক্তা এবং চিন্তাবীরদের সেই মহাসম্মেলনে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে আমার যে কী ভয় হচ্ছিল ভাই; কিন্তু আমায় শক্তি জুগিয়ে-ছিলেন প্রভু, আর তাই তো প্রায় প্রতিদিন বীরের (?) মতো আমি সেই মঞ্চে ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছি। যদি কিছু সাফল্য লাভ করতে পেরে থাকি তবে সে তাঁরই দেওয়া শক্তির কৃপায়; যদি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকি—তা অবশ্য আমার জানাই ছিল—সে আমার নিদারুণ অজ্ঞতার কারণে।

আপনার বন্ধু অধ্যাপক ব্র্যাডলি আমার প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন, সব সময় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আর কী বলব! আমি তো অপদার্থ, অথচ আমার প্রতি এখানে প্রত্যেকটি লোক যে কী আশ্চর্য সদয় সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সর্বোত্তম মহত্তম তাঁরই জয় হোক—তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের দরিদ্র সন্ন্যাসীও এই পরাক্রান্ত দেশের বিদ্বান ধর্মাত্মাদের সমান। জীবনের প্রতিটি দিন প্রভু আমাকে কত না সাহায্য করছেন, ভাই—সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় লক্ষ লক্ষ যুগ যেন বেঁচে থাকি, যেন ছিন্নবাসে আবৃত থেকে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রতিপালিত হয়েও কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করে যেতে পারি।

আপনি এখানে থাকলে কত না খুশি হতাম; থাকলে ভারত থেকে আগত মধুর স্বভাবের কয়েকজনকে দেখতে পেতেন; তাদের মধ্যে ছিলেন কোমল-হৃদয় বৌদ্ধ ধর্মপাল, বাগ্মী মজুমদার, এবং এইরকম সবাই; বুঝতে পারতেন, সেই সুদূরে অবস্থিত দরিদ্র ভারতে এমন সকল মহৎহৃদয় আছে যা এই মহৎ ও প্রবল দেশে জন্মলাভ করে লালিত পালিত আপনাদেরই প্রতি সহানুভূতিতে স্পন্দিত হয়।

আপনার সাধ্বী পত্নীর প্রতি অজস্র সম্মান এবং আপনার মিষ্ট-স্বভাব ছেলে-মেয়েদের অগাধ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাই।

কর্নেল হিগিন্‌স একজন উদারচেতা ব্যক্তি; তিনি জানাচ্ছেন, আপনার কন্যা নাকি তার কন্যার কাছে আমার বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছে; কর্নেল নিজেও

আমার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। আগামীকাল আমি ইভানস্টন যাব, আশা করি সেখানে অধ্যাপক ব্র্যাডলির সঙ্গে দেখা হবে।

ঈশ্বর আমাদের আরো পবিত্র, আরো শুদ্ধ করুন! আমরা যেন এই পার্থিব দেহ ত্যাগ করার পূর্বেও অম্লান আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি।

[চিঠিখানা এরপর আর এক খণ্ড কাগজে লেখা হয়েছে]

এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে আমি এবার মানিয়ে নেব। সারাজীবন ধরে আমি যে কোনো অবস্থাকেই ঈশ্বর-সৃষ্ট বলে গ্রহণ করেছি এবং সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে শান্তভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। প্রথম প্রথম আমেরিকায় নিজেকে আমার একেবারে খাপছাড়া বলে মনে হত। প্রভু-প্রদর্শিত পথে চলার অভ্যস্ত ধারা বর্জন করে নিজের নির্ধারিত পথে আমাকে চলতে হবে এমন একটা ভয় আমার হয়েছিল—কী ভয়ানক দুর্বুদ্ধি এবং কৃতঘ্নতা বুঝুন। এখন অবশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—হিমালয়ের তুষার শিখরে যিনি আমায় পথ দেখিয়েছেন, ভারতের অগ্নিতপ্ত সমতলভূমিতে আমায় যিনি পথ দেখিয়েছেন, এখানেও তিনিই আছেন আমাকে সাহায্য করার জন্য, ঠিক পথে চালিত করার জন্য। সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরই জয় হোক। তাই শান্তভাবে আমি আমার পুরাতন ধারাতেই চলা শুরু করেছি। কেউ না কেউ আমাকে একটু আশ্রয় দেন, আহার দেন, কেউ না কেউ এসে আমাকে বলেন তাঁরই গুণগান করতে, আমি জানি এসব তাঁরই আদেশ, আর আমাকে তা পালন করতেই হবে। আর আমার যা কিছু প্রয়োজন তা তিনিই জুটিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

"যে আমাতে আশ্রয় নিয়েছে, যে আর সব প্রয়াস এবং আত্ম-দাবি বিসর্জন দিয়েছে, আমি তার কাছে তার সব যাচিত বস্তু বহন করে নিয়ে যাই।" (গীতা)

এই রকমই এশিয়াতে। ইউরোপেও এই রকম। আমেরিকাতেও তাই। তাই ভারতের মরুপ্রান্তরে। তাই আমেরিকার ব্যবসায়িক কোলাহলে। তিনি তো এখানেও আছেন, নেই কি? তা যদি না থাকেন তবে ধরে নেব, তিনি চাইছেন আমি আমার তিন মিনিটের মাটির দেহ বর্জন করি—আশা করি সানন্দে আমি সেই দেহ পরিত্যাগ করতে পারব।

ভাই, আমাদের দেখা হতে পারে, আবার নাও পারে। তিনিই জানেন। আপনি মহৎ, বিদ্বান এবং শুদ্ধপ্রাণ। আপনার কাছে কিংবা আপনার স্ত্রীর কাছে নীতিবাক্য প্রচারের কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বেদ হতে এই অংশগুলি উদ্ধৃত করছি:

"চতুর্বেদ, বিজ্ঞান, ভাষা, দর্শন এবং অন্য আর সব শিক্ষা নেহাৎই অলঙ্কারমাত্র। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হল সেই সত্য জ্ঞান অর্জন করা যার দ্বারা আমরা তাঁর কাছে উপনীত হতে পারি—যিনি তাঁর প্রেমে চির অপরিবর্তনীয়।"

"তিনিই বাস্তব, তিনিই বোধগম্য, তিনিই দৃশ্যমান; তাঁরই মাধ্যমে ত্বকের স্পর্শ অনুভূত, চক্ষু দর্শনক্ষম, তাঁরই মাধ্যমে জগৎসংসার লাভ করে তার বাস্তবতা!"

"তাঁর বাণী শুনলে আর কিছু
শুনবার থাকে না'।

তাঁকে দেখলে থাকে না আর কিছু
দেখবার ;
তাঁকে পেলে আর কিছু পাবার
থাকে না।"

"তিনি আমাদের সকলের চক্ষুর দৃষ্টি, সকলের কর্ণের শ্রবণ, তিনিই আমাদের সকলের আত্মার আত্মা।"

বৎস, তোমাদের বাবা-মায়ের চাইতেও বেশি কাছে আছেন তিনি। তোমরা ফুলের মতো পবিত্র এবং নিষ্পাপ। চিরকাল তাই থেকো, দেখবে তিনি তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রিয় অস্টিন, তুমি যখন খেলা কর, তোমার সঙ্গে তখন খেলা করেন আর একজন খেলার সাথী, সকলের চেয়ে তিনিই তোমাকে বেশি ভালোবাসেন ; আর জানো, তিনি কত কৌতুকময় ! তিনি খেলা করছেন সর্বদাই— কখনো মস্ত মস্ত বল নিয়ে, যাদের আমরা বলি সূর্য কিংবা পৃথিবী,—কখনো খেলা করছেন তোমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে—তোমাদের সঙ্গে হাসছেন, খেলছেন। তাঁকে দেখা, তাঁর সঙ্গে খেলা করা কত না মজার ! ভাবো একবার।

প্রিয় অধ্যাপকজী, আমি এখন এখানে ওখানে ঘুরছি। চিকাগোয় যখন আসি তখন মিঃ ও মিসেস লিয়নসের সঙ্গে দেখা করি নিয়মিত ; এখানে যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে অন্যতম মহত্তম দম্পতি এঁরা। দয়া করে আমাকে যদি চিঠি দেন তাহলে ঠিকানা লিখবেন : c/o মিঃ জন. বি. লিয়ন, ২৬২ মিশিগান এভিনিউ, চিকাগো।

"বহুর এই জগৎসংসারে সেই অদ্বিতীয় একজনকে—জগতের সব অপসৃয়মান ছায়ার মধ্যে একমাত্র অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বকে—মৃত্যুময় বিশ্বে একমাত্র জীবনকে যে আশ্রয় করেছে—একমাত্র সেই দুঃখ-কষ্ট সংঘাতের সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। অন্য কেউ পারে না, অন্য কেউ না।" (বেদ)

ন্যায় বা দ্বৈতবাদী চিন্তাধারার একজন মহান দার্শনিক উদয়নাচার্য বলেছেন— "বৈদান্তিকদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মন্, নৈয়ায়িকদের মধ্যে যিনি ঈশ্বর, সাংখ্যদের মধ্যে পুরুষ, মীমাংসকদের মধ্যে কারণ, বৌদ্ধদের মধ্যে নিয়ম, নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে নিরপেক্ষ শূন্য, যারা প্রেমী তাদের মধ্যে যিনি অনন্ত প্রেম, তিনি তাঁর করুণার পক্ষপুটে আমাদের আশ্রয় দিন !" তাঁর লেখা আশ্চর্য গ্রন্থ "কুসুমাঞ্জলি"র শুরুতেই এই উৎসর্গ বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে ; এই গ্রন্থে তিনি বলতে চাইছেন যে, প্রকাশ-নিরপেক্ষ এক ব্যক্তিস্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, যিনি অনন্ত প্রেমময় এবং নৈতিক শাসনকর্তা।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ বন্ধু
বিবেকানন্দ

[৪]

চিকাগো
১০ অক্টোবর, ১৮৯৩

প্রিয় মিসেস তানাত উডস,

গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছি। এখন আমি চিকাগোর নানা জায়গায় বক্তৃতা করছি; মনে হয় সব বেশ ভালোই হচ্ছে; প্রতি বক্তৃতায় ৩০ থেকে ৮০ ডলার করে আসছে। ধর্মসম্মেলনের দৌলতে চিকাগোয় বিনা ব্যয়ে আমার এমন বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে যে এই মুহূর্তে এই ক্ষেত্রটি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। আপনি নিশ্চয় এই ব্যাপারে একমত হবেন। কিন্তু বোস্টনে হয়ত আমি শীঘ্রই আসতে পারি, তবে কবে তা বলতে পারছি না। গতকাল ফিরলাম স্ট্রীটর থেকে, সেখানে একটি বক্তৃতায় আমি ৮৭ ডলার পেয়েছি। এই সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার বক্তৃতার কথা আছে। সপ্তাহ শেষে আরো চাহিদা হবে আশা করি। মিঃ উডসকে আমার ভালোবাসা এবং আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে প্রীতি জানাচ্ছি।

আপনাদের বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[৫]

C/o জে লিয়ন
২৬২ মিশিগান এভিনিউ
চিকাগো
২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনি জেনে খুশি হবেন, এখানে আমার কাজ বেশ ভালোই চলছে; অত্যন্ত গোঁড়া কয়েকজন ছাড়া এখানে প্রায় প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেছে। বহু দূর দূর দেশ থেকে অনেক লোক এখানে এসে মিলিত হয়েছে, তাদের নানা প্রকল্প, নানা মিশন, নানা ধারণা—সবাই তা কার্যকর করে তুলতে চায়, আর আমেরিকা এমন একটি স্থান যেখানে সব কিছুরই সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। আমি কিন্তু ভেবে স্থির করেছি যে আমার প্রকল্পের বিষয়ে আর কিছুই বলব না; আমি এ ব্যাপারে এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, এই 'হেদেন' তার প্রকল্প অপেক্ষা বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতএব প্রকল্পের কথা নিজের মনে রেখে অন্য যে কোনো বক্তার মতোই কাজ করে যাব, যদিও সে কাজ আমার প্রকল্পেরই কাজ।

যিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আজ পর্যন্ত আমাকে যিনি পরিত্যাগ করেন নি, যতদিন এখানে থাকব আমাকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না। জেনে

খুশি হবেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারেও কাজ ভালোই হচ্ছে, খুবই ভালো হবে আশা করি। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি খুবই কাঁচা, তবে কাজ শীঘ্রই শিখে নেব। চিকাগোতে আমি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই এখানে আরো কিছুকাল থাকতে চাই এবং টাকা রোজগার করতে চাই।

আগামীকাল আমি মহিলাদের পাক্ষিক ক্লাবে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি; এই ক্লাবটি এই শহরের সব থেকে প্রভাবশালী সংস্থা। আপনাকে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব, যিনি আপনাকে আমার কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁকেই বা কী বলে নমস্কার জানাব! এখন মনে হচ্ছে আমার প্রকল্প হয়ত সম্ভব হবে, আর তা আপনারই দৌলতে।

এই পৃথিবীতে আপনার অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপে আমার আশীর্বাদ থাকবে এবং আপনি সুখী হবেন।

আপনার ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ জানাই।

আপনাদের চির স্নেহবন্ধ
বিবেকানন্দ

[৮]

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
চিকাগো
১৯ নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় মিসেস উড্স,

আপনার পত্রের জবাব দিতে বিলম্ব হল, মার্জনা করবেন। জানি না কবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আগামীকাল আমি ম্যাডিসন ও মিনিয়াপোলিস রওয়ানা হচ্ছি।

আপনি যে ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা বলছেন তার নাম ডাঃ মর্মেরি, তিনি লণ্ডনের অধিবাসী। লণ্ডনের গরিবদের মধ্যে কাজ করে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন, তিনি অত্যন্ত মিষ্ট স্বভাবের মানুষ। আপনি বোধ হয় জানেন না, সারা পৃথিবীর মধ্যে চার্চ অব ইংল্যাণ্ডই একমাত্র ধর্মীয় সংস্থা যেখান থেকে ধর্ম মহাসম্মেলনে কোনো প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি; এই ধর্ম মহাসম্মেলনকে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ নিন্দা করেছিলেন, ডাঃ মর্মেরি তথাপি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

আমি শীঘ্র করে পত্র না দিলেও, সদয় বন্ধু, আপনার প্রতি এবং আপনার মহৎ পুত্রের প্রতি আমার ভালোবাসা একইরকম থাকবে।

আমার বই এবং অন্যান্য চিঠি ও কাগজপত্র মিঃ হালের ঠিকানায় এক্সপ্রেস

ডাকযোগে দয়া করে পাঠিয়ে দিতে পারেন কি? ওগুলো আমার দরকার। ডাক খরচ এখানে দেওয়া হবে।

ঈশ্বর আপনার এবং আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন।

আপনার চিরবন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

মিস স্যানবর্ন কিংবা পূর্বাঞ্চলে আমাদের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের পত্র দেবার সময় সুযোগ হলে তাদের আমার সম্মান জানাবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[৭]

(চিকাগোর মিস হ্যারিয়েট ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা)

ডেট্রয়েট
১৭ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

তোমার প্যাকেটটি গতকাল পেয়েছি। তোমার ঐ মোজাগুলো পাঠাতে হল সেজন্য দুঃখিত,—আমি নিজেই এখানে যোগাড় করে নিতে পারতাম। অবশ্য এর দ্বারা তোমার স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটা সুখের বিষয়। মোট কথা, ঝুলিটি শক্ত করে অাঁটা সসেজের চাইতেও বেশি ফুলেছে। কী করে বয়ে নিয়ে বেড়াব জানি না।

আজ আমি মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে ফিরেছি, মিঃ পামারের সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় ছিলাম বলে তার খুব দুঃখ। অবশ্য মিঃ পামারের বাড়িতে সত্যিকারের "সুসময়" ছিল। লোকটি অতি হৃদয়বান আমুদে প্রকৃতির, "সুসময়টা" এবং তার "তপ্ত স্কচ" একটু বেশিরকমই পছন্দ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ লোকটি, আর শিশুর মতো সরল।

আমার চলে আসাতে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিল না। এখানে একটি সুন্দরী তরুণী আছে। খুবই সুন্দরী, খুবই বুদ্ধিমতী, আর অত্যন্ত আধ্যাত্মিকবোধ সম্পন্ন, পার্থিব সুখ-পরান্মুখ! ঈশ্বর তারক ল্যাণ করুন! আজ সকালে মিসেস ম্যাকডুভেলের সঙ্গে এসেছিল মেয়েটি; ভারি সুন্দর কথা বললে, গভীর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ কথা—আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি। সে যোগীদের বিষয়ে সবই জানে, নিজে তা অভ্যাস করে অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছে।

"পথ সকল অনুসন্ধানের বাইরে।" ঈশ্বর তার কল্যাণ করুন—অমন নিষ্পাপ, অমন পবিত্র, অমন শুদ্ধ! আমার এই মেহনতের জীবনে, এই দুঃখময় জীবনে, মাঝে

মাঝে যখন তোমার মতো সুখী পবিত্র মুখ দেখতে পাই তখনই হয় সান্ত্বনা। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রার্থনায় বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে সকল ধার্মিকজনকে আমি প্রণাম করি।" এই প্রার্থনার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করি তখনই যখন এমন একখানি মুখ দেখি যাতে ভগবান তার আঙুলে নির্ভুলভাবে "আমার" এই কথাটি লিখে দিয়েছেন। তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক, তোমরা সুখী হও, চির চির কাল ধরে শুদ্ধ পবিত্র থাক। এই ভয়ানক বিশ্বের কর্দম এবং আবর্জনা যেন তোমাদের পা কখনো স্পর্শ না করে। ফুলের মতো হয়ে তোমরা জন্মলাভ করেছ; সেইভাবেই বেঁচে থেকে যেন সেইভাবেই চলে যেতে পার—এই আমার সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

[৮]

[চিঠিখানা লেখা রেভারেণ্ড আর. এ. হিউমকে। তিনি ছিলেন ভারতে এক মিশনের পরিচালক। ম্যাসাচুসেটসের অবারনডেল থেকে ১৮৯৪ সালের ২১ মার্চ তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে পত্র দিয়েছিলেন; তাঁর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীকে এক প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িত করা। মিঃ হিউম ভারতে জন্মলাভ করেছিলেন; তিনি তাঁর চিঠি আরম্ভ করেছিলেন, "আমার ভারতীয় স্বদেশবাসী স্বামী বিবেকানন্দ" বলে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, মিশনারীরা ভারতে যা করছে ঠিকই করছে এবং বিদেশে ভারত সম্পর্কে যা বলছে ঠিকই বলছে; তিনি বলতে চেয়েছেন, ডেট্রয়েটে এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থানে স্বামীজী ভারতের এবং ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছেন।]

ডেট্রয়েট
২৯ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনার চিঠিখানা এইমাত্র এখানে আমার কাছে পৌঁছুল। আমার এখন খুব তাড়া; আপনার লেখার মধ্যে কয়েকটি ভুল আছে, সেগুলি আমি সংশোধন করে দিচ্ছি—মনে কিছু করবেন না।

প্রথমত, পৃথিবীর কোনো ধর্মের বা ধর্মপ্রবর্তকের বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও উচ্চারণ করি না—তা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আপনার যা-ই মনোভাব হোক না কেন। আমার কাছে সকল ধর্মই পবিত্র। দ্বিতীয়ত মিশনারীরা আমাদের ভাষা শিক্ষা করে না, এমন কথা আমি কখনো বলি নি। আমি বলেছি, যদি কেউ সংস্কৃত শেখেও তবু তার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না; একথা আমি এখনো বলি; কোনো ধর্মসংস্থার বিরুদ্ধেই আমি কথা বলিনি; তবে হ্যাঁ আমি বলেছি এবং এখনো জোর দিয়ে বলি যে, ভারতকে কখনো ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে না; ক্রিশ্চান

ধর্মের দ্বারা ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকের অবস্থা উন্নত হয়েছে—একথা আমি স্বীকার করি না; আমি একথাও বলি যে দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টানদের বেশীর ভাগ শুধু যে ক্যাথলিক তাই নয়, তারা নিজেদের বর্ণ খ্রীষ্টান বলেও পরিচয় দেয়, অর্থাৎ খ্রীষ্টান হবার পরেও তারা আপন আপন বর্ণ আঁকড়ে থাকে; আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, যদি হিন্দুসমাজ তার স্বতন্ত্র প্রথা বর্জন করে তাহলে হিন্দুধর্মের শত ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতীয় খ্রীষ্টানদের নব্বই শতাংশ সেই হিন্দুধর্মেই ফিরে আসবে।

শেষ কথা, আমাকে আপনার স্বদেশবাসী বলে সম্বোধন করার জন্য আপনাকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইউরোপীয় কেউ ভারতে জন্মলাভ করলেও বিদেশী; মিশনারী হোন আর না হোন, এমন একজন ইউরোপীয় বিদেশী এই প্রথম একজন ঘৃণিত নেটিভকে তার স্বদেশবাসী বলে সম্বোধন করতে সাহস করলেন। আপনি ভারতেও কি আমাকে এই সম্বোধন করতে সাহস পাবেন? ভারতে জন্মলাভ করেছে আপনাদের এইরূপ মিশনারীদের অনুরূপ সম্বোধন করতে বলুন তো দেখি—যারা ভারতে জন্মায়নি এমন মিশনারীদের বলুন তো দেখি, ভারতবাসীকে তারা অন্তত মানুষ বলে গণ্য করুক। আর বাকী সব কথা এই: পৃথিবী পর্যটনকারী অথবা গল্প-লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী আমার ধর্ম অথবা সমাজকে বিচারের জন্য কি দাঁড় করাতে পারি! তা যদি করি তবে তো আপনিই আমাকে মূর্খ বলবেন।

ভাই—মনে কিছু করবেন না—কিন্তু আমার ধর্ম বা সমাজ সম্পর্কে আপনি কী-ই বা জানেন? যদিও আপনার জন্ম ভারতে। জানা একেবারেই অসম্ভব—কারণ এই সমাজ একটি বদ্ধ সমাজ। তদুপরি, জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ব থেকে গড়া ধারণা নিয়েই তো মানুষ বিচার করতে বসে, তাই নয় কি? আমাকে আপনার স্বদেশবাসী বলে সম্বোধন করার জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ ও ভালোবাসা এখন বা এর পরেও জন্ম নিতে পারে।

আপনাদের ভ্রাতৃস্বরূপ
বিবেকানন্দ

[৯]

(অধ্যাপক জন হেনরি রাইটকে লেখা)

নিউ ইয়র্ক
২৫ এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপক,

আপনার আমন্ত্রণে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ৭ মে তারিখে আসব। শয্যার কথা আর কী বলব—বন্ধু, আপনার ভালোবাসার গুণে, আপনার মহৎ হৃদয়ের প্রসাদে কঠিন পাথরও পালকের মতো কোমল হয়ে উঠতে পারে।

সালেমে গ্রন্থকারদের ব্রেকফাস্ট সভায় যেতে পারছি না, দুঃখিত। ৭ মে নাগাদ গৃহে আসছি।

আপনাদের বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[১০]

(মিস ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লেখা)

নিউ ইয়র্ক
২৬ এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

তোমার চিঠি এসেছে গতকাল। তুমি ঠিকই বলেছ—'লুনাটিক ইন্টিরিয়র'-এর মজাটা খুবই উপভোগ করলাম, ভারত থেকে আগত যে ডাক গতকাল তুমি পাঠিয়েছ, বহুদিন পরে তা সত্যিই সুসংবাদ বহন করে এনেছে, মাদার চার্চও তাঁর চিঠিতে সেই কথাই লিখেছেন। দেওয়ানজীর কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পাওয়া গেছে। বৃদ্ধ বরাবরের মত এবারও সাহায্য করতে চেয়েছেন, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। তাছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকাও ছিল, আমার সম্বন্ধে লেখা; প্রমাণ পাওয়া গেল যে আমার জীবনে অন্তত একবারও ধর্মপ্রবর্তক তার আপন দেশে সম্মান পেলেন। আমার সম্বন্ধে লেখা আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নানা অংশবিশেষও পেলাম। কলকাতার কাগজ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ তৃপ্তিকর; কিন্তু তাতে প্রশংসার সুর এত উচ্ছ্বসিত যে সে আর তোমার কাছে পাঠানো যায় না। ওরা আমাকে সুবিখ্যাত, অতি আশ্চর্য প্রতিভা ইত্যাদি অনেক আবোল তাবোল আখ্যা দিয়েছে; সারা দেশের হয়ে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেছে। কিন্তু আমার নিজের দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কী বলল না বলল সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আগ্রহ নেই; একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। আমার বৃদ্ধা মাতা রয়েছেন। সারা জীবনই তিনি দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু এই সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি আমাকে ঈশ্বরের এবং মানুষের সেবায় ছেড়ে দিতে পেরেছেন; মজুমদার কলকাতায় বলে বেড়াচ্ছিল, আমি দূর দেশে নীতিভ্রষ্ট পাশব জীবন যাপন করছি; আমি আমার মায়ের সব থেকে প্রিয় সন্তান, তাঁর একমাত্র আশা-ভরসাস্থল—আমার সম্পর্কে ওসব কথা শুনে আমাকে একেবারে বর্জন করতে হলে মা আমার মরেই যেতেন। কিন্তু ঈশ্বর মহান, তাঁর সন্তানের ক্ষতি কেউ করতে পারে না।

এখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে—আমি না চাইতেই তা ঘটেছে। দেশের যে প্রধান কাগজটিতে আমার অত প্রশংসা করা হয়েছে, বলা হয়েছে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে আমি আমেরিকায় এসেছি, এ ঈশ্বরের অপার করুণা—সে কাগজের সম্পাদক কে জান? মজুমদারেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা! বেচারী মজুমদার,—ঈর্ষাবশত মিথ্যা প্রচার করে সে আপন স্বার্থেরই ক্ষতি করেছে। ভগবান জানেন, আমি কখনো আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিনি।

এর পূর্বে "ফোরাম" পত্রে মিঃ গান্ধীর প্রবন্ধ আমি পড়েছি।

গত মাসের "রিভিয়ু অব রিভিয়ুস" পত্র যদি পেয়ে থাক তবে ভারতে আফিঙ সম্পর্কিত প্রশ্নে হিন্দুদের বিষয়ে লেখা প্রবন্ধটি মাকে পড়ে শুনিয়ো; প্রবন্ধটি লিখেছেন ভারতে নিযুক্ত একজন উচ্চতম ইংরেজ রাজকর্মচারী। তিনি ইংরেজদের তুলনা

করেছেন হিন্দুদের সঙ্গে এবং হিন্দুদের প্রশংসা করে একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন তো ছিলেন আমাদের জাতির একজন ঘোর শত্রু। এখন হঠাৎ এই দিক পরিবর্তন হল কী করে ?

বোস্টনে মিসেস ব্রিডের বাড়িতে আমার খুব ভালো কেটেছে; অধ্যাপক রাইটের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আবার আমি বোস্টনে যাচ্ছি। দর্জি আমার নতুন গাউন তৈরী করে দিচ্ছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (হারভার্ড) বক্তৃতা করতে যাচ্ছি, ওখানে অধ্যাপক রাইটের অতিথি হব। বোস্টনের কাগজে কাগজে আমাকে স্বাগত জানিয়ে চমৎকার সব লেখা বের হচ্ছে।

এই সব আবোল তাবোলে আমি অবশ্য ক্লান্ত। মে মাসের শেষদিকে আমি চিকাগোয় আসব, কয়েকদিন সেখানে থেকে তারপর আবার ফিরব পূর্ব দিকে।

গতকাল ওয়ালডর্ফ হোটেলে বক্তৃতা করলাম। মিসেস স্মিথ ২ ডলার করে টিকেট বিক্রয় করেছিলেন। হলটি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য ছোট হল। এখনও টাকাকড়ির মুখ অবশ্য দেখিনি। আজকের মধ্যে পাব আশা করি।

লিন-এ একশ ডলার উপার্জন করেছি। টাকাটা পাঠালাম না, কারণ নতুন গাউনটি করতে হবে এবং আরো কিছু বাজে খরচ আছে।

বোস্টনে কোনো টাকা রোজগারের আশা কোরো না। অবশ্য আমেরিকার মস্তিষ্ক আমি স্পর্শ করব এবং যদি পারি তাকে আলোড়িত করে তুলব।

তোমার স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[১১]

(মিস ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা)

নিউ ইয়র্ক
২ (১) মে, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

এখনই তোমাকে পুস্তিকাটি পাঠাতে পারব বলে মনে হয় না। গতকাল ভারত থেকে যে কাগজের ছোট কাটিং পেয়েছি সেটি অবশ্য পাঠাচ্ছি। তোমার পড়া হলে ওটি মিসেস ব্যাগলির কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। এই কাগজের সম্পাদক মজুমদারের আত্মীয়। বেচারী মজুমদারের জন্য এখন আমি দুঃখিত বোধ করছি ! !*

আমার কোটের ঠিক কমলা রঙটি পাওয়া যায় নি, কাজে কাজেই এর পরে যেটা ভালো সেইটিই নিতে হল—টকটকে লাল আর হলুদে মেশানো রঙ।

* এই দুটি বাক্য বাঁদিকের মার্জিনে আড়াআড়িভাবে লেখা ছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই কোট তৈরী হবে। ওয়ালডর্ফে বক্তৃতা করে সেদিন প্রায় ৭০ ডলার পেয়েছি। আগামীকালের বক্তৃতায় আরো কিছু পাব আশা করি।

৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বোস্টনে বক্তৃতার কর্মসূচী আছে, কিন্তু ওরা খুব কম টাকা দেয়।

গতকাল ১৩ ডলার দিয়ে একটি মীরশুম পাইপ কিনেছি—ফাদার পোপকে যেন বোলো না। কোটের দাম পড়বে ৩০ ডলার। আমি বেশ ভালোই আছি, খাবার-দাবার জুটছে···যথেষ্ট টাকাকড়িও। আগামী বক্তৃতাগুলি হয়ে গেলে ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব বলে আশা করি।

···সন্ধ্যায় নিরামিষাশীদের এক ভোজসভায় বক্তৃতা করব! আমি তো নিরামিষভোজী জানোই।···যখন নিরামিষ জোটে তখন সেটাই আমার পছন্দ। আগামী পরশু লিম্যান অ্যাবটের কাছে আমার আর একটি মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ আছে। সব মিলিয়ে সময়টা আমার বেশ ভালোই কাটছে, বোস্টনেও খুব ভালো কাটবে আশা করি; শুধু অপরিসীম বিরক্তিকর ব্যাপার হল এই বিশ্রী বক্তৃতা আর বক্তৃতা। অবশ্য ১৯ তারিখ পার হয়ে গেলেই—বোস্টন থেকে এক লাফে···চিকাগোয়···তারপর অনেকটা নিশ্বাস ফেলবার সময় এবং বিশ্রাম, দুই-তিন সপ্তাহের বিশ্রাম। শুধু বসে বসে গল্প করব—গল্প করব আর ধূমপান করব।

ভালো কথা, তোমাদের নিউ ইয়র্কের লোকেরা বেশ ভালো—অবশ্য মস্তিষ্কের চাইতে তাদের টাকা বেশি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছেও আমি বক্তৃতা করব। তিনটি বক্তৃতা বোস্টনে, তিনটি হার্ভার্ডে—সবই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস ব্রীড। এখানেও কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে, অতএব চিকাগো যাওয়ার পথে আর একবার আমাকে নিউ ইয়র্কে আসতে হবে—ওদের কিছু কড়া কথা শোনাব, টাকা পকেটস্থ করে চট করে চলে যাব চিকাগোয়।

চিকাগোতে পাওয়া যায় না এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বোস্টন থেকে পেতে চাও তাহলে জলদি লিখে জানাও। এখন আমার কাছে প্রচুর ডলার। যা চাইবে এক মিনিটের মধ্যে তা পাঠিয়ে দেব। ব্যাপারটা কোনোরকম অমার্জিত হবে মনে করো না—আমার কাছে কোনো দমবাজি পাবে না। আমি যদি ভাই হয়ে থাকি তবে সেইরকম আচরণই করব। দুনিয়ার যে ব্যাপারটাকে আমি সব থেকে ঘৃণা করি তার নাম ভণ্ডামি।

তোমার স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

[১২]

নিউ ইয়র্ক
৪ মে, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,

এই মাত্র আপনার সহৃদয় পত্রখানা পেলাম। আপনি যেমন বলছেন তাই করে সুখী হব—একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কর্নেল হিগিনসের পত্রও পেয়েছি। আমি তার জবাব দেব।

আমি রবিবার (৬ মে) যাব বোস্টনে। সোমবার মিসেস হোউর উইমেন্স ক্লাবে আমার বক্তৃতা।

আপনাদের চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[১৩]

১৭ বিকন স্ট্রীট, বোস্টন
মে, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,

ইতিমধ্যে আপনি পুস্তিকাখানা এবং চিঠিপত্র পেয়েছেন। আপনি যদি চান তবে চিকাগোয় গিয়ে ভারত থেকে আসা ভারতীয় রাজা ও মন্ত্রীদের চিঠিপত্র আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব; ভারতে রয়্যাল কমিশনের অধীনে যে আফিঙ কমিশন বসেছিল তার একজন কমিশনার এই মন্ত্রীদের অন্যতম। আপনি যদি চান তবে তাদের দিয়েই আপনার কাছে চিঠি লেখাব, তাতে আপনি নিঃসন্দেহে বুঝবেন যে আমি প্রবঞ্চক নই। কিন্তু ভাই, আমাদের জীবনের আদর্শ তো লুকোনো, সত্য গোপন করা এবং ঘটনা অস্বীকার করা।

আমাদের ত্যাগ করেই যেতে হবে, গ্রহণ করা আমাদের নয়। আমার মাথায় যদি "খেপামি"টা না থাকত তবে এখানে আমি কখনো আসতাম না। ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম এই আশা নিয়ে যে এর ফলে আমার আদর্শের সাহায্য হবে। দেশের লোক যখন এই সম্মেলনে আমাকে পাঠাতে চাইছিলেন তখন কিন্তু আমি অনিচ্ছাই প্রকাশ করেছি। যখন এসেছি তখনও তাদের বারে বারে বলেছি, "তোমরা আমাকে ওখানে পাঠাতে পার, কিন্তু সম্মেলনে আমি যোগ দিতে পারি নাও পারি।" ওরা আমাকে পাঠাল আমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে।

বাকি যা সব আপনি করেছেন। আপনি আমার দয়াময় বন্ধু, আপনার সন্তোষ বিধান করতে আমি নৈতিক দিক থেকে বাধ্য; বাকি দুনিয়ার কে কী বলল না

বলল তা আমি গ্রাহ্যও করি না—সন্ন্যাসীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও নেই। অতএব আপনার কাছে অনুরোধ—ঐ পুস্তিকা বা চিঠিপত্র থেকে কোনো অংশ ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন না। পুরাতন মিশানারীর চেষ্টায় আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করি না, কিন্তু মজুমদারকে যে ঈর্ষাজ্বরে আক্রান্ত করল তাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত, প্রার্থনা করি তার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হোক—মজুমদার লোকটি আসলে ভালোই, সারাজীবন সে সৎকাজ করারই চেষ্টা করেছে। এর দ্বারা অবশ্য আমার গুরুদেবের একটি বাণী প্রমাণিত হচ্ছে, তিনি বলেছেন, "যদি কালো ভুসো ভর্তি ঘরে বাস করো তাহলে যতই সাবধানে থাক না কেন, কিছু কালি তোমার জামাকাপড়ে লাগবেই।" অতএব, কোনো এক ব্যক্তি সৎ এবং পবিত্র হবার হাজার চেষ্টা করলেও যতক্ষণ সে এই জগৎসংসারে থাকবে ততক্ষণ তার কোনো অংশ নীচের টানে নামবেই।

ঈশ্বরমুখী পথ পার্থিব পথের বিপরীত। এই জগতে খুব কম লোকই আছে যারা একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং ধনদৌলত লাভ করতে পারে।

আমি কখনো মিশনারী ছিলাম না, কখনো হবও না—আমার স্থান হিমালয়ে। এতাবৎ কাল এবিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়ে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, "হে ভগবান, আমি আমার গুরুভাইদের মধ্যে প্রচণ্ড দুঃখকষ্ট দেখতে পেয়েছি; অনুসন্ধান করতে করতে তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় বার করেছি; ঔষধ প্রয়োগে চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। অতএব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

আপনার এবং আপনাদের সকলের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ চিরস্থায়ী হোক।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো।

আগামীকাল কিংবা পরশু আমি চিকাগো যাচ্ছি।

আপনাদের
বি

[১৪]

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
চিকাগো
২৪ মে, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,

এই সঙ্গে আপনার কাছে দুখানা পত্র পাঠিয়ে দিলাম; একখানা আমাদের রাজপুতানার একজন শাসক রাজা: খেতড়ির মহারাজের লেখা, আর একখানা লিখেছেন

আফিঙ কমিশনার তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য জুনাগড়ের প্রাক্তন মন্ত্রী—যে ব্যক্তিকে ভারতের গ্লাডস্টোন বলা হয়ে থাকে। আশা করি, চিঠি দুখানা পড়ে আপনি নিঃসংশয় হবেন যে আমি প্রতারক নই।

একটি কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কখনো মজুমদারের দলপতি বলে নিজের পরিচয় দিই নি। সে যদি এমন কথা বলে থাকে তবে সত্যি কথা বলে নি।

আশা করি, আপনার পড়া হলে পত্র দুখানা আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন, পুস্তিকা না পাঠালেও চলবে, ওটির আমার প্রয়োজন নেই।

আপনি আমার প্রিয় বন্ধু, আমি যে প্রকৃত সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আপনার পূর্ণ সন্তোষ বিধান আমার কর্তব্য; তবে ব্যাপারটি কেবল আপনারই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইতরজনেরা আমার সম্বন্ধে কী ভাবল বা বলল সেবিষয়ে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না।

আমাদের দেশের এক মহান সন্ন্যাসী—ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট রাজা ভর্তৃহরি সেই প্রাচীনকালে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; তিনি বলেছেন "কেউ তোমাকে সাধুসন্ত বলবে, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ আবার কেউ দানব। এইসব কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা নিজের কাজে মন দেবে।"

ভগবান আপনার চিরকল্যাণ করুন। আপনার সন্তানদের আমার ভালোবাসা এবং আপনার পত্নীকে আমার নমস্কার জানাই।

আপনার প্রেমবন্ধ বন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল—কিন্তু সে শুধু সমাজসংস্কার ব্যাপারে। মজুমদার এবং চন্দ্র সেন সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল তারা একনিষ্ঠ নয়—এখনো আমার এই মত পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখা দেয়নি। ধর্মীয় ব্যাপারে পণ্ডিতজীর সঙ্গেও আমার প্রচুর মতপার্থক্য ছিল; তার মধ্যে প্রধান হল, আমি মনে করি সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর পণ্ডিতজীর মতে সেটা পাপ। দেখুন তো ব্রাহ্মসমাজ মনে করে সন্ন্যাস গ্রহণ পাপের কাজ!

আপনাদের
বি

আপনাদের দেশের ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজ কিছুকালের জন্য কলকাতায় বিস্তার লাভ করেছিল, তারপর লোপ পায়। এইরকমভাবে তা বিলুপ্ত হয়েছে বলে আমার কোনো দুঃখও নেই আনন্দও নেই। সমাজ তার করণীয় কাজ—সমাজসংস্কারের কাজ করেছে। তার ধর্মমতের মূল্য কানাকড়িও ছিল না, অতএব তা তো লোপ পাবেই। মজুমদার যদি মনে করে তার জন্য আমিও দায়ী তবে সে তার ভুল। আমি এখনো তাদের সমাজসংস্কার নীতির দৃঢ় সমর্থক; কিন্তু বেদান্তের

বিরুদ্ধে তাদের অর্বাচীন ধর্মমত কী করে টিকে থাকতে পারবে! তাতে আমার কী করার আছে? ও মরে গেলে সে কি আমার দোষ? বৃদ্ধ বয়সে মজুমদার ছেলেমানুষি করছে, সে এখন এমন সব কৌশল করছে যা আপনাদের খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেয়ে একটুও ভালো নয়। ঈশ্বর তার কল্যাণ করুন এবং তাকে আরো ভালো পথ দেখান।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

আপনি আনিসকুয়ামে কবে যাচ্ছেন? অস্টিন এবং বিমকে আমার ভালোবাসা। আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার; আর আপনার প্রতি আমার যে কী গভীর ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আপনাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১৫]

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
১৮ জুন, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,

অন্যান্য চিঠিগুলো আগে খুঁজে পাইনি, তাই তা পাঠাতে দেরী হয়েছে; সেজন্য মাফ করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি।

আনিসকুয়ামে আসব কিনা জানি না। আমি আবার না লেখা পর্যন্ত ঐ চিঠিগুলি ফেরত পাঠাবার দরকার নেই। বোস্টনের কাগজে আমার বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে মিসেস ব্যাগলি বোধ হয় খুব বিচলিত হয়েছেন। ডেট্রয়েট থেকে তার একখানা কপি তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তারপর আমাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন; তিনি আমাকে প্রচুর অনুগ্রহ করেছেন।

ভাই, আপনার ন্যায় বলিষ্ঠহৃদয় সচরাচর পাওয়া যায় না। এই আমাদের দুনিয়াটা সত্যিই খুব অদ্ভুত জায়গা। এই দেশের জনগণের কাছ থেকে যে পরিমাণ অনুগ্রহ লাভ করেছি মোটের ওপর তার জন্য প্রভুর প্রতি আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ—এখানে তো আমি নিতান্তই একজন আগন্তুক, যার তেমন কোনো পরিচয়ও কেউ জানে না! অবশ্য ভগবানের সকল কাজই শ্রেষ্ঠ।

আপাদের চির কৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

ইস্ট ইণ্ডিয়া স্ট্যাম্পগুলি আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য; দেখুন যদি তাদের ভালো লাগে।

[১৬]

১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

আমাদের কোনো সংগঠন নেই, কোন সংগঠন আমরা গড়তেও চাই না। প্রত্যেকেই যেমন খুশি শিক্ষা দিতে পারে, যে কেউ যেমন খুশি প্রচার করতে পারে—এমন স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ভেতরে যদি তোমার প্রেরণা থাকে তবে অন্যরা তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েই পারে না। থিয়সফিস্টদের পদ্ধতি আমাদের হতেই পারে না, তার খুব সহজ সরল কারণ হল ওরা একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আমরা তা নই।

আমার নীতি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তি মানুষদের শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি খুব কমই জানি; কোনো ফাঁক না রেখে সেই সামান্যটুকুই আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। যেখানে আমি অজ্ঞানান্ধ সেখানে আমার তা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই; থিয়সফিস্ট, খ্রীষ্টান, মহমেডান কিংবা দুনিয়ার আর কেউ সাধারণ মানুষকে সাহায্য করছে দেখলে আমি যা আনন্দ পাই অন্য কিছুতে তা পাই না। আমি একজন সন্ন্যাসী; সেই হিসাবে আমি নিজেকে একজন সেবক মনে করি, দুনিয়ায় নিজেকে আমি কখনোই প্রভু মনে করি না।···লোকে যদি আমাকে ভালোবাসে সে ভালোবাসাকে আমি স্বাগত জানাই, যদি তারা আমাকে ঘৃণা করে তবে তাও আমার কাছে স্বাগত।

প্রত্যেকেরই নিজেকে রক্ষা করতে হবে, প্রত্যেকেই তার নিজের কাজ করবে। আমি কোনো সাহায্য যাচ্ঞা করি না, কোনো সাহায্য এলে তা প্রত্যাখ্যান করি না। এই জগতে সাহায্য পাবার কোনো অধিকার অবশ্য আমার নেই। যে কেউ আমাকে সাহায্য করেছে বা করবে সে আমার প্রতি তার করুণাই প্রদর্শন করবে, সে আমার কোনো অধিকার বাবদে নয়, তাইতো আমি সব সাহায্যের জন্যই চির কৃতজ্ঞ।

যখন আমি সন্ন্যাসী হলাম তখন সজ্ঞানেই এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছি, জেনে-শুনেই যে আমার এই দেহ উপবাসে শেষ হয়ে যেতে পারে। তাতে কী, আমি তো ভিখিরী। আমার বন্ধুরা দরিদ্র, দরিদ্রদের আমি ভালোবাসি, স্বাগত জানাই দারিদ্র্যকে। মধ্যে মধ্যে আমাকে যে উপবাসে কাটাতে হয় সেজন্য আমি আনন্দিত। আমি কারও সাহায্য চাই না। তাতে লাভ কী? সত্য আত্মপ্রকাশ করবেই, আমাকে কেউ সাহায্য না করলে সত্য মরে যাবে না! "সুখ ও দুঃখকে সমান মেনে নিয়ে, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমান মেনে নিয়ে, সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (গীতা)। চিরন্তন প্রেম, সর্ব অবস্থায় অবিচলিত ধীরতা এবং ঈর্ষা বা আক্রোশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি—পরিণামে তারই জয়। তারই জয়, আর কিছুর নয়।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১৭]

৫৪ ডব্লু, ৩৩ নিউ ইয়র্ক
২৫ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় ভাই,

আমি চলে গিয়েছিলাম ক্যাটসকিল পর্বতে; যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি ডাকে দেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার—অতএব আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে আমার দেরী হয়েছে, মাফ করবেন; "ঈগল" পত্রে আপনার যে চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পত্রখানার মধ্যে বিদ্যাবত্তা, সত্যনিষ্ঠা এবং মহত্ত্বের আশ্চর্য পরিচয় আছে; সর্বোপরি তার মধ্যে রয়েছে প্রতিক্ষেত্রে সৎ ও সত্যের প্রতি আপনার সর্বজনীন অনুরাগের পরিচয়। এই পৃথিবীতে পারস্পরিক সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি মহৎ কাজ; আর এরকম কাজ তখনই সম্ভব হয় যখন আপনার ন্যায় বলিষ্ঠ-হৃদয় তার মহত্ত্বে অবিচলিত থাকে। ভাই, ঈশ্বর আপনাকে চিরকাল যেন সাহায্য করেন; আপনি এবং আপনার সংস্থা যে বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালন করবার জন্য আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

আপনার প্রতি এবং এথিক্যাল সোসাইটির সদস্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি।

আপনাদের চির বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[১৮]

৫৪ ডব্লু, ৩৩ নিউ ইয়র্ক
মে, ১৮৯৫

প্রিয়—,

তোমার কাছে পত্র দেবার পরে আমার ছাত্ররা সাহায্য নিয়ে ভীড় করে এসেছে, এখন আর সন্দেহ নেই, ক্লাশ বেশ ভালোই চলবে।

এতে আমি অতীব আনন্দিত, কেন না শিক্ষকতা এখন আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে—তা এখন আমার কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং আহারের মতোই আবশ্যক।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক একটি ইংরেজী কাগজে—সম্পর্কে অনেক কিছু দেখলাম।— তো ভারতে বেশ ভালো কাজ করছে, নিজেদের ধর্ম বিষয়ে হিন্দুদের সপ্রশংস করে

তুলছে···।—এর লেখায় আমি কোনো বিষ্যাবত্তার পরিচয় পাই না,···বিন্দুমাত্র আধ্যাত্মিকতারও সন্ধান পাই না। সে যাই হোক, পৃথিবীর উপকার যে-ই করতে চাইবে ঈশ্বর যেন তাকে গতি দেন।

দমবাজরা কত সহজেই না দুনিয়াকে ভাঁওতা দিতে পারে; সভ্যতার উদয়কাল থেকে আজ পর্যন্ত হতভাগ্য মানবসমাজের নিবেদিত মস্তকে কত না প্রবঞ্চনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

[১৯]

ইউ. এস. এ
মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিংগা,

গত সপ্তাহে তোমাকে 'ব্রহ্মবাদিন' বিষয়ে লিখেছি। তখন ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতাবলীর কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। সব কিছু সন্নিবেশিত করেই একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। নিউ ইয়র্কে গুডইয়ারের কাছে আমেরিকার জন্য কয়েকশত কপি পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ দিনের মধ্যে আমি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করব। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগ বিষয়ে আমার আরো বৃহৎ পুস্তক আছে —কর্মযোগ আগেই বেরিয়েছে, রাজযোগ খুবই বৃহৎ হবে, তা ছাপতে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, জ্ঞানযোগ ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ করতে হবে।

"ব্রহ্মবাদিন"-এ কৃপানন্দর কাছ থেকে একখানা যে পত্র প্রকাশ করেছ তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে। খ্রীষ্টানরা যে আঘাত করেছে তার জন্য কৃপানন্দ এখনো জ্বলছে, আর তাই তার পত্রে প্রকাশ পেয়েছে অশালীনতা এবং প্রত্যেকের ওপর আক্রমণ। এটা "ব্রহ্মবাদিন"-এর সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অতএব ভবিষ্যতে কৃপানন্দ কিছু লিখলে তা একটু মোলায়েম করে দিয়ো; যত স্থূল বা উন্মাদ হোক না কেন কোনো ধর্মসম্প্রদায়কে কর্কশভাবে আক্রমণ করা সঙ্গত নয়। ভালো হোক মন্দ হোক কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ "ব্রহ্মবাদিন"-এ স্থান পাবার উপযুক্ত নয়। অবশ্যই প্রতারকদের প্রতি আমরা কোনো সক্রিয় সহানুভূতি দেখাব না। তোমাকে আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—পত্রিকাখানা এত বেশী টেকনিক্যাল যে এখানে তার গ্রাহক পাওয়া সম্ভব নয়। চোয়াল-ভাঙা সংস্কৃত শব্দ এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় একজন সাধারণ পাশ্চিমদেশীয় জানেও না, বা ওসব জানবার আগ্রহও তার নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, পত্রিকাখানা ভারতের পক্ষেই ঠিক উপযুক্ত। বিশেষ উপরোধের কথাবার্তা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে একেবারে বাদ দিতে হবে; সর্বদা তোমাকে মনে রাখতে হবে—তুমি সারা পৃথিবীকে সম্বোধন করে কথা বলছ, কেবলমাত্র ভারতকে নয়; আর মনে রাখবে—সেই পৃথিবী তোমার বক্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। প্রত্যেকটি সংস্কৃত বাক্যের অনুবাদ সাবধানে প্রয়োগ করবে, আর সবকিছু যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করবে।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছুবার আগেই আমি ইংল্যাণ্ডে চলে যাব। আমাকে চিঠি দেবে নিম্ন ঠিকানায়: C/o ই. টি. স্টার্ডি এস্কোয়ার, হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম, ইংল্যাণ্ড।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২০]

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড
লণ্ডন
মে, ১৮৯৬

প্রিয় বোন,

আবার সেই লণ্ডনে। এখন ইংল্যাণ্ডে জলহাওয়া বেশ মনোরম এবং শীতল। উনানে আগুন। জানো, এবার আমরা একটি পুরো বাড়িই পেয়েছি নিজেদের জন্য। বাড়িটি ছোট কিন্তু খুব তাতে সুবিধা; তাছাড়া, আমেরিকার ন্যায় এখানে বাড়ি তেমন ব্যয়বহুল নয়। তোমার মায়ের বিষয়ে আমি কী ভাবছিলাম জানো তো! তাঁকে এই তো একখানা চিঠি লিখলাম, ঠিক ঠিক ডাকেও ফেলেছি—ঠিকানা লিখেছি: C/o মনরো এণ্ড কোং, ৭ রু স্ক্রাইব, প্যারিস। এখানে কয়েকজন পুরানো বন্ধুবান্ধব আছেন, মিস ম্যাকলয়েডও এসেছেন বাইরে থেকে। মেয়েটি সোনার মতো খাঁটি, আর অতি সহৃদয়। বাড়িতে আমাদের সুন্দর একটি ছোট পরিবার গড়ে উঠেছে, তাতে যোগ দিয়েছেন ভারত থেকে আগত আর একজন সন্ন্যাসী। বেচারী!—একজন নির্ভেজাল হিন্দু, আমার মতো সাহস নেই, আমার মতো চালুও নয়; সে সবসময় স্বপ্নালু, শান্ত এবং মিষ্ট কোমল! কিন্তু ওরকম হলে চলবে না। আমি তাকে কিছুটা সক্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই আমি দুটি ক্লাস পেয়েছি, তা চলবে চার কি পাঁচ মাস, তারপরে চলে যাব ভারতে। কিন্তু আমার হৃদয় রয়েছে আমেরিকায়, আমি ভালোবাসি ইয়াঙ্কি দেশকে! আমি চাই নতুন জিনিস। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কোনো অভিপ্রায় আমার নেই, প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে অবসন্ন জীবন যাপনের কোনো সাধ আমার নেই; প্রাচীন কাল নিয়ে আমি হা হুতাশ করতে পারি না। আমার রক্তে এত তেজ যে ওসব আমার পোষায় না। আমেরিকা হল সেই দেশ যেখানে লোকের সকল সুযোগ আছে। আমি অত্যন্ত আধুনিকতাপন্থী হয়ে উঠেছি। ভারতে যাচ্ছি এইটি দেখতে যে, সেই সাংঘাতিক রক্ষণশীলতার অচলায়তনে কিছু একটা করতে পারি কিনা, একটা নতুন কিছুর—সহজ সরল সবল তাজা, নবজাত শিশুটির ন্যায় সম্পূর্ণ অভিনব কিছুর সূত্রপাত করতে পারি কিনা। শাশ্বত অসীম সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ বলতে বোঝায় একটি মূলনীতি—কোনো ব্যক্তি নয়। তুমি, আমি আর প্রত্যেকে সেই মূল আধারেরই

খণ্ড খণ্ড অংশ ; কোনো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই মূল আদর্শ যত বেশী প্রকাশ পাবে সে তত বেশী মহৎ হয়ে উঠবে ; পরিণামে সকলের মধ্যেই এই আদর্শ পূর্ণ বিকাশলাভ করবে, তখন সবাই হবে একীভূত, বস্তুত এখনো তাই আছে। ধর্মের সার কথাটি এই, আর ধর্ম পালনের উপায় হল এই এককভাবের সাধনা—যার আর এক নাম প্রেম। বাকী সব প্রাচীন ধোঁয়াটে আচার-অনুষ্ঠান আসলে কুসংস্কার মাত্র। সে সব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কেন? তৃষ্ণার্তকে ডোবার জল দেওয়া কেন—যখন জীবন ও সত্যের স্রোতস্বিনী নিকটে প্রবাহমান? আসলে ব্যাপারটা মানুষের স্বার্থপরতা, অন্য কিছু নয়। জীবন সংক্ষিপ্ত—সময় উড়ে চলে যাচ্ছে ; একজন কারও আইডিয়া যে স্থানে এবং যে লোকের মধ্যে সবথেকে ভালো কার্যকর হবে সেই স্থানই তার দেশ, সেই লোকেরাই তার আপনজন। আমি চাই ডজনখানেক বলিষ্ঠ হৃদয়—উদার মহৎ অকপট মানুষ!

আমি বাস্তবিকই বেশ ভালো আছি, মহানন্দে জীবন উপভোগ করছি।

তোমাদের চির প্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১১]

(অধ্যাপক জন হেনরি রাইটকে লেখা)

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড
লণ্ডন, এস, ডব্লু
১৬ মে, ১৮৯৬

প্রিয় অধ্যাপকজী,

যে আঘাত আপনার ওপর পড়েছে তারই দুঃসংবাদ এল গত ডাকে।

ভাই, এই তো দুনিয়া—এই মায়া মোহ—একমাত্রই ঈশ্বরই সত্য। আকার-প্রকার সবই অপস্রয়মান ; কিন্তু আত্মা ঈশ্বরে নিহিত, আত্মা ঈশ্বরের অংশ, তাই তা অমর এবং সর্বত্র বিদ্যমান। আমাদের যা কিছু ছিল তা সবই এখনো রয়েছে আমাদের চতুর্দিকে, কারণ আত্মার যাওয়া নেই আসাও নেই, আত্মা শুধু তার অভিপ্রকাশের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে।

আপনি এবং মিসেস রাইট উভয়েই সরল-মনা এবং পবিত্র, আর এ বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার ভেতরকার দেবত্ব জাগ্রত হয়েছে এবং তা অপসারিত করে দিয়েছে এই মিথ্যা এবং ভ্রান্তি যে কারও মৃত্যু ঘটা সম্ভব।

"এই সংসারে বহুর মধ্যে যে সব কিছুর একই অবলম্বন দেখতে পায়, অচেতনের জগতে যে এক চিরন্তন চেতনকে উপলব্ধি করে, এই অপস্রয়মান জগতে যে সেই এক অদ্বিতীয় এবং অপরিবর্তনীয়কে দেখতে পায়, অনন্ত শান্তি তারই লভ্য।"

আপনার ওপর এবং আপনাদের সকলের ওপর ঈশ্বরের শান্তির প্রাচুর্য নেমে আসুক এই আমার প্রার্থনা।

আপনার চির প্রেমবদ্ধ বন্ধু
বিবেকানন্দ

[২২]

৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড, লণ্ডন
৭ জুন, ১৮৯৬

প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শকে সামান্য কয়েকটি কথাতেই প্রকাশ করা যায়, তা হল: মানবসমাজের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে তার সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

এই জগৎসংসার কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে পুরুষ হোক বা নারী হোক—তাকে আমি করুণা করি, আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটি ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সকল দুঃখ-যন্ত্রণার মূলে রয়েছে অজ্ঞতা, অন্য কিছু নয়। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের নিয়ম এবং হায়, যুগের পর যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা পৃথিবীতে সর্বাধিক সাহসী এবং বরেণ্য তাঁদের বহুজনহিতায় সর্বজনসুখায় আত্মবিসর্জন করতেই হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর ধর্মসমূহ নিতান্ত প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এখন পৃথিবীর যা একান্ত প্রয়োজন তা হল চরিত্র। পৃথিবীতে আজ তাদেরই প্রয়োজন যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত, যারা স্বার্থলেশশূন্য। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় প্রবল করে তুলবে।

তোমার কাছে কুসংস্কার কিছু নেই; আমার বিশ্বাস তোমার মধ্যে একটা জগৎ-চালনাকারী শক্তি আছে, সেই রকম আরো শক্তিও আসবে তোমার মধ্যে। আমাদের যা চাই তা হল জ্বালাময়ী বাণী এবং বলিষ্ঠতর কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো জাগো। সারা জগৎসংসার দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি এখন নিদ্রামগ্ন থাকতে পার? চল আমরা আহ্বান করতেই থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কী আছে? এর চেয়ে মহত্তর আর কোন কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি কখনো আটঘাট বেঁধে কাজ

করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে এবং বাস্তবে পরিণত হয়। আমি কেবল বলি—ওঠো, জাগো!

তুমি আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে!

তোমাদের স্নেহবন্ধ
বিবেক

[২৩]

৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোড
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
৬ জুলাই, ১৮৯৬

(ডাঃ লুইস আই জেনসকে লেখা)

প্রিয় বন্ধু ও ভাই,

আপনার ২২ জুনের চিঠি যথাসময়ে পৌঁছেছে এবং তা আমাকে বিপুল আনন্দ দিয়েছে। মহৎ কাজটির অগ্রগতি হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শীতকালে কেমব্রিজে যে কাজ হবে তার কথা মিসেস বুলের কাছ থেকে শুনে দারুণ খুশি হলাম; সে কাজ পরিচালনার জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। আপনি সর্বশক্তির অধিকারী হোন—এই কামনা করি। মাঝে মাঝে ম্যাগাজিনের জন্য লিখতে পারলে আমি যারপরনাই খুশি হব; প্রথম লেখাটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাতে পারব আশা করি—মানে যখন একটু অবসর পাব। ধর্ম-ভাবসম্পন্ন বলে আমরা যাদের মনে করি তাদের মৃত্যু উচিত নয়—এ কথা বলাই বাহুল্য,—জাতির মধ্যে যেমন নতুন রক্তসঞ্চার প্রয়োজন, এদেরও তেমনি নব নব ধর্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক। অন্যান্য যারা তাদের নিজ নিজ মতবাদে অটল থাকে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সক্ষম হওয়াটা খুবই প্রীতিপ্রদ।

ইতিমধ্যে গুডউইন এবং অন্য স্বামী নিশ্চয়ই আমেরিকায় পৌঁছেছে। আপনার মহৎ কাজে তারা সাহায্য করতে পারবে আশা করি। সকল সৎকার্যে ঈশ্বর-প্রেরণা সঞ্চারিত হোক, সৎকর্মে নিযুক্ত সকল কর্মীর অনন্ত কল্যাণ হোক।

চির সত্যাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[২৪]

(শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা)

[মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে]

দার্জিলিঙ
১৯ মার্চ, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভবগতে রামকৃষ্ণায় !

তোমার শুভ হোক ! আশীর্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ এই পত্রখানা তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। আমার মনে হয় পর্বত-প্রধান হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরগুলি মৃতপ্রায়দেরও প্রাণবান করে তোলে। রাস্তায় চলাচলের ক্লান্তিও কথঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে বলে মনে হয়। আমি ইতিপূর্বেই স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছি, এই আকাঙ্ক্ষা এমনই শক্তিশালী যে তাতে হৃদয় আলোড়িত হয়; তোমার পত্র পড়ে মনে হচ্ছে, তুমিও সেরূপ আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছ। এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই মনের একাগ্রতাকে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে নিয়োজিত করে। "মুক্তিলাভের অন্য কোনো পন্থা নেই।" এই ভাবনাই তোমার উত্তরোত্তর বর্ধিত হোক, যতদিন না তোমার সমুদয় অতীত কর্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায়। তারই অনুসরণে নিতান্ত অকস্মাৎ তোমার অন্তরে ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটবে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমার অনুরাগের দৃঢ়তা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তোমার পরম কল্যাণকর সেই জীবন্মুক্তির অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়ের আচার্য শ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যার ফলে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্যশালী হয়ে মহামোহসাগর থেকে লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্য সম্যক যত্নবান হতে পার। চিরতেজস্বী হও! মুক্তি করতলগত বীরদেরই, কাপুরুষদের নয়। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, সম্মুখে মহামোহরূপ শত্রুগণ! সত্য বটে যে, "শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে", তা সত্ত্বেও সেজন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ বীরগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়ে কী কষ্ট না পাচ্ছে! আহা! তাদের হৃদয়ভেদী কারুণ্যপূর্ণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ তাদের পাশ মোচন করতে, দরিদ্রের ক্লেশভার লাঘব করতে এবং অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করতে অগ্রসর হও! ঐ শোনো, বেদান্ত দুন্দুভি ঘোষণা করছে—"ভয় নেই"! সেই ধ্বনি নিখিল বিশ্ববাসীর হৃদয়গ্রন্থিভেদে যেন সমর্থ হয়।

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

[২৫]

আলমবাজার মঠ, কলকাতা
৫ মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আমি একমাসের জন্য দার্জিলিঙে গিয়েছিলাম। এখন অনেকটা ভালো আছি। দার্জিলিঙে অসুখটা একেবারে সেরে গিয়েছিল। এই শারীরিক উন্নতিটা কায়েম করার মানসে আমি আগামীকাল যাচ্ছি আর একটি হিল স্টেশন আলমোড়ায়।

আপনাকে তো আগেই লিখে জানিয়েছি, এখানে কাজকর্ম আদৌ আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না—যদিও আমাকে সম্মান জানানোর জন্য সারা দেশ ও জাতি এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং লোকে আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল! ব্যবহারিক দিকটা যেন ভারতে হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, কলকাতার কাছে জমির দাম খুবই বেড়ে গেছে। উপস্থিত আমার আইডিয়া হল তিনটি রাজধানী শহরে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। এইগুলি হবে আমার নর্মাল স্কুল—যেখান থেকে আমি সর্বত্র আক্রমণ চালাব।

আমি আরো কয়েক বছর বাঁচি বা না বাঁচি, ভারত কিন্তু রামকৃষ্ণরই হয়ে গেছে।

অধ্যাপক জেনসের কাছ থেকে একখানা সহৃদয় পত্র পেয়েছি, বৌদ্ধধর্মের বিকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমার মন্তব্যের কথা তিনি তাতে উল্লেখ করেছেন। আপনিও লিখেছেন, এতে ধর্মপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে। মিঃ ধর্মপাল লোকটি খুবই ভালো, আমি তাকে ভালোবাসি; কিন্তু ভারতীয় কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করা তার শোভা পায় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকে যাকে নানা নোংরামিতে ভরা আধুনিক হিন্দুধর্ম বলে তা আসলে বৌদ্ধধর্মের জগাখিচুড়ি। হিন্দুরা এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝুক, তাহলেই বিনা বাক্যব্যয়ে ওটা তাদের পক্ষে বর্জন করা সহজতর হবে। বৌদ্ধধর্মের যে প্রাচীন ভাব, বুদ্ধ নিজে যা প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। আর আপনি তো ভালোই জানেন, আমরা হিন্দুরা তাকে অবতার বলে পুজো করি। সিংহলের বৌদ্ধধর্মও তেমন কিছু ভালো নয়। সিংহল সফর করে আমার মোহ সম্পূর্ণ ভেঙেছে; সেখানে প্রাণবান লোক হিন্দুরাই। বৌদ্ধরা প্রায়ই খুব ইউরোপীয় ভাবাপন্ন—এমন কি মিঃ ধর্মপাল এবং তার পিতারও ইউরোপীয় নাম ছিল, পরে তারা তা বদল করেছেন। অহিংসা পরমো ধর্মঃ—এই নীতির প্রতি বৌদ্ধদের একমাত্র সম্মান ও বিশ্বস্ততা দেখা যায় যেখানে সেখানে কসাইখানা খুলে বসবার মধ্যে! এমন কি পুরোহিতরা পর্যন্ত সে কাজে উৎসাহ দেন। আমি এককালে ভাবতাম, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম এখনো অনেক ভালো কাজ করতে পারবে। কিন্তু এখন আমি সেই ধারণা পুরোপুরি বর্জন করেছি, স্পষ্ট বুঝতে পারি—কী কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল; বীভৎস মূর্তি আর নানা লাম্পট্য রীতিনীতি নিয়ে এই ধর্মের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাকেও সিংহলীরা যদি বিসর্জন দেয় তবে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হব।

থিয়সফিস্টদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, আপনি মনে রাখবেন ভারতে থিয়সফিস্টরা এবং বৌদ্ধরা নিতান্তই তুচ্ছ। ওরা কয়েকখানা কাগজ বার করে, নিজেদের নিয়ে প্রচুর ঢক্কানিনাদ করে এবং চেষ্টা করে পাশ্চাত্যবাসীদের শ্রবণ আকর্ষণ করতে।…

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলাম, এখানে হয়ে গেছি আর এক লোক। এখানে সমস্ত জাতি আমাকে তাদের একান্ত নির্ভরমূল বলে গণ্য করে—আর ওখানে আমাকে দেখা হত বদ্ধ নিন্দিত একজন প্রচারকরূপে। এখানে রাজা মহারাজাও আমার গাড়ি টানে, ওখানে একটি ভালো হোটেলে পর্যন্ত আমার প্রবেশ লাভ ঘটত না। সেই হেতু এখানে আমি যা কিছু বলব তা বলব সমস্ত জাতির ও আমার জনগণের কল্যাণের জন্য—তা সে কথা দু-চারজনের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। যা কিছু খাঁটি এবং সৎ তাকেই গ্রহণকরব, তাকেই ভালোবাসব, তার প্রতিই সহনশীল হব—ভণ্ডামির প্রতি কিন্তু কখনোই নয়। আমি এখন ভারতে একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি, সেই কারণে থিয়সফিস্টরা আমাকে খাতির করতে এবং আমার চাটুকারিতা করতে চেষ্টা করেছিল, সেই হেতু আমাকে কয়েকটি স্পষ্ট কথা কড়া ভাষায় বলতে হয়েছে—যাতে আমার কোনো কাজের দ্বারা তাদের দমবাজির সমর্থন হবার আর কোনো অবকাশ না থাকে। সে কাজটি হয়ে গেছে, এবং আমি তাতে খুশী। আমার স্বাস্থ্যে কুলোলে এইসব ভুঁইফোঁড় দমবাজগুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতাম, অন্তত যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম।…আপনাকে বলতে পারি, ভারত এরই মধ্যে সম্পূর্ণতই রামকৃষ্ণর হয়ে গেছে এবং আমি এখানে কাজকর্ম খানিকটা সংগঠিত করে তুলেছি শুদ্ধ সংস্কৃত এক হিন্দুধর্মের জন্য।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[২৬]

আলমোড়া
১১ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

তোমার শেষ রিপোর্টটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার বিশেষ কিছু সমালোচনা নেই, শুধু বলতে চাই—আর একটু স্পষ্ট করে, বুঝবার মতো করে লিখো।

এ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, কাজটিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। এর আগে একটি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, প্রাথমিক এবং পরীক্ষা-মূলক রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান, বিশেষত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস সুরু করা দরকার এবং সেজন্য এক সেট অ্যাপারেটাস যোগাড় করা উচিত; এই পরামর্শ সম্বন্ধে কী করা হল না হল তার কিছুই এখনো জানতে পারলাম না।

আর একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বাংলায় এ যাবৎ যত বিজ্ঞানের বই অনুবাদ হয়েছে তার সব সেট ক্রয় করা বিষয়ে ; এই পরামর্শটি সম্পর্কেই বা কী করা হল ?

এখন আমার মনে হচ্ছে একই বারে তিন তিনজন মহান্ত নির্বাচন করা দরকার— একজন ব্যবসায়িক দিকটি পরিচালনা করবেন, একজন দেখবেন এক্সপেরিমেণ্টের দিক, আর একজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়টি দেখাশুনা করবেন।

শিক্ষা-অধিকর্তা পাওয়াই দুষ্কর। অন্য দুটি কাজের ভার ব্রহ্মানন্দ এবং তুরীয়ানন্দকে দেওয়া যেতে পারে। দর্শকদের মধ্যে কেবল কলকাতার বাবুদেরই পাওয়া যাচ্ছে জেনে আমি দুঃখিত। তারা কিছু কাজের নয়। আমরা চাই সাহসী কর্মঠ তরুণ— যারা কাজ করতে পারে, ভাঁড় চাই না।

ব্রহ্মানন্দকে বলবে সে যেন অবশ্যই মঠে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য এবং ভাবী পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধাদি পাঠানোর জন্য অভেদানন্দ এবং সারদা-নন্দকে লেখে। কাগজের জন্য জি. সি. ঘোষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ? দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করে যাও এবং তৈরী হও।

অখণ্ডানন্দ মহুলাতে চমৎকার কাজ করছে, কিন্তু কাজের সিস্টেমটা ভালো নয়। মনে হচ্ছে তারা একটিমাত্র গ্রামেই তাদের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করে ফেলছে, আর কাজও তো মাত্র মুষ্টিভিক্ষা বিতরণ করা। এই সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ প্রচারও হচ্ছে বলে তো শুনিনি। জনগণকে যদি স্বাবলম্বী হতে না শেখানো হয় তবে সারা পৃথিবীর সম্পদ দিয়েও ভারতের ক্ষুদ্র একটি গ্রামকে সাহায্য করা যাবে না। কাজের একটি দিক হবে প্রধানত শিক্ষামূলক—নৈতিক এবং বুদ্ধিগত। এই বিষয়ে কী হচ্ছে তার কোনো খবর পাই নি, শুধু জেনেছি—কিছু ভিখিরীকে সাহায্য করা হচ্ছে। ব্রহ্মানন্দকে বলবে জেলায় জেলায় যেন কেন্দ্র স্থাপন করে, যাতে আমাদের সামান্য সঙ্গতি নিয়েও বৃহত্তম এলাকায় কাজ হতে পারে।

তাছাড়া, এখনো আর একটি কাজ সফল হয় নি ; কোনো স্থানে তারা এখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি, ফলে সর্বত্র সোসাইটি গড়ে ওঠে নি, লোকশিক্ষা প্রচার সম্ভব হয় নি ; এই শিক্ষা লোক সাধারণের লাভ হয় নি যে তাদের হতে হবে স্বাবলম্বী ও মিতব্যয়ী, লোকেরা বুঝতে পারেনি যে তাদের বিবাহ বর্জন করা দরকার—বুঝতে শেখেনি যে এই রূপেই তারা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। দানের দ্বারা হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়, এখন সেই খোলা জায়গাটি দিয়েই আসল কাজ অগ্রসর করিয়ে নিতে হবে।

সব থেকে সহজ উপায় হল একটি কুটির ভাড়া নেওয়া—তারপর তাতে গুরু মহারাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। গরিব লোকেরা সেখানে আসুক সাহায্য লাভের জন্য, আরাধনার জন্যও। সকালে ও সন্ধ্যায় সেখানে পুরাণের কথা হোক—তারই মধ্য দিয়ে লোককে তোমরা যা শেখাতে চাও শেখাতে পার। ধীরে ধীরে লোকদের আকর্ষণ বাড়বে। তখন মন্দিরকে তারাই বাঁচিয়ে রাখবে ; হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে সেই কুটীর-মন্দির এক মহান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ত্রাণকার্যে যারা যাবে তারা যেন প্রথমেই প্রতি জেলায় একটি কেন্দ্রীয় এলাকা বাছাই করে নেয়—সেখানে

যেন তৈরী করে এক কুটীর-মন্দির, তার মারফতই তখন আমাদের এই কাজ প্রসার লাভ করবে।

কাজটা হৃদয়গ্রাহী হলে সবচেয়ে মূঢ় ব্যক্তিও তা সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকেই বলব যে প্রত্যেকটি কাজকেই নিজের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। পৃথিবীতে সব কিছুই বটবৃক্ষের বীজের ন্যায়, দেখতে তা সরষের মতো ক্ষুদ্র হলেও তারই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষেরই মহৎ সম্ভাবনা। সেই বাস্তবিক বুদ্ধিমান যে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে পারে এবং সব কাজকেই সত্যিকারের মহৎ কাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়।

অধিকন্তু, ওরা যেন এটাও লক্ষ্য রাখে যে যোগ্য লোকের আহার প্রতারকরা ঠকিয়ে না নেয়। ভারতে অলস বদমায়েসের অভাব নেই, আর আশ্চর্য এই, এরা কখনো ক্ষুধার জ্বালায় মরে না—কিছু না কিছু তাদের সব সময়ই জুটে যায়। ব্রহ্মা-নন্দকে বল, ত্রাণ-কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেককে সে যেন এইসব কথা লিখে দেয়—কোনো কাজের কাজ হবে না অথচ টাকা খরচও হবে, এরকম ব্যাপার যেন না ঘটে। সামান্য মাত্র ব্যয়ে যথাসম্ভব বড় এবং স্থায়ী কাজ আমরা চাই।

এখন দেখতে পাচ্ছ, নতুন নতুন মৌলিক আইডিয়া তোমাদের নিজেদেরই ভেবে বার করতে হবে—নইলে আমি মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু ভেঙেচুরে ছত্র-খান হয়ে যাবে। একটি প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখ: তোমরা একটি মিটিং কর—তার আলোচ্য বিষয় হবে "সীমাবদ্ধ সামান্য সঙ্গতি থেকে কীভাবে আমরা স্থায়ী এবং সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করতে পারি"। কয়েকদিন আগে যেন প্রত্যেককে নোটিস পায়, প্রত্যেকে যেন কোনো না কোনো পরামর্শ দিতে পারে, সব প্রস্তাব ও পরামর্শ নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা চলুক; সব শেষে আমাকে একটি রিপোর্ট পাঠাও।

শেষ কথা এই, আমার গুরুভাইদের কাছে আমার যে প্রত্যাশা তার চেয়ে অনেক বেশী আমার সন্তানদের কাছে—এই কথাটি মনে রাখবে। আমি নিজে যত বড় হতে পেরেছি, আমি চাই আমার সন্তানদের প্রত্যেকে তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একজন অতিমানব হতে হবে—হতেই হবে: এই আমার বাণী। আজ্ঞানুবর্তিতা, প্রস্তুতি এবং আদর্শের প্রতি অনুরাগ—এই তিনটি গুণ যদি থাকে তবে কিছুতেই তোমাদের আটকে রাখতে পারবে না।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ,
বিবেকানন্দ

[২৭]

আলমোড়া
২৩ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল,

এই চিঠি সংক্ষিপ্ত হল, কিছু মনে কোরো না। কোনো একটা জায়গায় পৌঁছেই তোমাকে বিস্তারিত পত্র দেব। এখন আমি পাহাড় থেকে সমতলের দিকে নামছি।

ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও অকপটতা সম্ভব—তোমার একথার অর্থ আমি বুঝি না। আমার কথা বলতে পারি, প্রাচ্য দেশীয় লৌকিকতার সামান্য যেটুকু আমার এখনো আছে তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে শিশুর সরলতা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি সব-কিছু ছাড়তে প্রস্তুত আছি। আহা, যদি একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস করা যায়, সরলতার মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়! তাই কি সবচেয়ে পবিত্র নয়?

এই সংসারে আমরা কাজ করি অন্যের ভয়ে, ভয়ে ভয়ে কথা বলি, চিন্তা করি ভয়ে ভয়ে। হায়রে, আমাদের জন্মই শত্রু দেশে! গুপ্তচর বিশেষভাবে তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। এমন একটা ভীতির হাত থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে লোক অগ্রসর হয়ে যেতে চায় তার কপালে কত না দুর্গতি! এ দেশ কি কখনো বন্ধুদের দেশ হবে? কে জানে? আমরা তো কেবল চেষ্টাই করতে পারি।

কাজ আগেই শুরু হয়ে গেছে, উপস্থিত দুর্ভিক্ষত্রাণই প্রধান কর্ম। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে কাজ চলছে; দুর্ভিক্ষত্রাণ, খানিকটা প্রচার এবং কিছু শিক্ষা দান। অবশ্য এখন পর্যন্ত এসব নিতান্তই তাৎপর্যবিহীন; শিক্ষাধীন ছেলেদের সুযোগ মত কাজে টেনে আনা হচ্ছে। বর্তমানে কাজের ক্ষেত্র মাদ্রাজ ও কলকাতা। মিঃ গুডউইন কাজ করছেন মাদ্রাজে। একজন কলম্বোতেও গেছেন। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি মাসের কার্যবিবরণী তোমার কাছে পাঠানো হবে, যদি না অবশ্য ইতিমধ্যে রিপোর্ট তোমার কাছে পৌঁছে থাকে। আমি কর্মকেন্দ্র থেকে দূরে রয়েছি, কাজেই বুঝলে তো কাজের গতি একটু ঢিলে। কিন্তু কাজ মোটের ওপর সন্তোষজনক।

তুমি এখানে না এসে ইংল্যাণ্ড থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পার। দরিদ্র ভারতবাসীর উপকারে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।

আমি ইংল্যাণ্ডে গেলে, ওখানকার কাজ যে অনেকটা জেঁকে উঠবে সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তথাপি এখানকার কর্মচক্র খানিকটা ঘুরতে আরম্ভ না করলে এবং আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালাবার মতো অনেকে আছে এবিষয়ে নিশ্চিত না হতে পারলে আমার পক্ষে ভারত ছাড়া সমীচীন হবে না। মুসলমানদের ভাষায় "খোদার মর্জিতে" তা হবে মাস কয়েকের মধ্যে। আমার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কর্মী—খেতড়ির রাজা এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন। আশা করছি তিনি শীঘ্রই ভারতে ফিরে আসবেন; তিনি যে আমার বিশেষ সহায়ক হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনন্ত ভালোবাসা ও আশীর্বাদসহ

তোমাদের

বিবেকানন্দ

[২৮]

আলমোড়া

২৯ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল,

স্টার্ডির একখানা চিঠি আমি পেলাম গতকাল তাতে জানলাম তুমি ভারতে এসে সবকিছু নিজের চোখে দেখতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ। গতকালই আমি সেই চিঠির জবাব দিয়েছি। কিন্তু মিস মূলারের কাছ থেকে তোমার প্ল্যান সম্পর্কে যা জানতে পারলাম তাতে এই বাড়তি চিঠি দেওয়া প্রয়োজন বোধ হল, আর এক্ষেত্রে জবাবটা সরাসরি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তোমাকে অকপটে বলি, ভারতের জন্য কাজের ব্যাপারে তোমার যে একটি বিরাট ভবিষ্যৎ আছে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। একটি নারীরই প্রয়োজন ছিল, পুরুষের নয়—ভারতীয়দের, বিশেষত মেয়েদের কাজে সত্যিকারের এক সিংহিনীর প্রয়োজন ছিল।

ভারত এখনো মহীয়সী নারীর জন্ম দিতে পারে না, তার জন্য তাকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। তোমার শিক্ষাদিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, অসীম, অনুরাগ, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার কেলটিক রক্ত—সব মিলিয়ে তুমিই সেই কাজের যোগ্য নারীরূপে পরিগণিত হয়েছ।

তবু অসুবিধাও অনেক। এখানে যে বিপুল দুঃখ-যন্ত্রণা, যে অন্ধ সংস্কার, যে দাসত্বের মনোভাব বর্তমান সে বিষয়ে তুমি কোনো ধারণাই করতে পারবে না। এখানে এসে দেখবে তুমি অর্ধ-নগ্ন অসংখ্য নরনারী-বেষ্টিত হয়ে আছ—যাদের জাতি-বর্ণ এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সম্পর্কে সব অদ্ভুত ধারণা, যারা ভয়ে হোক বা ঘৃণায় হোক শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং যাদের শ্বেতাঙ্গরাও ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে মনে করবে পাগলাটে, এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে।

তার ওপর এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত। এদেশের প্রায় সব জায়গায় শীতকাল তোমাদের গ্রীষ্মকালের ন্যায়, আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হলকা চলছে।

শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যবস্থা নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর তবে আসতে পার, তবে তোমাকে শতবার স্বাগত জানাই। আমার কথা বলতে পারি, অন্য সব জায়গার মতো এখানেও আমি তুচ্ছ, তথাপি আমার যে সামান্য প্রভাব আছে তা তোমার সাহায্যে নিয়োজিত হবে।

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে খুব ভালো করে ভেবে দেখো; তারপর যদি বিফল হও কিংবা যদি কর্মে বিরক্তি আসে তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো, আমি আমরণ তোমার পাশে দাঁড়াব—সে তুমি ভারতের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত মতবাদ ত্যাগই কর আর আঁকড়েই থাক। মরদের বাত আর হাতির দাঁত একবার বের হয়ে এলে আর ফিরে যায় না। আমি তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। অবশ্য এই সঙ্গে তোমাকে একটি হুঁশিয়ারীও দিতে চাই। তোমাকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, মিস মুলার বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া চলবে না। মিস মুলার তার আপন ভাবে খুবই ভালো মেয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—ছোট বেলা থেকেই তার মাথায় এই একটি ধারণা ঢুকে যায় যে নেতৃত্ব করার জন্যই তার জন্ম লাভ হয়েছে আর পৃথিবীকে চালাতে গেলে টাকা হলেই চলবে, অন্য কোন গুণাবলীর দরকার নেই। তার চাওয়া না চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই এই ধারণাটি বারে বারেই মাথা তুলছে; তুমি দিন কয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারবে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়। তার এখন ইচ্ছা তার নিজের জন্য, তোমার জন্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে যে বন্ধুরা আসবেন তাদের জন্য কলকাতায় একটি বাড়ি নেওয়া।

এটি তার সহৃদয়তা এবং আমায়িকতার পরিচায়ক; কিন্তু তার এই মঠ কর্তৃত্বের প্ল্যান সফল হবে না দুটি কারণে—(এক) তার রুক্ষ মেজাজ এবং অতিরিক্ত মাতব্বরিপনা, (দুই) আর তার অদ্ভুত অব্যবস্থিতচিত্ততা। কারো কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা ভালো দূর থেকে; আর যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সর্ব ব্যাপারেই তার ভালো হয়।

মিসেস সেভিয়ার অতি সৎ এবং মমতাময়ী—তিনি একটি রমণীরত্ন! সেভিয়ার দম্পতি সম্ভবত একমাত্র ইংরেজ দম্পতি যারা নেটিভদের ঘৃণা করেন না। স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া যায় না। একমাত্র মিঃ এবং মিসেস সেভিয়ারই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেন নি, কিন্তু তাঁদের এখনো কোনো কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট নেই। তুমি যখন আসবে তখন তাঁদের সহকর্মীরূপে পেতে পার, তাতে তোমার এবং তাদেরও সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা হল, নিজের পায়ে দাঁড়ানো—সেটি অপরিহার্য।

আমেরিকার সংবাদে জানতে পারলাম, আমার দুই বন্ধু—বোস্টনের মিসেস ওলি বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড এই শরৎকালেই ভারত দর্শনে আসছেন। মিস ম্যাকলয়েডকে তো তুমি লণ্ডন থেকেই চেনো—সেই যে প্যারিস ফ্যাশানের পোশাকে সজ্জিতা আমেরিকান মহিলাটি; মিসেস ওলি বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, তিনি

আমেরিকায় আমার বিশেষ একজন দয়ালু বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইউরোপ হয়ে আসছেন; অতএব আমার পরামর্শ—তুমি তাঁদের সঙ্গে এসো—একত্রে ভ্রমণে পথের এক ঘেয়েমি দূর হতে পারে।

দীর্ঘকাল পরে অন্তত স্টার্ডির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রাণহীন চিঠি। মনে হয়, লণ্ডনের কাজ পণ্ড হওয়াতে তিনি হতাশ হয়েছেন।

অনন্ত ভালোবাসাসহ
সদা ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২৭]

C/o এফ. এইচ. লেগেট
২১ ওয়েস্ট টুয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,

আমার আচরণের পক্ষে কোনো কথা বলতে চাইছি না। যে মন্দ কাজ আমি করেছি তা কথা দিয়ে মুছে দেওয়া যায় না, আবার যদি কোনো ভালো কাজ করতে চাই তাও সেজন্য করে থামানো যাবে না।

গত কয়েকমাস ধরে কেবল শুনে আসছি—পশ্চিমের লোকদের দেওয়া কত না বিলাসিতা আমি ভোগ করছি, আমার মতো ভণ্ড না কি আর হয় না, নিজে বিলাস ভোগ করছি অথচ সব সময় অপরকে দিচ্ছি নিবৃত্তির উপদেশ, এমন সব না কি বিলাসের উপকরণ যা উপভোগের দরুন অন্তত ইংল্যাণ্ডে আমার চলার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি নিজেকে প্রায় মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিলাম এই আশা পোষণ করে যে আমার জীবনের রুক্ষ মরুভূমিতে একটি ক্ষুদ্র মরুদ্যান বুঝি দেখা দিয়েছে, আমার সমগ্র জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা ও বিষাদ মলিনতার মধ্যে বুঝি একটি ক্ষুদ্র আলোক রেখা দেখা দিয়েছে; কঠোর পরিশ্রম এবং কঠোরতর অভিশাপভরা জীবনে এক মুহূর্তের বিনোদন—সেই মরুদ্যান, সেই আলোক রেখা, সেই মুহূর্তটিও কি মাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগের মুহূর্ত !!

যারা আমাকে সেইটুকু পেতে সাহায্য করেছে তাদের প্রতিদিন একশবার আশীর্বাদ করে আমি খুশি হয়েছি; আর এখন দেখ তোমার শেষ চিঠিখানা এল এক বজ্রের করতালির মতো, সব স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল। তোমার সমালোচনা আমি অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি—এই সব ভোগ বিলাসের কথা বার্তায় এবং স্মৃতিপটে জাগ্রত অন্য সব স্বপ্নদৃশ্যে আমার আর বিশ্বাস নেই। এ কথা আমি জোর করেই

বলছি। যদি উপযুক্ত বিবেচনা কর তাহলে বন্ধু বান্ধবদের একথা জানিয়ে দেবে আশা করি ; আমার ভুল হলে সংশোধন করে দিয়ো।

রিডিং-য়ে তোমার বাড়ির কথা আমার স্মরণ আছে ; সেখানে আমাকে খাদ্য হিসাবে দেওয়া হত বাঁধাকপি সেদ্ধ, আলু, সেদ্ধ ভাত আর মসুর ডাল—আর সময় মশলার স্থান পূরণ করত তোমার স্ত্রীর গালমন্দ ও অভিশাপ। তুমি আমাকে এক শিলিং বা এক পেন্স দামেরও কোনো চুরুট খেতে দিয়েছ বলে স্মরণ হয় না। খাদ্যাদি নিয়ে কিংবা তোমার স্ত্রীর বিরামহীন গালমন্দ অভিশাপ নিয়েও আমি কখনো কোনো অভিযোগ করেছি বলেও স্মরণ করতে পারছি না ; যদিও বাস করেছি চোরের মতো, ভয়ে কেঁপেছি সর্বদা আর প্রতিদিন কাজ করে গেছি তোমারই জন্য।

এর পর আসে সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়ির স্মৃতি—যেখানে কর্তা ছিলে তুমি এবং মিস মুলার। আমার গরবী ভাই বেচারী সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু মিস মুলার তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেও খাদ্য বা পানীয় অথবা শয্যা কিংবা এমনকি আমাকে দেওয়া ঘরটির ব্যাপারেও কোনো বিলাস-ব্যসনের অবকাশ ছিল বলে স্মরণ করতে পারছি না।

তারপর মিস মুলারের বাড়ি। মিস মুলার আমাকে খুবই দয়া করেছেন, কিন্তু আমি সেখানে বাদাম আর ফল খেয়ে বেঁচে থেকেছি। এর পরের স্মৃতি হল লণ্ডনের সেই অন্ধকার গর্তের স্মৃতি—সেখানে আমাকে কাজ করতে হত প্রায় সারা দিন রাত, তারপর পাঁচ-ছয় জন লোকের খাবার রান্না করা—বেশীরভাগ রাতেই আমার জুটত এক টুকরা রুটি আর একটু মাখন।

আমার স্মরণ আছে মিসেস স্টার্ডি আমাকে একরাতে তার বাড়িতে আহার ও আশ্রয় দিয়েছিলেন—পরদিন সকালেই কালো বদমাসটাকে গাল দিয়েছেন এই বলে যে, সেই কালো বর্বরটা এতই নোংরা আর সারা বাড়িটাকে সে ধোঁয়ায় ভর্তি করে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সেভিয়ার ব্যতীত ইংল্যাণ্ডে আর কারও কাছ থেকে রুমালের মতো বড়ো একখণ্ড ন্যাকড়াও আমি পেয়েছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডে থাকতেই আমার শরীর ও মনের ওপর যে বিরামহীন চাপ পড়েছে তার ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। এইতো আমার প্রতি তোমাদের ইংরেজদের দান, অথচ খাটাতে খাটাতে তোমরা আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। এখন আমাকে গালমন্দ অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে ভোগ বিলাসে সময় কাটিয়েছি বলে !! তোমাদের মধ্যে কোন একজন কি আমাকে একটি কোট দিয়েছিলে ? কে দিয়েছিলে একটি চুরুট ? একটুকরো মাছ কি মাংস কি কেউ দিয়েছিলে ? তোমাদের মধ্যে কারও কি এই স্পর্ধা আছে যে বলতে পারে—আমি তোমাদের কাছে খাদ্য বা পানীয় অথবা চুরুট—তামাক—সিগারেট কিংবা পোশাক নয়ত টাকা চেয়েছি ? স্টার্ডি, ভগবানের দোহাই, তোমার বন্ধুদের একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ, প্রথমে জিজ্ঞাসা কর তোমার "ভেতরকার ভগবানকে যিনি কখনো ঘুমিয়ে থাকেন না"।

তোমরা অনেক টাকা দিয়েছ আমার কাজের জন্য। তার প্রত্যেকটি পেনী জমা রয়েছে। তোমাদের চোখের সামনে আমি আমার ভাইকে দূর করে দিয়েছি, সম্ভবত মৃত্যুর দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছি; যে টাকা আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয় তা থেকে একটি ফার্দিংও আমি তাকে দিই নি।

আর একদিকের চিত্রও আমার স্মরণ আছে: ইংল্যাণ্ডে যখন আমি শীতে কষ্ট পেয়েছি তখন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার আমায় পোশাক জুগিয়েছেন, আমার নিজের মায়ের চেয়েও ভালো করে আমার সেবা করেছেন, আমার দুর্বলতা সহ্য করেছেন, আমার কষ্টভোগের অংশ নিয়েছেন। আর তবু আমার প্রতি তাদের অফুরন্ত আশীর্বাদই আছে, আর কিছু নেই। আর সেই মিসেস সেভিয়ার আজ হাজার হাজার লোকের পূজো পাচ্ছেন—যিনি কখনো সম্মানলাভের জন্য লালায়িত হন নি। তিনি যখন দেহত্যাগ করবেন তখনও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে মনে রাখবে দরিদ্র ভারতবাসীদের একজন মহীয়সী হিতসাধিকা হিসাবে। এঁরা আমাকে কখনো ভোগ বিলাসের জন্য গালমন্দ অভিশাপ দেন নি; অথচ আমার প্রয়োজন হলে অথবা আমি চাইলে তারা আমাকে সব রকম বিলাসের উপকরণ যোগাতে প্রস্তুত।

মিসেস বুল, মিস ম্যাকলয়েড, মিঃ ও মিসেস লেগেটের কথা তোমাকে বলবার প্রয়োজন দেখি না। আমার প্রতি তাদের অনুরাগ ও মমতার কথা তুমি জান; মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড আমাদের দেশেও ছিলেন, তখন তাঁরা আমাদের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা চলাফেরা করেছেন কোনো বিদেশী কখনো তেমনটি করেনি—ওঁরা সব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন; তাঁরা কিন্তু বিলাস-ব্যসনের জন্য আমাকে কখনো গালমন্দ অভিশাপ দেন নি। আমি যদি ভালো খাওয়া দাওয়া করি, ইচ্ছা করে যদি এক ডলার দামের চুরুট খাই তবে ওঁরা আত্যন্তিক আনন্দ বোধ করবেন। এই লেগেট এবং বুলদের মতো লোকেরাই আমার আহার জুগিয়েছেন, তাদের টাকাতেই আমার চুরুট কেনা হয়েছে, কয়েকবার তারাই আমার বাসস্থানের ভাড়া দিয়েছেন; আর এই সব সময়টা ধরে আমি নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করছিলাম তোমাদেরই লোকদের কাজে, যখন তোমরা এক অন্ধ কুঠরী আর উপবাসের বিনিময়ে আমার দেহ শোষণ করে নিচ্ছিলে আর জমা করে রাখছিলে এখানকার এইসব ভোগ-বিলাসের অভিযোগ আর নিন্দা।

"গর্জনেতে ভীষণ দেখি শারদ মেঘের দল
কভু নয়ত বর্ষণ;
বর্ষা কালের বাদল মেঘে রবের নেইকো লেশ
তবু বিশ্বজুড়ে প্লাবন।"

দেখ স্টার্ডি, যারা সাহায্য করেছেন, এখনো সাহায্য করছেন তাদের মুখে কোনো নিন্দা নেই, কোনো গালমন্দ অভিশাপ নেই: যারা কিছুই করে না, যারা আসে কেবল নিজ নিজ মতলব হাসিল করতে, তারাই কেবল সমালোচনা করে, গালমন্দ

অভিশাপ দেয়। এই সব হৃদয়হীন, অপদার্থ, স্বার্থপর, অকর্মন্যরা যে সমালোচনা করে সেটাকেই আমি আশীর্বাদ বলে গণ্য করি। এই সব অতি স্বার্থপর মতলব-বাজদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে থাকতে পারাটাই আমার কাম্য।

ভোগবিলাসের কথা বলছ! এই সব সামালোচকদের এক এক করে পরখ করে দেখ—এরা সকলে ভোগসর্বস্ব, কোথাও কোনো আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। ভগবানের অসীম করুণা, আজ হোক কাল হোক এদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েই। আর এইসব হৃদয়হীন স্বার্থপর লোকদেরই অভিপ্রায় অনুযায়ী আমার আচরণ-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করতে তুমি আমায় উপদেশ দিচ্ছ! আমি সেইরকম করছি না বলে তুমি দিশেহারা বোধ করছ!

আমার গুরুভাইদের কথা আমি তাদের যা করতে বলব তা ছাড়া তারা কিছুই করবেন না। যদি কোথাও তারা কোনো স্বার্থপরতা দেখিয়ে থাকেন তাহলে তা করেছেন আমারই আদেশে, নিজেরা স্বার্থপর হবেন বলে নয়।

লণ্ডনে আমাকে যে অন্ধকুঠরীটি দিয়েছিলে তাতে তোমার সন্তানদের থাকতে দিতে কি? খাটতে খাটতে এবং প্রায় সবদিন আধা-উপবাসে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দিতে কি? সেরকমটা হলে মিসেস স্টার্ডির কেমন লাগত? আর তাঁরা তো সন্ন্যাসী; আর একথাও জানা দরকার, কোনো সন্ন্যাসীই অপ্রয়োজনে তার জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন না, বা অনাবশ্যক কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

পশ্চিম জগতে এই রকম অনাবশ্যক কষ্ট করে আমরা সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করেছি মাত্র। ঐ সন্ন্যাসীরা আমার ভাই, আমার সন্তান। আমার জন্য তারা অন্ধকূপে পড়ে মরবেন সে আমি কখনো চাই না। যা কিছু সৎ এবং সত্য আছে তার নামে শপথ করে বলতে পারি—তারা কাজ করবেন অথচ উপবাসে থাকতে হবে, সকলরকম কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করেও তাদের গালমন্দ অভিশাপ শুনতে হবে, তা আমি কখনো চাই না।

আর একটি কথা।—দেহ নির্যাতনের মতবাদ আমি কোথায় প্রচার করেছি তা যদি তুমি দেখিয়ে দিতে পার তবে খুবই খুশি হব। শাস্ত্রের কথা তুললে আমি বলব—পরমহংস এবং সন্ন্যাসীরা আমাদের জীবনযাত্রার যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন কোনো শাস্ত্রী তার বিরোধিতা করুক তো দেখি, তবে বুঝব।

দেখ স্টার্ডি, আমার হৃদয় বেদনার্ত। আমি সবই বুঝি। তুমি কিসের মধ্যে পড়েছ তা আমি জানি—এমন একদল লোকের খপ্পরে তুমি পড়েছ যারা তোমাকে আপন কাজে লাগাতে চায়। তোমার স্ত্রীর কথা বলছি না। তিনি এতই সরল যে তার কাছ থেকে কোনো বিপদ দেখা দেবে না। কিন্তু বৎস: তোমার মধ্যে মাংস-গন্ধ—কিছু টাকা হয়েছে তোমার—অতএব শকুনের ভীড় জমেছে। এই তো জীবন।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছ। সেই ভারত মরে যায়নি স্টার্ডি, সে এখনও বেঁচে আছে। সেই জীবন্ত ভারত এখনো তার মর্মবাণী প্রচারের স্পর্ধা

রাখে, ধনগর্বীদের সে ভয়ও করে না খাতিরও করে না ; কারও মতামতকেই সে ভয় করে না—যেখানে তার পায়ে শেকল সেখানেও না এবং যারা সেই শেকল ধরে রেখেছে সেই তার শাসকদের মুখোমুখী হয়েও না। সেই ভারত এখনো বেঁচে আছে স্টার্ডি, সেই অমর প্রেমের ভারত, সেই অনন্ত বিশ্বস্ততার ভারত, সেই অপরিবর্তনীয় ভারত এখনো বেঁচে আছে ; আচারে আচরণেই যে শুধু তার পরিবর্তন হয়নি তা নয়—প্রেমে, বিশ্বাসে এবং বন্ধুত্বেও সে সমানই অপরিবর্তনীয় রয়েছে। আর সেই ভারতের সন্তানদের মধ্যে যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই আমি তোমাকে ভালোবাসি স্টার্ডি, ভালোবাসি আমার ভারতীয় প্রেম দিয়ে ; তোমার এই ভ্রান্তি অপনোদনে সাহায্য করার জন্য যে কোনো দিন হাজার দেহ বিসর্জন করতে আমি প্রস্তুত।

তোমাদের চিরদিনের
বিবেকানন্দ

[৩০]

চিকাগো
২৬ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস লেগেট,

আপনার যাবতীয় সহৃদয়তার জন্য বিশেষত সহৃদয় পত্রখানার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমি আগামী বৃহস্পতিবার চিকাগো থেকে যাত্রা করছি, সেদিনের জন্য টিকেট, বার্থ সব পাওয়া গেছে।

মিস নোবল এখানে বেশ ভালোই কাজ করছে, কাজ করে সে নিজের পথ করে নিচ্ছে। সেদিন আলবার্টার সঙ্গে দেখা হল। এখানে থেকে সে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে, খুবই সুখী আছে। মিস অ্যাডামস (জেন অ্যাডামস) বরাবরেরই মত একটি এঞ্জেল।

যাত্রা করার আগে জো জো কে চিঠি লিখব, তারপর সারারাত পড়ব।

মিঃ লেগেটকে এবং আপনাকে অজস্র ভালোবাসা জানাচ্ছি।

আপনাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৩১]

চিকাগো
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৯

(মিসেস লেগেটকে লেখা)

প্রিয় মা,

মাদাম কালভের দর্শন ছাড়া আর কোনো নতুন খবর নেই। উনি একজন মহীয়সী নারী। তাঁর সঙ্গে আরো দেখা সাক্ষাৎ হলে খুশী হতাম। সাইক্লোনের

বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে এক বিশাল পাইন গাছ—দৃশ্যটি অতি চমৎকার। তাই নয় কি?

আমি আজ রাত্রিতে এই স্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অ—অপেক্ষা করছে: তাড়াতাড়িতে এই কয়েক ছত্র লিখছি। মিসেস্ ব্ল্যাডামস বরাবরের মতোই সহৃদয়। মার্গট চমৎকার কাজ করছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আপনাকে চিঠি দেব।

ফ্র্যাঙ্কিন সেনসকে অজস্র ভালোবাসা।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

[৫২]

লস এঞ্জেলস
৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গট,

তোমার ষষ্ঠ চিঠি এসেছে; কিন্তু আমার ভাগ্যে এখনো কোনো পরিবর্তন আসে নি। তোমার কি মনে হয় পরিবর্তনের ফল ভালো হবে? কোনো কোনো লোকের ধাতই ঐ রকম: তারা দুঃখ ভোগ করতে ভালোবাসে। যাদের মধ্যে আমি জন্মলাভ করেছি সেই সব লোকের জন্য যদি বুক না ফাটাতাম তবে অন্য কারও জন্য ঠিকই তা করতাম। সে ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই। বুঝতে পারছি, কোনো কোনো লোকেরই এই রকমই ধরন-ধারণ। এ কথা সত্য আমরা সকলেই সুখের সন্ধানে ছুটি; কিন্তু কেউ কেউ অসুখী হয়েই সুখ পায়—অদ্ভুত ব্যাপার, তাই নয় কি? কোনোটাতেই কোনো ক্ষতি অবশ্য নেই, কিন্তু সুখ এবং অ-সুখ দুটিই বড় ছোঁয়াচে। ইনগারসোল এক বার বলেছিলেন, তিনি যদি ভগবান হতেন তবে ব্যাধির বদলে স্বাস্থ্যকে ছোঁয়াচে করে দিতেন; উনি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেন নি যে স্বাস্থ্যও ব্যাধির ন্যায় ছোঁয়াচে, বেশী ছাড়া কম নয়! ঐটিই বিপদ। আমি অ-সুখী লোক এবং দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করলাম তাতে দুনিয়ার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তা যেন অপরের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। এইটিই আসল কথা। ধর্মপ্রবক্তা যখনই মানুষের অবস্থা দেখে যন্ত্রণা বোধ করতে শুরু করেন তখনই তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়, তিনি বুক চাপড়াতে থাকেন, সবাইকে ডেকে বলতে থাকেন—তোমরা টারটারিক অ্যাসিড গেলো, কয়লা চিবোও, ছাই মেখে গোবর গাদার ওপর বসে বসে, কেবল কঁকাও আর চোখের জল ফেলো! আমার মনে হয় এদের সকলেরই অসম্পূর্ণতা ছিল। সত্যি সত্যি অসম্পূর্ণতা ছিল তাদের। বিশ্ব সংসারের বোঝা যদি তুমি তুলে নিতে প্রস্তুত থাক তো তা তুলে নাও, যেমন করে হোক নাও। কিন্তু আমরা যেন তোমার কঁকানি গালমন্দ অভিশাপ না শুনি! তোমার কষ্ট ভোগ দিয়ে আমাদের তুমি ভয় পাইয়ে দিয়ো না—যেন আমাদের মনে না হয় যে আমাদের নিজ নিজ দুঃখভার নিয়েও আমরা বেশ ভোকা আছি। যে

মানুষ সত্যিই বোঝা বহন করেন তিনি জগৎ সংসারকে আশীর্বাদ করে একলা আপন পথে আপনি চলেন। তাঁর মুখে একটিও নিন্দার কথা নেই, সমালোচনার একটি কথাও নেই ; কোনো অশুভ যে নেই তা নয়—কিন্তু তিনি তো আপন ইচ্ছায় নিজের খুশিতে সেই ভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। যিনি পরিত্রাতা তিনিই "আপন পথে আপনি যাবেন, যারা পরিত্রাণ পেল তারা নয়।"

আজ সকালে আমি এই আলোকেরই সন্ধান পেলাম। এই আলোক যদি আমার সঙ্গী হয়, যদি তা আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত হয় তাহলেই যথেষ্ট।

যারা দুঃখভারগ্রস্ত তারা এসো, আমার ওপর সব ভার চাপিয়ে দাও, তারপর তোমাদের যেমন খুশি চল এবং কর, নিজেরা সুখী হও—আর আমার যে কখনো অস্তিত্ব ছিল সে কথা ভুলে যাও।

অনন্ত ভালোবাসা সহ
তোমার পিতা
বিবেকানন্দ

[৩১]

(মিসেস লেগেটকে লেখা)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রিট
স্যানফ্র্যান্সিসকো
১৭ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মা,

আপনার সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে ভারী খুশি হলাম। আপনি অবশ্য নিশ্চিন্ত হতে পারেন—আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। তথাপি কোনো কারণে একটু বিলম্ব হলে মার্ভাসনেস দেখা দেয়।

ডাঃ এবং মিসেস হিলার শহরে ফিরে এসেছেন ; ওরা বলছেন, মিসেস মেলটনের রগড়ারগড়ির ফলে ওদের খুব উপকার হয়েছে। আমার দিক থেকে দেখছি, বুকের ওপর বেশ বড় বড় কয়েকটা লাল দাগ পড়ে গেছে। পরে সম্পূর্ণ সেরে যায় কিনা সেকথা আপনাকে নিশ্চয় জানাব। অবশ্য আমার কেসটি এমনই যে আপনা থেকে তা সারতে সময় লাগবে।

আপনার এবং মিসেস অ্যাডামসের অনুগ্রহের জন্য আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। আমি নিশ্চয়ই যাব এবং চিকাগোয় তাদের সঙ্গে দেখা করব।

আপনার সব ব্যাপার কেমন চলছে ? আমি এখানে "হয় কর নয় থাম"—এই প্ল্যানে চলছি, এখন পর্যন্ত ফল খারাপ হয় নি। তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয়া মিসেস হ্যানসবরো এখানে রয়েছেন ; আমাকে সাহায্য করার জন্য তিনি কাজ, কাজ আর কাজ করেই চলেছেন। ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে শক্তি দিন। তিন বোন তিনটি এঞ্জেল ; তাই নয় কি ? এখানে ওখানে এরকম মহৎ হৃদয়ের সন্ধান পেলে মনে হয় এই জীবনের যাবতীয় অসারতায় ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।

আপনার চির কল্যাণ হোক—এই আমার প্রার্থনা। বলা বাহুল্য, আপনিও স্বর্গের দূতীদের অন্যতমা।

মিস কেটকে ভালোবাসা জানাই।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

"মায়ের সন্তান" কেমন আছে ?

মিস পেনসার কেমন আছেন ? তাকে আমার ভালোবাসা জানাই। আপনি তো জানেন, চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে আমি খুবই নিকৃষ্ট, কিন্তু আমার হৃদয়টি মিথ্যা নয়। মিস স্পেনসারকে এ কথা বলবেন।

[৩৪]

(মিসেস লেগেটকে লেখা) ১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট
স্যানফ্র্যান্সিসকো
১৭ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মা,

জোর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম ; আমাকে লিখেছে যেন চার খণ্ড কাগজে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিই, তার ফলে মিঃ লেগেট টাকাটা আমার নামে ব্যাঙ্কে রাখতে পারবেন। সময়মত তার কাছে পৌঁছুতে পারা যাবে না বলে কাগজগুলি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভালো হচ্ছে, আর্থিক দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ হচ্ছে। আমি বেশ সন্তুষ্ট আছি। আপনার ডাকে আরো বেশি লোক সাড়া দেয়নি দেখে আমি আদৌ দুঃখিত নই। আমি জানতাম তারা সাড়া দেবে না। তথাপি আপনার অনুগ্রহের জন্য আমি আপনার প্রতি সদা কৃতজ্ঞ। আপনার এবং আমাদের সকলের চির কল্যাণ হোক।

আমার চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে ভালো হয় : ১২৩১ পাইন স্ট্রীট, C o দি হোম অব ট্রুথ। আমি যদিও ইতস্তত ঘুরে বেড়াব কিন্তু এই জায়গাটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আর এখানকার লোকেরা আমার প্রতি খুবই সদয়।

আপনি এখন বেশ ভালো আছেন জেনে খুবই খুশি হলাম। মিসেস ব্লডগেটের কাছে খবর পেলাম মিসেস মেলটন লস এঞ্জেলস থেকে চলে গেছেন। তিনি কি নিউ ইয়র্কে গেছেন ? ডাঃ এবং মিসেস হিলার গত পরশু স্যানফ্রান্সিসকোতে ফিরে এসেছেন। তারা বলছেন, মিসেস মেলটনের দ্বারা তাদের প্রচুর সাহায্য হয়েছে। মিসেস হিলার আশা করছেন শীঘ্রই সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন।

এখানে এবং ওকল্যাণ্ডে এর মধ্যেই আমার অনেকগুলি বক্তৃতা হয়ে গেছে। ওকল্যাণ্ডের বক্তৃতা থেকে ভালো পয়সা পাওয়া গেছে; স্যানফ্র্যান্সিসকোতে প্রথম সপ্তাহে টাকা পয়সা পাওয়া যায়নি, এ 'সপ্তাহে যাচ্ছে। আশা করি আগামী সপ্তাহেও পাওয়া যাবে। বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট যে সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন সেকথা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। তিনি সত্যি কত ভালো।

ভালোবাসা সহ
আপনাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

তুরীয়ানন্দর কোনো খবর কি আপনি জানেন? সে কি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে?

বি

[৩৫]

(মিসেস লেগেটকে লেখা)

১৭১৯, টার্ক স্ট্রীট
স্যানফ্র্যান্সিসকো
৭ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মা,

ক্ষতের কারণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে সংবাদ পেলাম, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই বার আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আপনার সহৃদয় পত্রখানা আমাকে বেশ চাঙ্গা করে তুলেছে। লোকে আমাকে সাহায্য করতে এল কি না এল তাতে আমি আর ভ্রূক্ষেপ করি না; আমি ক্রমেই কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি এবং মনে মনে স্থির ও শান্ত হচ্ছি।

মিসেস মেলটনকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাবেন। পরিণামে আরোগ্য-লাভ করবই তা নিশ্চিত। মোটের ওপর আমার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, মাঝে মাঝে অবশ্য আবার শরীর খারাপ হয়। তবে প্রত্যেকবারই অসুখটা কম তীব্র হয় এবং বেশীক্ষণ থাকেও না।

তুরীয়ানন্দ এবং সিস্টির চিকিৎসা করানোটা আপনারই উপযুক্ত কাজ হয়েছে। আপনার মহৎ হৃদয়, ভগবানের আশীর্বাদ আপনি লাভ করেছেন। আপনার এবং আপনাদের সকলের চির কল্যাণ হোক।

এ কথা ঠিক যে আমার ফ্রান্সে যাওয়া উচিত এবং ফরাসী চর্চা করা উচিত। জুলাই মাসে কিংবা তার আগেই আমি ফ্রান্সে পৌঁছব বলে আশা করি। জগন্মাতাই জানেন। সকল ব্যাপারেই আপনার যেন ভালো হয়—এই আমার সতত প্রার্থনা।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

[৩৬]

১৭ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মিঃ লেগেট,

এই সঙ্গে এক্সিকিউট করা উইলখানা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। তার অভিপ্রায় অনুসারে উইল স্বাক্ষর করা হয়েছে; বরাবরের মতোই আমি আবার আপনাকে এর ভার নেবার কষ্ট স্বীকার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনি এবং আপনাদের আর সবাই আমার প্রতি বরাবর সমান সদয় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বন্ধু জানেন তো, মানুষের স্বভাবই হল—যেখানে সে উপকার পেয়েছে সেখানেই সে আরো উপকার চায়।

আমি তো সেই রকমই একজন মানুষ—আপনার সন্তান।

অ—কিছু গোলমাল করেছে জেনে খুব দুঃখিত হলাম। মাঝে মাঝে এরকম গোলমাল সে করে থাকে—অন্তত আগে তাই করত। আমি মাথা গলাতে সাহস পাই না—আরো গোলমাল সৃষ্টির ভয়ে। তাকে কী করে সামলানো যায় তা আপনিই ভালো জানেন। আপনি যখন এই চিঠি পাবেন ততক্ষণে আমি স্যান-ফ্র্যান্সিসকো ছেড়ে চলে যাব। কাজেই ভারত থেকে আসা আমার চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় যদি দয়া করে পাঠিয়ে দেন তবে খুব ভালো C/o মিসেস হাল, ১০ অ্যাসটার স্ট্রীট, চিকাগো। মার্গটের চিঠিপত্রও ঐ একই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। মার্গটের স্কুলের জন্য আপনি যে এক হাজার ডলার দান করেছেন তাতে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।!

আমার প্রতি এবং আমাদের সকলের প্রতি আপনার এবং আপনাদের সকলের সর্বকালীন এবং সমপরিমাণ ক্ষমতা অব্যাহত রয়েছে; আপনি এবং আপনারা সকলে অতন্ত্র আশীর্বাদ লাভ করুন—এই আমার সতত প্রার্থনা।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

মিসেস লেগেট সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন জেনে সবিশেষ আনন্দিত হলাম।

বি

[৩৭]

(লস এঞ্জেলসের মিসেস ব্লডগেটকে লেখা)

২ মে, ১৯০০

প্রিয় রশ্মি মাসী,

আপনার অতি সহৃদয় পত্রখানা এসেছে। ছয়মাস কঠোর পরিশ্রমের পর আমি আবার জ্বর এবং স্নায়বিক ব্যাধিতে পড়েছি। অবশ্য এইটি জানা গেছে যে আমরা

কিডনি এবং হৃদ্‌যন্ত্র বরাবরের মত ভালো আছে। গ্রামাঞ্চলে ক'দিন বিশ্রাম নেব তারপর চিকাগো রওয়ানা দেব।

মিসেস মিলওয়ার্ড অ্যাডামসকে এই মাত্র একখানা চিঠি দিলাম; আমার কন্যা মিস নোবলকে একখানা পরিচয় পত্রও দিয়েছি; বলেছি সে যেন গিয়ে মিসেস অ্যাডামসের সঙ্গে দেখা করে এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি যা জানতে চান সব কিছু যেন তাঁকে জানায়।

মাগো, আপনার জীবনে কল্যাণ ও শান্তি আসে যেন। একটু শান্তি আমারও বিশেষ প্রয়োজন—আমার জন্য আপনি একটু প্রার্থনা করুন। কেটকে ভালোবাসা জানাই—

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

মিস স্পেনসারকে,—বাসাকুইসিটুজ (?) দের, মিসেস এস—কে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসা জানাই।

ট্রিকসের মাথায় এক ঝুড়ি ভালোবাসা।

বি

[৩৮]

পেরোস গীরেক
ব্রেটাগনে
২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

মিস আলবার্টা স্টার্জেসকে তার ২৩তম জন্মদিনে

বীরের শপথ, হৃদয় সরস
মাতার, সবার মিষ্ট পরশ
কোমল পুষ্পরাজির; মায়ায়
তারই, আরো শক্তি-ছায়ায়
কাঁপে, বেদীর পরে নাচন
শিখার আমোদ ভরা কাঁপন;
শক্তি যাহা চালায়
যে প্রেম শুধু মানায়;

দূর-প্রসারী স্বপন সে তো
ধৈর্য-ধরা পথ নেবে তো
　　নিজের পরে প্রত্যয় অপার
　　ছোট বড় নাইকো বিচার
সকল দৃষ্টি দেবে,
তোমারই তা রইবে ;
এ সব কিছু, আরো আরো
　　যা চাহে মোর প্রাণ
আজ এই দিনে হোক তোমারো
　　"মাতা" করুন দান।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদসহ
তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৭]

প্রিয় আলবার্ট,

এই ছোট কবিতাটি তোমার জন্মদিনের উদ্দেশে। রচনা ভালো হয়নি, কিন্তু ওতে রয়েছে আমার সমগ্র ভালোবাসা। অতএব আমি নিশ্চিত, এটি তোমার ভালো লাগবে।

ওখানে যে পুস্তিকাগুলি আছে তার একখানা করে কপি কি তুমি দয়া করে মাদাম বেসনার্ড, ক্লেরয়, ব্রেস কমপেইন, ওইসেকে পাঠিয়ে দেবে? আমি তাহলে বাধিত হব।

তোমার শুভানুধ্যায়ী
বিবেকানন্দ
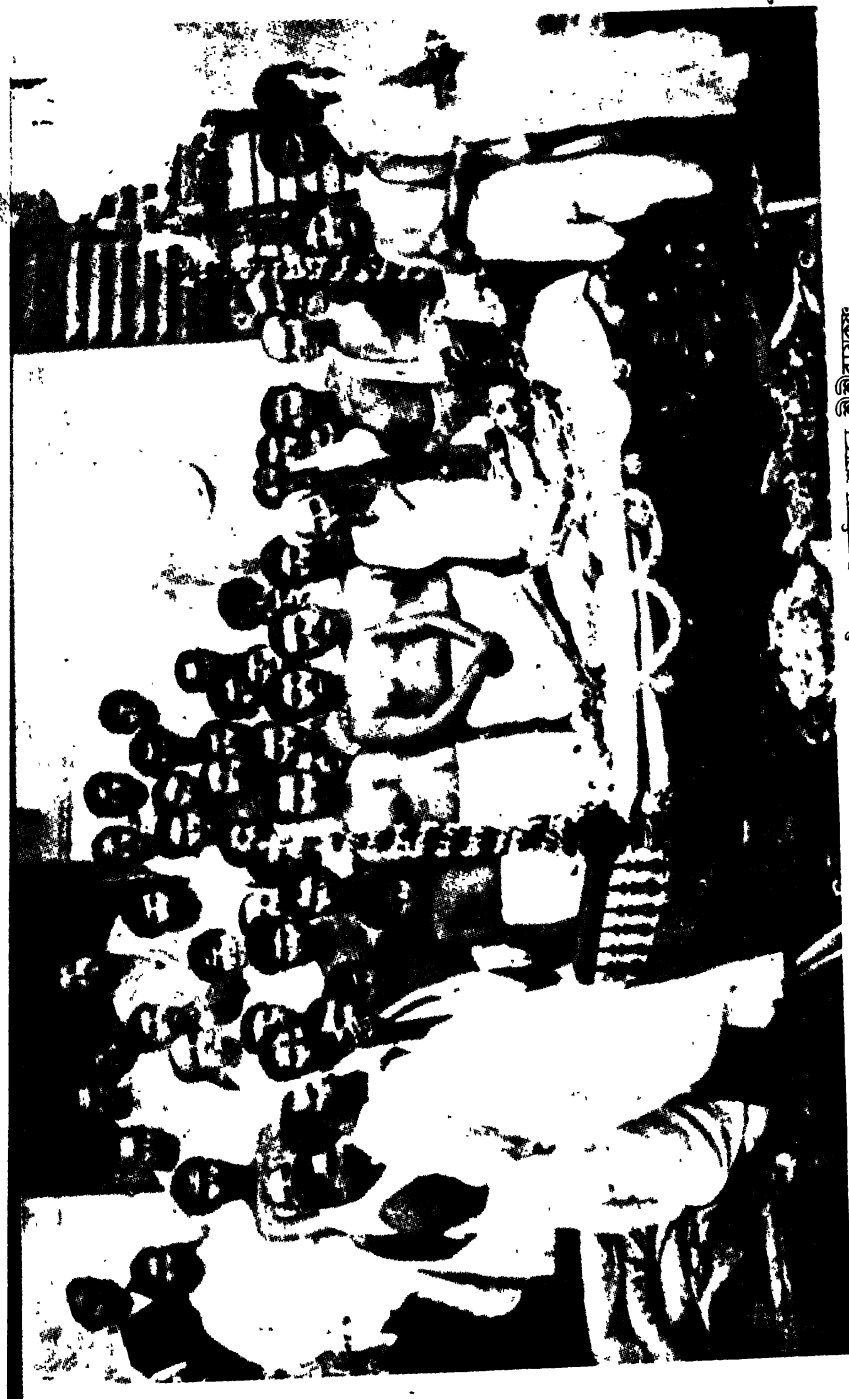
স্বামী বিবেকানন্দ সহ শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অন্তিম শয়নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৯৮ সনে কাশ্মীরে
শ্রীমতী জে, ম্যাকলিওড, শ্রীমতী ওলি বুল, বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা
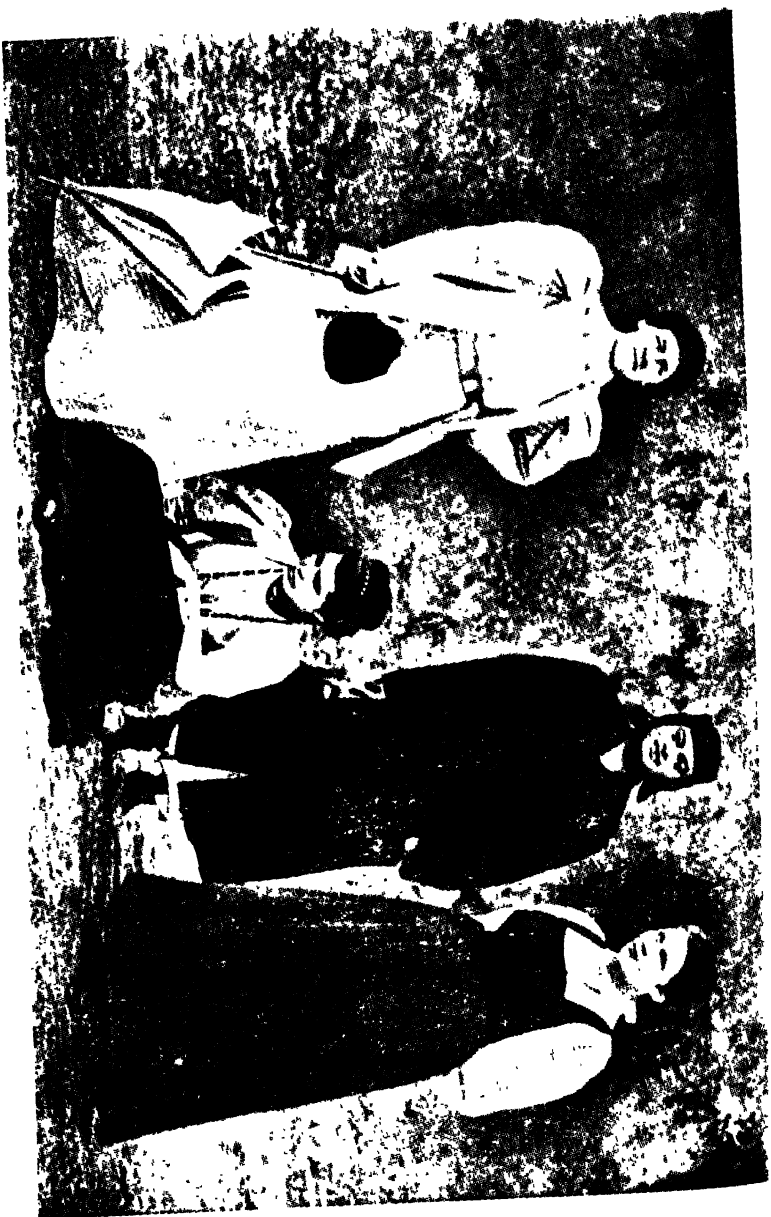
কাশ্মীরে। চেয়ারে বসে: সদানন্দ, বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ধীরানন্দ

কাশীপুর বাগানবাড়ি।

প্রবন্ধ ও বক্তৃত
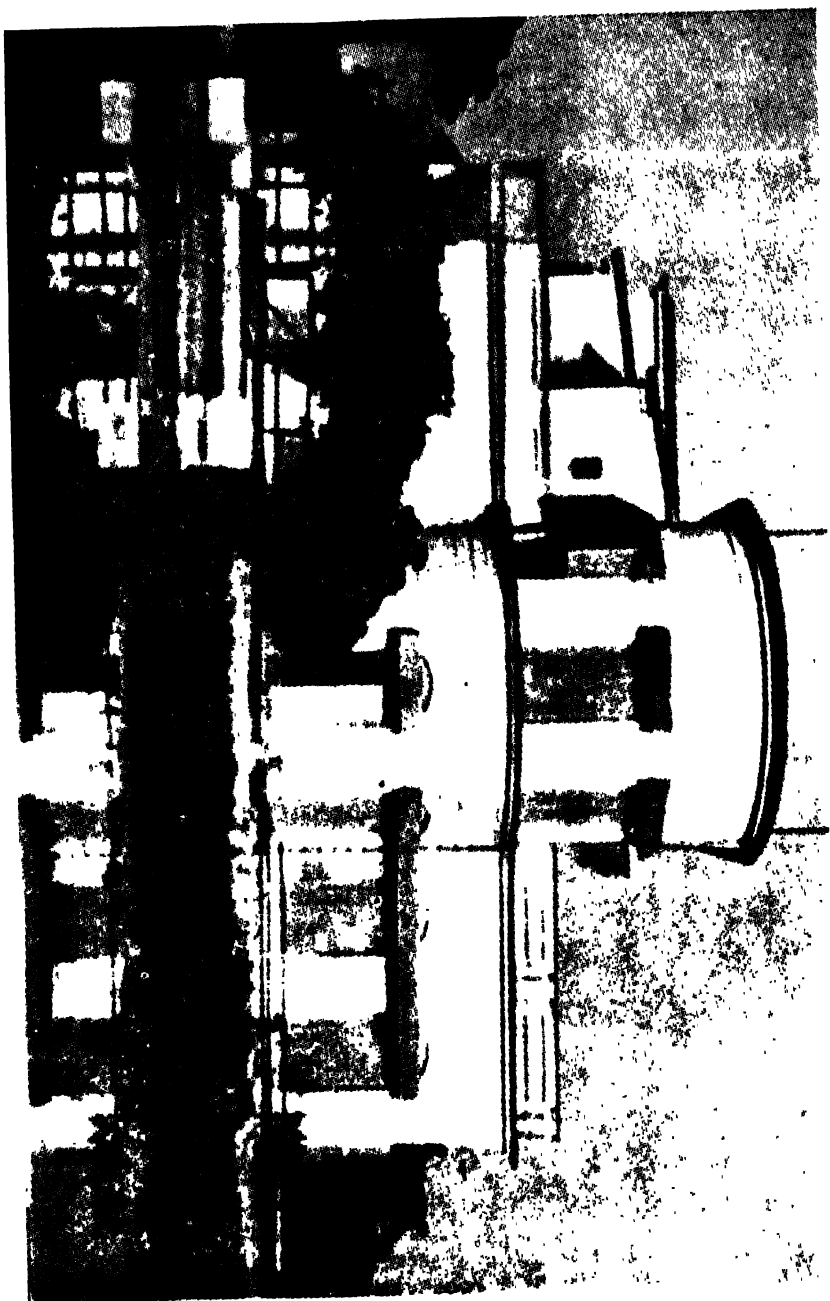
আমাদের কর্তব্য

[চিকাগো থেকে ১৮৯৪ সনের ২৩শে জুন মহীশূরের মহারাজার কাছে লেখা]

শ্রীনারায়ণ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের সাহায্যেই আমার এদেশে আসা সম্ভব হয়েছে। তারপর আমি এদেশের জনগণের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছি। এদেশের অতিথিপরায়ণ জনগণ আমার সকল চাহিদা পূরণ করেছেন। এ এক আশ্চর্য দেশ, এর অধিবাসীগণও অদ্ভুত। এদেশের মত জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রয়োগ বিশ্বের আর কোন দেশেই হয়নি। সবকিছুই যেন যন্ত্র। এদেশের জনসংখ্যা হল সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার বিশভাগের একভাগ। অথচ জগতের সমস্ত সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ তাদের অধিকারে। অগাধ তাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য, সীমাহীন তাদের বিলাসিতা। এখানে প্রত্যেকটা জিনিষের মূল্য অত্যধিক। এখানে শ্রমিকের মজুরি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী, তবুও পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত বিরোধ চলছে। আমেরিকান মহিলাদের মতন এত বেশী সুযোগ-সুবিধা বিশ্বের আর কোন দেশের মহিলারাই পায় না। ধীরে ধীরে, তারা সবকিছুই নিজেদের হাতে নিচ্ছেন ; আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষের থেকে বেশী। অবশ্যই প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে বেশীর ভাগই পুরুষ।

আমাদের জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লোকরা তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁদের জাতিভেদপ্রথা আরও জঘন্য। এই জাতিভেদ হল অর্থগত। আমেরিকানরা ডলারকে ঈশ্বরের মতন সর্বশক্তিমান মনে করেন ; আর তাই ভাবেন, ডলার সবকিছুই করতে পারে। এদেশের মত এত বেশী আইনকানুন বিশ্বের আর কোন দেশে নেই, আবার এদেশের মত আইনের এত বেশী অমর্যাদা আর কোন দেশে নেই। আমাদের দরিদ্র হিন্দুরা এদের তুলনায় হাজার গুণ নীতিপরায়ণ। ধর্মের নামে তারা হয় ভণ্ডামি করে নতুবা পাগলামি। স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের প্রতি বিরক্তবোধ করেন, আর তাই নতুন পথের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরা পবিত্র বেদের চিন্তাধারার সামান্যতম অংশও কত উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে, মহাশয়, তা আপনি চোখে না দেখলে অনুধাবন করতে পারবেন না। ধর্মের প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে একমাত্র বেদই সক্ষম। শূন্য থেকে সৃষ্টি, সৃষ্ট আত্মা, স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট অত্যাচারী ঈশ্বর, প্রজ্বলিত নরকের অগ্নি প্রভৃতি মতবাদে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিরক্তবোধ করেন। সৃষ্টির ও আত্মার অবিনশ্বরতা, আমাদের আত্মার অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে বেদের মহান চিন্তাধারা এঁরা কোন-না-কোন উপায়ে গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বের সব শিক্ষিত ব্যক্তিরাই পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি—উভয়ের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হবেন, আর ঈশ্বরকে আমাদের পূর্ণতার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে

বুঝতে শিখবেন। এখন থেকেই এখানকার শিক্ষিত পুরোহিতরা এইভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন।

আমার মনে হয় পাশ্চাত্যবাসীগণের আরও বেশী প্রয়োজন আধ্যাত্মিক উত্তরণের, আর আমাদের প্রয়োজন আরও বেশী বৈষয়িক উত্তরণের। জনগণের দারিদ্রই ভারতের সব দুর্দশার মূল কারণ৷ পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্ররা মন্দপ্রকৃতির, সেই তুলনায় আমাদের দরিদ্ররা দেবতুল্য।

সেই কারণে আমাদের দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতিবিধান করা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য। নিম্নশ্রেণীর জনগণের জন্য আমাদের একটি কাজ করাই উচিত ; তা হল তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং তাঁদের লুপ্তপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশসাধন। আমাদের জনগণ ও রাজন্যবর্গের সামনে এই কাজ মহান কর্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মোচিত করেছে। এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু কাজ করা হয়নি। পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতার বন্ধন তাঁদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পদদলিত করে রেখেছে, এই বন্ধনের নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ অক্ষম— তাঁরা ভুলে গেছেন মানুষ হিসেবে তাঁদের অস্তিত্বের কথা। নতুন চিন্তাধারার আলোকে তাঁদের আলোকিত করতে হবে। তাঁদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে করতে হবে সচেতন, যার ফলে তাঁরা পারিপার্শ্বিক বিশ্বজগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। ফলত নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নারী-পুরুষকে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে।

একমাত্র সাহায্য যা একান্তভাবে তাঁদের প্রয়োজন তা হল নতুন চিন্তাধারার আলোকে তাঁদের হৃদয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা। আর অবশিষ্ট অংশ তার প্রতিক্রিয়ায় নিজে থেকেই গড়ে উঠবে। আমাদের কাজ হল রাসায়নিক উপাদান-গুলিকে একত্র করা—প্রাকৃতিক নিয়মেই তা স্ফটিকের আকার ধারণ করবে। সুতরাং আমাদের একমাত্র কাজ হল তাঁদেরকে নতুন চিন্তাধারায় আলোকিত করা, বাকিটুকু তাঁরা নিজেরাই করে নেবেন। ভারতবর্ষে এই কাজটি করা একান্তভাবে জরুরী। এই চিন্তাধারা আমি অনেকদিন ধরেই মনে মনে পোষণ করে আসছি। কিন্তু ভারতে তা কার্যকরী করতে পারি নি—সেই কারণেই এদেশে এসেছি। দরিদ্র জনগণকে শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলি হল—মহারাজ, ধরুন আপনি প্রতি গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে দিলেন, দেখবেন তাতেও কোন উপকার হবে না, কারণ ভারতে দারিদ্র্য এত ভয়ঙ্কর যে, গরিব বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে বরঞ্চ ক্ষেতে গিয়ে পিতাকে সাহায্য করবে, নতুবা অন্য কোন উপায়ে জীবিকার সংস্থান করবে। পর্বত মহম্মদের কাছে না আসাতে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যেতে হয়েছিল, সেইরূপ দরিদ্র বালকেরা যদি বিদ্যালয়ে আসতে না পারে, তাহলে তাদের নিকটেই শিক্ষা পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার উদারহৃদয়, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা গ্রামে-গঞ্জে ধর্মশিক্ষা প্রদান করছেন, যদি তাঁদের মধ্যে কিছু লোককে ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে সংগঠিত করা যায়, তাহলে তাঁরা একস্থান থেকে আর একস্থানে লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যাও শেখাতে পারবেন। ধরুন—এই ধরনের দুজন লোক কোন এক সন্ধ্যায়

একটি ক্যামেরা, একটি ভূগোলক ও কতকগুলি মানচিত্র নিয়ে একটি গ্রামে উপস্থিত হলেন। তাঁরা অজ্ঞ লোকদের জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল সম্পর্কে অনেক কিছু শেখাতে পারবেন। বিভিন্ন জাতি ও দেশের কথা গল্পচ্ছলে তাদের কাছে বলা যেতে পারে, তা হলে সারাজীবন বই পড়েও তারা যা শিখতে পারবে না তার থেকেও একশগুণ বেশী এইভাবে শুনে শুনে জানতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠন—আর তার জন্য প্রয়োজন অর্থের। ভারতে এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করবার মত লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের কথা তাঁদের কাছে টাকা নেই। একটি চাকাকে গতিশীল করা প্রথমে খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু একবার গতি পেলে তা ক্রমশ দ্রুততর বেগে চলতে থাকে। নিজের দেশে আমি এই কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করেছি, কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আশ্বাস পাইনি। আপনার বদান্যতায় আমি এদেশে আসতে পেরেছি।

ভারতের দরিদ্র জনগণ মরুক বা বাঁচুক, সে ব্যাপারে আমেরিকানদের কোন মাথাব্যথা নেই। কেনই বা তারা ভাবতে যাবে, যেখানে আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। হে আমার মহদাশয় মহারাজ, জীবন ক্ষণিকের জন্য, জগতের সব চাকচিক্যই ক্ষণস্থায়ী। যে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে সেই বেঁচে থাকে, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা জীবন্মৃত হয়েই থাকে। মহারাজ, আপনার মতন একজন উদারহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছে করলে ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারেন। তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধররা আপনার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঈশ্বর করুন, লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত, অজ্ঞ ভারতবাসীর জন্য আপনার মহৎ হৃদয় গভীরভাবে অনুভব করুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

বিবেকানন্দ

কলকাতায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

[নিউইয়র্ক থেকে ১৮৯৪ সনের ১৮ই নভেম্বর রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত]

সম্প্রতি কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে এবং আমার সহ-নাগরিকবৃন্দ যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্ভাষণ আমাকে পাঠিয়েছেন, তা আমি পেয়েছি।

মহাশয়, আপনারা যে আমার এই সামান্যতম কাজকে অভিনন্দিত করেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি অপর জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারে না।

শ্রেষ্ঠত্ব, নীতি ও পবিত্রতা সম্পর্কিত মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে যেখানে আলাদা থাকার মনোবৃত্তি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে, সেখানেই পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার মনে হয়, ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ জাতির চারিদিকে আচারের দেওয়াল তৈরী করা। যার ভিত্তি হল অন্যকে ঘৃণা করা আর উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ সংস্পর্শ থেকে হিন্দুদের দূরে রাখা।

প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবাদীরা যতই মিথ্যা যুক্তি দ্বারা এই সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, এটা সুনিশ্চিত যে অপরকে ঘৃণা করলে নিজেরও নৈতিক অধঃপতন হয়। যে জাতি একদিন পৃথিবীর মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ, সে কিনা আজ অবজ্ঞা আর উপহাসের পাত্র হয়েছে! এটাই হল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যে নিয়ম আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, আমরাই সেই নিয়ম অমান্য করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।

দেওয়া-নেওয়া হল প্রকৃতির নিয়ম, ভারতবর্ষ যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, তবে তার রত্নভাণ্ডার বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে মুক্তমনে বিলিয়ে দেওয়া চূড়ান্তভাবেই প্রয়োজন। পরিবর্তে অপরে যা দিতে চায় তা গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন।

হৃদয়কে উন্মোচিত করাই জীবন, আর সংকোচন মানে মৃত্যু। জীবন মানে ভালোবাসা, ঘৃণা করার অর্থ মৃত্যু। যখন থেকে আমরা অপর জাতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল আমাদের নৈতিক অধঃপতন। যতদিন না আমরা হৃদয়কে উন্মোচিত করতে পারছি ততদিন কোন কিছুই আমাদের নৈতিক অধঃপতন রোধ করতে পারবে না। সুতরাং পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গেই হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দৃঢ় করতে হবে ভালোবাসার বন্ধন। শতশত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও স্বার্থপর ব্যক্তি (গল্পকথার কুকুরের মতন গরুর জাবনা-পাত্রে শুয়ে থাকে, নিজেও খায় না, অথচ গরুকেও খেতে দেয় না) যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অন্যের অনিষ্ট করা। সেই তুলনায় প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণে যান, তিনি দেশের জন্য অনেক বেশী মঙ্গলসাধন করেন।

পাশ্চাত্যবাসীরা জাতীয় জীবনে যে সুন্দর কাঠামো তৈরী করেছেন, তার গোপন চাবিকাঠি হল তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা। যতদিন না আমাদের জাতীয় জীবনে ঐ ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে উঠছে ততদিন অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা অর্থহীন।

অন্যকে স্বাধীনতা দিতে যার অনীহা সে কি কখনও নিজে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য? বৃথা চিৎকারে শক্তির অপচয় না করে আসুন আমরা শান্তভাবে ও মানবিকভাবে কাজ করতে শুরু করি। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—কেউ যদি কোন কিছু পাওয়ার যোগ্য হয় তা হলে বিশ্বের কোন শক্তিই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রাচীনকালে আমাদের জাতীয় চরিত্র ছিল মহান, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় চরিত্র আরও গৌরবান্বিত হবে।

শঙ্কর আমাদের নৈতিক চরিত্রে পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় অবিচলিত রাখুন।

সাহসী তরুণদের প্রতি

[১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে নিউইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা]

সংঘকে শক্তিশালী কর, কোন কিছুর দরকার নেই, দরকার শুধু তিনটি জিনিসের। তা হল—ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহিষ্ণুতা। জীবন মানে ব্যাপ্তি, হৃদয়ের প্রসারই হল ভালোবাসা। অতএব সকল ভালোবাসাই জীবন, এটাই হল জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিচ্ছবি। স্বার্থপরতার অর্থ নৈতিকতার মৃত্যু। নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত ব্যক্তি এক অর্থে দৈহিক দিক থেকে মৃত। ভালোবাসায় ভরা জীবনই লোকের ভালো করে, আর মৃত্যু করে অপকার। শতকরা নব্বুই জন নিষ্ঠুর ব্যক্তিই মৃত অথবা প্রেতাত্মা। আমার প্রিয় বালকবৃন্দ, এর কারণ হল যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, সে মৃত ছাড়া আর কিছুই নয়। বালকবৃন্দ, উপলব্ধি কর, হ্যাঁ উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও; দরিদ্র, অজ্ঞ ও পদদলিত জনগণের জন্য ভাবো, অনুভূতির জোয়ারে হৃদয়ের স্পন্দন হোক শুদ্ধ, বন্ধ হোক মস্তিষ্কের অনুরণন। উপলব্ধির জোয়ার যখন তোমাদের পাগল করে দেবে তখন ঈশ্বরের পদতলে হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ করো। তাহলে তখনই তাঁর কাছ থেকে পাবে ক্ষমতা, সাহায্য আর অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার।

সংগ্রাম, শুধুমাত্র সংগ্রামই ছিল গত দশ বৎসর যাবৎ আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও আমি বলি সংগ্রামের কথা। যখন চারিদিকে নেমে এসেছিল অন্ধকার, তখনও আমি বলেছিলাম সংগ্রামের কথা। যখন পেয়েছি আলোর সন্ধান তখনও বলেছি সংগ্রামের কথা। বালকবৃন্দ ভয় পেও না। ওপরের অসীম আকাশের দিকে তাকাও, মনে করো না এ তোমাকে ধ্বংস করবে। বরঞ্চ ধৈর্য ধর, কিছু সময়ের মধ্যে দেখতে পাবে সব কিছুই তোমার পদতলে আসীন। ধৈর্য ধর, আরও উপলব্ধি করতে পারবে যে শুধু অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি অথবা বিদ্যার দ্বারা কিছুই হয় না। শুধুমাত্র ভালোবাসায় সব হয়। ভালোবাসায় ভরা হৃদয়ই শুধুমাত্র সকল বাধার মধ্যে দিয়ে পথ তৈরী করে এগিয়ে যেতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সামনে একটাই সমস্যা, তা হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া কোন ধরনের ব্যাপ্তিই সম্ভব নয়।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় ছিলেন মুক্ত, ফলত আমরা পেয়েছি একটি সুন্দর ধর্ম। কিন্তু তারা সমাজের পায়ে পরালেন একটা ভারী শিকল। যাকে এককথায় বলা যেতে পারে ভয়ঙ্কর, অসহনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সমাজ সর্বদা স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো। আবার অন্যদিকে তাদের ধর্মের দিকেও তাকিয়ে দেখো। প্রগতির প্রথম শর্ত হল স্বাধীনতা। মানুষের যেমন চিন্তা ও বাক্‌শক্তির

স্বাধীনতা থাকা উচিত, তেমনি তার খাদ্যের, বস্ত্রের, বিবাহের এবং অন্যান্য বিষয়েরও স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, অবশ্যই এই স্বাধীনতা যেন অন্যের ক্ষতি না করে।

আমরা বোকার মত শুধু বস্তুবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলছি। ভারতবর্ষের মতন আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত দেশে সত্যিকারের ধার্মিকের সংখ্যা ১ লক্ষের বেশী নয়। এই অল্পসংখ্যক লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে পঙ্কিলতায় অথবা অনশনে থাকতে হবে কেন ? একজন ব্যক্তিই বা না খেয়ে মরবে কেন ?

মুসলমানরা হিন্দুদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল কেন ? এর কারণ বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতি হিন্দুদের অজ্ঞতা। এমনকি মুসলমানরা হিন্দুদের শিখিয়েছিল তাঁতীর তৈরী বস্ত্র পরিধান করতে, পারিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য পরিবেশনের শিল্পও হিন্দুরা তাঁদের কাছ থেকে শিখেছিল। আমি তেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, যিনি আমাকে খাদ্য দিতে পারেন না, তিনি কেমন করে স্বর্গীয় আনন্দ দিতে পারবেন।

ভারতকে আবার জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে হবে। দরিদ্র জনগণের খাদ্যের সংস্থান করতে হবে। শিক্ষার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে· আর পুরোহিত-ব্রতের খারাপ দিকগুলিকে দূর করতে হবে।

পুরোহিত পেশা নয়, কোন সামাজিক অত্যাচার নয়, প্রয়োজন আরও খাদ্যের সংস্থান ও জনগণের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা। আমাদের নির্বোধ যুবকেরা ইংরেজদের কাছ থেকে আরও ক্ষমতা লাভের জন্য সভা-সমিতি করছেন—এতে তারা শুধু উপহাস করে।

যে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে অপারগ, সে কখনই স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। দাসেরা ক্ষমতা চায় শুধুমাত্র অন্যদের দাস করে রাখার জন্য।

আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ধীরে ধীরে করতে হবে, লোকদের বেশী করে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে ও সমাজকে অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়ার মাধ্যমে। প্রাচীন ধর্ম থেকে পুরোহিত পেশাকে নির্মূল করতে হবে—তাহলেই পাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমার কথা কি বুঝতে পারছ ? ভারতীয় ধর্ম দিয়ে একটা ইউরোপীয় সমাজ গড়তে পারো ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা কার্যকরী করা সম্ভব। এটাকে সম্ভব করতেই হবে।

এই মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য মধ্য ভারতে একটি স্থান নির্বাচিত করতে হবে, যেখানে তোমরা স্বাধীনভাবে তোমাদের মত প্রকাশ করতে পারবে, যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তোমাদের মতবাদ অনুসরণ করবে, শুধুমাত্র তারাই সেখানে থাকবে। এর ভিতর একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে সমগ্র ভারতে তার শাখা ছড়িয়ে দিতে হবে। বর্তমানে এই সংস্থার ভিত্তি হবে শুধু ধর্ম, কোনরকম উগ্র সামাজিক সংস্কারের কথা প্রচার করা চলবে না। অজ্ঞ লোকেরা যাতে কুসংস্করাচ্ছন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মগুরুদের বাণী, যা কিনা সর্বজনীন মুক্তি ও সাম্যের গান গেয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই সমাজে পরিবর্তন আনতে যত্নবান

হতে হবে। প্রজ্বলিত করো মুক্তির আলো, চারিদিকে ছড়িয়ে দাও তার রশ্মিছটা। ফলের কথা না ভেবে কাজ করে যাও। মনে রেখো নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তোমার মানসিকতা যেন সেবকের মত হয়, চেষ্টা কর নিঃস্বার্থ হতে। একজন যদি গোপনে অন্যের নিন্দা করে সেদিকে কান দিও না। অসীম ধৈর্য ধর, জয় তোমাদের হবেই। এই ব্যাপারেই এখন যত্নবান হও।

অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা ত্যাগ করো।

আমি পত্রের মাধ্যমে তোমার সাথে সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ রাখি বলে, আমার অন্যান্য বন্ধুদের নিকটে নিজেকে জাহির করতে যেও না। জানি তুমি অতটা মূর্খ নও, তথাপি আমি তোমাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। কারণ ঐ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনেক সংস্থাই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ফলের কথা চিন্তা না করে শুধুমাত্র কাজ করে যাও, অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করার অপর নাম জীবন।

আমি চাই তোমাদের ভিতর যেন কোন ধরনের কপটতা, ভণ্ডামি ও নোংরামি স্থান না পায়। আমি সব সময় ঈশ্বরের ওপরে নির্ভর করি। নির্ভর করি দিনের আলোর মত পরিষ্কার সত্যের ওপর।

যশের জন্য অথবা অন্যের ভালো করার জন্য আমি ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছি—হৃদয়ে এই ধরনের কলঙ্কজনক ব্যথা দিয়ে আমাকে যেন মরতে না হয়।

আমাদের মধ্যে মিথ্যার কোন স্থান থাকবে না, থাকবে না কোন অসৎ উদ্দেশ্যের। কোন ছলচাতুরি, কোন ধরনের নোংরামি যেন আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় না পায়, গোপনে কিছুই করা হবে না, সবকিছুই খোলাখুলি করা হবে।

কেউ যেন গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হওয়ার সুযোগ না পায়, ঐ ধরনের গুরুতে আমাদের প্রয়োজন নেই।

হে আমার সাহসী বালকবৃন্দ, তোমরা এগিয়ে যাও, অর্থ থাক আর না থাক, লোকশক্তি থাকুক বা না থাকুক, তোমাদের তো বুকভরা ভালোবাসা আছে? ঈশ্বর তো তোমাদের পাশে আছেন? পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমাদের গতি প্রতিরোধ করতে পারবে না—অতএব তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।

থিওসফিস্টদের একটি কাগজ বলেছে যে তারাই আমার সাফল্যের মিনার গড়ে রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে এই ধরনের অপপ্রচার মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

লক্ষ্যের প্রতি যত্নবান হও। সবরকম অসত্যের বিরুদ্ধে সাবধান হও, সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হও, জয় আমাদের হবেই। হয়ত ধীরে ধীরে কিন্তু জয় সুনিশ্চিত।

মনে কর আমার কোনদিন অস্তিত্ব ছিল না—এই ভেবে কাজ করে যাও। মনে কর তোমাদের প্রত্যেকের ওপর কাজের সমগ্র ভার অর্পিত হয়েছে। পঞ্চাশ শতাব্দী তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। অতএব কাজ করে যাও।

আমি জানি না কবে ভারতে ফিরতে সক্ষম হব। মনে রেখো, কাজ করার এ

হলো উপযুক্ত ক্ষেত্র। ভারতবর্ষের লোকেরা আমার কাজের জন্য হয়ত আমার প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু কেউ কোন কাজের জন্য একটা পয়সাও সাহায্য করবে না।

কোথা থেকেই বা তারা পয়সা পাবে, নিজেরাই তো ভিখিরি? গত দু হাজার বছর ধরে ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে জনহিতকর কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি অবলুপ্ত হয়েছে।

জাতি, জনগণ সম্পর্কিত মতবাদ তারা সবেমাত্র গ্রহণ করতে শিখছে। সেইজন্য আমি তাদের দোষ দেবো না।

সকলের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ।

ভারতে কাজের পরিকল্পনা

[৩রা জানুয়ারি, ১৮৯৫ তারিখে চিকাগো থেকে বিচারপতি স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লেখা]

হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস নিয়ে আজ আপনাকে চিঠি লিখছি। প্রথমে বলে রাখি, আমি জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানসিক দিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছি, আপনি তাদের মধ্যে অন্যতম। আপনার মধ্যে জ্ঞান ও অনুভূতির এক অপূর্ব আত্মিক মিলন হয়েছে। তাছাড়া আপনার চিন্তাধারাকে কার্যকরী করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সর্বোপরি আমি আপনার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। সেইজন্য আস্থাসহকারে আপনার কাছে আমার কয়েকটা মতবাদ ব্যক্ত করছি।

ভারতবর্ষে খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে, এটাকে শুধু বজায় রাখলেই চলবে না, আরও উদ্যমের সাথে এর ব্যাপ্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। পরিকল্পনা সম্পর্কে নানারকম চিন্তা-ভাবনার পর আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। প্রথমে মাদ্রাজে একটি ধর্মতত্ত্বের মহাবিদ্যালয় খুলতে হবে, তারপর সেখানে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে; আমাদের যুবকদের বেদ, তার বিভিন্ন ভাষ্য ও দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, এর সাথে সাথে বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হবে। এবং ঐ মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র হিসেবে একটি ইংরেজীতে ও অপর একটি দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। প্রথমে এই কাজটি করতে হবে। বিন্দু বিন্দু জল থেকেই সমুদ্রের সৃষ্টি। জীবন সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়কে গ্রহণ করে মাদ্রাজ একটা সুন্দর পথ অনুসরণ করছে।

সমাজের যে আমূল সংস্কার প্রয়োজন এ বিষয়ে আমি ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে একমত। কিন্তু কিভাবে এটা করা যায়? সংস্কারকদের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু আমার পরিকল্পনা এই রকম। অতীতে আমরা যা করেছি তার মধ্যে নিশ্চিতভাবে খারাপ কিছুই নেই। আমাদের সমাজ মোটেই খারাপ নয়, বরঞ্চ যথেষ্ট ভালো। আমি এই সমাজের আরো ভালো চাই।

মিথ্যা থেকে সত্যে অথবা মন্দ থেকে ভালোয় উপনীত হয়ে নয়, সত্য থেকে গভীরতর সত্যে এবং ভালো থেকে গভীরতর ভালোতে উপনীত হতে হবে। আমি আমার দেশবাসীকে বলতে চাই—আপনারা এতদিন যা করেছেন তা সবই সঠিক, এখন থেকে আপনাদের আরও ভালো কাজ করতে হবে।

জাতিভেদপ্রথার কথাই ধরুন, সংস্কৃতে 'জাতি' শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। সৃষ্টির প্রথম ধারণার মধ্যেই রয়েছে 'জাতি' কথাটির তাৎপর্য। 'জাতি' কথাটির অর্থ বৈচিত্র্য, যার মানে হল জীবন বা সৃষ্টি। 'আমি একক আমার মধ্যেই আছে বহুত্বের উপস্থিতি'—বিভিন্ন বেদে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে থাকে একক—আর সৃষ্টি হল বহুত্বের ব্যঞ্জনা। এখন যদি এই বহুত্বের ব্যঞ্জনা স্তব্ধ হয় তা হলে সৃষ্টির লয় হবে।

যতদিন কোন শ্রেণী কর্মঠ ও সক্রিয় থাকে, ততদিনই স্পন্দিত হয় বৈচিত্র্য। যখন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে অক্ষম বা বিরত হয় তখনই হয় তার মৃত্যু। 'জাতি' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজের চারিত্রিক গঠন, নৈতিক পূর্ণতা ও জাত সম্পর্কে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই অর্থ হাজার হাজার বছর ধরেই প্রচলিত। এমনকি খুব আধুনিক বইতেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয়নি, এমনকি প্রাচীন পুস্তকেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়নি।

তাহলে ভারতের অধঃপতনের কারণ কি? মনে হয় 'জাতি'র এই বিশেষ অর্থ থেকে বিচ্যুতি। যেমন গীতা বলেছে—জাতির লয় হলে বিশ্বজগৎও ধ্বংস হবে। এটা কি সত্যি যে এই বৈচিত্র্যের স্পন্দন বন্ধ হলে বিশ্বচরাচরও ধ্বংস হবে?

বর্তমান শ্রেণীবিভাগ সত্যিকারের 'জাতি'র অর্থ প্রতিধ্বনিত করে না, বরঞ্চ এর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাস্তবে এটা জাতির বা বৈচিত্র্যের মুক্তগতির পথ অবরুদ্ধ করেছে।

কোন চিরকালীন প্রথা, শ্রেণীবিশেষের জন্য সুবিধা অথবা বংশানুক্রমিক শ্রেণী-বিভাগ সত্যিকারের 'জাতি'কে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে বাধা প্রদান করেছে। যখনই কোন দেশে এই ধরনের বৈচিত্র্য স্তব্ধ হয়, তখনই সেই জাতি লুপ্ত হয়।

আমার দেশবাসীর কাছে আমি যা বলতে চাই তা হল—ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ 'জাতি' প্রথার অবলুপ্তি।

প্রত্যেকটি মৃতপ্রায় অভিজাতশ্রেণী অথবা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীই 'জাতি'র পথে বাধাস্বরূপ, এরা কোন জাতি নয়।

জাতিকে তার বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে দাও, জাতির সামনের সমস্ত বাধা অপসারিত কর—তাহলেই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। ইউরোপের দিকে তাকান—যখনই এরা জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল—সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষের সামনে থেকে বাধার প্রাচীর অপসারিত হল। এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতি গঠনে প্রয়াসী হলেন—তখন থেকেই শুরু হল ইউরোপের জয়যাত্রা।

সত্যিকারের জাতিবিকাশের সর্বাধিক সুবিধা হল আমেরিকাতে—সেইজন্যই সেখানকার জনগণ মহান।

প্রত্যেক হিন্দুই জানেন যে জ্যোতিষীরা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার জাতি নির্বাচনে সচেষ্ট হন। এটাই হল সত্যিকারের জাতি বা ব্যক্তিত্ব—যা জ্যোতিষীরা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং পরিপূর্ণভাবে এটাকে কার্যকরী করতে পারলে আবার আমরা দাঁড়াতে পারব। এই বৈচিত্র্যের অর্থ অসাম্য অথবা বিশেষ সুবিধা প্রদান নয়। আমার পরিকল্পনা হল—হিন্দুদের দেখানো যে তাঁদের কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, শুধুমাত্র প্রাচীন ঋষিদের প্রদর্শিত পথে চলতে হবে আর ঝেড়ে ফেলতে হবে সবরকমের জড়তা। শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

অবশ্য মুসলমানদের অত্যাচারে আমাদের প্রগতি বিঘ্নিত হয়েছিল; তখন ছিল জীবন-মরণ সমস্যার প্রশ্ন, প্রগতির কোন প্রশ্নই ছিল না।

এখন আর সেই সমস্যা নেই, আমাদের এখন সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মত্যাগী অথবা মিশনারীদের প্রদর্শিত ধ্বংসাত্মক পথে নয়—একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব

পথে। প্রাসাদ এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি—তাই খারাপ দেখাচ্ছে। আমরা শত শত বছরের অত্যাচারের দরুন প্রাসাদ নির্মাণে বিরত ছিলাম।

কাজ শেষ হলেই, প্রাসাদ হবে সুন্দর। এসব হল আমার পরিকল্পনা। এও আমি অনুভব করেছি যে প্রত্যেক জাতির জীবনে আসে এক ধরনের প্রধান স্রোত—ভারতের ক্ষেত্রে তা হল ধর্ম। এটাকে শক্তিশালী করতে পারলে এর উভয়পার্শ্বস্থ স্রোতও জোরালোভাবে সাথে সাথে প্রবাহিত হবে। এটা হল আমার চিন্তাধারার একটা দিক। সময়মত আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারব।

আমি এদেশ থেকেই শুধুমাত্র সাহায্য আশা করি—কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার মতবাদ প্রচার করা ছাড়া আর কিছুই করিনি।

আমি চাই ভারতেও যেন একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। কবে নাগাদ ভারতে ফিরব জানি না। আমি সব সময় গুরুদেবকে অনুসরণ করি, কারণ আমার মুক্তি তাঁর হাতেই বাঁধা। 'হে প্রভু, এই বিশ্বজগতে রত্নভাণ্ডারের সন্ধান করতে গিয়ে তোমাকেই শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পেয়েছি—তোমার পদতলেই আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ করতে চাই।'

'হে প্রভু, ভালবাসার সন্ধান করতে গিয়ে তোমাকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার পাত্র হিসেবে আবিষ্কার করেছি—তোমাকেই আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ করতে চাই।'

ঈশ্বর আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন।

ভক্তি

[পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে প্রদত্ত ভাষণ]

স্বামীজী আমন্ত্রিত হয়ে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে তিনি মাসাধিককাল বাস করেছিলেন। তাঁর সেখানকার কার্যাবলী দেখে কাশ্মীরের মহারাজা ও তাঁর ভ্রাতারা সাবশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কয়েক দিন মুরী, রাওয়ালপিণ্ডি ও জম্মু পরিভ্রমণ করেন এবং প্রতিটি স্থানেই বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি শিয়ালকোটে আসেন এবং দুটি বক্তৃতা করেন—একটি হিন্দিতে ও একটি ইংরাজিতে। হিন্দি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভক্তি'; তার সারাংশের অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো :

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম বিদ্যমান, তাদের উপাসনাপদ্ধতির ধরন-ধারণ বিভিন্ন রকমের হলেও বস্তুত তারা এক। কোথাও তারা মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে উপাসনা করে, কেউ বা অগ্নির উপাসনা করে, কেউ বা মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। আবার এমনও অনেক আছে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। এগুলি সবই সত্য, কারণ এদের ভেতরের ভাবটি, আসল ধর্ম ও সত্যগুলি যদি দেখ, তাহলে দেখবে সেগুলি সবই এক রকম। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয় না, তাঁর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করা হয় না; কিন্তু মহাপুরুষদের ঈশ্বর-বিবেচনায় উপাসনা করা হয়। বৌদ্ধধর্ম এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভক্তি সর্বত্রই বিরাজমান—ভগবানের প্রতি হোক আর মহাপুরুষের প্রতিই হোক। ভক্তিরূপে উপাসনার রীতি সর্বত্রই সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে এবং জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি অল্প আয়াসেই লাভ করা যায়। জ্ঞানলাভের জন্য অবস্থার আনুকূল্য চাই এবং দুরূহ অভ্যাসের প্রয়োজন। উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে এবং সর্বরকম পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে মানুষ সত্যিকারের যোগাভ্যাস কখনই করতে পারে না। কিন্তু জীবনের যে কোন অবস্থাতেই মানুষের পক্ষে ভক্তি অভ্যাস করা সহজসাধ্য। শাণ্ডিল্যঋষি ভক্তিপ্রসঙ্গে বলেছেন যে তীব্র ঈশ্বর প্রেমকেই ভক্তি বলে। প্রহ্লাদও সেই এক কথা বলেছেন। মানুষ একদিন অনাহারে থাকলে কত কষ্ট পায়! পুত্রের মৃত্যু হলে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে! ভক্তির মহৎ গুণ হল অন্তরকে নির্মল করা, শুধু ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি অন্তরকে নির্মল করার পক্ষে যথেষ্ট। 'হে ঈশ্বর, অগণিত তোমার নাম। কিন্তু প্রতিটি নামেই তোমার শক্তি প্রকটিত। প্রতিটি নামেরই কী সুগভীর ও মহৎ তাৎপর্য।' সর্বদাই আমাদের ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। সেজন্য স্থান-কালের বিচারের কোন প্রয়োজন নেই।

যে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয় তাদের পদ্ধতিতেও পার্থক্য থাকবেই। একদল মনে করেন যে তাঁদের উপাসনা-পদ্ধতিই সর্বাধিক কার্যকরী। আর এক দল মনে করেন যে মোক্ষলাভের পক্ষে তাদের পদ্ধতিই অধিক ফলপ্রসূ। কিন্তু এদের মূল সত্যটির দিকে নজর করলেই বোঝা যাবে যে আসলে এরা এক।

শৈবরা শিবকেই সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন, বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণুই সর্বশক্তিমান। দেবীর উপাসকরা দেবী ছাড়া বিশ্বজগতে আর কাউকেই সর্বশক্তিমান বলে মানতে রাজী নন। কিন্তু ভক্তি লাভ করতে গেলে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করতে হবে। বিদ্বেষ ভক্তিলাভের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। যাঁর কারু প্রতি বিদ্বেষ নেই তিনিই ঈশ্বরকে লাভ করেন। অবশ্য নিজ নিজ আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস একান্তভাবেই প্রয়োজন। হনুমান বলেন, "বিষ্ণু এবং রাম যে একই তা আমি জানি। তবু পদ্মপলাশলোচন রামই আমার হৃদয়ের ধন।" মানুষ যে বিশেষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় সেটা তার ভেতর থেকেই যায়। সারা পৃথিবীতে যে একটি মাত্র ধর্মই বিরাজ করে না, এটাই হল তার আসল কারণ। এবং ঈশ্বরের বিধানও তা নয়। কারণ তাহলেই পৃথিবীতে শৃঙ্খলার বদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। জন্মগত প্রবৃত্তি অনুসারেই মানুষের চলা উচিত। এবং সেই পথে চলবার জন্য যদি তারে গুরু লাভ হয়—তাহলেই তার উন্নতি হয়। মানুষকে আপন অভিরুচি অনুযায়ী চলত দেওয়া উচিত; তাকে যদি অন্য পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে যতটুকু পেয়েছিল সেটুকুও হারিয়ে অপদার্থে পরিণত হয়। একজন মানুষের অবয়বের সঙ্গে যেমন আরেকজনের মিল নেই, মানুষের স্বভাবেও তেমনি অমিল। অতএব যে যার মত চলতে বাধা কি? নদী একটা বিশেষ পথ কেটে চলে; সেই গতিপথেই যদি খাল কেটে তার গতিকে চালনা করা হয় তাহলে তার স্রোত এবং গতি তীব্রতর হয়। কিন্তু যদি তার গতিপথকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে তার স্ফীতি এবং গতিতে মন্দা পড়েছে। মানুষের জীবন মূল্যবান এবং সেই কারণেই তাকে তার প্রারব্ধ প্রবৃত্তি অনুসারে চলতে দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না. কোন ধর্মের উপর কোনরকম বলাৎকার ছিল না; সেই কারণেই ধর্ম রক্ষা পেয়েছে। আমি যা ভাবছি সেটাই একমাত্র সত্য এবং সে বিশ্বাস যার নেই সেই মূর্খ—এই ধারণা থেকেই ধর্মের কলহের সূত্রপাত হয়।

পৃথিবীর সব মানুষ একটিমাত্র ধর্মপথই অনুসরণ করুক—ঈশ্বরের যদি এইরকই অভিপ্রায় হত তাহলে এতগুলি ধর্মের উদয় হল কেন? সকলের উপর একটি ধর্মমত চাপিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা অনেক হয়েছে। তলোয়ার উঁচিয়েও সব মানুষকে এক ধর্মমতে আনা যায় নি। তার ফলে বরং একটির জায়গায় দশটি ধর্ম দেখা দিয়েছে। একটি ধর্ম সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া এই দুইটি শক্তির ফলই মানুষ এবং সেই কারণেই সে চিন্তাশীল। মানুষের মনে এই দুটি শক্তি যদি না থাকতো মানুষ তাহলে চিন্তা করতে অক্ষম হত। মানুষ একটি চিন্তাশীল জীব। মানস (mind) আছে বলেই মনুষ্য। এই চিন্তাশক্তি তিরোহিত হলেই সে পশুসদৃশ হয়। সে রকম মানুষ কে চায়? ঈশ্বর করুন ভারতবাসীদের যেন এ হেন অবস্থা কখনও না হয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে একের মধ্যেই বহুর প্রয়োজন। অবশ্য বৈচিত্র্য মানে শুধু এই নয় যে একজন ক্ষুদ্র এবং আর একজন মহান; সকলেই যখন স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে পূর্ণভাবে বিকাশ করে—সেটাই বৈচিত্র্য। সব ধর্মেই সৎ এবং ক্ষমতাবান পুরুষ দেখা দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্যই তাঁদের ধর্মমত

শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। সব ধর্মেই যখন এই রকমের আদর্শ পুরুষ দেখতে পাওয়া যায় তখন কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা সঙ্গত নয়।

এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। যে ধর্ম পাপকর্মের সমর্থক সেও কি সম্মানার্হ? নিঃসন্দেহে এর উত্তর হবে—না। এই ধরনের ধর্মের উৎখাত চাই কারণ এ অমঙ্গলের সূচনা করে। সব ধর্মই সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং স্বীয় জীবনের পবিত্রতা ধর্মেরও ঊর্ধ্বে বলে মানতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে শুদ্ধাচার মানে অন্তরের এবং বাইরের উভয়েরই পবিত্রতা। শাস্ত্রে উল্লেখিত উপায়ে অবগাহন ইত্যাদি দিয়ে বাইরের পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্তরের পবিত্রতা লাভ হয় মিথ্যা এবং অসদাচার থেকে বিরত থেকে এবং পরোপকার থেকে। তুমি যদি পাপাচার না করো, মিথ্যা না বলো, মদ্যপানে আসক্ত না হও, জুয়ো না খেলো, চুরি না করো—এ সবই উত্তম কথা। কিন্তু এ সবই তোমার কর্তব্য, এর জন্য বাহবা দাবি করতে পারো না। তাছাড়া, অপরের জন্য করণীয় কর্তব্য কিছু আছে। তুমি যেমন নিজের মঙ্গলসাধন করবে, অপরের জন্যও তাই করবে।

এখন আমি খাদ্যের বাছবিচার সম্বন্ধে কিছু বলবো। পুরনো প্রথা সবই প্রায় লুপ্ত হয়েছে। কেবল এর সঙ্গে পংক্তিভোজন চলবে না, ওর ছোঁওয়া খাওয়া যাবে না—এই রকম কয়েকটা ভাসা-ভাসা ধারণা দেশবাসীর মনের মধ্যে রয়ে গেছে। শত শত বৎসরের প্রাচীন সুনিয়মগুলির ভেতর শুধুমাত্র ছোঁওয়াছানির পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণাটাই রয়ে গেছে। শাস্ত্রে তিনরকম খাদ্যের প্রতি বিধিনিষেধ আছে। প্রথমত, যে খাদ্য স্বভাবতই অশুদ্ধ যেমন রসুন বা পিঁয়াজ। এসব জিনিস অধিক পরিমাণে আহার করলে কামভাবের উদয় হয়। তা থেকেই দুরাচারী কর্মে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনা। সে সব কাজ ভগবানের কাছে এবং মানুষের চোখেও হেয়। দ্বিতীয়ত, বাইরের অপবিত্র সংস্পর্শেও খাদ্য অপবিত্র হতে পারে। সেইজন্য বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে আমাদের খাবার রাখা উচিত। তৃতীয়ত, অবাঞ্ছিত মানুষের ছোঁওয়া খাবার না খাওয়াই ভাল। কারণ কুস্পর্শ থেকেই কুচিন্তা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণসন্তান যদি কদাচারী ও দুশ্চরিত্র হয় তার হাত থেকেও খাদ্য গ্রহণ করা অনুচিত।

কিন্তু এইসব রীতিনীতির আসল মর্ম এখন আর নেই। যা রয়েছে তা হল একজন মানুষ যতই জ্ঞানী বা পবিত্র হোন না কেন, তিনি উচ্চবর্ণজাত না হলে তাঁর হাতের খাবার আমরা খেতে পারি না। এমন কি ময়রার দোকানেও প্রাচীন রীতিনীতিগুলি আজ অবহেলিত। তাকালেই দেখবে সমস্ত মিষ্টিগুলির উপর ঝাঁক ঝাঁক মাছি, রাস্তার ধুলোবালিও উড়ে এসে পড়ছে এবং স্বয়ং ময়রার পরিধেয়টিও তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। ক্রেতাদের এক বাক্যে বলা উচিত যে হালুইকরের দোকানে যদি কাঁচের আলমারীতে মিষ্টি না রাখা হয় তাহলে কিছুতেই তাঁরা মিষ্টি কিনবেন না। তাহলে দেখবে মাছিদের বয়ে আনা কলেরা এবং অন্যান্য রোগের জীবাণু খাবারে ছড়ানোর ব্যাপার কি রকম বিলক্ষণভাবে বন্ধ হয়। যেখানে ক্রমোন্নতি হবার কথা আমাদের সেখানে হয়েছে অবনতি। মনু বলেছেন, জলে কখনও থুতু ফেলবে না কিন্তু আমরা যত আবর্জনা নিয়ে নদীতেই ফেলি। এইসব কথা বিবেচনা করে আমরা বুঝতে পারি যে বহিরঙ্গের পবিত্রতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শাস্ত্রকাররা একথা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু ইদানীংকালে এসব কথার সারমর্ম বিস্মৃত হয়ে শুধু আক্ষরিক অর্থটাই আমরা মনে করে রেখেছি। চোর, ডাকাত, মদ্যপ সহজেই আমাদের স্বজাতি হতে পারে, কিন্তু কোন সজ্জন এবং মহাশয় ব্যক্তি যদি তাঁর অনুরূপ কোন নীচু জাতের মানুষের সঙ্গে আহারাদি করেন অমনি তাঁকে জাতিচ্যুত করে চিরকালের মত তাঁর সর্বনাশ সাধন করা হবে। এই প্রথাই আমাদের জাতির সর্বনাশের একটি কারণ। সুতরাং এই কথাটা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে দুরাচারীর সংস্রবেই পাপ হয় এবং সজ্জনের সাহচর্যেই মহত্ত্ব লাভ হয়। দুরাচারীর সংস্রব ত্যাগ করলেই বাইরের পবিত্রতা রক্ষা হয়।

কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করা অনেক বেশী দুঃসাধ্য কাজ। অন্তরকে পবিত্র করতে হলে সত্য বলতে হয়, দরিদ্রের সেবা করতে হয়, দুঃস্থকে সাহায্য করতে হয়। আমরা কি সব সময়ে সত্য কথা বলি? আসলে যা ঘটে সেটা এইরকম। নিজের কোন প্রয়োজনে মানুষ ধনীগৃহে যায়। ধনবান মানুষটিকে দরিদ্রের রক্ষক ইত্যাদি বলে নানারকম চাটুকারিতা করে। অথচ সেই ধনী ব্যক্তিটি তার গৃহাগত দরিদ্র ব্যক্তিটির গলা কাটতেও হয়ত দ্বিধা করবে না। এর মানে কি হলো? সর্বৈব মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এতেই মানুষের মন কলুষিত হয়। এই জন্যই বলা হয় যে, যে মানুষ বারো বছর ধরে একটিও কুচিন্তা না করে অন্তরকে পূত-পবিত্র করেছেন তাঁর মুখনিঃসৃত সব কথাই সত্য হয়। সত্যের এতই ক্ষমতা। যে ব্যক্তি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্রতা লাভ করেছেন তাঁরই শুধু ভক্তিতে অধিকার জন্মায়। আবার অন্তরকে পূত-পবিত্র করাটাও কিন্তু ভক্তির একটা বৈশিষ্ট্য। যদিও ইহুদী, মুসলমান এবং খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের মত বহিরঙ্গের পবিত্রতায় অতটা বেশী জোর দেয় না, তবুও কোন না কোন ভাবে তাদের ভিতরও এই রীতি প্রচলিত আছে। তারাও বুঝেছে যে অন্তত কিছু পরিমাণে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহুদীদের ভিতর মূর্তিপূজা বিনিন্দিত। কিন্তু তাদের মন্দিরে একটি সিন্দুক প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেটিকে তারা বলতো 'আর্ক'। এর ভেতরে তাদের ধর্মপুস্তক রাখা হতো। সিন্দুকের উপরে দুদিকে দুটি পক্ষ-বিস্তৃত স্বর্গীয় দূতের মূর্তি থাকতো এবং তাদের মাঝখানেই নাকি মেঘরূপে স্বর্গীয় অবস্থান। সে মন্দির বহুকাল আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু নতুন মন্দিরগুলো ঠিক পুরাতন মন্দিরের অনুকরণেই স্থাপিত হয়েছে। তার অভ্যন্তরে সিন্দুক এবং ধর্মপুস্তকগুলিও স্থান পেয়েছে। রোমান ক্যাথলিক এবং গ্রীক খ্রীষ্টানদের ভিতর কিছু পরিমাণে মূর্তিপূজার রেওয়াজ আছে। যীশু এবং তাঁর মাতার মূর্তি উপাসনা হয়। প্রোটেস্টান্টরা মূর্তিপূজা করে না। কিন্তু তারা ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে উপাসনা করে। সেটাকেও মূর্তিপূজার অন্য আর একটি রূপ বলা চলে। পার্শী এবং ইরানীরা বহুলাংশেই অগ্নি-উপাসক। মুসলমানরা প্রফেট এবং অন্যান্য মহাত্মাদের উপাসনা করে এবং নামাজ পড়বার সময় কাব্বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় যে ধর্মের প্রথম পর্যায়ে বাইরের কোন কিছুর উপর খানিকটা নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অন্তরাত্মা যতই পবিত্রতর হয় সে ততই বিমূর্ত চিন্তায় মগ্ন হয়। "জীবাত্মাকে ব্রহ্মণে যুক্ত করাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, সাধনার অভ্যাস মধ্য-পন্থা, নামজপ নিম্নপন্থা, বাহ্য পূজা আর্চা সর্বনিম্ন পন্থা।" কিন্তু এই কথাটা স্পষ্টভাবে

বোঝা দরকার যে সর্বনিম্ন পন্থাটিও কিন্তু কোন রকমেই পাপাচার নয়। যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারেই তাকে চলতে হবে ; তার পথ থেকে তাকে বিরত করলে সে তার লক্ষ্য পৌঁছবার জন্য অন্য উপায়ে আবার নিজের পথই ধরবে। সেই কারণে যে মূর্তির উপাসক আমরা তার নিন্দা করবো না। উন্নতির পথে সে তখন ঐ পর্যায়ে ; সুতরাং ঐটাই তার চাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করবেন। কিন্তু উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বাদ-বিসম্বাদের কোন ফল নেই।

কিছু কিছু মানুষ ধনলাভের আশায় ঈশ্বরের উপাসনা করে, কেউ কেউ আবার ভগবানকে ডাকে পুত্রকামনায়। তারা ভাবেন তারা ভক্ত। এটা কিন্তু মোটেই ভক্তি নয় এবং তারাও ভক্ত নয়। এদের কাছে যদি কোন সাধু এসে বলে যে সে সোনা বানাতে পারে এরা অমনি তার পিছু নেবে। তারপরেও এরা নিজেদের ভক্ত বলে পরিচয় দেবে। পুত্রকামনায় ভগবানকে ডাকলে ভক্তি হয় না ; ঐশ্বর্যকামনায় ঈশ্বরকে উপাসনা করলে ভক্তি হয় না। এমন কি স্বর্গকামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করলেও ভক্তির পরিচয় দেওয়া হয় না।

নরকযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় ঈশ্বরকে ডাকলেও ভক্তি হয় না। ভীতি অথবা কামনা কোনটাই ভক্তির উৎস নয়। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি বলেন, "হে ঈশ্বর, আমি সুন্দরী স্ত্রী চাই না, আমি জ্ঞানও চাই না, মুক্তিও চাই না। শত শত বার জন্ম-মৃত্যুতেও আমার আপত্তি নেই। আমার একমাত্র কামনা আমি যেন তোমারই কর্মে নিযুক্ত থাকি।" এই অবস্থায় অর্থাৎ মানুষ যখন সর্বভূতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তখনই তার ভক্তি লাভ হয়। তখনই তিনি কীটাণু থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সব কিছুতেই বিষ্ণুকে প্রকটিত হতে দেখেন, তখনই তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান দিকে দিকে তাঁর প্রকটিত রূপে। তখনই তিনি উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বর ব্যাতিরেকে আর কিছুই নেই। যখন নিজেকে প্রাণিজগতে সবচাইতে অকিঞ্চিৎকর মনে করে তিনি ঈশ্বরকে ডাকেন তখনই সত্যিকারের ভক্তি তিনি লাভ করেন। তখনই তীর্থ আর বাহ্য উপাসনাকে তিনি বহু পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিটি মানুষই তখন তাঁর কাছে দেবতার মন্দির।

শাস্ত্রে ভক্তির কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলি, সেই ভাবেই মাতা ইত্যাদিও বলা হয়। ভক্তির অনুভূতিকে তীব্রতর করবার জন্যই এই সম্পর্কগুলির কথা ভাবা হয়, এবং ঈশ্বরকে নিকটতর, প্রিয়তর করে অনুভব করতে সাহায্য করে। রাসলীলার রাধাকৃষ্ণের কাহিনীটাই ভাবা যাক। ভক্তের মর্মকথার উদাহরণ এটা, কারণ পৃথিবীতে নরনারীর প্রেমের চাইতে গভীরতর প্রেম আর নেই। যেখানে এই তীব্র প্রেমের অবস্থান সেখানে কোন ভয় নেই আর এই অবিচ্ছেদ্য সর্বগ্রাসী যুগল বন্ধন ছাড়া অন্য কোথাও কোন বন্ধন নেই। কিন্তু পিতার ক্ষেত্রে ভালবাসার সঙ্গে ভয় যুক্ত হয় কারণ পিতার প্রতি আমাদের সম্ভ্রমও থকে। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা কিনা, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা কিনা, এসব নিয়ে কি-ই বা আমাদের মাথাব্যথা ? তিনি আমাদের প্রিয়তম এবং সমস্ত ভয়-ভাবনা ছেড়ে তাঁর প্রেমেই মগ্ন থাকবো আমরা। মানুষ যখন সকল কামনা থেকে মুক্ত হয় তখনই শুধু ভগবানকে ভালবাসতে পারে।

ঈশ্বরপ্রেমে সে তখন পাগল ; আর কোন চিন্তাই তার তখন থাকে না। প্রিয়ার প্রতি প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের উদাহরণস্বরূপ। কৃষ্ণ হলেন ভগবান, রাধার তাঁর প্রতি প্রেম। এই কাহিনীগুলি পড়লে ভগবৎপ্রেমের রূপ তোমরা জানতে পারবে। কিন্তু কয়জনেই বা বুঝতে পারবে এসব ? যাদের অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত দুরাচার, যারা সদাচার কি জানে না, তারা কি করে বুঝবে এসব কথা ? মানুষ যখন মন থেকে সবরকম পার্থিব চিন্তাকে দূর করে দিতে পারে, এবং সদাচারী হয়ে পবিত্র পরিবেশে বাস করে তখন সে অশিক্ষিত হলেও তার পক্ষে সূক্ষ্মতম বিমূর্ত চিন্তাও সম্ভবপর হয়। কিন্তু সে রকম মানুষ কয়জনই বা আছে ? পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যাকে মানুষ ভ্রষ্ট করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দেহ এবং আত্মাকে পৃথক ধরে নিয়ে মানুষ দেহ দিয়ে পাপাচার করে ভাবতে পারে যে আত্মা নির্মলই রইল, কলুষিত হলো না। পৃথিবীর ধর্মগুলি সত্যভাবে অনুসৃত হলে এমন একটি মানুষও থাকতো না—হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টান—যে নাকি পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে উঠতো না। কিন্তু, ভালই হোক আর মন্দই হোক মানুষ আপন অন্তর্নিহিত স্বভাব দিয়েই পরিচালিত হয়। তবু এই পৃথিবীতে সব কালেই কিছু মানুষ থাকবেন ঈশ্বরের নামেই যাঁরা মত্ত হন, ঈশ্বরের কথা পাঠ করলেই যাঁদের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে থাকে। এরাই হলেন সত্যকারের ভক্ত।

ধর্মপথের প্রথম পর্যায়ে মানুষ ভগবানকে প্রভু এবং নিজেকে তাঁর ভৃত্য বলে কল্পনা করে। তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটছে বলে সে তাঁর চরণে কৃতকৃতজ্ঞ। এসব কথা ছেড়ে দাও। আসল কথা হলো আকর্ষণীশক্তি একটাই—সেই শক্তিই ঈশ্বর। সেই আকর্ষণীশক্তির আজ্ঞাবহ হয়েই সূর্য, চন্দ্র এবং সব কিছুই চলছে। পৃথিবীর ভাল-মন্দ, সমস্তই ঈশ্বরের। আমাদের জীবনে, ভাল অথবা মন্দ যাই ঘটুক না কেন সবই আমাদের ঈশ্বরাভিমুখে নিয়ে চলেছে। কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই একজন অন্য জনকে হত্যা করে। কিন্তু তার পেছনেও একটি প্রেম আছে—তা সে নিজের জন্যই হোক বা অন্য কারো জন্যই হোক।

বাঘ যখন মহিষকে হত্যা করে তার কারণ হয় সে নিজে নয়ত তার শাবকরা ক্ষুধার্ত।

ঈশ্বর প্রেমেরই মূর্ত প্রকাশ। তিনি সব কিছুতেই বিরাজমান। জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত প্রত্যেকেই তাঁর প্রতিই আকর্ষিত হচ্ছে। স্ত্রী যখন স্বামীকে ভালবাসে সে বুঝতে পারে না যে আকর্ষণীশক্তিটি হলো তার স্বামীর অন্তরস্থিত ঈশ্বরসত্তা। একমাত্র পূজনীয় হলেন প্রেমের দেবতা। যতক্ষণ তাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে রক্ষাকর্তা বলে উপাসনা করি ততক্ষণ আমাদের উপাসনা বাহ্যিক। কিন্তু যখন এসব পার হয়ে তাঁকে আমরা প্রেমের ঠাকুর বলে ভাবতে পারি, সর্বভূতেই তাঁর বিস্তার এবং তাঁর মধ্যেই সব কিছুর অধিষ্ঠান দেখতে পাই তখনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ হয়।

হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি

[স্বামীজী লাহোরে পৌঁছলে আর্য সমাজ এবং সনাতন ধর্মসভার নেতৃস্থানীয় তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। লাহোরে তিনি স্বল্প কয়েকদিনই ছিলেন। সেই সময়ের ভেতরই তিনি তিনটি ভাষণ দেন। প্রথম ভাষণটি ছিল, "হিন্দুত্বের সাধারণ ভিত্তি," দ্বিতীয়টি ছিল 'ভক্তি' ; তৃতীয়টি ছিল তাঁর সুবিখ্যাত ভাষণ "বেদান্ত"। তাঁর প্রথম বক্তৃতার বক্তব্য এখানে দেওয়া হল।]

পুণ্যভূমি আর্যাবর্তে পবিত্রতম এই ভূখণ্ড ; এই স্থান হল মনু উল্লিখিত ব্রহ্মাবর্ত। এই দেশ থেকেই জাগরিত হয়েছিল প্রবল অধ্যাত্ম-বাসনা। সেই বিরাট অধ্যাত্ম-বাসনা, একদিন পৃথিবীকে প্লাবিত করবে, ইতিহাসের বক্তব্যও তাই। এই দেশ থেকেই উদ্ভূত আধ্যাত্মিক উন্মুখতাগুলি। তার বিরাট স্রোতস্বীনিগুলির মতই, একত্রীভূত হয়ে শক্তিমান হয়েছে ; তারপর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রম করে বজ্রকণ্ঠে আত্ম ঘোষণা করেছে। ভারতের উপর বহিরাগতদের মত আক্রমণ হয়েছে তার প্রথম ধাক্কাটা লেগেছে এই দেশেরই উপর। আর্যাবর্তের উপর বর্বর জাতির আক্রমণকে বুক পেতে বাধা দিয়েছে এই বীর প্রসবিনী দেশ। এত যন্ত্রণা সহ্য করেও এই দেশের পূর্ব গৌরব এবং শক্তি নিঃশেষ হয়নি। এই দেশেই পরবর্তী কালে নানক তাঁর বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই খানেই তিনি তাঁর উদার হৃদয় উন্মোচন করে দুহাত বাড়িয়ে হিন্দু, মুসলমান সকলকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বীরদের একজন জন্মেছিলেন—গুরু গোবিন্দ সিং। ধর্মের জন্য তিনি তাঁর নিজের এবং প্রিয়জনের রক্ত দান করেও যখন আত্ম-বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন তখন একটিও অভিযোগ না করে নিঃশব্দে একটি আহত সিংহের মত দক্ষিণাবর্তে চলে গিয়েছিলেন।

পঞ্চনদের পুত্রগণ, আমাদের এই প্রাচীন ভূমিখণ্ডে, তোমাদের সামনে আমি শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আসিনি, কারণ শিক্ষা দিতে পারি এমন বেশী কিছু আমার নেই। আমি পূব দেশ থেকে এসেছি পশ্চিমের ভাইদের সঙ্গে অভিনন্দন বিনিময় করতে, চিন্তাধারার বিনিময় করতে। আমি এখানে এসেছি আমাদের মত বিভেদ জানবার জন্য নয়। আমি জানতে চাই আমাদের চিন্তার ঐক্য কোথায়। আমি বুঝতে চাই কোন পথে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন চিরস্থায়ী হবে, কোন ভিত্তিতে স্থাপিত হলে অনাদিকাল থেকে উচ্চারিত সে বাণী ধ্বনিত হচ্ছে সেই বাণী দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে বেড়ে উঠবে। আমি বলতে চাই সংগঠনের কথা, ধ্বংসের কথা নয়, সমালোচনার দিন শেষ হয়েছে, এখন সংগঠনের জন্য আমরা অপেক্ষমান। সময়ে সুতীব্র সমালোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজন। চিরকালের কাজ হলো সংগঠন আর প্রগতি ; সমালোচনা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ নয়।

গত শতাধিক বৎসর ধরে আমাদের জাতির সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলি পশ্চিমী বিজ্ঞানের আলোক সম্পাতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সমালোচনার বন্যা বয়ে গেছে দেশের উপর দিয়ে। স্বভাবতই সমস্ত দেশ জুড়ে গৌরবোজ্জ্বল মহান চিন্তানায়কদের আবির্ভাব হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আস্থাবান এই সব মানুষ দেশকে ভালবেসে ছিলেন, তার চাইতে ভালবেসেছিলেন তাঁদের ধর্মকে, ঈশ্বরকে। তাঁদের প্রেম ও অনুভূতি এত গভীর ছিল বলেই তাঁরা যা কিছু অন্যায় সে সব কিছুরই এত তীব্র সমালোনা করেছিলেন। অতীতের এই মহান আত্মাদের জয় হোক। কত মঙ্গলই না সাধন করেছেন তাঁরা! কিন্তু বর্তমানের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে বলছে: "যথেষ্ট হয়েছে।" যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে, যথেষ্ট দোষান্বেষণ হয়েছে। এখন সময় এসেছে নতুন করে গড়বার; সময় হয়েছে সংগঠনের। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে একত্রীভূত করে সংহত করবার সময় এসেছে। এই সংহতশক্তিকে প্রয়োগ করে শুরু হবে জাতির সম্মুখ যাত্রা। যে যাত্রা বহু শতাব্দী ধরে স্তব্ধ হয়ে আছে। সন্মার্জিত গৃহে মানুষের বসতি শুরু হোক। পথ নিষ্কণ্টক। আর্যদের সন্ততিরা, তোমরা তোমাদের যাত্রা শুরু করো।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই প্রেরণাই আমাকে এখানে এনেছে। প্রথমেই আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি কোন দলভুক্তও নই, কোন গোষ্ঠীভুক্তও নই। তারা সবাই গৌরবোজ্জ্বল—তাদের সকলকেই ভালবাসি আমি। সারা জীবন ধরে তাদের মধ্যে কি ভাল কি সত্য তাই আমি খুঁজেছি। সেই জন্যই আজ সন্ধ্যায় আমি আমাদের মতের ঐক্য স্থানগুলিই তুলে ধরতে চাই; যদি সম্ভব হয় তো খুঁজে বার করতে চাই সর্বসম্মত একটি মিলন স্থান। যদি ঈশ্বরের করুণায় তা সম্ভব হয়, তাহলে সেইখান থেকেই আমরা শুরু করি। তত্ত্বকে কর্মে রূপায়িত করি। আমরা হিন্দু। হিন্দু কথাটা আমি কোন কদর্থে ব্যবহার করছি না অথবা এ কথাটার কোন কদর্থ থাকতে পারে তাও আমি বিশ্বাস করি না। সে কালে এ কথাটার সহজ অর্থ ছিল সিন্ধুনদের অপর পারের অধিবাসী। আজকে অনেকে—যারা আমাদের ঘৃণা করে তারা হয়ত এই কথাটার কদর্থ করে। কিন্তু নামে কিছু এসে যায় না। হিন্দু নামটি একদিন গৌরবময় হয়ে উঠবে কিনা, আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আমাদেরই উপর, অথবা হিন্দু বলতেই একটা লজ্জাজনক নাম—অর্থাৎ যারা ধূলায় ধূসরিত, অপদার্থ, অবিশ্বাসী তাই বোঝাবে কিনা সেটাও নির্ভর করছে আমাদের উপর। আজ হিন্দু বলতে যদি খারাপ কিছু বোঝায়, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। আমাদের কর্ম দিয়ে এসো আমরা প্রমাণ করি যে এই কথাটির চাইতে মহত্তর কোন কথা পৃথিবীর কোন ভাষাই আবিষ্কার করতে পারবে না। আমার চিরকালের রীতি পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোন কারণেই লজ্জাবোধ না করা। আমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আত্মাভিমানী মানুষদের মধ্যে একজন। আমি খোলাখুলি ভাবেই বলতে পারি যে তার কারণ আমি নই, কারণ আমার পিতৃপুরুষ। আমি যতই আমাদের অতীত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছি, যতই পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়েছি, ততই আমি গর্বে ফুলে উঠেছি। তা থেকেই আমি শক্তি লাভ করেছি, আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে, আমাকে মাটির ধূলা থেকে উত্তীর্ণ করে আমার পিতৃপুরুষের পরিকল্পিত

কর্মে আমাকে নিযুক্ত করেছে। প্রাচীন আর্যজাতির বংশধররা, ঈশ্বরানুগ্রহে তোমাদের হৃদয়ও সেই গর্বে পূর্ণ হোক। তোমাদের রক্ত প্রবাহে প্রবাহিত হোক পিতৃপুরুষের প্রতি আস্থা, এবং তা থেকে জগতের মোক্ষ লাভ হোক।

কোথায় বিশেষভাবে আমাদের ঐক্য, কোথায় আমাদের জাতীয় জীবনের মিলন কেন্দ্র সেটি খুঁজে বার করবার আগে একটি কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যেমন প্রত্যেকটি বিভিন্ন মানব সত্তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা ব্যক্তি তা থাকে সেই সকম একটা জাতির সঙ্গে আর একটা জাতির বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকে। প্রকৃতির রাজ্যের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করাই প্রত্যেক মানুষের জীবনের লক্ষ্য, তার বিগত কর্মফল তার জন্য যেমন একটি বিশেষ পথকে নির্দিষ্ট করে দেয়—জাতির জীবনেও তাই। প্রত্যেক জাতিকেই তার নির্ধারিত নিয়তিকে পূর্ণ করতে হবে। প্রত্যেক জাতিকেই তার নিজস্ব বিশেষ বাণীটি পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সমস্ত জাতিগুলির যাত্রাপথের সঙ্গে নিজের স্থান করে নিতে হবে, সমস্ত জাতির মিলিত ঐকতানের সঙ্গে নিজের সুরটি মিলাতে হবে। এদেশে শিশুকালে আমরা সাপের মাথার মণির গল্প শুনেছি। যতক্ষণ সেই মণিটি থাকবে সাপটাকে নিয়ে যা কিছুই করো না কেন কোন মতেই মারতে পারবে না তাকে। দৈত্যদানাদের বেলাতেও শুনেছি তাদের প্রাণগুলি সব থাকত ছোট ছোট পাখিদের মধ্যে। যতক্ষণ সেই পাখিগুলির কোন বিপদ না ঘটতো পৃথিবীর কোন শক্তিই দৈত্যদানাদের প্রাণে মারতে পারতো না। তাদের গুঁড়িয়ে দিলেও, তাদের শরীরগুলো টুকরো টুকরো করে ফেললেও কিছুতেই মরতো না তারা। জাতির জীবনেও তাই। প্রত্যেক জাতিরই একটি বিশেষ প্রাণকেন্দ্র থাকে—সেখানেই প্রতিষ্ঠিত থাকে জাতির জাতিত্ব। সেই প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করতে না পারলে জাতির মৃত্যু হয় না। এইভাবে বিচার করলে আমরা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে অতি আশ্চর্য একটা ব্যাপার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি। আমাদের এই ভক্তির দেশের উপর দিয়ে বর্বর জাতিদের বিজয় অভিযানের ঢেউ এসেছে একটার পর একটা। শত শত বৎসর ধরে এদেশের আকাশবাতাস 'আল্লা হো আকবর' চীৎকারে রণরণিত হয়েছে, সেদিন কোন হিন্দুই জানতো না তার শেষ মুহূর্তটি কখন সমাগত হবে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক অত্যাচারিত আর অধ্যুযিত আমাদের এই দেশ। কিন্তু আমরা সেই একই জাতি অপরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যদি প্রয়োজন আসে বার বার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুতই আছি আমরা। কেবল তাই নয়, কেবল শক্তির পরিচয়ই নয়, আমরা যে বহির্বিশ্বেও বেরিয়ে পড়তে পারি তার পরিচয়ও পাওয়া গেছে। সম্প্রসারণই জীবনের পরিচয়।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চিন্তা এবং ভাবধারা কেবলমাত্র ভারত সীমান্তেই আবদ্ধ হয়ে নেই ; আমাদের ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিশ্বাভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে, বিদেশের সাহিত্যে তারা অনুপ্রবেশ করেছে, অন্য জাতিদের সঙ্গে সমস্থান গ্রহণ করেছে, এমন কি কোন কোন স্থানে একনায়কত্বের অধিকার লাভ করেছে। পৃথিবীর সামগ্রিক প্রগতিতে ভারতের দান যে সর্বাধিক—এসব থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মানুষের চিন্তাজগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম অবদান—

দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা। আমাদের পিতৃপুরুষ আরও অনেক কিছু করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অন্য জাতিদের মত তাঁরাও বহিঃপ্রকৃতির রহস্য অনাবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন সে কথা আমরা জানি। তাঁদের বিরাট মেধা দিয়ে এই আশ্চর্য জাতিটি ঐক্ষেত্রেও এমন অবিশ্বাস্য রকমের নৈপুণ্য দেখাতে পারতেন যা বিশ্বের গৌরব হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ওর চাইতে মহত্তর কিছুর জন্যই ঐ পথ তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। তাই বেদের পৃষ্ঠা থেকে বেজে উঠেছে মহত্তর এক সুর: "যে বিজ্ঞান দিয়ে আমরা যিনি অপরিবর্তনীয়, তাঁকে জানতে পারি, সেই বিজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরিবর্তনশীল, বিলীয়মান প্রকৃতির বিজ্ঞান, দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ মরজগতের বিজ্ঞান হয়ত মহান, হয়ত কেন নিঃসন্দেহে মহান। কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষের অভিজ্ঞতায় সেই বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম যে বিজ্ঞান অপরিবর্তনশীলের বিজ্ঞান— কারণ তিনিই শান্তি। সেখানেই প্রাণ মৃত্যুহীন, একমাত্র সেখানেই পূর্ণতা, একমাত্র সেখানেই সব দুঃখের অবসান। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ভাত-কাপড় আর অপরের প্রতি প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা ছাড়া আর কি দিতে পারে? যে বিজ্ঞান কেবল অন্যদের উপর প্রভুত্ব করতে শেখায়, দুর্বলের উপর শক্তিমানের নিপীড়নই যার শিক্ষা— তাঁরা চাইলে এমন বিজ্ঞান সহজেই আবিষ্কার করতে পারতেন। ঈশ্বরকে শতকোটি ধন্যবাদ তাঁরা এ জিনিস চাননি; তাঁরা মুহূর্তে অপর প্রান্তটি ধরেছিলেন। সেটা ছিল অনেক বেশী উজ্জ্বল, উচ্চতায় অসীম, শান্তিতে অনন্ত। সেই ধারাই হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে পিতা থেকে পুত্রে, মিশে গেছে আমাদের সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আমাদের শিরা উপশিরার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা একেবারে আমাদের স্বভাবে পরিণত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিন্দু এবং ধর্ম এদুটো কথা এক হয়ে গেল, তাই এই হল আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এবং একে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। আগুন জ্বালিয়ে, তলোয়ার হাতে অনেক বর্বর জাতি এসেছিল, সঙ্গে করেছিল তাদের বর্বর ধর্ম, কিন্তু তারা কেউ এ জাতির প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারে নি, ছুঁতে পারে নি 'মণি'টিকে, মারতে পারে নি 'ছোট পাখি'টিকে, জাতির আত্মার প্রাণকেন্দ্রটি যেখানে অবস্থিত। এই হল আমাদের প্রাণশক্তির উৎস। এবং এই উৎস যতদিন বিরাজমান থাকবে এ জাতিকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতন এবং যন্ত্রণা আমাদের আহত করতে পারবে না। আমরা যতদিন আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবো, আমরা প্রহ্লাদের মতই অক্ষত ভাবে অগ্নির হলকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। হিন্দু যদি আধ্যাত্মিক না হয় আমি তাকে হিন্দুই বলবো না। অন্য দেশে মানুষ প্রথমে একটি রাজনৈতিক জীব, তারপর সে হয়ত সামান্য কিছু ধর্ম সাধন করতে পারে। কিন্তু এই ভারতবর্ষে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যাস এবং তারপর সময় থাকলে অন্য কিছু। এই কথাটা মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কেন জাতির কল্যাণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল দেশের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে খুঁজে বার করা। পুরাকালেও তাই করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও তাই করতে হবে। বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করাই হল জাতির ঐক্য সৃষ্টি। ভারতীয় জাতি

বলতে বোঝাবে ঐক্যবদ্ধ সেই মানুষগুলি যাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার একই সুর বেজে উঠেছে।

এদেশে বিভিন্ন মতাবলম্বী দল যথেষ্ট ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ আমাদের ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই হল যে বিমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তারপর অবশ্য তার অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা এবং ব্যাখ্যা হয়েছে। মূল তত্ত্বকে কার্যকরী করতে গিয়েই সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা। সুতরাং বিভিন্ন মতাবলম্বীরা এদেশে তো থাকবেই। কিন্তু সেই কারণে দলীয় কলহ থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন মত নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু দলাদলি নয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাড়া পৃথিবীর অগ্রগতি সম্ভব নয়, কিন্তু দলাদলিতে কিছু ভাল ফল হয় না। একদল মানুষ সব কাজ করে উঠতে পারে না, পৃথিবীর অসীম শক্তিকে অল্পসংখ্যক মানুষ কাজে লাগাতে পারে না। তাই প্রয়োজন থেকেই কর্ম-বিভাগ হয়েছে—বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজনেই বিভিন্ন মতাবলম্বীরা থাকুন। কিন্তু যেখানে আমাদের পিতৃপুরুষরা ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত বিভিন্নতাই বাহ্য, সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা মিলনসূত্র সকলকে ঐক্যতায় বেঁধেছে—তখনও কি কলহ-বিবাদের কোন প্রয়োজন আছে? আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলছেন: 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—অস্তিত্ব আছে শুধুমাত্র একজনেরই, ঋষিরা তাঁকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকেন।

যে দেশে সবধর্মীয় সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে সেই দেশে যদি সাম্প্রদায়িক কলহ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, পরস্পরের প্রতি যদি হিংসা বিদ্বেষ থাকে, তাহলে কোন লজ্জায় কোন অধিকারে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের বংশোদ্ভব বলে দাবি করতে পারি?

আমরা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত অথবা গাণপত্য যাই হই না কেন, প্রাচীন অথবা আধুনিক বৈদিক মতাবলম্বীই হই, প্রাচীন গোঁড়ামিতেই বিশ্বাস করি অথবা আধুনিক পরিমার্জিতই মতেই বিশ্বাস করি, যদি আমরা আমাদের হিন্দু বলে পরিচয় দিই তাহলে কয়েকটি প্রধান নীতিতে আমাদের সবাইকেই বিশ্বাস করতেই হবে এবং সেই নীতিগুলি সকলের ক্ষেত্রেই একইরকম ভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য তার ব্যাখ্যায় অনেক রকমের প্রভেদ থাকতে পারে এবং থাকবেও। সেই প্রভেদ থাকাও উচিত। কারণ আমাদের মানদণ্ডর হিসাবে সকলকেই বাধ্য করা আমাদের রীতি নয়। কারণ সকলকেই আমাদের ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধ্য করা এবং আমাদের প্রণালীতেই বাস করতে বাধ্য করা হলে সুগভীর অন্যায় করা হবে। মনে হয় এখানে যারা উপস্থিত আছেন একটা কথা সবাই মানবেন: বেদের চিরন্তন শিক্ষাই ধর্মের গুহ্য তত্ত্ব। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি এই পবিত্র গ্রন্থের আরম্ভও নেই, শেষও নেই, এ প্রকৃতির সমকালীন, এবং আমাদের সমস্ত ধর্মীয় বৈষম্য এবং দ্বন্দ্বর সমাপ্তি হয় যখন আমরা এর সম্মুখীন হই; আমাদের সমস্ত ধর্মীয় বৈষম্যের শেষ বিচার যে এইখানেই সে বিষয়েও আমরা সবাই একমত। বেদ সম্বন্ধে হয়ত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হতে পারে। কোন মতাবলম্বীরা হয়ত এক অংশ থেকে অন্য একটি অংশকে পবিত্রতর মনে করেন। কিন্তু এসবে কিছুই এসে যায় না যদি আমরা সকলেই বেদের সামনে নিজেদের ভ্রাতৃসম মনে করি। আজকে আমাদের যা কিছু শুভ, পবিত্র এবং পুণ্যময় সঞ্চয় আছে

সে সব কিছুই আমরা পেয়েছি এই চিরন্তন এবং অত্যাশ্চর্য সাহিত্য থেকে। আমাদের সত্যিই যদি এই বিশ্বাস তাহলে প্রথমেই এই তত্ত্বটি দেশের দিকে দিকে জানিয়ে দেওয়া যাক। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে বেদ শ্রেষ্ঠতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, যে আসনে তাঁর অধিকার বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রথমেই, তাহলে বেদ, দ্বিতীয় কথা হল আমরা সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী—যে শক্তি সৃষ্টি করেন এবং রক্ষাও করেন এবং প্রলয়কালে যে বিশ্বজগৎ তার নিকট গমন করে তাঁতেই বিরাজিত থাকে এবং যথাকালে আবার প্রত্যাগমন করে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণায় আমাদের মতানৈক্য থাকতে পারে। কেউ হয়ত একান্ত ভাবেই স্বকীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কারো ঈশ্বর হয়ত স্বকীয় বা অমানবীয় আবার কারো হয়ত বিশ্বাস যে ঈশ্বর কোন ভাবেই স্বকীয় নন, এবং এরা প্রত্যেকেই বেদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারে। তবুও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, একটি অত্যাশ্চর্য অনন্ত শক্তি—যা থেকে সব কিছুই উদ্ভূত হয়েছে। যাঁর মধ্যেই সকলের অবস্থান এবং অন্তে সেইখানেই সকলেই প্রত্যাবর্তন করবে—এই মহাশক্তিকে যে বিশ্বাস করে না তাকে হিন্দুই বলা যায় না। তাই যদি হয়, তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে আমরা সেই কথাটাই প্রচার করবার চেষ্টা করি। ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার যে ধারণাই থাক তাই তুমি প্রচার করো, সে পার্থক্য কোন পার্থক্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কথা প্রচারিত হোক। সেইটুকুই শুধু আমাদের কামনা। একটা ধারণা হয়ত আর একটা ধারণা থেকে উন্নততর হতে পারে। কিন্তু একথা মনে রেখো কোন একটা ধারণাও খারাপ নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ত ভাল, আর একটা ধারণা হয়ত আরও ভাল, কোন একটা ধারণা হয়ত শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমাদের ধর্মের পর্যায়ে খারাপ বলে কোন শব্দ নেই। যে যে ধারণা নিয়েই ঈশ্বরের নাম প্রচার করুক—ঈশ্বর তাঁদের সকলেরই মঙ্গল করুন। যত বেশী তাঁর নাম প্রচারিত হবে, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। আমাদের শিশুরা এই ধারণার মধ্যেই যেন বেড়ে ওঠে। ঈশ্বরের নাম-চিন্তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক—দীন-দুঃখীর কুটির থেকে বিত্তবান ক্ষমতাবানের ঘর পর্যন্ত।

আমার তৃতীয় বক্তব্য হল অন্যান্য জাতিদের মত আমরা বিশ্বাস করি না যে এই পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে চিরকালের মত লয়প্রাপ্ত হবে। আমরা একথাও বিশ্বাস করি না যে বিশ্ব-জগতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। এই আর একটি চিন্তার ক্ষেত্র যেখানে আমরা সকলেই একমত হতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টির কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। কেবল বিশেষ বিশেষ কালে বিশ্বজগতের বহিরঙ্গের স্থূল বস্তু তার সূক্ষ্ম অবস্থায় ফিরে যায় এবং সেই অবস্থাতেই কিছুকাল অবস্থান করে এবং তারপর কোন এক সময়ে বহির্জগতে নিক্ষিপ্ত হয়ে যখন অনন্তরূপে প্রকটিত হয় তাকেই আমরা বলি প্রকৃতি। কালেরও পূর্ব থেকে ঢেউ এর আবর্তের মত গমনাগমনের এই গতিবেগ চিরন্তনভাবে অবস্থান করছে এবং অনন্তকাল ধরেই থাকবে।

তারপর, সব হিন্দুরাই মনে করে মানুষ মানে কেবলমাত্র এই স্থূল দেহটি নয়। এর অন্তরে যে সূক্ষ্মতর একটি দেহ এবং মন আছে কেবল তাই নয়, তার চাইতেও মহত্তর কিছু আছে। কারণ দেহের এবং মনের পরিবর্তন আছে। কিন্তু দেহের এবং মনের

এমনকি সূক্ষ্মতর দেহেরও উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান—তিনিই মানুষের আত্মন্। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই, মৃত্যু তাঁর কাছে অপরিজ্ঞাত। তারপর আর একটি বিশিষ্ট ধারণা—যে ধারণা আর অন্য কোন জাতির ভেতরেই নেই—আমাদের আছে। আমি শাস্ত্রে উল্লেখিত জন্মান্তরবাদের কথা বলছি। আত্মন্ জন্মের পর জন্ম বিভিন্ন দেহের মধ্যে বাস করতে করতে একটা সময়ে তার পুনর্জন্মের বাসনা লোপ পায়। তখনই তার মুক্তি হয় এবং পুনরায় জন্ম হয় না। এছাড়া, আর একটা ব্যাপারেও আমরা সবাই একমত—তা আমরা যে মতাবলম্বীই হই না কেন। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। কোনও মতানুসারে আত্মা এবং ঈশ্বর দুটি ভিন্ন সত্তা। কোনও মত অনুসারে আত্মা অনির্বাণ অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। আবার কেউ মনে করেন আত্মা অনন্তেই লীন। আমরা যদি এই বিষয়ে একমত হই যে আত্মা অনন্ত, আত্মা কখনও সৃষ্টি হয়নি, সুতরাং তার মৃত্যুও নেই এবং নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত বহু জন্ম এবং দেহের মধ্য দিয়ে তার আবর্তন-বিবর্তন চলবে, তাহলে আত্মার ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈক্য থাকলে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তারপরই আমরা আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনের কথায় আসছি। তোমরা যারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে একটি মৌলিক অনৈক্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দিয়েছে। আমরা শাক্তই হই, বৈষ্ণবই হই, অথবা এমনকি বৌদ্ধই হই আর জৈনই হই, আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে আত্মা আপন স্বভাবেই পূর্ণ এবং পবিত্র, অসীম এবং চির আনন্দময়। অবশ্য দ্বৈতবাদীদের মতে এই স্বভাবজাত আনন্দঘন অবস্থাটি পূর্বকৃত অসৎ কর্মের জন্য সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় সে আবার ক্রমে ক্রমে তার পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা বলেন যে সঙ্কুচিত হওয়ার ধারণাটি কিয়দংশে ভ্রমাত্মক। কারণ মায়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের মনে হয় যে আত্মার পূর্ণ শক্তি ব্যাহত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা পূর্ণরূপেই প্রকটিত থাকেন। আমাদের ভিতর এইসব নিয়ে যতই মতানৈক্য থাক, যে চিন্তাটি প্রধান সেখানে পাশ্চাত্যচিন্তা এবং প্রাচ্যচিন্তার মধ্যে দুস্তর বিভেদ। পশ্চিম ঈশ্বরকে খুঁজছে বহির্জগতে। তাদের কাছে তাঁদের ধর্মপুস্তকগুলি প্রত্যাদিষ্ট। কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্ফুরিত হয়েছে।

বন্ধুগণ, হে আমার ভ্রাতাগণ, এই সত্যটি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই কথাটা বারংবার স্মরণ করতে হবে। কারণ স্থির নিশ্চিত ভাবে একথা জানি এবং তোমাদেরও এই কথাটাই অনুধাবন করতে অনুরোধ করি যে মানুষ যদি রাত্রিদিন শুধু ভাবে যে সে অকিঞ্চিৎকর—তা থেকে কোন মঙ্গল হয় না। কোন মানুষ যদি দিনরাত্রি নিজেকে হতভাগ্য আর অপদার্থ বলে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত অপদার্থই হতে হয় তাকে। তুমি যদি বলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আছি, আমি আছি," তাহ'লেই তুমি থাকবে। আর তুমি যদি বলো, "আমি নেই", যদি কেবলই ভাবতে থাকো ঐ একই কথা যে তুমি কিছু নও, তুমি অপদার্থ, তাহলে তুমি অপদার্থই হবে। এই মহা সত্যটি সব সময়ে স্মরণে রাখবে। আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা অনন্ত দিব্যাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। কেমন করে অপদার্থ হতে পারি আমরা। আমরাই সব, সব

কিছু করতেই আমরা প্রস্তুত। মানুষ সর্ব-কর্ম পারদর্শী। আমাদের পিতৃপুরুষদের অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল। অন্তরে এই সুগভীর আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই তাঁরা সভ্যতাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। যখনই অধঃপতন এসেছে, অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছে, জানবে যে আত্মবিশ্বাসের স্খলন থেকেই তার শুরু। আত্মবিশ্বাস হারানো মানেই ঈশ্বরে বিশ্বাস হারানো। তোমরা কি বিশ্বাস করো যে সেই অনন্ত, মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন তোমার অন্তরে, তোমার ভিতর দিয়ে তাঁরই কর্ম পরিচালিত হচ্ছে? যদি তুমি বিশ্বাস করো যে সর্বব্যাপী ঈশ্বর অন্তর্যামী, ওতঃপ্রোতভাবে প্রবেশ করেছেন তোমার দেহে, মনে এবং আত্মায়, তাহলে কি তোমার হতাশা আসতে পারে কখনও? আমি হয়ত একটি জল বুদ্‌বুদ্, তুমি হয়ত পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। কি হয়েছে তাতে? আমিও অনন্ত সাগর থেকে উদ্ভূত, তুমিও তাই।

আমারও অনন্ত জীবন, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আধ্যাত্মিকতা, তোমারও তাই। আমি তো জন্ম থেকেই অনন্ত জীবন, অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত শক্তির সঙ্গে যুক্ত, যোগ যুক্ত আর তুমি যদিও পর্বত-প্রমাণ, তুমিও তাই। সেই জন্য, হে ভ্রাতৃগণ, জন্ম থেকেই তোমাদের সন্তানদের এই উন্নত, মহান, জীবন-সঞ্জিবনীর মত শিক্ষাটি দিও। তাদের অদ্বৈতবাদ শেখাবার কোন প্রয়োজন নেই, ইচ্ছা হলে তাদের দ্বৈতবাদ বা যে কোন বাদই শেখাতে পারো, কারণ ভারতবর্ষে সব তত্ত্বের মূল তত্ত্ব এইটাই। আত্মা যে পূর্ণ, এই দুর্লভ তত্ত্বটি ভারতবর্ষের সব ধর্মাবলম্বীরাই বিশ্বাস করেন। মহা দার্শনিক কপিল মুনি বলেছেন যে প্রকৃতিগত ভাবে আত্মা যদি পবিত্র না হয় আত্মা পরবর্তী কালেও পবিত্রতা লাভ করতে পারে না; কারণ প্রকৃতিগত ভাবে যা পবিত্র নয় তা পূর্ণতা লাভ করলেও তার পূর্ণতা বার বার ব্যাহত হবে। অপবিত্রতাই যদি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহলে কয়েক মুহূর্তের জন্য পবিত্রতা লাভ করলেও অপবিত্রই থাকতে হবে তাকে। কারণ ঐ পবিত্রতা একটা সময়ে তিরোহিত হবে এবং স্বভাবসিদ্ধ অপবিত্রতার আবার উদয় হবে। সেই জন্যই আমাদের সব দার্শনিকরাই বলেছেন যে আমরা প্রকৃতিগতভাবেই সৎ এবং পূর্ণ, অপবিত্র, অপূর্ণ নয়। আমাদের সেই মহা ঋষির উদাহরণটি মনে রাখা উচিৎ যিনি মৃত্যুকালে তাঁর মনকে তাঁর মহান চিন্তা এবং মহান কর্মগুলিকে স্মরণ করতে বলেছিলেন। দ্যাখো তিনি তাঁর মনকে তার দুর্বলতা এবং ভ্রমগুলিকে স্মরণ করতে শিক্ষা দেননি। ভ্রম ত হবেই, দুর্বলতাও নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তোমার সত্য প্রকৃতিকে সর্বদা স্মরণে রেখো। ভ্রম থেকে মুক্ত হবার, দুর্বলতা থেকে নিরাময় হবার—এই একমাত্র পন্থা।

দেখা যাচ্ছে এই কয়েকটা বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বীরা এক মত। এবং মনে হয় এই ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী ধর্মবিশ্বাসীরা, প্রাচীন এবং আধুনিক সকলেই হাত মেলাতে পারবেন। কিন্তু সর্বোপরি আর একটা কথা আছে যেটা দুঃখের বিষয় আমরা বার-বারই ভুলেই যাই। ভারতীয় চিন্তায় ধর্ম উপলব্ধির বিষয়। "ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাস রাখো, তাহলেই তুমি নিরাপদ"—এই শিক্ষা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়; কারণ এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। তুমি নিজেকে যাতে পরিণত করবে তুমি তাই। ঈশ্বরের করুণায় এবং আপন প্রচেষ্টায় তুমি নিজেকে যা করবে তুমি তাই হবে। কিছু তত্ত্বে আর ধর্মনীতিতে বিশ্বাস করলেই চলবে না।

ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ থেকে যে উদাত্ত বাণীটি ধ্বনিত হয়েছিল "অনুভূতি" তাই হল উপলব্ধি। এবং আমাদেরই একমাত্র শাস্ত্র যা বার বার ঘোষণা করেছে, "ঈশ্বর দর্শনীয়"। সাহসিকতার সুস্পষ্ট উক্তি নিশ্চয়ই ; এবং একান্ত ভাবেই সত্য। এর প্রতিটি ধ্বনি সত্য, প্রতিটি অনুকম্পন সত্য। তোতা পাখির মত কোন একটা তত্ত্বকে মুখস্ত করা নয়। বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বীকৃতিও নয়—সে তো কিছুই নয়। তোমার জীবনে তার আগমনের উপলব্ধি চাই। তাই, আমাদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নয়। পুরাকালে এবং আধুনিক কালেও ঈশ্বর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন—এই আমাদের প্রমাণ। আমরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী শুধু এই কারণে নয় যে এর পেছনে অনেক সুযুক্তি আছে। প্রকৃত কারণ হল পুরাকালে হাজারো মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, স্বচক্ষে দর্শন করেছেন, একালেও এমন অনেকেই আছেন যাঁদের এই উপলব্ধি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হাজারো মানুষ আসবে যারা আত্মাকে উপলব্ধি করবে এবং আপন আত্মার দর্শন পাবে। অতএব, সর্বোপরি আমাদের এই চিন্তাটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং যত বেশী তা করতে পারবো, ধর্মীয় দলাদলি ততই কমবে। কারণ যিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন একমাত্র তিনিই ধার্মিক। আমরা অনেক সময়ই ধর্মের বালসুলভ বকবকানিকে ধর্মীয় সত্য বলে ভুল করি, বুদ্ধিবাদী কথাবার্তাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মনে করি। তার ফলেই আসে দলীয় বাক-বিতণ্ডা ; তার পরেই দ্বন্দ্ব মারামারি। আমরা যদি একবার বুঝতে পারি যে উপলব্ধিই ধর্ম তখন নিজেদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারবো যে ধর্মীয় সত্যের উপলব্ধির পথে আমরা কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছি। যখনই আমরা বুঝতে পারবো যে অন্ধকারে আমরা দিশাহারা এবং অন্যদেরও সেই অন্ধকারের পথেই নিয়ে যাচ্ছি, তখনই বন্ধ হবে ধর্মীয় দলাদলি, বাক-বিতণ্ডা আর দ্বন্দ্ব মারামারি। যখনই কেউ একা দলীয় দ্বন্দ্ব শুরু করতে চাইবে, তাকে প্রশ্ন করো, "তুমি কি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছো ? আত্মনকে উপলব্ধি করেছো ? যদি না করে থাকো, তাহলে তাঁর নাম প্রচার করবার কি অধিকার তোমার ? তুমি নিজে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আমাকেও অন্ধকারে টানতে চাইছো—যেমন একজন আর একজন অন্ধকে পথ দেখায় এবং তার ফলে দুজনেই গর্তে পড়ে।"

সেইজন্য অপরের দোষ ধরবার আগে নিজের কথাটা খুব ভাল করে ভাববে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের পথে উপলব্ধি করতে দাও। তারা তাদের আপন অন্তরের সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করুক আপন প্রচেষ্টায়। যেদিন অনাচ্ছাদিত উদার সত্যটি তারা দেখতে পাবে সেদিন তারা বুঝতে পারবে কি অপার আনন্দময় তার অনুভূতি। ভারতবর্ষের প্রতিটি দ্রষ্টা, যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে বার বার এই আনন্দঘন অনুভূতির কথা বলে গেছেন। তখন তাদের অন্তর থেকে কেবল প্রেমের কথাই বের হবে। কারণ তাদের হৃদয়ে তারা যাঁর স্পর্শ পেয়েছে তিনি যে স্বয়ং প্রেম-সত্ত্বা। তখনই শুধু সব দলাদলির অবসান হবে. আমরা বুঝতে শিখবো, হৃদয়কে উন্মুক্ত করে, সুতীব্র প্রেমে জড়িয়ে ধরবো এই হিন্দু শব্দটিকে আর তাদের যারা এই হিন্দু নামে পরিচিত। শুনে রাখ, যেদিন এই নামটি শোনা মাত্র তোমার অন্তরে শক্তির তড়িৎ কম্পন অনুভব করবে, জানবে তখনই মাত্র তুমি হিন্দু। যেদিন

এই নামধারী যে কোন মানুষ, সে যে দেশ থেকেই আসুক না কেন, সে আমাদের ভাষা অথবা যে কোন ভাষাই বলুক না কেন। সেই মানুষকে যখন তুমি নিকটতম, প্রিয়তমের মত গ্রহণ করতে পারবে, সেই দিন তুমি হিন্দু। যেদিন এই নামের যে কোন মানুষের দুর্দশাকে তুমি তোমার আপন পুত্রের দুর্দশা বলে মনে করবে—সেই দিন তুমি হিন্দু। এই বক্তৃতার শুরুতে যে মহাপ্রাণ গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা বলেছি, যেদিন তাঁর মত হিন্দুদের জন্য সব কিছু সইতে পারবে, সেদিন তুমি হিন্দু। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে হিন্দু ধর্মের রক্ষায় নিজের রক্ত দান করে, সন্তানদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত দেখে, যাদের জন্য রক্ত দিয়েছেন তাদের দ্বারাও প্রবঞ্চিত হয়ে, তিনি আহত পশুরাজের মত নীরবে বিদায় নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু যারা তাকে অকৃতজ্ঞের মত পরিত্যাগ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে একটাও অভিশাপের বাণী নিঃসৃত হয়নি। শোনো আমার কথা! যদি দেশের মঙ্গল কামনা করো তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি গুরু গোবিন্দ সিং হয়ে উঠতে হবে। তোমার দেশবাসীর মধ্যে অজস্র দোষ তুমি দেখতে পারো, কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের ধমনীতে হিন্দু রক্তের কথা। যদি তারা তোমাকে আঘাতও দেয় তবু সর্বপ্রথমেই তাদের ঈশ্বর ভেবে পূজা দিতে হবে। তারা সবাই যদি তোমাকে অভিশাপ দেয়, তুমি তাদের পাঠাবে প্রেমের বাণী। তারা যদি তোমাকে বিতাড়িত করে, তুমি সেই পুরুষ সিংহ গোবিন্দ সিং-এর মতই বিদায় নিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে, এই রকম মানুষই হিন্দু নামের যোগ্য। এই রকম আদর্শই সব সময়ে আমাদের চোখের সামনে থাকা উচিৎ। এসো আমাদের ক্ষুদ্র কুঠারগুলিকে কবর দিয়ে চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বইয়ে দিই।

যারা ভারতের নব জাগরণের কথা বলছে তাদের বলতে দাও। আমি সারাজীবন ধরে কাজ করছি, অন্তত করবার চেষ্টা করছি; আমি বলছি যতদিন না তোমরা আধ্যাত্মিক হবে ততদিন ভারতের নবজাগরণও নেই। শুধু তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর শুভাশুভ তারই ওপর নির্ভর করছে। আমি তোমাদের খোলাখুলিভাবেই একটা কথা বলছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিতেই আজ নাড়া লেগেছে। বস্তুবাদের বালির দুর্বল ভিত্তির উপর যত বিরাট ইমারৎই তুমি সৃষ্টি করো না কেন একদা তার দুঃখের দিন আসবেই, একদিন সে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হবেই। পৃথিবীর ইতিহাসই তার সাক্ষী। একটার পর একটা জাতি এসেছে, ঘোষণা করেছে মানুষই সর্বস্ব। বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের মহিমা। হায়রে! পাশ্চাত্য ভাষায় বলা হয়, মানুষ তার ভূতাত্মাকে ত্যাগ করলো (Gives up his ghost); আমরা বলি মানুষ দেহ ত্যাগ করে। পাশ্চাত্য মানুষ প্রধানত দেহ, তারপর সেই দেহের একটি আত্মা। আমাদের ক্ষেত্রে মানুষ একটি আত্মা-শক্তি, তারপর তার একটি দেহ। এইখানেই ত আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সেই কারণেই ওদের সব সভ্যতা, দৈহিক আরাম ইত্যাদি দুর্বল বালির ভিত্তির উপর গাঁথা বলেই, অল্পায়ু হয়ে, একটার পর একটা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা এবং চীন, জাপানের মত সভ্যতা-যারা ভারতের পাদপ্রান্তে বসে জীবনের শিক্ষা নিয়েছে—তারা আজও বেঁচে আছে এবং তাদের নবজাগরণের সম্ভাবনার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। এদের জীবন Phoenix-এর

মত ; হাজার বার ধ্বংস হলেও, প্রতিবারই নব গৌরবে জেগে ওঠে। কিন্তু বস্তু-ভিত্তিক সভ্যতার একবার পতন হলে আর কোনদিন জেগে ওঠে না। সেই ইমারৎ একবার পড়ে গেলে শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। তাই বলছি, ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা করো, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

তাড়াহুড়ো করো না, অপরের অনুকরণ করো না। অনুকরণ যে সভ্যতা নয় এই মহৎ শিক্ষার কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। রাজার পোষাকে সাজলেই কি আমি রাজা হয়ে যাবো? সিংহ চামড়া পরিহিত শৃগাল কি কখনও সিংহ হয়? অনুকরণ, ঘৃণ্য অনুকরণ, কখনই প্রগতির পথে নিয়ে যায় না। সেটাই মানুষের ভয়াবহ অধঃপতনের চিহ্ন। হায়! মানুষ যখন নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে—সেটাই তার উপর শেষ আঘাত। মানুষ যখন তার পিতৃপুরুষকে নিয়ে লজ্জিত হয়, তখনই তার শেষ। এই ত আমি, হিন্দুজাতির সামান্যতম একজন, তবু আমি জাতির গৌরবে গর্বিত। আমার পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্বিত। নিজেকে হিন্দু বলেই আমার গৌরব। তোমাদের সামান্য সেবক হিসেবেও আমার গৌরব। তোমরা তপস্বীদের বংশধর, তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঋষিদের বংশধর ; আমি তোমাদেরই একজন দেশবাসী বলে আমি গৌরবান্বিত। তাই, নিজেদের বিশ্বাস করো, পিতৃপুরুষদের নিয়ে লজ্জিত না হয়ে গৌরবান্বিত হও। আর অনুকরণ করো না, কখনও করো না। যখনই অন্যের করায়ত্ত হও, তখনই নিজের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হও। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও যদি অন্যের হুকুমে চলতে থাকো ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাবে, এমন কি চিন্তাশক্তিটুকু পর্যন্ত। আপন প্রচেষ্টায় তোমার যা আছে তাকে প্রকাশ করো, কিন্তু অনুকরণ করো না। যদিও অপরের মধ্যে যা ভাল তা তুমি গ্রহণ করতে পারো। অপরের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতেই হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপণ করে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে মাটি, বাতাস আর জলের যোগান দাও, বীজ থেকে যখন চারাগাছটি হয়, এবং চারাগাছটি যখন বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হয়, সেটি কি মাটি, না জল, না হাওয়া? সবকিছুকে গ্রহণ করে সে আপন প্রকৃতি অনুসারেই বিশাল মহীরুহের রূপ নেয়। তোমারও সেইরকমই হোক। আমাদের বাস্তবিকই অপরের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখবার আছে ; যে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাকে তো মৃতই বলা চলে। মনু বলেছেন: 'আদদীত পরাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরোদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥'—"নীচ কুল থেকেও স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করতে পারো। নীচ কুলোদ্ভব মানুষকেও পরিচর্য্যা করেও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করতে পারো। এমন কি চণ্ডালকেও পরিচর্য্যায় তুষ্ট করে মোক্ষলাভের পথ শিক্ষা করতে পারো।" যা কিছু ভাল তাই অপরের কাছ থেকে শিখতে পারো। অপরের কাছ থেকে আহরণ করে নিজের মত করে গ্রহণ করো। কিন্তু নিজেকে অন্যতে পরিণত করো না। ভারতীয় জীবন ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ো না। এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভেবো না যে সব ভারতীয়রা যদি অন্য এক জাতির মত পোষাক পরতো, আহারাদি করতো এবং ব্যবহার করতো তাহলেই ভারতের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হতো। তোমরা জানো সামান্য কয়েক বছরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কত শক্ত। ভগবান জানেন কত হাজার হাজার বছরের পুরনো এক

বিশেষ জীবনধারার অভ্যাস তোমার রক্তে প্রবাহিত। তোমরা কি বলতে চাও যে সেই প্রবাহের ধারা যা প্রায় সাগর সঙ্গমে সমাগত তা আবার পশ্চাৎমুখী হয়ে যাত্রা করবে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গের দিকে? তা অসম্ভব। সেই দুরূহ প্রচেষ্টায় তাতে ভাঙ্গন ধরবে। সুতরাং জাতির জীবন-প্রবাহকে তার পথে বইতে দাও; তার গতিপথের সমস্ত বাধাকে অপসরণ করো, গতিপথকে পরিষ্কার করো, সে তখন তার নিজের আবেগেই চলতে থাকবে; তখন জাতির জীবনেও দেখা দেবে কর্মধারা, আসবে প্রগতি।

এইভাবেই দেশের জন্য আধ্যাত্মিক কাজ তোমরা করো এই আমার প্রস্তাব। সময়াভাবে আরও অনেক সব সমস্যার কথা আলোচনা করা সম্ভবপর হবে না। যেমন ধরো 'বর্ণাশ্রম' প্রথা।

আমি সারাজীবন ধরে এই প্রশ্নটিকে নানা দিক থেকে চিন্তা করেছি। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশের এই সমস্যা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। আমি এদেশের প্রায় সব জায়গার মানুষের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত হয়েছি—এর যথার্থ তাৎপর্য আমি চিন্তার আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারিনি। এ নিয়ে যতই পড়েছি এবং ভেবেছি ততই যেন আরও বেশী বিভ্রান্ত হয়েছি। অবশেষে একদিন যেন ক্ষুদ্র একটা আলোক রেখা দেখতে পেলাম এবং এর তাৎপর্য যেন কিছুটা বুঝতে শুরু করলাম। তারপর পানাহার নিয়েও একটা সমস্যা। বাস্তবিকই একটা বিরাট সমস্যা। আমরা সাধারণত যা মনে করি এটা ঠিক ততটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নয়। আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পানাহার নিয়ে যে রকম জোরাজুরি করা হয় সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং শাস্ত্র বহির্গত। অর্থাৎ, সত্যিকারের পবিত্র পানাহারের নিয়মকে বর্জন করে আমরা কষ্ট পাই। আমরা এর প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলেছি।

আরও কয়েকটি সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ করতেই অনেক দেরী হলো, আমিও তোমাদের আরও বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। বর্ণাশ্রম এবং অন্যান্য বিষয়গুলো ভবিষ্যতে অন্য কোন সময় আলোচনা করবো।

আর একটি কথা বলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা আজ শেষ করবো। ভারতবর্ষে বহুদিন থেকেই ধর্ম তার গতি হারিয়েছে। সেই গতিহীন ধর্মে আমরা গতি এনে দিতে চাই। প্রতিটি মানুষের জীবনে ধর্মকে প্রতিফলিত করতে চাই। ধর্ম, আগেও যেমন ছিল এখনও তাকে তাই করতে হবে; রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতম কৃষকের গৃহে প্রবেশ করতে হবে ধর্মকে। জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ ধর্ম, মানুষের জন্মাধিকার, প্রতিটি দেশবাসীর দুয়ারে দুয়ারে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ঈশ্বরের দান বাতাসের মতই সহজলভ্য করে তুলতে হবে ধর্মকে। ভারতে এই হলো আমাদের কাজ। কিন্তু ছোট ছোট ধর্মীয় দল তৈরী করে আর তাদের মতানৈক্য নিয়ে কলহ বিবাদ করে সে কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। যেখানে আমাদের ঐক্য সেইটুকুই প্রচার করি আমরা, মতানৈক্যগুলোকে ছেড়ে দিই। তারা তখন নিজেরাই নিজেদের সামলাবে। আমি ভারতবাসীদের কাছে বার বার বলেছি যে শত শত বৎসরের তমসায় একটি ঘর যদি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সেখানে গিয়ে 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলে

চেঁচালেই কি অন্ধকার দূর হবে? আলো নিয়ে এসো, মুহূর্তে অন্ধকার দূর হবে। মানুষকে রূপান্তরিত করবার এটাই হলো গোপন সূত্র। তাদের কাছে মহত্তর বিষয়ের কথা বলো; প্রথমে মানুষকে বিশ্বাস করো। মানুষকে তার নিকৃষ্টতমরূপে দেখেও কোন অবস্থাতেই আমি মানুষের উপর আস্থা হারাইনি। আমি যখনই মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছি, প্রথম প্রথম উজ্জ্বল সম্ভবনা না দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানীই মনে হোক অথবা মূর্খই মনে হোক, মানুষের প্রতি আস্থা রাখো। তাকে দেবদূতই মনে হোক অথবা শয়তানই মনে হোক—মানুষকে বিশ্বাস করো। প্রথমে মানুষকে বিশ্বাস করো। তারপর তার ভেতর যদি দোষ দেখতে পাও, সে যদি ভুল করে, সে যদি অসংস্কৃত, জঘন্য রীতিনীতি গ্রহণ করে, জেনো সে এসব কোনটাই তার আসল প্রকৃতি থেকে আসেনি, এসেছে উচ্চাদর্শের অভাবে। মানুষ যখন সত্যের সন্ধান পায় না তখনই সে মিথ্যার দিকে চলে। সেই জন্য ভুলকে সংশোধন করবার এক মাত্র পন্থা সত্যকে প্রসারিত করা। তাই করো, তখন তাকে তুলনা করে দেখতে দাও। তুমি তার সামনে সত্যটি শুধু তুলে ধরো, তোমার কাজ সেখানেই শেষ। তাকে তার নিজের মনে তুলনা করতে দাও, এবং তুমি যদি তাকে প্রকৃত সত্যই দিয়ে থাকো, মিথ্যা মুহূর্তে অন্তর্হিত হবে। আলো অন্ধকারকে দূর করে, সত্য মঙ্গলকে পরিস্ফুট করে। তোমরা যদি দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে চাও এই হলো তার পথ। মারামারি নয়। এমনকি তারা যা করছে সেটা যে খারাপ সে কথা বলেও নয়। মঙ্গলকে তার সামনে রাখো। দেখবে কত আগ্রহের সঙ্গে সে তা গ্রহণ করবে। দেখবে মৃত্যুহীন ঐশী শক্তি, মানুষের মধ্যে যিনি নিয়ত বাস করছেন, জাগ্রত হয়ে বেরিয়ে এসে যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু গৌরবময় তার জন্য হাত প্রসারিত করেছেন।

যিনি আমাদের জাতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, যাঁকে বিষ্ণু শিব শক্তি বা গণপতি বলে যে নামেই ডাকা হোক, সগুণ বা নির্গুণ, সাকার বা নিরাকার যে ভাবেই উপাসনা করা হোক, যাঁকে আমাদের পূর্বপুরুষরা জেনে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলে অভিহিত করেছেন—তিনি তাঁর মহান প্রেমসহ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁর কৃপায় আমরা যেন পরস্পরকে বুঝতে পারি, তাঁর কৃপায় যে আমরা প্রকৃত প্রেম ও সত্যানুরাগের সঙ্গে পরস্পরের জন্য কাজ করতে পারি এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান কাজের মধ্যে যেন আমাদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত গৌরব, ব্যক্তিগত স্বার্থ কামনা বিন্দুমাত্র না প্রবেশ করে।

কর্ম ও তার রহস্য

[৪ঠা জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রী, লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত]

আমার জীবনে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলি লাভ করেছি, তার একটি হচ্ছে যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দিতে হবে, তার উপায়গুলির প্রতিও ততটাই দিতে হবে। যাঁর কাছ থেকে আমি এই শিক্ষালাভ করেছি তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর নিজের জীবন ছিল এই মহান নীতির এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই একটি নীতি থেকে আমি সর্বদা বহু মহৎ শিক্ষা লাভ করছি এবং আমার মনে হয় সাফল্যের সব রহস্য এর মধ্যেই আছে—উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ি, লক্ষ্য আমাদের কাছে এত বেশী মনোহর, এত বেশী লোভনীয় হয়—আমাদের মানস-দিগন্তে এত বিরাটভাবে উদিত হয় যে আমরা খুঁটিনাটিগুলি একেবারেই দেখতে পাই না।

কিন্তু যখন ব্যর্থতা আসে, তাকে যদি আমরা সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করি, তবে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখব যে ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে উপায়গুলির প্রতি আমাদের অমনোযোগিতা। উপায়গুলিকে দৃঢ় করা, সম্পূর্ণ করার দিকে উপযুক্ত মনোযোগ দান আমাদের প্রয়োজন। উপায়গুলি ঠিক ঠিক হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি অবশ্যই হবে। আমরা ভুলে যাই যে কারণই কার্য উৎপাদন করে, কার্য নিজে উৎপন্ন হতে পারে না এবং কারণগুলি উপযুক্ত, শক্তিশালী ও ঠিক না হলে কার্য উৎপন্ন হবে না। একবার আদর্শ নির্বাচিত ও উপায়গুলি নির্ধারিত হলে আমরা আদর্শের কথা ভাবা প্রায় ছেড়ে দিতে পারি, কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করতে পারলে আদর্শ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। যখন কারণটি ঠিক আছে, তখন কার্য সম্বন্ধে আর কোন অসুবিধা হবে না, কার্য অবশ্যই হবে। যদি আমরা কারণ সম্বন্ধে যত্নবান হই, তাহলে কার্য নিজেই নিজের যত্ন নেবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য, উপায়গুলি কারণ। অতএব উপায়ের প্রতি মনোযোগ দানই জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য। আমরা গীতাতেও এটি পড়ে থাকি এবং সেখান থেকে শিক্ষা পাই যে আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হবে, যে কোন কাজই আমরা করি না কেন সেই কাজে সমস্ত মনটা ঢেলে দিতে হবে। সেই সঙ্গে আমরা যেন কাজে আসক্ত হয়ে না পড়ি। তার মানে, কোন কিছুর ফলে আমরা যেন কাজ ছেড়ে সরে না পড়ি, অথচ ইচ্ছামাত্রেই আমরা যেন সেই কর্মত্যাগে সক্ষম হই।

যদি আমরা নিজেদের জীবন বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই যে,—আমরা কোন কাজ গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, হয়তো তা বিফল হলো, তবুও আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি সেটা আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, এটিকে আরও আঁকড়ে ধরে

থাকা শুধুমাত্র আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত করবে, তবু আমরা সেটি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। মৌমাছি মধু খেতে এল, কিন্তু মধুভাণ্ডে তার পা আটকে গেল, সে আর পালাতে পারল না। বার বার আমরা নিজেদের এই রকম অবস্থার মধ্যে দেখি। এই হচ্ছে সারা জীবনের রহস্য। কেন আমরা এখানে এসেছি? আমরা এখানে মধু খেতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি আমাদের হাত পা এতে আটকে গেছে। আমরা ধরতে এসে ধরা পড়ে গেছি। আমরা ভোগ করতে এসে ভুক্ত হয়েছি। শাসন করতে এসেছিলাম, কিন্তু আমরাই শাসিত হচ্ছি। আমরা কাজ করতে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সব সময় আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জীবনের প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপারে এমনিই ঘটছে। অপরের মনের দ্বারা আমরা চালিত হচ্ছি এবং অপরের মনকে চালিত করার জন্য আমরা সর্বদা সংগ্রাম করছি। আমরা জীবনে সুখ উপভোগ করতে চাই, কিন্তু সেগুলি আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় করে ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতির কাছ থেকে সবকিছু পেতে, কিন্তু পরিণামে দেখতে পাই প্রকৃতিই আমাদের কাছ থেকে সব কিছু হরণ করে নেয়, আমাদের নিঃস্ব করে ফেলে দেয়।

যদি এমন না হতো তাহলে জীবন আনন্দের সূর্যকরোজ্জ্বল হয়ে উঠত। পরোয়া করো না। সব কিছু সফলতা-বিফলতা, সব কিছু সুখ-দুঃখ সত্ত্বেও জীবন আমাদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, যদি না আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

দুঃখের একটি কারণ হচ্ছে এই—আমরা আসক্ত, আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাই গীতা বলেছে—নিয়ত কর্ম কর, কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত হয়ো না; কর্মে আবদ্ধ হয়ো না! প্রতিটি বিষয় হতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করার শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখ, সে বস্তু যতই প্রিয় হোক না কেন, তার জন্য মন যতই ব্যাকুল হোক না কেন, তা ত্যাগ করতে হলে যতই বেদনা অনুভব কর না কেন, সব সত্ত্বেও যখন ইচ্ছা তাকে পরিত্যাগ করার মতো শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখ। এই জীবনে বা অন্য কোন জীবনে দুর্বলের কোন স্থান নেই। দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার মানসিক ও শারীরিক দুঃখ আনে। দুর্বলতাই মৃত্যু। শত সহস্র জীবাণু আমাদের চারদিকে রয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না যতক্ষণ না আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি, যতক্ষণ না আমাদের দেহ সেগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারধারে ভেসে বেড়াচ্ছে। গ্রাহ্য করো না। যতক্ষণ না মন দুর্বল হচ্ছে, সেগুলি আমাদের কাছে আসতে সাহস করে না, আমাদের কবলিত করার কোন শক্তি তাদের নেই। এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সত্য—শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই আনন্দ, চিরন্তন জীবন, অমরত্ব; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

বর্তমানে আমাদের যাবতীয় সুখের উৎস হচ্ছে আসক্তি। আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আসক্ত, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আসক্ত, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্মের প্রতি আসক্ত, যাবতীয় বাহ্যবস্তুতে আসক্ত, যাতে সেগুলি থেকে

আনন্দ লাভ করি। আবার এই আসক্তি ছাড়া আর কী আমাদের দুঃখ দিতে পারে? প্রকৃত আনন্দ পেতে হলে আমাদের অনাসক্ত হতে হবে। ইচ্ছামাত্র অনাসক্ত হবার শক্তি আমাদের থাকলে তবে আর কোন দুঃখ থাকত না। শুধু সেই মানুষই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ-লাভে সক্ষম, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে কোন বস্তুতে আসক্ত হবার অধিকারী, আবার প্রয়োজনকালে তাতে অনাসক্ত হবার শক্তিও রাখেন। মুশকিল এই যে যতটুকু আসক্ত হবার ক্ষমতা থাকা দরকার, ততটুকু অনাসক্ত হবার ক্ষমতা থাকাও দরকার। কিছু লোক আছে যারা কখনও কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয় না। তারা কখনও ভালবাসতে পারে না, তারা কঠিনহৃদয় ও উদাসীন। তারা জীবনের অধিকাংশ দুঃখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাত পায় না; কিন্তু সেটা দেওয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। দেওয়াল হওয়ার চেয়ে আসক্ত হয়ে আবদ্ধ হওয়া নিশ্চয় ভাল। তাই যে কখনও ভালবাসে না, যে কঠিন ও প্রস্তরবৎ, জীবনের অধিকাংশ দুঃখের থেকে পালাতে গিয়ে সে আনন্দের থেকেও পালিয়ে যায়। আমরা তা চাই না। এ দুর্বলতা, এ মৃত্যু। যে হৃদয় কখনও দুর্বলতা অনুভব করে না, কখনও দুঃখবোধ করে না, সে জাগ্রত হয়নি। সে জড় অবস্থায়। আমরা সে অবস্থা চাই না।

সেই সঙ্গে শুধু প্রেমের এই বিরাট শক্তি—আসক্তির এই প্রবল শক্তি, একটিমাত্র বস্তুর উপর আমাদের মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার শক্তি—নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলা, নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া অপরের জন্য—যা হচ্ছে দেবতাদের শক্তি, তা কিন্তু আমাদের কাম্য নয়; বরং আমরা চাই দেবতাদের চেয়েও মহত্তর হতে। পূর্ণ মানব প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমস্ত চিত্ত নিয়োজিত করতে পারলেও তবু অনাসক্তই থাকেন। এটা কী করে হয়? এই একটি রহস্য আমাদের শিখতে হবে।

ভিখারী কখনও সুখী হয় না। ভিখারী শুধু করুণা ও ঘৃণা-মিশ্রিত ভিক্ষাই পায়, অন্তত দানের পিছনে এই মনোভাব থাকে যে ভিখারী এক নীচ ব্যক্তি। যা সে পায় তা কখনও প্রকৃত উপভোগ করতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিখারী। আমরা যা কিছু করি তার প্রতিদান কামনা করি। আমরা ব্যবসায়ী। আমরা জীবন নিয়ে ব্যাবসা করি, পুণ্য নিয়ে ব্যাবসা করি, ধর্ম নিয়ে ব্যাবসা করি। হায়, আমরা প্রেম নিয়েও ব্যাবসা করি!

যদি তোমরা ব্যাবসা করতে এসে থাক, যদি আদান-প্রদানের প্রশ্ন, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রশ্নই বড় হয়ে থাকে, তাহলে বেচা-কেনার নিয়ম মেনে চল। ব্যাবসার ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, দামের ওঠা-নামা আছে, সব সময় আঘাতের আশঙ্কাও আছে। ব্যাপারটা যেন আয়নায় মুখ দেখার মতন। তোমার মুখ প্রতিবিম্বিত হলো; তুমি ভেংচি কাট, আয়নায় ভেংচি কাটা দেখবে; তুমি যদি হাস, আয়নাও হাসবে। এই হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়, এই হচ্ছে আদান-প্রদান।

আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি কি ভাবে? যা দিই তার দ্বারা নয়, যা প্রত্যাশা করি তার দ্বারাই। ভালবাসার প্রতিদানে পাই দুঃখ, ভালবাসি বলেই আমরা দুঃখ

পাই না, প্রতিদানে ভালবাসা চাই বলেই দুঃখ পাই। এই কামনা যেখানে নেই, সেখানে দুঃখ থাকে না। বাসনা কামনা হচ্ছে সকল দুঃখের কারণ। সফলতা ও বিফলতার নিয়মে সকল বাসনাই আবদ্ধ। বাসনা অবশ্যই দুঃখ আনবে।

প্রকৃত সাফল্যের, প্রকৃত সুখের সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে এই—যিনি কোন প্রতিদান কামনা করেন না, যিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, তিনিই সবচেয়ে কৃতী পুরুষ। কথাটা হেঁয়ালি বলে বোধ হবে। আমরা কি জানি না যে প্রত্যেক নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাত পান? আপাতভাবে হ্যাঁ। 'খ্রীষ্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তবু তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন'। সত্য কথা, কিন্তু আমরা জানি যে, এক মহান বিজয়ের—কোটি কোটি জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের আশীর্বাদধন্য করার কারণ হচ্ছে তাঁর ওই নিঃস্বার্থপরতা।

কিছু কামনা করো না। প্রতিদানে কিছু চেয়ো না। যা তোমার দেবার আছে দাও,—তা তোমার কাছেই ফিরে আসবে—কিন্তু সে বিষয় এখন ভেব না। হাজার গুণ বেড়ে তা ফিরে আসবে, কিন্তু তার উপর এখন মনোযোগ দিও না। দানের শক্তি লাভ কর, দাও,—ব্যস, সেখানেই শেষ। শেষ দান করার জন্যেই এই জীবন, প্রকৃতি তোমায় দান করতে বাধ্য করবে। তাই স্বেচ্ছায় দান কর। শিগ্‌গির হোক বা দেরিতে হোক তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। তুমি এই সংসারে এসেছ সঞ্চয় করতে। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তুমি গ্রহণ করতে চাও। কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপে তোমার হাত খুলতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাক বা না থাক, তোমাকে দিতেই হবে। যে মুহূর্তে তুমি বল, 'আমি দেব না', অমনি আঘাত আসে, তুমি দুঃখ পাও। এমন কেউ নেই যে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হবে না। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী লড়াই করবে, সে তত বেশী দুঃখ বোধ করবে। আমরা ত্যাগ করতে সাহস করি না বলে, প্রকৃতির এই বিরাট দাবি যথেষ্ট নম্রতার সঙ্গে স্বীকার করি না বলেই আমরা দুঃখ পাই। অরণ্য লোপ পেয়ে গেলে প্রতিদানে আমরা সূর্যের উত্তাপ পাই। সূর্য সমুদ্র থেকে জল শোষণ করে বৃষ্টিধারায় প্রত্যর্পণ করে। তুমি হচ্ছ আদান-প্রদানের এক যন্ত্র, তুমি গ্রহণ কর প্রত্যর্পণ করার জন্যই। কাজেই প্রতিদানে কিছু চেও না, যতই দান করবে, ততই তোমার কাছে ফিরে আসবে। যত শীঘ্র তুমি এই ঘরটি বায়ুশূন্য করবে, তত শীঘ্রই এটি বাইরের বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠবে। যদি তুমি সমস্ত দরজা-জানলার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দাও, ভেতরের বাতাস ভেতরেই থেকে যাবে, বাইরের বাতাস আর আসবে না ; ফলে ভেতরের বদ্ধ বাতাস দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠবে। নদী অবিরাম সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করছে এবং অবিরাম পূর্ণ হয়ে উঠছে। সাগরের মধ্যে নদীর গমন রুদ্ধ করো না ; যে মুহূর্তে তুমি এটি করবে, সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কবলিত হবে।

তাই ভিক্ষুক হয়ো না; অনাসক্ত হও! এটিই জীবনের সবচেয়ে দুষ্কর কর্ম! এই পথের বিপদ নির্ণয় করতে পারবে না। এমনকি বুদ্ধির সাহায্যে বাধাবিঘ্নগুলি বুঝলেও, সেগুলি যতক্ষণ না অনুভব করা যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা ঠিকমতো জানতে

পারি না। দূর থেকে এক উদ্যানের সাধারণ দৃশ্য আমরা দেখতে পারি। কিন্তু তাতে কী হয়? যখন আমরা সেই উদ্যানের মধ্যে যাই, তখনই আমরা তাকে অনুভব করি ও যথার্থভাবে জানতে পারি। যদিও আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং আমরা মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তা সত্ত্বেও এইসব বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের হৃদয়কে সতেজ রাখতে হবে,—এই সব বাধাবিঘ্নের মধ্যে আমাদের দেবত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রকৃতি চায় আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বদলে আঘাত করি, প্রতারণার বদলে প্রতারণা, মিথ্যার বদলে মিথ্যা, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাঘাত। তাই প্রয়োজন হয় দিব্যশক্তির যাতে আঘাতের বদলে আঘাত না করি, নিজেকে সংযত করি, অনাসক্ত হই।

প্রতিদিন নতুনভাবে আমরা অনাসক্ত থাকার সঙ্কল্প করি। আমরা আমাদের অতীতের ভালবাসা ও আসক্তির বস্তুগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং অনুভব করি তাদের প্রত্যেকটি আমাদের কীভাবে দুঃখগ্রস্ত করেছে। আমাদের 'ভালবাসা'র জন্যই আমরা নৈরাশ্যের অতলে চলে গিয়েছি। আমরা অন্যের হাতে ক্রীতদাসরূপে নিজেদের দেখেছি, আমাদের নীচের থেকে আরও নীচে টেনে নামানো হয়েছে। আবার আমরা নতুনভাবে সঙ্কল্প করি,—'এখন থেকে আমি নিজেই নিজের প্রভু হবো। এখন থেকে আমি নিজের উপর কর্তৃত্ব করব।' কিন্তু কার্যকালে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। আবার জীব বদ্ধ হয়ে পড়ে, মুক্ত হতে পারে না। পাখি জালে আবদ্ধ, ডানা ঝাপটে ছটফট করে। এই তো আমাদের জীবন।

আমি জানি বাধাবিঘ্নগুলি। সেগুলি প্রচণ্ড, আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে আমরা প্রায়ই নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ি; আন্তরিকতা, প্রেম এবং যা কিছু উদার ও মহৎ তাতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে সব মানুষ তাদের জীবনের তরুণ অবস্থায় দয়ালু, ক্ষমাশীল, সরল, অকপট ছিলেন, তাঁরা বৃদ্ধাবস্থায় মিথ্যার মুখোশধারী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মন হচ্ছে জটিলতার স্তূপ। হয়তো তাঁদের মধ্যে অনেকটা বাহ্যিক কৌশল থাকতে পারে। তাঁরা উগ্র-মস্তিষ্ক নন, বেশি কথা বলেন না, কিন্তু বললে বরং ভাল ছিল; তাঁদের হৃদয় বলে কিছু নেই, তাই তাঁরা কথা বলেন না। তাঁরা রাগ করেন না, অভিশাপ দেন না, কিন্তু রাগলে বরং ভাল হতো, অভিশাপ দিতে সক্ষম হলে আরও হাজারগুণ ভাল হতো। তারা পারে না। তাদের হৃদয়বৃত্তি মৃত, মৃত্যুর শীতল স্পর্শ সেখানে পৌঁছেছে, সেটি আর কোন কাজ করতে পারে না, এমন কি অভিশাপ দিতে, একটি কঠিন কথা বলতেও পারে না।

এ সব আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। তাই আমি বলি, আমাদের ঐশী শক্তির দরকার। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। একমাত্র ঐশী শক্তিই উপায়, মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র তার সাহায্যেই আমরা এইসব জটিলতা অতিক্রম করতে পারি, অক্ষত দেহে অজস্র দুঃখের ধারা পার হতে পারি। আমরা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে পারি, শতধা বিদীর্ণ হতে পারি, তবু আমাদের হৃদয় সর্বদা মহৎ থেকে মহত্তর হয়ে উঠবে।

এটি খুবই কঠিন। কিন্তু এই কঠিনতা নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আমরা জয় করতে পারি। আমাদের শিখতে হবে যে, আমাদের কোন কিছুই হবে না যতক্ষণ না আমরা সেটির উপযুক্ত হচ্ছি। আমি একটু আগেই বলেছি, কোন রোগ আমার কাছে আসতে পারে না যতক্ষণ না আমার দেহ তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে; রোগ কেবলমাত্র জীবাণুর উপর নির্ভর করে না, দেহমধ্যস্থ রোগ-প্রবণতার উপরও কিছুটা নির্ভরশীল। যেটি আমরা পাবার যোগ্য শুধু সেটাই পেয়ে থাকি। আমরা গর্ব ত্যাগ করে এটাই যেন উপলব্ধি করি যে, দুঃখ পাবার যোগ্য না হলে তা লাভ হয় না। কোন আঘাতই কখনও অকারণে আসে না। কখনও এমন কিছু অমঙ্গলের আগমন হয় না যার আসার পথ আমি নিজের হাতে তৈরি করিনি। এটা আমাদের জানা উচিত। নিজেকে বিশ্লেষণ কর এবং তুমি দেখবে যে প্রতিটি আঘাত যা তুমি পেয়েছ, তার জন্যে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলে বলেই এসেছিল। তুমি করেছ অর্ধেক প্রস্তুতি, বহির্জগৎ করেছে বাকি অর্ধেক। এই ভাবেই আঘাত এসেছিল। এই উপলব্ধিই আমাদের শান্ত করবে। সেই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ থেকে এক আশার বাণী আসবে, সেই আশার বাণী হচ্ছে—'বহির্জগতের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু যা আমার ভেতরে, আমার নিকটে, আমার নিজস্ব জগৎ, তা আমার নিয়ন্ত্রণে। যদি জীবনে ব্যর্থতার জন্য দুটির একত্রে প্রয়োজন হয়, যদি আমাকে আঘাত করার জন্যে উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহলে আমার অধীনে যেটি আছে সেটি আমি দেব না। তাহলে সেক্ষেত্রে কেমন করে আঘাত আসতে পারে? যদি আমি নিজেকে প্রকৃতই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে আঘাত কখনই আসবে না।'

শৈশবকাল থেকে আমরা সর্বদাই আমাদের বাইরের কোন কিছুর উপর দোষারোপ করার চেষ্টা করে আসছি। আমরা সর্বদাই অন্য লোকদের সংশোধন করার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেদের নয়। দুর্দশায় পড়লে আমরা বলি, 'ও, এ জগৎটা শয়তানের জগৎ।' আমরা অন্যদের গাল দিয়ে বলি, 'কি মোহাচ্ছন্ন মূর্খ!' কিন্তু আমরা নিজেরা যদি প্রকৃতই-এত ভাল হই, তবে এমন জগতে কেন আমরা আছি? যদি এ জগৎ শয়তানের রাজ্য হয়, তবে আমরাও নিশ্চয় শয়তান। নইলে কেন আমরা এখানে থাকব? 'ও, এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর!' খুব সত্যি; কিন্তু যদি আমরা তাদের চেয়ে ভাল হই, তাহলে তাদের মধ্যে আমাদের কেন দেখা যাবে? এটা একটু ভেবে দেখ!

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, শুধু সেটুকুই আমরা পেয়ে থাকি। আমরা যখন বলি জগৎ মন্দ আর আমরা ভাল, সেটা মিথ্যা কথা। এটা কখনই হতে পারে না। এই নিদারুণ মিথ্যা কথা আমরা নিজেদের বলে থাকি।

সর্বাগ্রে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এইটি—বাইরের কোন কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে বা কোন ব্যক্তির উপর দোষারোপ না করতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, সোজা হয়ে দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখবে এটাই সব সময়ে সত্যি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর!

এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখনও কখনও নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমরা বহু কথা বলি, নিজেদের দেবত্ব জাহির করি—আমরা সব কিছু জানি, সব কিছু করতে পারি, আমরা সর্বদোষশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, আবার পরমুহূর্তে একটা ছোট পাথর আমাদের আঘাত দেয়, কোন সাধারণ লোকের সামান্য রাগ আমাদের আহত করে—রাস্তার যে কোনও একটা মূর্খও 'এই দেবতাদের' দুঃখগ্রস্ত করে তোলে। যদি আমরা সত্যিই দেবতাস্বরূপ হতাম, তাহলে কি এমন হতো? জগৎকে দোষ দেওয়া কি ঠিক? ঈশ্বর—যিনি পবিত্রতম, মহত্তম, তিনি কি আমাদের কোন ছলচাতুরিতে দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারেন? যদি তোমরা যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহলে তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন জগৎ তোমাদের আঘাত দিতে পারে? তোমরা অক্ষতভাবে সপ্ত নরক পরিক্রমা করতে পার, কিছুই তোমাদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ কর, বহির্জগতের উপর দোষারোপ কর—তাতেই প্রমাণিত হয় তোমরা বহির্জগৎকে অনুভব কর, তোমাদের এই অনুভূতিই প্রমাণ করে যে মহত্ত্ব তোমরা দাবি কর, তা তোমরা নও। দুঃখের উপর দুঃখ জড় করে, বহির্জগৎ তোমাদের আঘাত হানছে কল্পনা করে, 'ও, এটা শয়তানের জগৎ! এই লোকটা আমায় আঘাত করছে, ওই লোকটা আমায় আঘাত করছে!' ইত্যাদি চিৎকার করে তোমরা শুধু নিজেদের অপরাধকেই বড় করে তুলছ। দুর্দশার সঙ্গে মিথ্যাকে যুক্ত করছ।

আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে—এটুকু আমরা পারি, এবং কিছুকালের জন্য অন্যের প্রতি মনোযোগ বন্ধ করতে হবে। উপায়গুলিকে নিখুঁত করে তুলতে হবে, লক্ষ্য তাহলে নিজেই নিজের দায়িত্ব নেবে। যদি আমাদের জীবন সৎ ও পবিত্র হয়, তাহলেই শুধু জগৎ পবিত্র ও সৎ হতে পারে। জগৎ কার্যস্বরূপ, আর আমরা কারণস্বরূপ। অতএব আমাদের নিজেদের পবিত্র করে তোলা যাক, নিখুঁত করে তোলা যাক।

মনের শক্তি

[৮ই জানুয়ারি ১৯০০ খ্রী, লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত]

পৃথিবীর সব জায়গাতেই সব যুগে অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে। আমরা সকলেই অসাধারণ ঘটনার কথা শুনেছি এবং আমাদের অনেকেরই এ বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। আজকের বিষয়টির প্রস্তাবনারূপে আমি বরং তোমাদের কাছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কয়েকটি ঘটনা বলব। একবার একটি লোকের কথা শুনেছিলাম, তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন মনে ভেবে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিতেন। আরও শুনেছিলাম তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। আমি কৌতূহলী হয়ে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই মনে মনে কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখলাম এবং পাছে ভুল হয় সেজন্য প্রশ্নগুলি কাগজে লিখে আমাদের পকেটে রাখলাম। আমাদের এক-একজনের সঙ্গে লোকটির সাক্ষাৎ হতেই তিনি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে উত্তর বলে দিতে লাগলেন। তারপর তিনি এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে ভাঁজ করে আমায় তার উল্টো পিঠে নাম সই করতে অনুরোধ করে বললেন, 'এটা দেখবেন না, পকেটে রেখে দিন; যখন আমি এটা চাইব তখন আবার বের করবেন।' আমাদের সকলের সঙ্গে এই একইরকম করলেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যা ঘটবে, এমন কিছু ঘটনা বলে দিলেন। তারপর বললেন, 'এবার আপনাদের যে ভাষায় খুশি কোন শব্দ বা কথা ভাবুন!' তাঁর সম্পূর্ণ অজানা সংস্কৃত ভাষায় আমি এক প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে চিন্তা করলাম। তিনি বললেন, 'এখন আপনার পকেট থেকে কাগজটা বের করুন!' সেই সংস্কৃত বাক্যটি কাগজে লেখা রয়েছে! একঘণ্টা আগে তিনি সেটি লিখে নীচে মন্তব্য করেছেন, 'যা লিখে রাখলাম এই ব্যক্তিটি পরে সেই কথাই ভাববেন।' ঠিক তাই হলো! আমাদের আর একজনকেও ঠিক ওই ধরনের কাগজ দিয়ে সই করে পকেটে রাখতে বলা হয়েছিল। তাঁকেও একটি কথা চিন্তা করতে বলা হয়েছিল। তিনি আরবী ভাষায় একটি বাক্য চিন্তা করেছিলেন, যা ওই লোকটির পক্ষে জানার সম্ভাবনা আরও কম। বাক্যটি ছিল কোরানের কোন অংশ। আমার বন্ধুটি দেখলেন যে সেই বাক্যটিই কাগজে লেখা হয়েছে।

আমাদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি জার্মান ভাষায় লেখা এক ডাক্তারী বইয়ের একটি বাক্য চিন্তা করেছিলেন। তাঁর কাগজে সেটি লিখিত ছিল।

সেদিন হয়তো কোন রকমে প্রতারিত হয়েছি ভেবে কয়েকদিন পরে আমি সেই লোকটির কাছে আবার গেলাম। এবার আমার সঙ্গে অন্য একদল বন্ধু ছিলেন এবং এবারও তিনি আশ্চর্যজনক সাফল্যের পরিচয় দিলেন।

আর একবার ভারতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় আমাকে এক ব্রাহ্মণের কথা বলা হলো, যিনি নানা বস্তু বের করে দিতে পারেন এবং সেগুলি যে কোথা থেকে

আসে তা কেউ জানে না। এই ব্যক্তি সেখানে ব্যাবসা করেন এবং বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমি তাঁকে আমায় তাঁর কৌশল দেখাতে বললাম। ঘটনাচক্রে তখন তাঁর জ্বর হয়েছিল। ভারতবর্ষে এক সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, যদি কোন সাধু অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তাহলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণটি আমার কাছে এসে বললেন, 'মহাশয়, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিন যাতে আমার জ্বর সেরে যায়।'

আমি বললাম, 'ভাল কথা, তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাতে হবে।'

তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর ইচ্ছামতো আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। পরে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এসেছিলেন।

তাঁর কোমরে শুধু একফালি কাপড় জড়ানো ছিল ; তাঁর সব পোশাক আমরা খুলে নিয়েছিলাম। আমার কাছে যে কম্বল ছিল সেটা তাঁকে গায়ে জড়ানোর জন্য দিলাম, কারণ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। ঘরের এক কোণে তাঁকে বসানো হলো। পঁচিশ জোড়া চোখ তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল।

তিনি বললেন, 'এবার যা কিছু আপনারা চান তা কাগজে লিখে ফেলুন !'

আমরা এমন সব ফলের নাম লিখলাম যা সেই দেশে জন্মায় না—আঙুর, কমলালেবু ইত্যাদি ধরনের। লেখা কাগজের টুকরোগুলি আমরা তাঁকে দিলাম। তারপর তাঁর কম্বলের ভেতর থেকে বের হতে লাগল আঙুরের থোলো, কমলালেবু ইত্যাদি। এত ফল বের হলো যে সব ওজন করলে মানুষটির ওজনের দ্বিগুণ হবে। তিনি আমাদের ফলগুলি খেতে বললেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি জানাল এটাকে সম্মোহনের ব্যাপার ভেবে। কিন্তু তিনি নিজেও খাওয়া শুরু করলেন, তাই দেখে আমরাও খেলাম। সেগুলি আসল ফলই ছিল।

সব শেষে তিনি একরাশ গোলাপফুল বের করলেন। প্রতিটি ফুলই নিখুঁত, পাপড়ির উপর শিশিরবিন্দু সমেত, একটিও থেঁতলানো নয়, একটিও নষ্ট হয়নি। একবারে রাশি রাশি ফুল !

লোকটির কাছ থেকে এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা যখন চাইলাম. তিনি বললেন, 'সব হাত-সাফাইয়ের ব্যাপার।'

ওটি যাই হোক না কেন, বোঝা গেল শুধুমাত্র হাত-সাফাইয়ের দ্বারা এ কাজ অসম্ভব। কোথা থেকে এমন বিপুল পরিমাণের জিনিস তিনি আনলেন ?

এ ধরনের বহু ঘটনা আমি দেখেছি। ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ালে এমনধারা শত শত ঘটনা তোমরা নানা জায়গায় দেখতে পাবে। প্রত্যেক দেশেই এ সব আছে। এমন কি এদেশেও এমন ধরনের কিছু আশ্চর্য ঘটনা তোমরা দেখতে পাবে। অবশ্য বেশ কিছু বুজরুকি নিঃসন্দেহে আছে, কিন্তু তাহলেও কোন প্রতারণা দেখলে এ কথাও তো তোমায় বলতে হবে যে প্রতারণা হচ্ছে কোন কিছুর অনুকরণ। কোথাও না কোথাও সত্য নিশ্চয় কিছু আছে, যার অনুকরণ করা হচ্ছে। যা নেই তার অনুকরণ করা যায় না। অনুকরণ করার জন্য প্রকৃত সত্য কিছু নিশ্চয় থাকা দরকার।

অতি প্রাচীন কালে—হাজার হাজার বছর আগে—ভারতে এমন সব ঘটনা আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী ঘটত। আমার মনে হয় যখন কোন দেশে লোক-বসতি খুব বেশি ঘন হয়ে ওঠে তখন আধ্যাত্মিক শক্তি (psychical power) হ্রাস পায়। কোন বিশাল দেশে লোক-বসতি খুব ক্ষীণ হলে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভবত বৃদ্ধি পায়। হিন্দুদের মন বিশ্লেষণপ্রবণ বলে এইসব ঘটনাগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেছিল। তারা কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, অর্থাৎ এই নিয়ে তারা একটি বিজ্ঞান গড়ে তুলেছিল। তারা দেখেছিল এইসব ঘটনা অসাধারণ হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়, অতি-প্রাকৃতিক কিছুই নেই। জড়জগতের অন্যান্য ঘটনার মতোই এগুলিও নিয়মের অধীন। কোন মানুষ এইরূপ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এগুলি নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা যায়, সাধন করা যায় এবং শক্তিগুলি অর্জন করা যায়। এই বিজ্ঞানকে তারা নাম দেয় রাজযোগ বিজ্ঞান। হাজার হাজার লোক আছে যারা এই বিজ্ঞানের চর্চা করে, সমস্ত জাতির পক্ষে এটি নিত্য উপাসনার অঙ্গ হয়ে গেছে।

হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এইসব অসাধারণ শক্তি মানুষের মনের মধ্যেই নিহিত আছে। এই মন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিরাট মনের অংশ। প্রত্যেক মনের সঙ্গে অপরাপর মনের সংযোগ আছে। প্রতিটি মন যেখানেই থাকুক না কেন গোটা বিশ্বের সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে।

চিন্তা-প্রেরণরূপে যে ঘটনা আছে তা তোমরা কখনও লক্ষ্য করেছ কি? এখানে কেউ কিছু চিন্তা করছে, সেই চিন্তাটি অন্য কোথাও অন্য কারও মনে স্পষ্ট ভেসে উঠল। উপযুক্ত প্রস্তুতি সহকারে—আকস্মিক ঘটনাক্রমে নয়—একজন দূরবর্তী একজনের মনে কোন চিন্তা পাঠাতে চাইল, অন্য মানুষটির মন জানে একটি চিন্তা আসছে, সে সেটি গ্রহণ করল ঠিক যে ভাবে পাঠানো হয়েছে সেই ভাবেই। দূরত্বের জন্যে কোন প্রভেদ হয় না। চিন্তাটি লোকটির কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং সে সেটি বুঝতে পারে। যদি তোমার মন এক স্বতন্ত্র বস্তুরূপে এখানে থাকে এবং আমার মন এক স্বতন্ত্র বস্তুরূপে ওখানে থাকে এবং এ দুয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহলে আমার চিন্তা তোমার কাছে কি করে পৌঁছানো সম্ভব? সাধারণ ক্ষেত্রে আমার চিন্তা সরাসরি তোমার কাছে পৌঁছায় না। আমার চিন্তাগুলিকে 'ঈথারে'র স্পন্দনে পরিণত হতে হবে এবং সেই ঈথার স্পন্দনগুলি তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছালে সেগুলিকে আবার তোমার নিজের চিন্তায় পরিণত করতে হবে। এখানে চিন্তাকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে আর ওখানে চিন্তাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এটা পরোক্ষ ঘোরানো প্রক্রিয়া। কিন্তু টেলিপ্যাথি বা ইচ্ছার সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ ব্যাপারে তা করতে হয় না, সেটি সোজাসুজি যোগাযোগ।

এটা প্রমাণ করে যে, যোগীরা যেমন বলেন মন তেমনি নিরবচ্ছিন্ন। মন বিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট এইসব মন সেই বিশ্ব-মনের অংশ বিশেষ, একই

সমুদ্রের ছোট ছোট তরঙ্গ ; আর মনের এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই আমরা আমাদের চিন্তা পরস্পরের কাছে সোজাসুজি পাঠাতে পারি।

আমাদের চারধারে কী ঘটছে তোমরা দেখ। জগৎ জুড়ে এক প্রভাব বিস্তারের ব্যাপার চলছে। আমাদের শক্তির কিছু অংশ ব্যয় হয় আমাদের নিজেদের দেহটিকে রক্ষা করার কাজে। তা বাদে বাকি শক্তির প্রতিটি কণা দিবারাত্র ব্যয় হচ্ছে অপরকে প্রভাবান্বিত করার কাজে। আমাদের দেহ, আমাদের গুণ, আমাদের বুদ্ধি ও আমাদের আধ্যাত্মিকতা—এ সবই ক্রমাগত অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। অপরদিকে আবার আমরাও এইভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছি। আমাদের চারদিকে এই ব্যাপারই চলছে। এখন একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। কেউ একজন এলেন, তুমি জান তিনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর ভাষা খুব সুন্দর এবং তিনি ঘণ্টা-খানেক তোমার সঙ্গে কথা বললেন; কিন্তু তিনি তোমার মনে কোন রেখাপাত করলেন না। তারপর আর একজন মানুষ এলেন, তিনি মাত্র কয়েকটি কথা বললেন। তাঁর বাক্য সুসংবদ্ধ নয়, হয়তো ব্যাকরণের ভুলও আছে। সে সব সত্ত্বেও তিনি তোমার মনে গভীর রেখাপাত করলেন। তোমরা অনেকেই এ রকম ঘটনা দেখে থাকবে। তাহলে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে শুধু কথা সব সময় মনে দাগ কাটতে পারে না। কথা, এমন কি চিন্তা পর্যন্ত লোকের মনে ছাপ দেবার ব্যাপারে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র কাজ করে, বাকি দু-ভাগ করে মানুষটি। তোমরা যাকে ব্যক্তিগত আকর্ষণ বল, সেটিই তোমাদের প্রভাবিত করে।

আমাদের পরিবারগুলিতে একজন কর্তা থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সার্থক হন, আবার কেউ হন না। কেন? আমরা ব্যর্থ হলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাই। যে মুহূর্তে আমি অকৃতকার্য হই, অমনি বলি অমুকই হচ্ছে এই বিফলতার কারণ। বিফলতার সময় কেউ নিজের দোষ বা দুর্বলতা স্বীকার করতে চায় না। প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে আর দোষটা চাপাতে চায় অন্য কারও ঘাড়ে বা অন্য কিছুর উপর, না হয়তো দুর্ভাগ্যের উপর। পরিবারের কর্তা যখন বিফল হন তখন তাঁদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত কেন কেউ কেউ বেশ ভালভাবে সংসার চালাতে পারে আবার অপরেরা পারে না কেন? তখন তুমি দেখবে যে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে মানুষটি নিজেই—তাঁর উপস্থিতি, তাঁর ব্যক্তিত্ব।

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের প্রসঙ্গে আমরা সর্বদা দেখি যে, মানুষটির ব্যক্তিত্বই তাঁকে গণ্য করে তুলেছিল। অতীতের বড় লোকদের, বড় চিন্তাবিদদের কথাই ধর। সত্যি কথা বলতে গেলে কটা চিন্তাই বা তাঁরা করেছেন? মানবজাতির প্রাচীন নেতারা আমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখে গেছেন, তার প্রতিটি গ্রন্থের কথাই ভাব, সেগুলির মূল্য নিরূপণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যত যথার্থ চিন্তার—নূতন ও খাঁটি চিন্তার উদ্ভব হয়েছে তার পরিমাণ মুষ্টিমেয় মাত্র। আমাদের জন্য যে সব চিন্তা তাঁরা তাঁদের বইয়ে রেখে গেছেন সেগুলি পড়ে দেখ। লেখকরা আমাদের কাছে বিরাট পুরুষ বলে মনে হয় না, অথচ আমরা জানি তাঁরা তাঁদের কালে বিরাট পুরুষই ছিলেন। কী তাঁদের বিরাট করেছিল? শুধুমাত্র তাঁদের চিন্তা, তাঁদের রচিত

গ্রন্থ, তাঁদের প্রদত্ত ভাষণের জন্য তাঁরা বিরাট পুরুষ হননি, এ সব ছাড়া অন্য কিছু ছিল যা এখন নেই। সেটি হচ্ছে তাঁদের ব্যক্তিত্ব। আমি আগেই যে মন্তব্য করেছি,—মানুষটির ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তিন ভাগের দু ভাগ, আর তাঁর বুদ্ধি, তার বাক্য হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ। আমাদের মধ্যে আসল মানুষটি, মানুষের ব্যক্তিত্বটিই কাজ করে। আমাদের কর্মগুলি হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ। মানুষটি থাকলেই কাজ হবে, কার্য কারণকে অনুসরণ করতে বাধ্য।

সব কিছু বিদ্যার, সব শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত মানুষ গড়া। কিন্তু তার বদলে আমরা সব সময় বাইরেটাই মাজা-ঘষার চেষ্টা করছি। যখন ভেতরে কিছু নেই তখন বাইরেটা মাজা-ঘষা করে কী লাভ? সব শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হলো মানুষকে উন্নত করা। যে মানুষ অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, অন্য মানুষদের যাদুগ্রস্ত করতে পারে, সে যেন এক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র এবং সেই মানুষ প্রস্তুত হলে যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে। এই রকম ব্যক্তিত্ব যে কোন বিষয়ে নিযুক্ত হলে সেটিকে কার্যকর করে তুলবে।

এখন আমরা দেখছি যে এটা সত্য হলেও আমাদের জ্ঞাত কোন প্রাকৃতিক নিয়ম এর ব্যাখ্যা করতে পারে না। রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে আমরা কী করে এর ব্যাখ্যা করব? কতখানি অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন এতে আছে, কতগুলি অণু কি অবস্থায়, কতগুলি কোষ কী ভাবে গঠিত হলে, ইত্যাদি ইত্যাদি এই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে পারে? তবু আমরা দেখি যে এটি বাস্তব সত্য, শুধু তাই নয়, এটিই আসল মানুষ, যে মানুষ বেঁচে থাকে, চলাফেরা করে, কাজ করে, অন্যকে প্রভাবান্বিত করে, পরিচালিত করে এবং শেষে চলে যায়; তাঁর বুদ্ধি, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর কর্ম—পেছনে ফেলে যাওয়া কিছু চিহ্নমাত্র। এটা ভেবে দেখ। বড় বড় ধর্মগুরুদের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলনা কর। দার্শনিকরা খুব কমই কারও ভিতরের মানুষটিকে প্রভাবান্বিত করেছেন, অথচ তাঁরা অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। অন্যদিকে ধর্মগুরুরা তাঁদের জীবদ্দশায় দেশে আলোড়ন এনে দিয়েছেন। ব্যক্তিত্বই এই প্রভেদ সৃষ্টি করেছে। দার্শনিকদের মধ্যে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব ক্ষীণ আর ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে এটি প্রবল। প্রথমোক্তরা বুদ্ধিকে স্পর্শ করেন আর শেষোক্তরা জীবনকে। একটি ক্ষেত্রে এটি যেন শুধু এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া,—কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানকে একত্র করা, যা ক্রমে সংমিশ্রিত হয়ে উপযুক্ত পরিবেশে আলোর ঝলক সৃষ্টি করতে পারে বা নাও পারে। অন্য ক্ষেত্রে যেন এক জ্বলন্ত মশাল ঘুরে ঘুরে সব কিছু প্রজ্জ্বলিত করে তুলছে।

যোগবিজ্ঞান দাবি করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার নিয়ম সে আবিষ্কার করেছে এবং সেই নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করলে প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিত্বকে বর্ধিত ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে এটি হচ্ছে অন্যতম এবং সব শিক্ষার রহস্য হচ্ছে এটি। সকলের পক্ষে এটি প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনীর জীবনে, দরিদ্রের জীবনে,

ব্যবসায়ীর জীবনে, অধ্যাত্মবাদীর জীবনে, প্রত্যেকের জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে এক মহান বিষয়। প্রাকৃতিক যে সব নিয়ম আমাদের জানা আছে, সেগুলির পিছনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সব নিয়ম রয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে স্থূল-জগতের সত্তা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্ম-জগতের সত্তা প্রভৃতি পৃথক কোন সত্তা নেই। যা কিছু আছে তা একটিই। আমরা বলতে পারি এটি ক্রমঃসূক্ষ্ম অস্তিত্ব, এর স্থূলতম অংশটি এখানে, এটি যতই সরু হচ্ছে ততই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। সূক্ষ্মতমটিকে আমরা আত্মা বলি, স্থূলতমটি হচ্ছে দেহ। এই ক্ষুদ্র জগতে যা আছে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাই আছে। আমাদের বিশ্বটি ঠিক এমনি, জগৎ তার স্থূলতম বাহ্যপ্রকাশ এবং ক্রমশ একবিন্দু অভিমুখী হয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে শেষে এটি ঈশ্বরে পর্যবসিত হয়েছে।

আমরা এটাও জানি যে, সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রবলতম শক্তি নিহিত আছে, স্থূলে নয়। কোন লোককে বিপুল ভার উত্তোলন করতে দেখলে আমরা দেখব যে তার মাংসপেশীগুলি ফুলে উঠেছে, তার সমস্ত শরীরে শ্রমের চিহ্ন দেখা যায় এবং আমরা ভাবি মাংসপেশীগুলিই শক্তিশালী বস্তু। কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি এনে দেয় সুতোর মতো সরু স্নায়ুগুলি। যে মুহূর্তে মাংসপেশীর সঙ্গে ওই সুতোগুলির একটির সংযোগ ছিন্ন হয়, অমনি মাংসপেশী একেবারেই কাজ করতে পারে না। এই ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলি সূক্ষ্মতর আর কিছু থেকে শক্তি নিয়ে আসে, সেটি আবার পর্যায়ক্রমে আরও সূক্ষ্ম কিছু থেকে নিয়ে আসে—চিন্তা ও ওই ধরনের কিছু থেকে। অতএব সূক্ষ্মই হচ্ছে প্রকৃত শক্তির আধার। অবশ্য স্থূল স্তরের গতিগুলিই আমরা দেখতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরের কোন আলোড়ন আমরা দেখতে পাই না। যখন কোন স্থূল বস্তু আলোড়িত হয়, আমরা তা বুঝতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই আমরা স্থূল বস্তুর সঙ্গে আলোড়নের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন মনে করি। কিন্তু সব শক্তি প্রকৃত সূক্ষ্মেই আছে। সূক্ষ্মে কোন আলোড়ন আমরা দেখি না কারণ সে আলোড়ন বোধহয় খুব তীব্র বলে আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের দ্বারা, কোন গবেষণার সাহায্যে যদি আমরা বাহ্য প্রকাশের কারণরূপ শক্তিগুলি ধরতে পারি, তাহলে শক্তির প্রকাশগুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। কোন হ্রদের তলদেশ থেকে একটি বুদ্বুদ উঠছে, তখন সেটির উপরে ওঠা আমরা কোন সময়েই দেখতে পাই না, উপরে উঠে যখন সেটি ফেটে যায় তখনই শুধু আমরা দেখতে পাই। তেমনিভাবে চিন্তা অনেকখানি পরিণতি লাভ করার পর কিংবা কার্যে পরিণত হওয়ার পর আমরা অনুভব করতে পারি। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ করি যে আমাদের কার্যের উপর, আমাদের চিন্তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তা থাকবে কী করে? যদি আমরা সূক্ষ্ম আলোড়নগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, যদি চিন্তার মূলটিকে ধরতে পারি, তা চিন্তায় পরিণত হবার আগেই, চিন্তা থেকে কর্মে রূপান্তরিত হবার অনেক আগেই, তাহলে আমাদের পক্ষে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে যার দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিগুলি, সূক্ষ্ম কারণগুলি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি, অনুসন্ধান করতে পারি, বুঝতে পারি এবং সর্ব শেষে সেগুলিকে আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে শুধু তখনই আমাদের পক্ষে নিজেকে নিজের বশে আনা সম্ভব। আর যে মানুষ নিজের মনকে

বশে আনতে পেরেছে, সে নিশ্চিতভাবে অন্তদের মনকেও বশে আনতে পারবে। সেইজন্য পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা সর্বদা ধর্মের অঙ্গ হয়েছে। পবিত্র ও নীতিপরায়ণ মানুষের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আর সব মনই হচ্ছে সেই একই মনের বিভিন্ন অংশমাত্র। যে একটি মৃৎখণ্ডের জ্ঞান লাভ করেছে, সে জগতের সকল মৃত্তিকাকেই জানতে পেরেছে। নিজের মন সম্বন্ধে যার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ আছে, সে প্রতিটি মনের রহস্য জানে এবং সব মনের উপরই তার নিয়ন্ত্রণশক্তি আছে।

এখন এই সূক্ষ্ম অংশগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমরা বহু পরিমাণ শারীরিক দুর্ভোগ এড়াতে পারি। যদি আমরা সূক্ষ্ম আলোড়নগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তবে বহু দুর্ভাবনা দূর করতে পারি, এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলি আয়ত্ত করতে পারলে আমরা বহু ব্যর্থতা এড়িয়ে যেতে পারি। এই পর্যন্ত যা বলা হলো তা এর উপযোগিতার কথা। এর পরে আরও উচ্চতর কিছু আছে।

এখন একটি মতবাদের কথা বলব, যা নিয়ে বর্তমানে বিচার-বিতর্ক করব না, শুধু সিদ্ধান্তটি তোমাদের সামনে রাখব। প্রতি মানুষকেই শৈশবকালে সেইসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পার হতে হয়, যা তার জাতি অতিক্রম করেছে। শুধু সেই জাতির ওইসব অবস্থা পার হতে হাজার হাজার বছর লেগেছে, আর শিশুর লাগে কয়েকটি বছরমাত্র। শিশুটি প্রথমে আদিম অসভ্য মানুষের মতো থাকে—সে পায়ের তলায় প্রজাপতি পিষে চলে। শিশুটি প্রথম অবস্থায় তার জাতির আদিম পূর্বপুরুষের মতোই থাকে। যতই সে বড় হতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে শেষে তার জাতির পরিণত অবস্থায় এসে পৌছায়। শুধু সে অতি দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে এটি করে ফেলে। এখন সমগ্র মানবসমাজকে একটি জাতি বলে ধর, কিংবা সমগ্র প্রাণিজগৎকে—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীগুলিকে একটি সমগ্র সত্তারূপে ভাব। এই সমগ্র সত্তা একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা বলা যাক। কিছু নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ উন্নতির ধারণা করা যায়। সমগ্র মানবজাতি সেই পূর্ণতা যতক্ষণ না লাভ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, যুগ যুগ ধরে বারে বারে জন্মগ্রহণ না করে, তাঁদের জীবনের স্বল্প কয়েকটি বছরের মধ্যে তাঁরা দ্রুতগতিতে অবস্থাগুলি পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করেন। আমরা জানি যে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা চলে যদি আমরা নিজেদের প্রতি অকপট হই। যদি কয়েকটি সভ্যতা-সংস্কৃতিবিহীন মানুষকে জীবনধারণের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্যবস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে কোন দ্বীপে বসবাস করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলেও তারা ক্রমে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর সভ্যতার বিকাশ ঘটাবে। এটিও আমাদের অজানা নয় যে এই উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা যায় কিছু বাড়তি উপায় দ্বারা। আমরা গাছপালার বৃদ্ধির সহায়তা করি; করি না কি? প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলেও গাছপালা বেড়ে ওঠে, তবে তাতে একটু বেশি সময় লাগে; তার চেয়ে অল্পসময়ে বেড়ে ওঠার জন্য আমরা তাদের সাহায্য করি। এ কাজ আমরা সব সময়েই করছি, কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধি দ্রুততর

করছি। মানুষের উন্নতি আমরা দ্রুততর করতে পারব না কেন? জাত হিসাবে আমরা তা করতে পারি। অপর দেশে শিক্ষক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অন্য জাতিগুলির উন্নতি আমরা ত্বরান্বিত করতে পারি। তাহলে ব্যক্তির উন্নতি কি আমরা ত্বরান্বিত করতে পারি না? আমরা তা পারি। এই উন্নতি ত্বরান্বিত করার কোন সীমা আমরা নির্ধারণ করতে পারি? এক জীবনে মানুষ কতটা উন্নতি করতে পারবে আমরা তা বলতে পারি না। কোন মানুষ এই পর্যন্ত মাত্র করতে পারে, তার বেশি নয়, এ কথা বলার পেছনে তোমার কোন যুক্তি নেই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তার গতি বাড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই তোমার পূর্ণতা লাভের আগে পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি? কাজেই এতে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে আজ হতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোটা জাতটাই যে ধরনের মানুষে ভরে যাবে, তেমনি পূর্ণ মানুষ একজন আজই আবির্ভূত হতে পারেন। যোগীরা এই কথা বলেন যে, বড় বড় অবতার ও মহাপুরুষরা এই ধরনের মানুষ। তাঁরা এই এক জীবনেই পূর্ণতা লাভ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বযুগে সর্বকালে এই ধরনের মানুষ আমরা পেয়েছি। এই সেদিনের কথা, এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করে চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন। উন্নতির এই ক্ষিপ্রগতি নিশ্চয় নিয়মের অধীন। ধর, এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজে বের করলাম এবং তাদের রহস্যভেদ করে নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োগ করলাম, তাহলেই আমরা উন্নত হব। আমাদের উন্নতির গতিকে ক্ষিপ্র করে, আমাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে আমরা এই জীবনেই পূর্ণতা লাভ করতে পারি। এটিই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক এবং যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মন ও তার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে এই পূর্ণতা লাভ। অর্থ ও অন্যান্য জাগতিক বস্তু দান করে অন্যকে সাহায্য করা কিংবা দৈনন্দিন জীবন নির্বিঘ্নে পরিচালন শিক্ষা দেওয়া—এ সব হচ্ছে শুধুমাত্র আনুষঙ্গিক কার্য।

এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্বকে প্রকট করে তোলা, তাকে সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে ইতস্তত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মতো বাহ্য প্রকৃতির খেলার পুতুলরূপে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষমাণ থাকতে না দেওয়া। এই বিজ্ঞান চায় যে তুমি শক্তিশালী হও, প্রকৃতির হাতে কাজটি ছেড়ে না দিয়ে নিজের হাতে তুলে নাও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের পারে চলে যাও। এই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য।

জ্ঞানে, শক্তিতে, সুখে-সমৃদ্ধিতে মানুষ বিকশিত হয়ে উঠেছে। জাতি হিসাবে আমরা ক্রমাগত উন্নত হচ্ছি। এটি যে সত্য, ধ্রুব সত্য তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও কি এটি সত্য? হ্যাঁ, কিছুটা। কিন্তু তবু এই প্রশ্ন জাগে: এর সীমা নির্ধারিত হবে কোথায়? আমি মাত্র কয়েক ফুট দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। কিন্তু এমন লোক আমি দেখেছি যিনি চোখ বন্ধ করেও পাশের ঘরে কী হচ্ছে তা দেখতে পান। তোমার যদি এটা বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি হয়তো তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকেও এভাবে দেখা শিখিয়ে দিতে পারেন। যে কোন লোককেই এটা

শেখানো যায়। কিছু লোক পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের মনে কী ঘটছে তা জেনে নিতে পারে। এই সব হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যায়।

এখন এ সব বিষয় যদি সত্য হয়, তবে আমরা সীমারেখা টানব কোথায়? এই ঘরের এক কোণে অপরের মনে কী ঘটছে তা যদি কেউ জানতে পারে, তবে পাশের ঘরের লোকের মনের খবর সে পাবে না কেন? যে কোন জায়গার লোকের চিন্তা টের পাবে না কেন? কেন পাবে না তা আমরা বলতে পারি না। আমরা সাহস করে বলতে পারি না এটা অসম্ভব। আমরা শুধু বলতে পারি, এটা কী ভাবে সম্ভব তা আমরা জানি না। এমন ব্যাপার ঘটা অসম্ভব এ কথা বলার কোন অধিকার জড়-বিজ্ঞানীদের নেই। তাঁরা বড় জোর বলতে পারেন, 'আমরা জানি না'। বিজ্ঞানের কর্তব্য হলো তথ্য যোগাড় করা, সেগুলির সামান্তীকরণ করা, কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করা, এবং সত্যকে প্রকাশ করা—এই পর্যন্ত। কিন্তু আমরা যদি তথ্যকে অস্বীকার করতে শুরু করি, তাহলে বিজ্ঞান গড়ে উঠবে কী ভাবে?

মানুষের শক্তি অর্জনের কোন সীমা নেই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সে কিছুতে আগ্রহী হলে অন্য সবকিছু ভুলে তাতেই ডুবে যায়। তোমরা জান ভারত বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি। গণিতের উৎপত্তি এখানে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত তোমরা সংস্কৃত ভাষার সংখ্যা অনুযায়ী ১, ২, ৩ ইত্যাদি থেকে ০ পর্যন্ত গণনা করছ। তোমরা জান বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে হয়েছিল, আর নিউটনের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে ভারতবাসীদের মাধ্যাকর্ষণের কথা জানা ছিল।

এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভারতীয় ইতিহাসের কোন একটি যুগে মানুষ ও তার মন—এই বিষয়ে ভারতবাসীরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল, কারণ এটিকে তাদের লক্ষ্যে পৌছোবার সহজতম উপায় বলে মনে হয়েছিল। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করলে মনের অসাধ্য কিছু নেই—এই বিষয়ে ভারতীয় মনে এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মানসিক শক্তির গবেষণাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। সম্মোহন, যাদু ও এই জাতীয় অন্য শক্তিগুলি তাদের কাছে অলৌকিক কিছু বলে মনে হয়নি। ইতিপূর্বে ভারতীয়রা যেভাবে নিয়মানুসারে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, সেইভাবে এই বিজ্ঞানটিও শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই বিষয়গুলির উপর জাতির এত বেশী দৃঢ় বিশ্বাস এসেছিল যে জড়বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। এই একটি বিষয়েই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা নানা ধরনের পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। কেউ পরীক্ষা করতে লাগলেন আলো নিয়ে, বিভিন্ন বর্ণের আলো দেহে কি ভাবে পরিবর্তন আনে তা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা একটি বিশেষ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করতেন, একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে বাস করতে লাগলেন এবং বিশেষ বর্ণের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে লাগলেন। এইভাবে সব ধরনের পরীক্ষা শুরু হলো। অন্যেরা শব্দ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন, তাঁদের কান খোলা ও বন্ধ রেখে। গন্ধ নিয়েও কেউ কেউ পরীক্ষা চালালেন এবং এইভাবে নানা কিছু চলতে লাগল।

সমস্ত ধারণাটাই ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশগুলিতে পৌঁছানো। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সত্যিই অতি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেই বাতাসের মধ্যে ভেসে থাকা বা বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলাফেরার চেষ্টা করেছেন। আমি তোমাদের এক গল্প বলব যা আমি পাশ্চাত্যের এক বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে শুনেছি। সিংহলের একজন গভর্নর ঘটনাটি দেখে তাঁকে বলেছিলেন—কতকগুলি কাঠি আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে এক টুলের মতো করে একটি বালিকাকে এনে আসন করে তার উপর বসানো হলো। বালিকাটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর যে লোকটি খেলা দেখাচ্ছিল, সে একটি একটি করে কাঠিগুলি সরিয়ে নিতে লাগল। সব কাঠিগুলি সরিয়ে নেবার পর বালিকাটি শূন্যে ভাসতে লাগল। গভর্নর ভাবলেন এর মধ্যে কোন কৌশল আছে, তাই তিনি তাঁর তরোয়াল বের করে সজোরে বালিকাটির নিচে শূন্য স্থানে চালিয়ে দিলেন। সেখানে কিছুই ছিল না। এখন একে কী বলবে? এটা যাদু বা অলৌকিক কিছু নয়। এটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। ভারতে কেউ বলবে না যে এমন ব্যাপার হতে পারে না। হিন্দুদের কাছে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তোমরা জান হিন্দুরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার সময় অনেক সময় বলে থাকে—'ও, আমাদের এক যোগী এসে সকলকে হটিয়ে দেবে।' এটি জাতির এক চরম বিশ্বাস। বাহুবল বা অস্ত্রবল আর কতটুকু? শক্তি তো সবই আত্মার।

এটি সত্য হলে এতেই মনের সব শক্তি নিয়োগ করার প্রলোভন বেশি হবে। তবে অন্যান্য সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা যেমন কঠিন, এক্ষেত্রেও তাই, বরং তার চেয়ে বেশী কঠিন। তবু বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা যে, এ সব শক্তি সহজেই লাভ করা যায়। বিপুল সম্পদ অর্জন করতে তোমার কত বছর লাগে? সেটা ভেবে দেখ! প্রথমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করতেই কত বছর তোমার লাগে? তারপর তোমার বাকী জীবনটাই তো পরিশ্রম করে যেতে হয়।

আবার বেশীর ভাগ বিজ্ঞানই সেইসব বস্তু নিয়ে আলোচনা করে যা গতিহীন, স্থির। তুমি এই চেয়ারটিকে বিশ্লেষণ করতে পার, চেয়ারটি তোমার সামনে থেকে পালিয়ে যাবে না। কিন্তু এই বিজ্ঞান মন নিয়ে কাজ করে, যা সর্বদাই চঞ্চল; যে মুহূর্তে তুমি তাকে নিয়ে গবেষণা করতে যাবে, সেটি তোমার কাছ থেকে সরে পড়বে। মনে এখন একটি ভাব রয়েছে, পরমুহূর্তেই হয়তো সেই ভাব বদলে গেল, সব সময়েই এই ভাবের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এইসব পরিবর্তনের মধ্যেই একে নিয়ে গবেষণা করতে হবে, ধরতে হবে, বুঝতে হবে, আয়ত্তে আনতে হবে। কাজেই কত বেশী কঠিন এই বিজ্ঞানটি! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করে আমি কেন তাদের কার্যকরী শিক্ষা দিই না। কেন? এটা তো ফাজলামি নয়। আমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছে বক্তৃতা দিই, বক্তৃতা শুনে বাড়ি ফিরে দেখলে বিশেষ কিছু লাভ হলো না, আমিও তাই দেখি। তারপর তুমি বললে, 'সব বাজে কথা!' তার কারণ তুমি এটাকে বাজে জিনিসরূপেই চেয়েছিলে। এই বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি, কিন্তু

সেই সামান্যটুকু জানতেই আমার জীবনের ত্রিশটি বছর ধরে পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপর এই ছ' বছর ধরে যেটুকু শিখেছি, সেইটুকুই লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছি। এই শিখতেই আমার ত্রিশটি বছর চলে গেছে—ত্রিশ বছরের কঠিন সংগ্রামের ফলে শিখেছি। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা পরিশ্রম করেছি, কখনও রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমিয়েছি, কখনও সারারাত্রি পরিশ্রম করেছি, কখনও কখনও এমন সব জায়গায় বাস করেছি, যেখানে কোন শব্দ ছিল না, বাতাস ছিল না বলা চলে, কখনও গুহায় বাস করেছি। কথাগুলি ভেবে দেখ। এসব সত্ত্বেও আমি অল্পই জেনেছি, না জানারই সামিল; আমি এই বিজ্ঞানের অঙ্গাবরণের প্রান্তটুকুমাত্র স্পর্শ করতে পেরেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই বিজ্ঞান সত্য, বিরাট ও আশ্চর্যকর।

এখন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যিই এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে চাও, তাহলে জীবনের যে কোন বিষয়কর্মের জন্য যতটা দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি বা তার চেয়ে বেশি সঙ্কল্প নিয়ে এর চর্চা শুরু করতে হবে।

ব্যবসাতে কি পরিমাণ মনোযোগেরই না প্রয়োজন হয় এবং কি কঠোর পরিশ্রমই না সেটি আমাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এমন কি বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র মরে গেলেও ব্যবসা বন্ধ থাকতে পারে না। বুক ফেটে গেলেও আমাদের কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়, প্রতিটি ঘণ্টা যন্ত্রণাদায়ক হলেও কাজ করে যেতে হয়। এই হচ্ছে বিষয়কর্ম, আর আমরা মনে করি এটাই ঠিক, এটাই ন্যায়সঙ্গত।

এই বিজ্ঞানের জন্য যে কোন ব্যবসার চেয়ে বেশী পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয়। ব্যবসায় অনেকে সাফল্য লাভ করতে পারেন, কিন্তু এতে খুব কম লোকই পারেন। কারণ যিনি এর চর্চা করবেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ব্যবসায় যেমন সবাই প্রচুর ঐশ্বর্যশালী না হতে পারলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করে, তেমনি এই বিজ্ঞানের চর্চাতেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আভাস পায়, যাতে এই বিজ্ঞানের সত্য সম্বন্ধে এবং কিছু লোক এই সত্য উপলব্ধি করেছেন সেই সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস জন্মায়।

এই হলো বিজ্ঞানটির রূপরেখা। এটি নিজের শক্তিতে ও নিজের আলোকে দাঁড়িয়ে অন্য যে কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে তুলনা করে দেখার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রবঞ্চক, যাদুকর, শঠ প্রভৃতি আর সব ক্ষেত্রের চেয়ে এ ক্ষেত্রে বেশী আছে। কেন? কারণটা একই—যে কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যা তাতে তত বেশী। কিন্তু তাই বলে কাজটা যে ভাল নয়, এ যুক্তি খাটে না। আর একটি কথা—সমস্ত যুক্তি-বিচার শোনা বুদ্ধিবৃত্তির ভাল ব্যায়াম হতে পারে এবং অদ্ভুত বিষয়ের কথা বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তার বেশী কিছু জানতে চায়, তাহলে শুধু বক্তৃতা শুনলে চলবে না। বক্তৃতায় এ শেখানো চলে না, কারণ এটি জীবন গঠনের কথা এবং একমাত্র জীবনের দ্বারাই জীবন সঞ্চার করা যায়। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এটি শিখতে সত্যিই সঙ্কল্প কর, তাহলে আমি পরম আনন্দের সঙ্গে তাকে সাহায্য করব।

আধ্যাত্মিক সাধনের কথা

[লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া, 'হোম অব ট্রুথ'-এ প্রদত্ত ভাষণ]

আজ সকালে প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনের বিষয়ে তোমাদের কিছুটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা আমি করব। এতকাল আমরা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার তার সাধনা সম্বন্ধে কিছু বললে ভাল হবে। এই বিষয়ের উপর ভারতবর্ষে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তোমাদের দেশের লোকেরা অনেক বিষয়ে যেমন কর্মদক্ষ, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি এই বিষয়ে দক্ষ। এ দেশের পাঁচজন লোক একত্রে মিলিত হয়ে বলল, 'আমরা এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ব।' পাঁচঘণ্টার মধ্যে সেটা করে ফেলল। ভারতের লোকেরা পঞ্চাশ বছরেও এটা করে উঠতে পারবে না, এ সব ব্যাপারে তারা এতই অপটু। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করো, যদি কেউ একটা দার্শনিক মত প্রচার করে, তা সে মতবাদ যতই উদ্ভট হোক, কিছু অনুগামী তারা পাবেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক নতুন সম্প্রদায় প্রচার করতে শুরু করল যে, যদি কোন লোক বারোবছর দিবারাত্র এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মুক্তিলাভ করবে—তাহলে শত শত লোক তা করার জন্য প্রস্তুত হবে। তারা সব কষ্ট নীরবে সহ্য করবে। বহু লোক আছে যারা ধর্মলাভের জন্য বছরের পর বছর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে। আমি এমন শত শত লোক দেখেছি। মনে রেখ, তারা কিন্তু সকলে নিরেট আহাম্মক নয়, তাদের বুদ্ধির গভীরতা ও ব্যাপকতা তোমাদের অবাক করে দেবে। কাজেই দেখছ, কর্মদক্ষতা শব্দটিও আপেক্ষিক।

অপরকে বিচার করার সময় আমরা সর্বদা এই একটি ভুল করে বসি; আমাদের ক্ষুদ্র মনোজগৎটিই সব কিছু এমনি ধারণার দিকে আমরা সব সময় ঝুঁকি; আমাদের নীতিবোধ, ঔচিত্যবোধ, কর্তব্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ হচ্ছে একমাত্র মূল্যবান বস্তু। সেদিন ইউরোপ যাত্রার পথে আমি মার্সাই বন্দর হয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে তখন 'বুল-ফাইট' হচ্ছিল। জাহাজের সব ইংরাজ যাত্রীরা উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে নৃশংস বলে নিন্দা করতে ও গাল দিতে লাগল। যখন আমি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলাম তখন শুনলাম বাজি রেখে মুষ্টিযুদ্ধ করার জন্য একদল প্যারিসে গিয়েছিল এবং ফরাসীরা তাদের দেশ থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে দূর করে দেয়। ফরাসীরা ভাবে মুষ্টিযুদ্ধটা পাশবিক। বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সব মতামত শুনে আমি খ্রীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করলাম—'অপরের বিচার করিও না, যাতে তোমারও বিচার না করা হয়।' যত আমরা শিখি ততই বুঝতে পারি আমরা কত অজ্ঞ, বুঝতে পারি যে মানুষের মন নামক বস্তুটি কত বিচিত্র ধরনের, কত বহুমুখী! যখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন আমার দেশের লোকের তপস্বীসুলভ সাধনাগুলির সমালোচনা করতাম, আমাদের দেশের বড় বড় প্রচারকরাও সেগুলির সমালোচনা করেছেন; বুদ্ধদেবের মত ক্ষণজন্মা মহামানবও সেগুলির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু

যত বয়স বাড়ছে ততই অনুভব করছি যে বিচার করার অধিকার আমার নেই। অনেক সময় মনে হয় বহু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এইসব তপস্বীর শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার একাংশও যদি আমার থাকত! প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার অভিমত ও সমালোচনার কারণ আমি দৈহিক নির্যাতন অপছন্দ করি বলে নয়, এর কারণ হচ্ছে নিছক ভীরুতা— কারণ এই কৃচ্ছ্রসাধন ও নির্যাতন ভোগ আমি সহ্য করতে পারি না, আমি সেগুলি করতে সাহস করি না।

তাহলে তোমরা দেখছ যে, শক্তি, বীর্য ও সাহস—এ সব অতি অদ্ভুত বস্তু। আমরা প্রায়ই বলি,—'সাহসী লোক', 'বীরপুরুষ', 'নির্ভীক মানুষ', কিন্তু আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে ওই সাহসিকতা বা বীরত্ব বা অন্য কোন গুণ ওই মানুষটির চরিত্রকে সব সময় প্রকাশ করে না। যে লোক কামানের মুখে ছুটে যেতে পারে, সেই আবার ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায়; আবার যে মানুষ কোনকালেই কামানের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায় না, প্রয়োজন হলে সে সাংঘাতিক অস্ত্রোপচার শান্তভাবে সহ্য করবে। এখন অপরের বিচার করার সময় সাহস, মহত্ত্ব ইত্যাদি শব্দগুলির সংজ্ঞা সর্বদা ভালভাবে নির্ধারণ করা দরকার। আমি 'ভাল নয়' বলে যে লোকটির সমালোচনা করছি, সেই লোকটিই হয়তো আমি যেসব বিষয়ে ভাল নই. সেই বিষয়গুলিতে আশ্চর্য রকমের ভাল হতে পারে।

আর একটি উদাহরণ দেখ। প্রায়ই দেখবে লোকে যখন নারী ও পুরুষের কর্মক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে তখন সব সময় এই ভুলটাই করে। তারা মনে করে পুরুষেরা লড়াই করতে ও প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে বলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায় এবং স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের তুলনা করা চলে। এটা অন্যায়। মেয়েরাও পুরুষদের মতোই সাহসী। নিজ নিজ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ দুজনেই সমান ভাল। নারী যেমন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ দিয়ে সন্তান পালন করে, কোন পুরুষ কি তেমন পারে? একজন কর্মশক্তির বিকাশ করেছে, অন্যজন সহ্যশক্তির। যদি বলো মেয়েরা কর্মক্ষম নয়, তবে বলব পুরুষরাও সহনশীল নয়। সমস্ত জগৎটাই এক ভারসাম্যের ব্যাপার। আমার জানা নেই, তবে কোনদিন হয়তো হঠাৎ টের পাব যে নগণ্য কীটের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের মানবতার সঙ্গে ভারসাম্যের সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বদমাইস লোকটারও এমন কোন সদ্‌গুণ থাকতে পারে, যা আমার ভেতরে একবারেই নেই। নিজের জীবনে আমি প্রতিদিন এটা লক্ষ্য করেছি। অসভ্য জাতের একজন লোককে লক্ষ্য কর। ইচ্ছা হয় আমার দেহটি যদি তার মতো অমন সুঠাম হতো! সে মনের সুখে খায়-দায়, অসুখ কাকে বলে তা হয়তো জানেই না, আর এদিকে আমি সমানে অসুখে ভুগছি। তার দেহের সঙ্গে আমার মগজটা বদলে নিতে পারলে কতই না আনন্দ পেতাম। সমস্ত জগৎটাই হচ্ছে শুধু তরঙ্গের উত্থান-পতন, কোন জায়গা নিচু না হলে অন্য জায়গা উঁচু হয়ে তরঙ্গাকার হয় না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য। তুমি এক বিষয়ে বড়, তোমার প্রতিবেশী অন্য বিষয়ে বড়। স্ত্রী ও পুরুষের বিচার করার সময় তাদের নিজস্ব মহত্ত্বের মান অনুসারে করো। একজনের জুতো অন্য জনের পায়ে ঢোকানো চলে না। একজনকে

খারাপ বলার কোন অধিকার অন্য জনের নেই। এ জাতীয় সমালোচনা সেই প্রাচীন কুসংস্কারের মতন—'এমন করা হলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।' কিন্তু তেমন করা হলেও সৃষ্টি এখনও ধ্বংস হয়নি। এ দেশে বলা হতো যে নিগ্রোদের স্বাধীনতা দিলে দেশের সর্বনাশ হবে, কিন্তু তা হয়েছে কি? আরও বলা হতো জনসাধারণকে শিক্ষিত করলে জগতের সর্বনাশ হবে,—কিন্তু তাতে কেবল জগতের উন্নতিই হচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ইংল্যাণ্ডের সম্ভাব্য দুরবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসার অবনতি ঘটছে। একটা রব উঠল যে ইংল্যাণ্ডের মজুরদের দাবি অত্যন্ত বেশী এবং জার্মানরা কম মাইনেতে কাজ করে। এ বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য জার্মানীতে এক কমিশন পাঠানো হলো এবং তারা রিপোর্ট দিল যে জার্মান মজুররা উচ্চহারে মজুরী পায়। এটা হলো কী করে? জনশিক্ষাই এর কারণ। তাহলে জনশিক্ষার ফলে জগতের সর্বনাশ হবে এ কথাটা কী করে খাটছে? ভারতবর্ষে বিশেষ করে এইসব প্রাচীনপন্থীদের সারা দেশ জুড়ে দেখা যায়। তারা জনগণের কাছে সবকিছুই গোপন করে রাখতে চায়। এইসব লোকেরা এক আত্মতৃপ্তিকর সিদ্ধান্ত করেছে যে, তাঁরাই হচ্ছেন জগতের মাথার মণি। তাদের বিশ্বাস যে, এই সব বিপজ্জনক পরীক্ষাগুলি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এতে শুধুমাত্র জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখন ব্যবহারিক কাজের কথায় ফিরে আসা যাক। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে মনস্তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চোদ্দশ বছর আগে ভারতবর্ষে পতঞ্জলি নামে এক দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনস্তত্ত্বের সমস্ত তথ্য প্রমাণ ও গবেষণা সংগ্রহ করেছিলেন এবং অতীতের সঞ্চিত সব অভিজ্ঞতার সুযোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্মরণ রেখ, এ জগৎ অত্যন্ত প্রাচীন, মাত্র দুই বা তিন হাজার বছর আগে এটি সৃষ্টি হয়নি। পাশ্চাত্যে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, নিউ টেস্টামেণ্ট-এর সঙ্গে আঠারো শ বছর আগে সমাজের পত্তন হয়েছিল। তার আগে কোন সমাজ ছিল না। পাশ্চাত্যের সম্পর্কে এ কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমস্ত জগতের সম্বন্ধে এটা সত্য নয়।

লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার এক বুদ্ধিমান পণ্ডিত বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন। তাঁর সব অস্ত্রগুলি ব্যবহার করার পর একদিন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তাহলে আপনাদের ঋষিরা ইংল্যাণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেননি কেন?

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'কারণ তখন ইংল্যাণ্ড বলে কিছু ছিল না যে তাঁরা আসবেন। তাঁরা কি জঙ্গলে প্রচার করবেন?'

ইঙ্গার সোল আমাকে বলেছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে এ দেশে প্রচার করতে এলে আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হতো। আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো কিংবা ঢিল মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো।'

কাজেই খ্রীষ্ট জন্মের চোদ্দশ বছর আগেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, এ ধারণা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এখনও মীমাংসা হয়নি যে সভ্যতা নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় এসেছে কিনা। সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রমাণের জন্য যে সব যুক্তি-প্রমাণ ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক সেই সব যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এটাও দেখানো যায় যে

বর্বর মানুষরা হচ্ছে অবনত সভ্য মানুষমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চীনের মানুষরা কখনও বিশ্বাস করে না যে, বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে. কারণ এ কথা তাদের অভিজ্ঞতার বিপরীত। কিন্তু তোমরা যখন আমেরিকার সভ্যতার কথা বল, তখন তোমাদের মনের মধ্যে থাকে তোমাদের জাতির স্থায়িত্ব ও উন্নতির কথা।

এ কথা বিশ্বাস করা খুবই সহজ যে, হিন্দুরা সাতশ বছর ধরে অবনতির পথে চলছে এবং তারা অতীতে অত্যন্ত সভ্য ছিল। আমরা প্রমাণ করতে পারি না যে, এটা সত্য নয়।

কোনও সভ্যতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই। পৃথিবীতে এমন কোন জাত নেই, যার সঙ্গে আর একটি সভ্য জাতির সংমিশ্রণ ছাড়া সে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই বলা যেতে পারে, সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল একটি বা দুটি জাতির মধ্যে, যারা বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাবগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এইভাবেই সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে।

ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাতেই কথা বলা যাক। কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের স্মরণ রাখতে বলছি, ধর্ম বিষয়ে যেমন কুসংস্কার আছে, তেমনি বিজ্ঞানের বিষয়েও কুসংস্কার আছে। যেমন অনেক পুরোহিত তাঁদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধর্মানুষ্ঠানকে গ্রহণ করেন, তেমন অনেক বিজ্ঞানী আছেন। ডারউইন বা হাক্সলির মতো বড় বড় বিজ্ঞানীদের নাম করা হলেই আমরা অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করি। এই হচ্ছে আজকালকার চলিত প্রথা। যাকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ হচ্ছে নিছক মতবাদ। তার মধ্যে অনেকগুলি আবার বহু মস্তক ও বহু হস্ত বিশিষ্ট ভূত বিশ্বাস করার কুসংস্কারের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়; তবে পার্থক্য এই যে বিজ্ঞানের কুসংস্কার মানুষকে গাছপাথর ইত্যাদি অচেতন পদার্থ থেকে একটু পৃথক বলে ভাবত। প্রকৃত বিজ্ঞান আমাদের সতর্কভাবে চলতে বলে। পুরোহিতদের সম্বন্ধে যেমন সতর্ক আমাদের হওয়া উচিত, তেমনি বিজ্ঞানীদের বেলায়ও সতর্ক হওয়া উচিত। প্রথমে অবিশ্বাসের সঙ্গে শুরু করবে, বিশ্লেষণ করবে, পরীক্ষা করবে, সব কিছু প্রমাণ পাওয়ার পরে গ্রহণ করবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অতি প্রচলিত কিছু বিশ্বাস এখনও প্রমাণিত হয়নি। এমন কি গণিতশাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানেও বহু সংখ্যক তত্ত্ব শুধুমাত্র কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত। উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব চোদ্দশ সালে এক বড় ঋষি কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের সুবিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আরও অনেকে তাঁর আবিষ্কারের অংশ বিশেষ নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির চর্চা প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আমি এখন বিষয়টি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কজন এটির অভ্যাস করবে? ক'দিন বা কমাস পরে এর অভ্যাস ছেড়ে দেবে? এই বিষয়ে তোমাদের উপযুক্ত উদ্যম নেই। ভারতবর্ষে লোকেরা কিন্তু যুগের পর যুগ ধৈর্য ধরে লেগে থাকবে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হয়ে

যাবে, তাদের কোন সাধারণ প্রার্থনাগৃহ বা সাধারণ প্রার্থনামন্ত্র বা ওই জাতীয় কোন কিছু নেই, কিন্তু তারা প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করে এবং মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করে এটাই তাদের ভক্তির প্রধান অঙ্গ। এইগুলিই হলো মূলকথা। প্রত্যেক হিন্দুর এগুলি অবশ্য করণীয়। এটিই সে দেশের ধর্ম। তবে প্রত্যেকেরই এক বিশেষ পদ্ধতি থাকতে পারে—শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ পদ্ধতি, মনঃসংযমের বিশেষ পদ্ধতি। একজনের যে কী বিশেষ পদ্ধতি এমন কি তার স্ত্রীরও জানার প্রয়োজন নেই : পুত্রের পদ্ধতি পিতারও জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সকলকেই এ সব অভ্যাস করতে হয়। আর এ সবের মধ্যে কোন গোপন রহস্য নেই। 'গোপন রহস্য' কথাটির কোন সম্পর্কই এ সবের সঙ্গে নেই। গঙ্গার কাছে হাজার হাজার লোককে দেখা যাবে প্রতিদিন তীরে বসে চোখ বুঁজে প্রাণায়াম ও একাগ্রতা অভ্যাস করছে। মানব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি সাধন-অভ্যাসের পথে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাধার দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হচ্ছে, ধর্মাচার্যরা মনে করেন যে, সাধারণ লোকেরা এ সবের উপযুক্ত নয়। এ ধারণার মধ্যে হয়তো কিছুটা সত্য থাকতে পারে, কিন্তু অহঙ্কারই হচ্ছে এর বেশী কারণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নির্যাতনের ভয়। উদাহরণস্বরূপ, এ দেশে প্রকাশ্যে কেউ প্রাণায়াম অভ্যাস করতে চাইবে না, কারণ তাকে এক অদ্ভুত জীব ভাবা হবে। এ সবের চলন এখানে নেই। অন্যদিকে, ভারতে যদি কেউ প্রার্থনা করে, 'ভগবান, আমাদের আজ দিনের আহার্য দাও' ; তবে লোকে তাকে উপহাস করবে। হিন্দুদের চোখে 'হে আমার স্বর্গবাসী পিতা' ইত্যাদি বলার চেয়ে বড় বোকামী আর কিছু নেই। উপাসনাকালে হিন্দুরা ভাবে যে, ঈশ্বর তার অন্তরেই আছেন।

যোগীদের মতে আমাদের দেহে তিনটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ আছে। একটিকে তাঁরা বলেন ইড়া, অপরটিকে পিঙ্গলা, আর দুটির মাঝখানেরটিকে সুষুম্না ; এগুলি সবই আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। বামদিকের ইড়া ও ডানদিকের পিঙ্গলা হচ্ছে স্নায়ুগুচ্ছ আর মাঝের সুষুম্না হচ্ছে ফাঁপা, স্নায়ুগুচ্ছ নয়। এই সুষুম্না পথটি বন্ধ থাকে, সাধারণ মানুষের এটি কোন কাজে লাগে না, সে শুধু ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারাই কাজ করে যায়। এই স্নায়ুগুলির মাধ্যমে অন্যান্য স্নায়ুতে সর্বদা মস্তিষ্কের আদেশ পৌঁছে দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে চালিত করার জন্য প্রবাহ আসা যাওয়া করে।

ইড়া ও পিঙ্গলাকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ করাই হচ্ছে প্রাণায়ামের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধুমাত্র এই শ্বাসক্রিয়া বিশেষ কিছু নয়—ফুসফুসের ভেতর কিছুটা বাতাস নেওয়া ছাড়া আর কি! রক্ত শোধন ছাড়া এর আর বিশেষ কাজ নেই। বাইরের থেকে যে বাতাসকে আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিই এবং রক্ত শোধনের জন্যে ব্যবহার করি, সেই বাতাসের মধ্যে কোন গোপন-রহস্য নেই ; এই ক্রিয়াটি এক গতিমাত্র। এই গতিকেই প্রাণ নামে এক স্পন্দনে পরিণত করা যায়। সব জায়গায় সব স্পন্দন হচ্ছে এই প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ। এই প্রাণই বিদ্যুৎ, এই প্রাণই চৌম্বকশক্তি, এই প্রাণই চিন্তারূপে মস্তিষ্ক হতে বিকীর্ণ হয়। সবই প্রাণ ; এই প্রাণই চালিত করছে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্ররাজিকে।

আমরা বলি, এই বিশ্বে যা কিছু আছে সবই প্রাণের স্পন্দনের ফলে প্রকাশিত হয়েছে। স্পন্দনের সর্বোচ্চ পরিণতি হচ্ছে চিন্তা। তারচেয়ে উচ্চতর যদি কিছু থাকে, তা ধারণা করার শক্তি আমাদের নেই।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দুটি প্রাণের দ্বারাই কাজ করে। প্রাণই বিভিন্ন শক্তিরূপে দেহের প্রতিটি অংশকে চালিত করে। ঈশ্বর কার্যের স্রষ্টা এবং সিংহাসনে বসে বিচারকার্য পরিচালনা করছেন—এই পুরানো ধারণা পরিত্যাগ কর। কাজ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কারণ অনেকটা প্রাণশক্তি আমরা ব্যয় করে ফেলি।

শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম—যাকে বলা হয় প্রাণায়াম—শ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাণের ক্রিয়াকে ছন্দোবদ্ধ করে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, তখন দেহের সব কিছু ঠিক মতো কাজ করে। যোগীর যখন নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে, তখন শরীরের কোন অংশ অসুস্থ হলে তাঁরা বোঝেন যে প্রাণ সেখানে ঠিক মতো ছন্দে চলছে না এবং তাঁরা সেই ত্রুটিপূর্ণ অংশের দিকে প্রাণকে পরিচালিত করেন যতক্ষণ না আবার ছন্দ ফিরে আসছে।

তুমি যেমন তোমার নিজের দেহের প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার, তেমনি যদি তুমি যথেষ্ট শক্তিমান হও, তাহলে তুমি এখান থেকেই ভারতে অবস্থিত অন্য কারও প্রাণকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পার। সব প্রাণই এক। কোন ছেদ নেই, ঐক্যই হচ্ছে নিয়ম। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আত্মিক—সব দিক দিয়ে সবই এক। জীবন হচ্ছে শুধু একটি স্পন্দন। যা এই 'আকাশ'—সমুদ্রকে স্পন্দিত করছে তা তোমাকেও স্পন্দিত করছে। যেমন কোন হ্রদে কঠিনতার মাত্রা অনুযায়ী বরফের বিভিন্ন স্তর গড়ে ওঠে, কিংবা বাষ্পের সাগরে বাষ্পস্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে, তেমনি এই বিশ্বও এক জড় পদার্থের সমুদ্র। এটি এক 'আকাশের' সমুদ্র, এর ভেতর ঘনত্বের বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী আমরা চন্দ্র, সূর্য তারাদের ও আমাদের নিজেদের দেখছি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রয়েছে, সব স্থান জুড়ে সেই একই পদার্থ বিদ্যমান।

যখন আমরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চা করি, তখন বুঝতে পারি যে জগৎ বস্তুত এক। অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগৎ, মনোজগৎ ও প্রাণজগৎ—এ সবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। সবই এক, শুধু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। যখন তুমি নিজেকে দেহ বলে ভাব, তখন তুমি যে মন সে কথা ভুলে যাও; আবার নিজেকে যখন মন বলে ভাব, তখন দেহের কথা ভুলে যাও। শুধু একটি মাত্র সত্তা আছে, যা হচ্ছে 'তুমি', সেটিকে তুমি জড় পদার্থ বা দেহ বলে মনে করতে পার, কিংবা সেটিকে মন বা আত্মা রূপেও দেখতে পার। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এ সব প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। কেউ কখনও জন্মেনি, কেউ কখনও মরবেও না, শুধু স্থান পরিবর্তন করা হয়—তার বেশী কিছু নয়। পাশ্চাত্য দেশে মরণকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা হয় দেখে আমি দুঃখিত হয়েছি, একটু আয়ুলাভের জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট। 'মৃত্যুর পরেও যেন আমরা বেঁচে থাকি! আমাদের জীবন দাও!' যদি কেউ তাদের বলে যে মৃত্যুর পরেও তারা বেঁচে থাকবে, তাহলে তারা খুবই খুশি হয়। এ বিষয়ে আমি সন্দেহ করি কী ভাবে? কী করে আমি কল্পনা করি যে আমি মৃত। নিজেকে মৃত বলে ভাবতে চেষ্টা কর,

দেখবে যে তোমার নিজের মৃতদেহ দেখার জন্য তুমি বেঁচেই আছ। জীবন এত অদ্ভুত সত্য যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তা ভুলতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ হতে পারে না, বেঁচে থাকা সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। চেতনার প্রথম প্রমাণ হলো—'আমি হই'। যে অবস্থা কোনকালে ছিল না, তার কল্পনা কে করতে পারে? সব সত্যের মধ্যে এটিই সবচেয়ে স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। অকল্পনীয় বিষয় নিয়ে কী ভাবে আলোচনা করা যায়? যা স্বতঃসিদ্ধ তার খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাইব কেন?

তাই যে কোন দিক থেকেই তুমি দেখ না কেন, সমগ্র জগৎ হচ্ছে এক অখণ্ড সত্তা। এই মুহূর্তে যেমন আমাদের কাছে এই বিশ্বটি হচ্ছে প্রাণ ও আকাশের, শক্তি ও জড় পদার্থের এক অখণ্ড সত্তা। মনে থাকে যেন, অন্যান্য মূল তত্ত্বের মতোই এ তত্ত্বটিও স্ববিরোধী। কারণ শক্তি কি?—যা জড়পদার্থে গতি সঞ্চার করে। আর জড়পদার্থ কি?—যা শক্তি দ্বারা চালিত হয়। গোলমেলে সংজ্ঞা! জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের গর্ব সত্ত্বেও আমাদের যুক্তি-বিচারের কয়েকটি মূলনীতি খুবই অদ্ভুত। সংস্কৃত প্রবচনে যেমন বলা হয়, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা!' এমন অবস্থাকেই বলা হয় 'মায়া'। এর অস্তিত্ব নেই, নাস্তিত্বও নেই। একে তোমরা 'সৎ' বলতে পার না, কারণ যা দেশ-কালের অতীত, শুধু তারই অস্তিত্ব আছে, তাই শুধু 'সৎ'। তবু এই জগৎ আমাদের অস্তিত্বের ধারণাকে কিছুটা পরিতৃপ্ত করে। সেজন্য এর আপাত অস্তিত্ব আছে।

কিন্তু যেটি প্রকৃত সত্তা সেটি সব বস্তুর ভেতর-বাইরে জুড়ে রয়েছে। সেই সত্তাই যেন ধরা পড়েছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। এই অসীম, অনাদি, অনন্ত, চির আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্‌বস্তুটিই আমাদের স্বরূপ, আসল মানুষ। এই মানুষটি জড়িয়ে পড়েছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। জগতের সব কিছুরই এমন অবস্থা। সব কিছুরই সত্য স্বরূপ হচ্ছে ওই একই অসীমত্ব। এটি আদর্শবাদ নয়; এ কথার অর্থ এই নয় যে জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। এর এক আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে, যা এর সব প্রয়োজন পরিপূর্ণ করে। কিন্তু এর অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পারমার্থিক সত্তাকে অবলম্বন করেই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বিষয়বস্তু ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি। এখন মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দেহের ভেতর যা কিছু আলোড়ন ঘটছে, তা স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণেরই কাজ। এখন তোমরা বোঝ আমাদের অজ্ঞাতসারে যে কাজগুলি হচ্ছে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণে আনলে কত ভাল হবে।

অন্য এক সময় আমি তোমাদের ঈশ্বর ও মানবের সংজ্ঞার কথা বলেছি। মানুষ যেন এক অসীম বৃত্ত, যার পরিধি কোন স্থানে নেই, কিন্তু কেন্দ্র এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন এক অসীম বৃত্ত, যার পরিধি কোন স্থানে নেই, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র রয়েছে। ঈশ্বর সকলের হাত দিয়ে কাজ করেন, সকলের চোখ দিয়ে দেখেন, সব পা দিয়ে হাঁটেন, সব দেহের মধ্যে)দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলেন, সকলের

জীবনে বাস করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়ে কথা বলেন এবং প্রতি মস্তিষ্কের মাধ্যমে চিন্তা করেন। মানুষ ঈশ্বরের মতো হতে পারে এবং সমস্ত বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করতে পারে, যদি সে তার আত্মচেতনার কেন্দ্রকে অনন্তগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। কাজেই আমাদের বোঝার প্রথম বিষয় হলো এই চেতনা। ধরা যাক, অন্ধকারের মধ্যে এক আদি-অন্তহীন রেখা রয়েছে। রেখাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার উপর দিয়ে এক জ্যোতির্ময় বিন্দু নড়ে চলেছে। চলার সময় জ্যোতির্বিন্দুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর আলোকিত করছে এবং যা পিছনে থাকছে তা আবার অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। আমাদের চেতনাকে এই উজ্জ্বল বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানের অভিজ্ঞতা সরিয়ে দিচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতাকে কিংবা সেগুলি অবচেতন অবস্থা লাভ করছে। আমাদের মধ্যে সেগুলির অস্তিত্ব আমরা টের পাই না, কিন্তু সেগুলি থেকে যায় এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। চেতনার সাহায্য ছাড়া বর্তমানে সংঘটিত প্রতিটি কর্মই অতীতে সজ্ঞানে করা হয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট প্রেরণা শক্তি সেই সব কর্মে সঞ্চারিত হয়েছিল।

সব নীতিশাস্ত্রেই প্রধান ভুল হচ্ছে যে, কী উপায়ে মানুষ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকবে সেই সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যর্থতা। সব নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়,—'চুরি করো না!' ভাল কথা। কিন্তু মানুষ চুরি করে কেন? কারণ সব চুরি, ডাকাতি ও মন্দ কাজগুলি নিয়মানুযায়ী স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে। দাগী চোর-ডাকাত, মিথ্যেবাদী, অন্যায়কারী নরনারী তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমনি হয়ে উঠেছে। এটি সত্যই মনস্তত্ত্বের এক দারুণ সমস্যা। অত্যন্ত সহৃদয়তার দৃষ্টি নিয়ে মানুষের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। ভাল হওয়া অত সহজ নয়। মুক্তিলাভের আগে পর্যন্ত তুমি এক যন্ত্র ছাড়া কিছু নও। ভাল বলে কি তোমার গর্ব করা উচিত? নিশ্চয়ই নয়। তুমি ভাল, কারণ তা না হয়ে তোমার উপায় নেই। অন্যজন মন্দ, কারণ তা না হয়ে তার উপায় নেই। তার অবস্থায় পড়লে তুমি যে কী হতে তা কে জানে? রাস্তার মেয়েছেলে বা জেলখানার চোর যীশু খ্রীষ্টের মতোই বলিপ্রদত্ত হচ্ছে যাতে তুমি সৎ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পার। সামাজিক ভারসাম্যের এই হচ্ছে নিয়ম। যত চোর ও খুনী, যত অন্যায়কারী, দুর্বল, বদমাইশ, শয়তান—তারা সকলেই আমার যীশু খ্রীষ্ট। দেবরূপী খ্রীষ্ট ও দানবরূপী খ্রীষ্ট উভয়েই আমার পূজার্হ। এই আমার নীতি, এই নীতি আমি এড়াতে পারি না। সাধু-সন্তের চরণে, বদমাইশ-শয়তানের পদেও আমার প্রণাম। তারা সকলেই আমার শিক্ষক, সকলেই আমার ধর্মগুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা। কারুকে হয়তো অভিশাপ দিই, তবু তাদের পতনের ফলেই আমি উপকৃত হই। কারুকে হয়তো আমি আশীর্বাদ করি, তার সৎকার্যের ফলে আমি উপকৃত হই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা যতটা সত্য, আমার কথাগুলিও ততটা সত্য। রাস্তার দুশ্চরিত্রা নারীকে দেখে আমায় ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে হয়, কারণ সমাজ তাই চায়। সে আমার ত্রাণকর্ত্রী, তার পতিতাবৃত্তি অন্য নারীদের সতীত্ব রক্ষার কারণ। কথাটি ভেবে দেখ! স্ত্রী-পুরুষ তোমরা সকলে কথাটা মনে মনে

বিচার করে দেখ। কথাটা সত্য—নিরাবরণ নির্ভীক সত্য। আমি জগৎকে যত বেশী দেখছি, যত বেশী নরনারী দেখছি, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে। কার দোষ দেব? কার প্রশংসা করব? সব কিছুর দুদিক দেখতে হবে।

আমাদের সামনে বিরাট কাজ রয়েছে। আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে—আমাদের অবচেতন স্তরে যে সব চিন্তা তলিয়ে আছে, যেগুলি আমাদের কাছে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে; সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে খুঁজে বের করা। খারাপ কাজটি নিঃসন্দেহে চেতন স্তরেই ঘটে, কিন্তু এই মন্দ কর্মটিকে সংঘটিত করার কারণটা ছিল বহু দূরে আমাদের অগোচরে অবচেতনার রাজ্যে; সেজন্য তার শক্তিও বেশী।

ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব প্রথমেই অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করে, আর আমরা জানি যে আমরা তাকে আয়ত্তে আনতে পারি। কেন? কারণ আমরা জানি যে চেতনই হচ্ছে অবচেতনের কারণ। অবচেতন চিন্তা হচ্ছে আমাদের লক্ষ লক্ষ তলিয়ে-যাওয়া পুরানো চেতন-চিন্তা; পুরানো চেতনকর্মগুলিই নিষ্ক্রিয়রূপে থাকে—আমরা সেগুলির দিকে ফিরে তাকাই না, সেগুলিকে জানি না, সেগুলির কথা ভুলে গেছি। কিন্তু মনে রেখ, অবচেতন স্তরে যদি অসৎ শক্তি থাকে, তবে সৎ শক্তিও আছে। পকেটে রেখে দেওয়ার মতো আমাদের মধ্যে অনেক কিছু রেখে দেওয়া হয়েছে। আমরা সেগুলির কথা ভুলে গেছি, সেগুলির কথা ভাবি না পর্যন্ত; তার মধ্যে অনেকগুলি চিন্তা আছে যেগুলি পচে যাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এইসব অবচেতন কারণ বেরিয়ে এসে মানব সমাজকে বিনষ্ট করে। অতএব, যথার্থ মনস্তত্ত্বের উচিত চেতনার নিয়ন্ত্রণে এগুলিকে আনার জন্য চেষ্টা করা। আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে গোটা মানুষটিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা যাতে সে নিজে সর্বময় কর্তা হতে পারে। দেহের মধ্যে যে সব যন্ত্রগুলিকে আমরা স্বয়ংক্রিয় বলে থাকি, যেমন যকৃত ইত্যাদি, সেগুলিকে পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছাধীন করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হচ্ছে অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। তারপরে হচ্ছে চেতনার পারে যাওয়া। যেমন অবচেতনার কাজ হয় চেতনার নিচে, তেমনি চেতনার ঊর্ধ্বেও আর এক ধরনের কাজ হয়। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌছলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ করে, মৃত্যু অমরত্বে রূপান্তরিত হয়, দুর্বলতা অনন্ত শক্তিতে পরিণত হয়, লৌহ-শৃঙ্খল রূপায়িত হয় মুক্তিতে। অতিচেতনার এই অসীম রাজ্যই আমাদের লক্ষ্য।

অতএব আমরা এখন দেখছি যে, কাজটিকে দু ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথমে দুটি সাধারণ স্নায়ু-প্রবাহ ইড়া ও পিঙ্গলাকে ঠিক মতো পরিচালিত করে অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত চেতনারও পারে যেতে হবে।

শাস্ত্রে বলে, তিনিই একমাত্র যোগী, যিনি সুদীর্ঘ অভ্যাস দ্বারা আত্ম-সমাহিত হয়ে এই সত্যে উপনীত হয়েছেন। এই অবস্থায় সুষুম্না উন্মুক্ত হয় এবং এই নতুন

পথে—যে পথে ইতিপূর্বে কোন প্রবাহ প্রবেশ করেনি—এক প্রবাহ প্রবেশ করবে এবং ক্রমশ উর্ধ্বে উঠবে, বিভিন্ন পদ্মরূপ কেন্দ্রের (যোগশাস্ত্রের ভাষায় আমরা তাই বলি) মধ্যে দিয়ে অবশেষে মস্তিস্কে পৌছবে। যোগী তখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ, ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধি করেন।

আমরা সকলে—আমাদের প্রত্যেকেই যোগের এই চরম অবস্থা লাভ করতে পারি। কাজটি কিন্তু দুরূহ। যদি কেউ এই সত্যে উপনীত হতে চায়, তাহলে তাকে শুধু বক্তৃতা শোনা বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কিছু ব্যায়ামের চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে। প্রস্তুতির উপর সব কিছু নির্ভর করে। একটি আলো জ্বালাতে কতক্ষণ সময় লাগে? মাত্র এক সেকেণ্ড। কিন্তু বাতিটা তৈরি করতে কতটা সময় যায়! আহার করতে কতটুকু সময় লাগে? বোধহয় আধ ঘণ্টা। কিন্তু খাবারগুলি প্রস্তুত করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা এক সেকেণ্ডের মধ্যে আলো জ্বালাতে চাই, কিন্তু ভুলে যাই বাতিটি প্রস্তুত করাই হচ্ছে প্রধান কাজ।

যদিও লক্ষ্যে পৌছান খুব কঠিন, তবু তার জন্য আমাদের সামান্যতম প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় না। আমরা জানি, কিছুই হারিয়ে যায় না। গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ জন্মে যারা যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, তারা কি গ্রীষ্মের মেঘের মতো বিলুপ্ত হয়ে যায়?'

কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'এ জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না, সখা! মানুষ যা কিছু করে, তা তার নিজেরই থাকে। এ জন্মে যোগের ফললাভ না হলে, পরজন্মে আবার তাকে এটি নিতে হবে।'

একথা না জানালে যীশু, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্য-অবস্থার ব্যাখ্যা কী করে করবে?

প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি নিঃসন্দেহে যোগের সহায়ক। কিন্তু এ সবই কেবল দৈহিক। বড় প্রস্তুতি হচ্ছে মানসিক। তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন শান্ত সমাহিত জীবন।

যদি তোমরা যোগী হতে চাও, তবে তোমাদের স্বাধীন হতে হবে। নিজেকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে, যেখানে তুমি একা ও সর্ব প্রকার দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত। যে আরামদায়ক সুখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করতে চায়, সে হচ্ছে সেই মূর্খের মতন যে নদী পার হবার জন্য কাঠের টুকরো ভেবে কুমিরকে আঁকড়ে ধরে। 'প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান কর, সর্ববস্তু তোমার নিকট আসবে।' এটাই এক বড় কর্তব্য, এটাই বৈরাগ্য। একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, মনে আর অন্য কিছুকে স্থান দিও না। আমাদের সর্বশক্তিকে নিয়োগ করা যাক সেই বস্তুটিকে লাভ করার জন্যে, যার কোনকালে বিনাশ নেই—সেটি হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা। আত্মোপলব্ধি লাভের বাসনা সত্যিই থাকলে আমাদের লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের বিকাশ ঘটবে। আমরা বহু ভুল করতে পারি, কিন্তু সেই ভুলগুলি ছদ্মবেশী দেবদূতরূপে মঙ্গল করতে পারে।

অধ্যাত্ম-জীবনের সবচেয়ে বড় সহায় হচ্ছে ধ্যান। ধ্যানে আমরা সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হই এবং আমাদের দেবত্বকে অনুভব করি। ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভর করি না। আত্মার স্পর্শে মলিনতম স্থানগুলিও উজ্জ্বলতম বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠতে পারে, জঘন্যতম বস্তুও সুরমণ্ডিত হতে পারে, শয়তান দেবতায় পরিণত হতে পারে—সব শত্রুতা, সব স্বার্থপরতা মুছে যেতে পারে। দেহবোধ যত কম হয়, ততই ভাল। কারণ দেহই আমাদের টেনে নিচে নামায়। দেহের প্রতি আসক্তির জন্য, দেহাত্মবোধের জন্য, আমাদের জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। রহস্যটি হচ্ছে এই:—চিন্তা করতে হবে যে আমি দেহ নই, আমি আত্মা এবং সমস্ত জগৎ, তার সম্পর্কিত যা কিছু, ভাল-মন্দ সব কিছুই হচ্ছে পর পর সাজানো কতকগুলি ছবি মাত্র—পটে আঁকা দৃশ্যাবলী,—যেগুলির আমি হচ্ছি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টামাত্র।

ভক্তি বা ঈশ্বরানুরাগ

খুব অল্প কয়েকটি ছাড়া প্রায় সব ধর্মেই সাকার ঈশ্বরের ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ছাড়া বোধহয় জগতের সব ধর্মেই সাকার ঈশ্বরের ধারণা আছে এবং সেই সঙ্গে ভক্তি ও উপাসনার ধারণাও জড়িত। বৌদ্ধ ও জৈনদের যদিও কোন সাকার ঈশ্বর নেই, কিন্তু অন্যেরা যেভাবে সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা ঠিক সেই ভাবেই তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের উপাসনা করে। কোন মহান সত্তাকে ভক্তি ও উপাসনা করতে হয়, যিনি মানুষের ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারেন—এই ধারণাটি সর্বজনীন। বিভিন্ন ধর্মে এই ভক্তি ও ভালবাসা বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নতম স্তর হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠান, যেখানে সূক্ষ্মভাব প্রায় একেবারেই অসম্ভব ; সূক্ষ্মভাবগুলিকে একেবারে নিম্নস্তরে নামিয়ে স্থূল আকারে পরিণত করা হয়েছে। নানারকম ক্রিয়াপদ্ধতির সঙ্গে নানা রকম প্রতীক এসে জুটেছে। জগতের সারা ইতিহাসেই আমরা দেখি যে মানুষ বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক রূপের মাধ্যমে বা প্রতীকের সাহায্যে সূক্ষ্ম ভাবকে ধরার চেষ্টা করেছে। ধর্মের বাহ্যিক অঙ্গগুলি—কাঁসরঘণ্টা, স্তবস্তোত্র, যাগযজ্ঞ, শাস্ত্র, মূর্তি—হচ্ছে ওই পর্যায়ভুক্ত। যা কিছু ইন্দ্রিয়-গুলির কাছে আবেদন কর, যা কিছু অমূর্তভাবকে মানুষের কাছে মূর্ত করতে সাহায্য করে, তাকেই গ্রহণ করে উপাসনার কাজে লাগানো হয়েছে।

মাঝে মাঝে সব ধর্মেই সংস্কারকদের আবির্ভাব হয়, যাঁরা সবরকম অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁদের বিরোধীতা ব্যর্থ হয়, কারণ মানুষ যতদিন বর্তমান অবস্থায় থাকবে, ততদিন তাদের অধিকাংশই সর্বদা চাইবে স্থূল কোন বস্তু আঁকড়ে ধরতে, যা তাদের ভাবগুলিকে ধারণ করবে, যা তাদের মনের ভাবমূর্তিগুলির কেন্দ্র হবে। মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা হচ্ছে সবরকম আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যেও আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছে। এগুলির প্রবেশ রোধ করা যায় না ; দীর্ঘ সংগ্রামের পরে দেখা যায় জনসাধারণ একটি প্রতীকের পরিবর্তে অপর একটিকে শুধু গ্রহণ করে। একজন মুসলমান মনে করে যে, অমুসলমানের প্রতিটি অনুষ্ঠান, প্রতিটি প্রতীক বা মূর্তি, ক্রিয়াকলাপ পাপে পূর্ণ, কিন্তু তার কাবা-মন্দিরে যখন আসে তখন সে সম্বন্ধে আর এ কথা মনে করে না। প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমান যেখানেই নমাজ পড়ুক না কেন, তাকে ভাবতে হয় যে সে কাবা-মন্দিরে আছে। যখন সে সেখানে তীর্থ করতে যায়, তাকে ওই মন্দিরের দেয়ালে অবস্থিত কালো পাথরটিকে চুম্বন করতে হয়। ওই পাথরে মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ তীর্থ যাত্রীর চুম্বনের চিহ্নগুলি শেষবিচারের দিনে বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্যে সাক্ষ্য দেবে। তারপর, আবার 'জিমজিম' কুয়ো আছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ওই কুয়ো থেকে যে কেউ একটু জল তুললে তার পাপ ক্ষমা করা হবে এবং সে পুনরুত্থানের দিন নবদেহ লাভ করে অনন্ত জীবন পাবে। অন্যান্য ধর্মে দেখতে পাই যে প্রতীক একটি

গৃহের রূপ ধারণ করেছে। প্রোটেস্ট্যান্টদের কাছে অন্যান্য স্থানের চেয়ে গির্জা বেশি পবিত্র। গির্জা হচ্ছে একটি প্রতীক। তারপর আছে শাস্ত্রগ্রন্থ। তাদের কাছে অন্যান্য যে কোন প্রতীকের চেয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ হচ্ছে পবিত্রতর।

প্রতীক উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা। আর কেনই বা আমরা তার বিরুদ্ধে প্রচার করব? মানুষের কেন এই সব প্রতীক ব্যবহার করা উচিত নয়, তার কোন যুক্তি নেই। প্রতীকের পিছনে উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিরূপেই মানুষ ওইগুলি ব্যবহার করে থাকে। এই বিশ্বই এক প্রতীক, এর মধ্যে দিয়ে ও এর সাহায্যে আমরা এর পিছনে ও এর পরে অবস্থিত লক্ষ্য বস্তুকে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মা, জড় নয়। মূর্তি, ঘণ্টা, প্রদীপ, শাস্ত্র, গির্জা, মন্দির ইত্যাদি সব পবিত্র প্রতীক খুব ভাল বটে, আধ্যাত্মিক—অঙ্কুরের বৃদ্ধির পক্ষে খুব সহায়ক; কিন্তু ওই পর্যন্ত, ওর বেশী আর উপযোগিতা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি অঙ্কুর আর বৃক্ষে পরিণত হয় না। গির্জার মধ্যে জন্মানোটা খুব ভাল, কিন্তু তার মধ্যে মরাটা খুব খারাপ। কিছু সাধনপ্রণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ে জন্মানো খুবই ভাল, তা ধর্মভাবরূপ চারাগাছটিকে বড় হতে সাহায্য করে। কিন্তু মানুষটি যদি সেই প্রণালীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে মারা যায়, তাহলে প্রমাণিত হয় তার কোন উন্নতি হয়নি, তার আত্মার বিকাশ হয়নি।

অতএব যদি কেউ বলে, এই সব প্রতীক, পদ্ধতি, অনুষ্ঠান চিরকালের জন্য ধরে রাখতে হবে; তবে সে ভ্রান্ত। কিন্তু যদি সে বলে, এই সব প্রতীক ও অনুষ্ঠান আত্মার বিকাশের সহায়ক এবং তার নিম্ন ও অনুন্নত অবস্থায় এগুলি প্রয়োজন; তবে সে ঠিক বলছে। কিন্তু তোমরা একটা ভুল করো না, আত্মার উন্নতির অর্থ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নয়। একজন মানুষের অসাধারণ বুদ্ধি থাকতে পারে, তবু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সে হয়তো শিশুমাত্র। এই মুহূর্তে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। তোমরা সকলেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিক্ষা পেয়েছ। এটা চিন্তা করার চেষ্টা কর। তোমাদের মধ্যে কজন ধারণা করতে পার সর্বব্যাপী বলতে কী বোঝায়? যদি খুব চেষ্টা করতো সমুদ্র আকাশ বা বিশাল সবুজ প্রান্তর বা মরুভূমির ভাব মনে আনতে পার। এগুলি সবই জড় প্রতিমূর্তি। যতদিন না সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে অদর্শরূপে ধারণা করতে পারছ, ততদিন এই সব জড়বস্তুর, এইসব রূপের সাহায্য তোমাদের নিতে হবে। এই জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভেতরে থাকুক বা বাইরে থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা সকলেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক, আর পৌত্তলিকতা ভাল, কারণ এটা মানুষের প্রকৃতিগত। কে এর পরে যেতে পারে? কেবল পূর্ণমানব, দেবমানবরাই পারেন। বাকী সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আমরা এই বিভিন্ন আকার ও রূপ বিশিষ্ট জগৎ প্রপঞ্চ দেখছি, ততদিন আমরা সবাই পৌত্তলিক। এই জগৎরূপে বিরাট প্রতীকের আমরা উপাসনা করছি। যে বলে আমি দেহ, সে তো জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। আমরা আত্মা, আত্মার কোন রূপ বা আকার নেই, আত্মা অসীম, জড় নয়। অতএব, যে লোক সূক্ষ্ম ধারণায় অসমর্থ, নিজের স্বরূপ চিন্তা করতে পারে না, নিজেকে জড়বস্তু দেহরূপে ভাবে এবং

সেইরূপে না ভেবে থাকতে পারে না, সেই হচ্ছে পৌত্তলিক। তবুও মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করে, একজন অন্যজনকে পৌত্তলিক বলে। অর্থাৎ বলা চলে, প্রত্যেক নিজের উপাস্য পুতুলকে ঠিক মনে করে এবং অন্যের উপাস্য পুতুলকে ভুল মনে করে।

অতএব, আমাদের এই সব বালকোচিত ধারণাকে ত্যাগ করা উচিত। আমাদের অজ্ঞ ব্যক্তিদের বাদানুবাদের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, যারা মনে করে ধর্ম কতকগুলি অসার কথার সমষ্টিমাত্র, কতকগুলি নীতি ব্যবস্থা, যাদের কাছে ধর্ম কেবলমাত্র বিচার বুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতি, যাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে তাদের পুরোহিতরা যে কথাগুলি বলেছে তাতে বিশ্বাস, যাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা বিশ্বাস করতেন, যাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কারের সমষ্টি, যা তারা আঁকড়ে ধরে থাকে সেগুলি তাদের জাতীয় সংস্কার বলে। আমাদের এ সবের পারে যেতে হবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক বিরাট প্রাণীরূপে দেখতে হবে, যে ধীরে ধীরে আলোকের দিকে এগিয়ে আসছে। এ যেন এক আশ্চর্য চারাগাছ, যে এক বিস্ময়কর সত্যের কাছে নিজেকে মেলে ধরছে, সেই সত্যের নাম ঈশ্বর। এই সত্যের অভিমুখে প্রথম গতি, প্রথম ঘূর্ণন সর্বদাই জড়ের মধ্যে দিয়ে, অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

এই সব অনুষ্ঠানের অন্তরে একটি ভাবই বাকী সবকিছুর থেকে প্রধান হয়ে উঠেছে—নামোপাসনা। তোমাদের মধ্যে যারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছ, যারা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছ, তারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে, সকল ধর্মের মধ্যেই এই ভাবটি প্রচলিত ছিল—নামোপাসনা। কোন নামকে সবচেয়ে পবিত্র বলা হয়। বাইবেলে আমরা পড়ি যে ঈশ্বরের নাম এত পবিত্র মনে করা হতো যে কেউ তা উচ্চারণ করতে পারত না, যে কোন সময়ে তা উচ্চারণ করা চলত না, কিছুর সঙ্গে তার তুলনা করা চলত না। সব নামের মধ্যে সেটি পবিত্রতম এবং ভাবা হতো ওই নামই হচ্ছে ঈশ্বর। এটা সম্পূর্ণ সত্য। এই বিশ্ব জগৎ নামরূপ ছাড়া আর কী? শব্দ বা নাম ছাড়া কিছু ভাবতে পার? শব্দ ও ভাব অভিন্ন। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পার তো এ দুটিকে পৃথক করার চেষ্টা কর। যখনই তুমি চিন্তা কর, তখনই শব্দ রূপের মাধ্যমে তা কর। একটি আর একটিকে নিয়ে আসে; ভাব শব্দকে নিয়ে আসে এবং শব্দ ভাবকে নিয়ে আসে। তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন ঈশ্বরের বাহ্য প্রতীক, এর পিছনে রয়েছে তাঁর পুণ্য নাম। প্রত্যেক বিশেষ দেহ হচ্ছে একটি রূপ, আর ওই বিশেষ দেহের পেছনে আছে তার নাম। যখনই তোমরা তোমাদের অমুক বন্ধুর কথা ভাব, তখনই তোমরা তার দেহের কথা ভাব এবং দেহের কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার নামের কথাও মনে উদয় হয়। এটি মানুষের প্রকৃতিগত। তার মানে বলা যেতে পারে, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষের মনের মধ্যে রূপজ্ঞান ব্যতীত নামজ্ঞান আসতে পারে না এবং নামজ্ঞান ব্যতীত রূপজ্ঞান আসতে পারে না। এরা অভিন্ন, এরা একই তরঙ্গের বাইরের দিক ও ভেতরের দিক। এই কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত হয়েছে। মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নাম-মাহাত্ম্য জানতে পেরেছে।

আবার আমরা দেখতে পাই বহু ধর্মে সাধু মহাপুরুষদের উপাসনা করা হয়। লোকে কৃষ্ণের উপাসনা করে, বুদ্ধের উপসনা করে, যীশুর উপাসনা করে, আরও অনেকের উপাসনা করে। আবার সাধুদের পূজাও প্রচলিত আছে: সারা জগতে শত শত সাধু-সন্তদের পূজা হয়ে থাকে। আর হবে নাই বা কেন? আলোর স্পন্দন সর্বত্র রয়েছে। পেঁচা অন্ধকারে তা দেখতে পায়। এতে প্রমাণিত হয় যে অন্ধকারেও আলো আছে, কিন্তু মানুষ তা দেখতে পায় না। মানুষের কাছে ওই আলোর স্পন্দন শুধুমাত্র প্রদীপ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সকল সত্তার মধ্যে প্রকাশিত করছেন, কিন্তু মানুষ কেবল তাঁকে মানুষের মধ্যেই দেখতে পায়, চিনতে পারে। যখন তাঁর আলোক, তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর চৈতন্য মানুষের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হয়, তখন—শুধু তখনই মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে। এইভাবে, মানুষ চিরকাল মানুষের মধ্যে দিয়েই ভগবানের উপাসনা করে এসেছে এবং যতদিন সে মানুষ থাকবে এই ভাবেই করে যাবে। সে এর বিরুদ্ধে চিৎকার করতে পারে, লড়াই করতে পারে, কিন্তু যখনই সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, তখন দেখবে ঈশ্বরকে মানুষরূপে চিন্তা করাটাই মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন।

অতএব আমরা দেখি যে, প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বর-উপাসনার জন্য তিনটি প্রাথমিক বিষয় আছে,—মূর্তি বা প্রতীক, নাম ও দেবতুল্য মানব। সকল ধর্মেই এগুলি আছে, তবু দেখবে যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করতে চায়। কেউ বলে, আমার নামই একমাত্র নাম; আমি যে রূপের উপাসক, সেটিই একমাত্র রূপ; আমার দেব-মানবরাই জগতে একমাত্র দেবমানব। তোমারগুলি শুধু পৌরাণিক গল্প। বর্তমানকালের খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা একটু সদয় হয়েছেন। তাঁরা বলেন প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রীষ্টান ধর্মেরই পূর্বাভাস, অবশ্য তাঁদের খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। ঈশ্বর প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করছিলেন, শেষে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সেগুলি পরিণতি লাভ করে। পূর্বের গোঁড়ামির চেয়ে এটা অন্তত প্রগতির লক্ষণ। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁরা এ কথাটাও বলতেন না; তাঁদের নিজেদের ধর্ম ছাড়া আর সবই অসত্য। এই ভাব কোন ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। লোকে সর্বদাই ভাবে যে সে নিজে যা করছে, সেটি করাই অন্যের পক্ষে উচিত কাজ হবে। বিভিন্ন ধর্মের চর্চা এই ব্যাপারটিতে আমাদের সাহায্য করে। এতে বুঝতে পারা যায়, যে ভাবগুলিকে আমরা আমাদের নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে চিন্তা করছিলাম, সেগুলি শত শত বছর আগে অন্যের ভেতর বর্তমান ছিল। এমন কি কখনও কখনও আমরা যে ভাবে ওগুলিকে ব্যক্ত করছি, তার চেয়ে ভাল ভাবে ব্যক্ত ছিল।

ভক্তির এই সব বাহ্যিক রূপের মধ্যে দিয়ে মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু যদি সে অকপট হয়, যদি সে প্রকৃতই সত্যে পৌঁছাতে চায়, তবে সে এগুলির চেয়ে এক উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়, যেখানে বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি মূল্যহীন। মন্দির বা গির্জা, শাস্ত্র বা অনুষ্ঠান হচ্ছে ধর্মের শিশু-শিক্ষালয়মাত্র, অধ্যাত্ম-পথের শিশুটিকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কিছুটা শক্তিমান করে তোলে। আর যদি কেউ ধর্ম চায়,

তাহলে তার এই প্রাথমিক সোপানগুলির প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা থেকেই প্রকৃত অনুরাগ বা প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়। কার এই আকাঙ্ক্ষা আছে? সেটাই প্রশ্ন। ধর্ম নীতিকথা মতবাদে নেই, তর্কযুক্তিতে নেই। ধর্ম হচ্ছে —হওয়া, ধর্ম হচ্ছে—অপরোক্ষানুভূতি। আমরা শুনতে পাই অনেকেই ঈশ্বর, আত্মা, বিশ্ব-রহস্য নিয়ে নানা কথা বলে, কিন্তু তাদের এক-একজনকে ধরে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছ? তুমি কি নিজ আত্মাকে দর্শন করেছ?'—কজন সাহস করে বলতে পারবে তারা করেছে? তা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে।

এক সময়ে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একত্রে সমবেত হয়ে তর্ক শুরু করেছিল। একজন বলল যে শিবই একমাত্র দেবতা; আর একজন বলল যে বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা এবং আর একজন অন্য দেবতার কথা বলল। এই নিয়ে তাদের আলোচনা আর শেষ হয় না। এক ঋষি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, বিবদমানরা তাঁকে বিষয়টির মীমাংসা করে দেবার জন্যে আহ্বান জানাল। তিনি প্রথমে যে ব্যক্তি শিবকে বড় বলছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি শিবকে দেখেছ? তার সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে? যদি না থাকে, তবে কেমন করে জানলে তিনি সবচেয়ে বড় দেবতা?' তারপর বিষ্ণুর উপাসককে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বিষ্ণুকে দেখেছ?' তাদের সকলকে প্রশ্ন করে তিনি টের পেলেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের কেউ কিছু জানে না। সেই জন্যই তারা অত বিবাদ করছিল, যদি তারা সত্যিই ঈশ্বরকে জানত, তাহলে আর তর্ক করত না। শূন্য কলসী জলে ডোবালে শব্দ হয়, কিন্তু সেটি পূর্ণ হয়ে গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ প্রমাণ করে যে, তারা ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ধর্ম তাদের কাছে বইতে লেখার জন্য একরাশ বাজে কথামাত্র। সকলেই এক-একখানা বড় বই লিখতে ব্যস্ত, বইয়ের কলেবর যতদূর সম্ভব বড় করতে হবে, সেজন্য অন্য যতগুলি বই থেকে পারে সে বিষয়বস্তু চুরি করে এবং কখনও তার ঋণ স্বীকার করে না। তারপর সেই বই প্রকাশ করে পৃথিবীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, আগের থেকেই সেখানে যত গণ্ডগোল আছে, তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

অধিকাংশ লোকই নাস্তিক। আমি আনন্দিত যে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে আর এক শ্রেণীর নাস্তিকের উদ্ভব হয়েছে,—আমি জড়বাদীদের কথা বলছি। তারা অকপট নাস্তিক। কপট ধর্মবাদী নাস্তিকের চেয়ে তারা ভাল। ধর্মবাদী নাস্তিকরা ধর্মের কথা বলে। ধর্ম নিয়ে বিবাদ করে, অথচ তারা ধর্ম চায় না, কখনও ধর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না, কখনও তা বোঝারও চেষ্টা করে না। খ্রীষ্টের কথাগুলি স্মরণ কর:—'চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে; খোঁজ, তুমি তা পাবে; করাঘাত করলে তোমার কাছে দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।' এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য, রূপক বা কল্পনা নয়। এই কথাগুলি ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান পুত্রদের অন্যতম একজনের হৃদয়ের শোণিত হতে উৎসারিত হয়েছে, যিনি আমাদের এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন;

এই কথাগুলি সেই মানুষের প্রত্যক্ষানুভূতির ফল, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করেছিলেন, তুমি-আমি এই বাড়িটাকে যেমন প্রত্যক্ষ করছি, তার চেয়ে শতগুণ স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন। ঈশ্বরকে কে চায়? এটাই প্রশ্ন। তোমরা কি মনে কর পৃথিবীশুদ্ধ লোক ঈশ্বরকে চেয়েও পাচ্ছে না? তা কখনও হতে পারে না। এমন কি অভাব আছে যা পূরণ করার উপযোগী বস্তু বাইরে নেই? মানুষ নিঃশ্বাস নিতে চায়, তার জন্য বাতাস আছে। মানুষ খেতে চায়, সেজন্য খাদ্য আছে। কোথা থেকে এই সব বাসনার উৎপত্তি? বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব থেকে। আলোই চক্ষু সৃষ্টি করেছে, শব্দই কর্ণ সৃষ্টি করেছে। এইভাবে মানুষের প্রতিটি বাসনাই পূর্ব থেকে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তুর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ণত্বলাভের বাসনা, লক্ষ্যে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির পারে যাবার ইচ্ছা কোথা থেকে এল, যদি না কোন বস্তু সেটি সৃষ্টি করে থাকে, মানুষের আত্মার ভেতর সেটি প্রবেশ করিয়ে না দিয়ে থাকে এবং সেটিকে ওখানেই স্থিতি করিয়ে দিয়ে থাকে? অতএব যার ভেতর এই বাসনা জেগেছে, সে লক্ষ্যে পৌঁছবে। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সব কিছু চাই। তোমাদের চারপাশে যা দেখ তা ধর্ম নয়। আমাদের গিন্নীর বসার ঘরে সারা পৃথিবী থেকে আসবাবপত্র আনা হয়েছে এবং সম্প্রতি ফ্যাশান হয়েছে জাপানী কিছু রাখার, তাই তিনি একটি জাপানী ফুলদানি কিনে ঘরে রাখলেন। অধিকাংশ লোকের কাছে ধর্মটা এমনধারা; তাদের ভোগের জন্য সর্বপ্রকার বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গে একটু ধর্মের ছিটেফোঁটা না হলে জীবনটা ঠিক মতো হয় না, কারণ সমাজ তাদের সমালোচনা করবে। সমাজ প্রত্যাশা করে, তাই তাদের কিছুটা ধর্ম চাই। পৃথিবীতে এই হচ্ছে ধর্মের বর্তমান অবস্থা।

এক শিষ্য তার গুরুর কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আমি ধর্ম লাভ করতে চাই।'

গুরু যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসলেন। যুবকটি প্রতিদিন এসে ধর্মলাভের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি এ বিষয়ে যুবকটির চেয়ে ভাল বুঝতেন। একদিন খুব গরম পড়ায় তিনি যুবকটিকে তাঁর সঙ্গে নদীতে গিয়ে স্নান করতে বললেন। যুবকটি জলে ডুব দিতেই বৃদ্ধ তার পিছনে গিয়ে তাকে জলের নিচে জোর করে চেপে ধরলেন। যুবকটি খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করলে পরে তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জলের মধ্যে থাকার সময় সে সবচেয়ে বেশী কী চেয়েছিল।

শিষ্য উত্তর দিল, 'নিশ্বাসের জন্য বাতাস।'

তখন গুরু বললেন, 'ভগবানকে কি ওই রকম ভাবে চাও? যদি চাও তো মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে পাবে।'

যতক্ষণ না তোমাদের ওই রকম ব্যাকুলতা, ওই রকম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, ততক্ষণ তোমাদের ধর্মলাভ হবে না, যতই তর্ক বিচার কর, যতই শাস্ত্র পড় বা বাহ্য অনুষ্ঠান কর, কিছুতেই কিছু হবে না। যতদিন না তোমার মধ্যে ওই ধর্মপিপাসা জাগছে, ততদিন

নাস্তিকের চেয়ে তুমি বিন্দুমাত্র ভাল নয়। নাস্তিক বরং অকপট, কিন্তু তুমি তা নও।

এক বড় ঋষি বলতেন, 'মনে কর, একটা ঘরে এক চোর আছে। কোনক্রমে সে জানতে পারল পাশের ঘরে একতাল সোনা রয়েছে এবং দুটি ঘরের মধ্যে একটা খুব পাৎলা পার্টিশান রয়েছে। চোরটার কী অবস্থা হবে? তার ঘুম ছুটে যাবে, খেতে পারবে না বা কিছু করতে পারবে না। তার সারা মন পড়ে থাকবে কী করে ওই সোনার তালটা পাবে সেই দিকে। তোমরা কি বলতে চাও, যদি এইসব লোকেরা সত্যি বিশ্বাস করত যে, সুখ আনন্দ ও মহিমার খনি ভগবান এখানে আছেন, তাহলে তাঁকে লাভ করার চেষ্টা না করে সাধারণভাবে সংসারিক কাজ করে যেত?'

যেই মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ঈশ্বর আছেন, তখনই সে তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে ওঠে। অন্যেরা নিজের নিজের পথে চলতে পারে, কিন্তু যখনই কেউ নিশ্চিত হয় যে, সে যে রকম জীবন যাপন করছে তার চেয়ে উন্নততর জীবন আছে, যখনই সে নিশ্চিতরূপে অনুভব করে যে ইন্দ্রিয়গুলিই মানুষের সর্বস্ব নয়, যখনই সে বুঝতে পারে যে আত্মার অবিনাশী নিত্য অক্ষয় আনন্দের তুলনায় এই সীমাবদ্ধ জড়দেহ কিছু নয়, তখনই সে পাগলের মতো হয়ে ওঠে, যতক্ষণ না সেই আনন্দ নিজে খুঁজে পাচ্ছে। এই উন্মত্ততা, এই তৃষ্ণা, এই ঝোঁককে ধর্মজীবনের 'জাগরণ' বলে এবং যখনই মানুষের এই অবস্থা হয়, তখনই তার ধর্মজীবন শুরু হয়।

কিন্তু এটা হতে অনেক সময় লাগে। এই সব আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, তীর্থভ্রমণ, শাস্ত্রাদি, কাঁসর-ঘণ্টা, প্রদীপ, পুরোহিত প্রভৃতি ওই অবস্থার জন্যই প্রস্তুতি। এইগুলি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত যখন পবিত্র হয়ে ওঠে, তখন তা স্বভাবতই সর্ব পবিত্রতার আকার স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ করতে চায়। বহু শতাব্দীর ধূলিতে আবৃত লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট সারাক্ষণ থাকলেও তার দ্বারা আকর্ষিত হয় না, কিন্তু যেই ধূলি অপসারিত হয় অমনি সেই লৌহখণ্ডকে চুম্বক আকর্ষণ করে নেয়। তেমনই ধারা জীবাত্মা শত শত যুগের অপবিত্রতা, দুর্বৃত্ততা ও পাপের ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন থাকে। এইসব আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা, পরের হিতসাধন দ্বারা, পরকে ভালবেসে বহু জন্মের পরে যখন সে যথেষ্ট পবিত্র হয়, তখন তার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণগুণ জন্মায়। সে জেগে উঠে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হবার জন্য সংগ্রাম করে।

তবুও, এই সব মূর্তি ও প্রতীক উপাসনা ধর্মের সূচনামাত্র। এগুলি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম নয়। প্রেমের কথা সব জায়গায় আমরা বলতে শুনি। প্রত্যেকেই বলে, 'ঈশ্বরকে ভালবাস।' মানুষ জানে না ভালবাসা কী। যদি জানত, তবে এত হাল্কা ভাবে এ কথা তারা বলত না। প্রত্যেকেই বলে সে ভালবাসতে পারে, তারপর অল্পকাল পরেই দেখা যায় তার প্রকৃতিতে ভালবাসা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক নারী বলে সে ভালবাসতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই দেখতে পায় যে সে ভালবাসতে পারে না। এই পৃথিবী ভালবাসার কথায় ভরা, কিন্তু ভালবাসা বড় শক্ত। ভালবাসার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তা লাভ-ক্ষতি জানে না। যতক্ষণ তুমি দেখবে একজন অন্যজনের কাছে

কিছু পাবার জন্য তাকে ভালবাসছে, তখনই বুঝবে সেটি ভালবাসা নয়, তা হচ্ছে দোকানদারি। যেখানে কেনাবেচার প্রশ্ন থাকে, সেটি ভালবাসা নয়। কাজেই যখন মানুষ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 'আমাকে এটা দাও, সেটা দাও।'—সেটি ভালবাসা নয়। কী করে হবে? আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানালাম, তুমি তার বদলে আমায় কিছু দিলে,—এটা তো হচ্ছে কেবল দোকানদারি।

খুব বড় এক রাজা বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন, সেখানে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। সাধুর সঙ্গে অল্প আলাপ করে রাজা এত খুশি হলেন যে, তাঁর কাছ থেকে কিছু উপহার গ্রহণ করার জন্য সাধুকে অনুরোধ করলেন।

সাধু বললেন, 'না, আমি নিজের অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট আছি। এই সব গাছ আমার আহারের জন্য যথেষ্ট ফল দেয়। এই সুন্দর পবিত্র ঝর্ণাগুলি আমার প্রয়োজন মতো জলদান করে। এই সব গুহায় আমি নিদ্রা যাই। যদিও তুমি সম্রাট, তবু তোমার উপহারে আমার কী প্রয়োজন?'

রাজা বললেন, 'শুধু আমাকে কৃতার্থ করার জন্যে, পবিত্র করার জন্য আমার সঙ্গে রাজধানীতে চলুন, আমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করুন!'

অবশেষে সাধু সম্রাটের সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন। তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে সোনা, হীরা-জহরৎ, দামী পাথর ও আরও অনেক বিস্ময়কর বস্তু ছিল। চারদিকে ঐশ্বর্য-বৈভবের চিহ্ন। সম্রাট তাঁর প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধুকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর ঘরের এক কোনে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'প্রভু, আমাকে আরও সম্পদ দাও, আরও সন্তান-সন্ততি, আরও সাম্রাজ্য।'

ইতিমধ্যে সাধু উঠে চলে যাওয়া শুরু করলেন। রাজা তা দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, দাঁড়ান! আপনি আমার উপহার না নিয়ে চলে যাচ্ছেন?'

সাধু তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি কী দেবে? তুমি নিজেই তো সবসময় ভিক্ষা চাইছ।'

প্রেমের ভাষা অমন নয়। যদি ভগবানের কাছে তুমি এটা সেটা দেবার জন্য প্রার্থনা কর, তবে প্রেমে আর দোকানদারিতে তফাৎ কি? প্রেমের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, তা কোন আদান-প্রদান জানে না। প্রেম সর্বদাই দাতা, কোনকালেই গ্রহীতা নয়। ঈশ্বরপুত্র বলেন, ঈশ্বর যদি চান তো আমি তাঁকে আমার সর্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না। এ জগতে আমি কিছুই চাই না। তাঁকে ভালবাসতে চাই বলেই আমি তাঁকে ভালবাসি, তার বদলে তাঁর কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ চাই না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিনা তা কে জানতে চায়? আমি তাঁর কাছ থেকে কোন শক্তি চাই না বা তাঁর শক্তির কোন প্রকাশও দেখতে চাই না। তিনি প্রেমের ঠাকুর এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমি আর কিছু বলতে চাই না।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে যে, প্রেম কোন ভয় জানে না। যতকাল মানুষ ভাববে ভগবান এমন একজন, যিনি মেঘের উপর বসে একহাতে পুরস্কার ও অন্য হাতে

দণ্ড দিচ্ছেন, ততকাল কোন ভালবাসা সম্ভব নয়। ভয় দেখিয়ে কি কারুকে ভালবাসানো যায়? মেষ কি সিংহকে ভালবাসে? ইঁদুর বিড়ালকে? ক্রীতদাস মনিবকে? ক্রীতদাসরা মাঝে মাঝে ভালবাসার ভান করে, কিন্তু সে কি সত্যি ভালবাসা? কোথাও কখনও দেখেছ ভয়ের মধ্যে ভালবাসা আছে? সেটা সব সময় ভান। ভালবাসার সঙ্গে কখনও ভয়ের ভাব থাকতে পারে না। ভেবে দেখ—রাস্তায় এক তরুণী জননী আছে। যদি একটা কুকুর তাকে দেখে ডেকে ওঠে, সে অমনি দৌড়ে কাছের বাড়িটিতে ঢুকে পড়বে। মনে কর পরদিন সে তার ছেলেটিকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, একটা সিংহ ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, মা তখন কোথায় থাকবে? নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য একেবারে সিংহের মুখে। ভালবাসা তার সব ভয়কে জয় করেছে। ঈশ্বর প্রেমেও তাই হয়। ঈশ্বর পুরস্কার দাতা না দণ্ড বিধাতা তার পরোয়া কে করে? প্রেমিকের এমন চিন্তা হয় না। একজন বিচারপতির কথা ভাব, যখন তিনি বাড়ি আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে কীভাবে দেখেন? বিচারপতি বা পুরস্কার দাতা বা দণ্ডদাতারূপে নয়, তার স্বামীরূপে, প্রেমিকরূপে। তাঁর সন্তানরা তাঁকে কী ভাবে দেখে? তাদের স্নেহময় পিতারূপে, শাস্তিদাতা বা পুরস্কারদাতারূপে নয়। তেমনি ঈশ্বরের সন্তানরাও তাঁকে কখনও পুরস্কারদাতা বা দণ্ড বিধাতা বলে দেখে না। যারা তাঁর প্রেমের স্বাদ কখনও পায়নি, শুধু তারাই তাঁর ভয়ে কাঁপে। সব ভয় দূর করে দাও! যদিও শাস্তিদাতা বা পুরস্কারদাতা রূপে ঈশ্বর সম্বন্ধে ওই সব ভয়ঙ্কর ধারণাগুলির প্রয়োজন থাকতে পারে অসভ্য মানুষদের মনে। কিছু ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাত্মরাজ্যে অসভ্য বর্বর এবং এই ধারণাগুলি তাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে মানুষরা অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন যারা ধর্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে, তাদের কাছে এমন ধারণাগুলি শিশুসুলভ, মূর্খতামাত্র। এমন মানুষেরা ভয়ের সকল ভাব পরিত্যাগ করে।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর। প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। যখন মানুষ প্রথম দুটি অবস্থা পার হয়ে যায়, যখন সে সব দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ঝেড়ে ফেলেছে, তখন, সে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। এই জগতে আমরা কতই তো দেখতে পাই সুন্দরী নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসছে। কতবারই না দেখি সুন্দর পুরুষ কুৎসিত নারীকে ভালবাসে। কিসের আকর্ষণে? বাইরের লোক শুধু দেখে কুৎসিত নর বা কুৎসিত নারী, কিন্তু প্রেমিক তেমন দেখে না। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের মতন এতো সুন্দর আর কেউ নেই। কেমন করে এটা হয়? যে নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, সে তার নিজের মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে আদর্শ আছে, তা ওই কুৎসিত পুরুষের উপর আরোপ করে। সে ওই কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসছে ও পূজা করছে তা নয়, সে তার নিজের আদর্শকেই পূজা করছে ও ভালবাসছে। সেই পুরুষটি শুধু উপলক্ষ্যমাত্র এবং এই উপলক্ষ্যের উপর সে তার নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করে তাকে ঢেকে ফেলে এবং এটাই তার উপাস্যবস্তু হয়ে ওঠে। এখন ভালবাসার সর্বক্ষেত্রেই এটা ঘটে। আমাদের অনেকেরই

ভাই-বোনকে দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু আমাদের ভাই-বোন হয় বলেই তারা আমাদের কাছে সুন্দর।

এই বিষয়ের দার্শনিক পটভূমি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেই নিজের আদর্শকে বাইরে প্রক্ষেপ করে তার উপাসনা করে। এই বহির্জগৎ শুধু উপলক্ষ্যমাত্র। আমরা যা কিছু দেখি তা আমাদেরই মন থেকে বাইরে প্রক্ষেপ করি। একটি বালুকণা এক ঝিনুকের খোলের মধ্যে ঢুকে উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এই উত্তেজনার ফলে শুক্তির মধ্যে রস সৃষ্টি হয়ে বালুকণাকে আবৃত করে ফেলল এবং পরিণামে এক সুন্দর মুক্তা উৎপন্ন হলো। সেইভাবে বাহ্য বস্তুগুলি বালুকণার মতো আমাদের উপলক্ষ্য জুটিয়ে দেয়, যার উপর আমরা নিজেদের আদর্শ আরোপ করে তাকে নিজেদের উপযুক্ত বস্তু করে নিই। মন্দ লোকেরা এই জগৎকে ঘোর নরকরূপে দেখে এবং ভাল লোকেরা পরম স্বর্গরূপে। প্রেমিকরা দেখে জগৎ প্রেমে পরিপূর্ণ, হিংসুটেরা দেখে হিংসায় ভরা। সংগ্রামীরা দেখে সংগ্রামের ক্ষেত্ররূপে, শান্তিপ্রিয়রা শান্তি ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। পূর্ণ মানবরা ঈশ্বর ছাড়া কিছু দেখেন না। সুতরাং আমরা সর্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করি; যখন আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছই যেখানে আদর্শকে আদর্শরূপে ভালবাসি, তখন সব যুক্তিতর্ক ও সন্দেহ চিরতরে দূর হয়ে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কি যায় না, তা নিয়ে কে ভাবে? আদর্শ কখনও নষ্ট হতে পারে না, কারণ তা আমার প্রকৃতিরই অংশ। আদর্শ সম্বন্ধে আমি তখনই সন্দেহ করব, যখন নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। একটিতে সন্দেহ না হলে অন্যটিতেও সন্দেহ হবে না। ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান ও পূর্ণ দয়াময় হতে পারেন কিনা, তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর মানবের পুরস্কার দাতা কিনা, তিনি আমাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকের দৃষ্টিতে না দয়াবান সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখেন তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

প্রেমিক এই সব অতিক্রম করে গেছেন, পুরস্কার বা শাস্তির অতীত তিনি, ভয় বা সন্দেহের পারে পৌঁছেছেন, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন তাঁর নেই। তাঁর কাছে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট। এই জগৎ যে প্রেমের প্রকাশস্বরূপ এটা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়? অণুকে অণুর সঙ্গে, পরমাণুকে পরমাণুর সঙ্গে কোন শক্তি মিলিত করছে? গ্রহগুলি পরস্পরকে আবর্তিত করার কারণ কি? কোন শক্তি আকর্ষণ করছে মানুষকে মানুষের প্রতি, নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, জীবজন্তুকে পরস্পরের প্রতি, সমস্ত জগৎকে এক কেন্দ্রের দিকে? একেই প্রেম বলে। এর প্রকাশ ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত, এই প্রেম সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি—সব কিছুর মধ্যে আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করছে ঈশ্বর-প্রেম। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, বুদ্ধ এমন কি এক ছাগশিশুর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন. মাতা সন্তানের জন্য প্রাণ দেয়, স্বামী স্ত্রীর জন্য। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, আর আশ্চর্যের কথা যে, এই একই প্রেমের

প্রেরণায় চোর চুরি করে, খুনী খুন করে। . দও এই সব ক্ষেত্রে মূল ভাবটি প্রেম হলেও তার প্রকাশভঙ্গী পৃথক। এটিই জগতের একমাত্র প্রেরণাশক্তি। চোরের প্রেম সম্পদের উপর, প্রেম তার মধ্যে আছে কিন্তু সেটি ভুল পথে পরিচালিত। এইভাবে সব রকম পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের পিছনে আছে শাশ্বত প্রেম। মনে কর, একজন নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের এক চেক লিখল এবং ঠিক সেই সময় সেই ঘরে বসে একজন তার বন্ধুর নাম জাল করল। যে আলোতে দুজনে লিখছে তা একই, কিন্তু এদের প্রত্যেকেই আলোটি যে ভাবে ব্যবহার করছে তার জন্য সে নিজে দায়ী। আলোর কোন দোষ গুণ নেই। জগতের প্রেরণাশক্তি এই প্রেমও অমনি নির্লিপ্ত, সর্ববস্তুতে সমানভাবে আলোক বর্ষণ করছে। এই প্রেম বিনা জগৎ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

'হে প্রিয়তম, কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পতিকে ভালবাসে। হে প্রিয়তম, কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে। কেহই বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালবাসে।' এমন কি অতিনিন্দিত স্বার্থপরতাও একই প্রেমের প্রকাশ। এই খেলা থেকে সরে দাঁড়াও, এতে মিশে যেও না, শুধু এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলী—দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত এই বিচিত্র নাটক দেখে যাও আর এই অপূর্ব ঐকতান শুনে যাও! সবই সেই এক প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ। এমন কি স্বার্থপরতার মধ্যেও সেই 'আত্মভাব' বাড়তে থাকে, ক্রমশ বহু-গুণ হয়ে ওঠে। সেই 'আত্মসর্বস্ব' মানুষ বিবাহিত হলে দুটি 'আত্মসর্বস্ব' মানুষ হয়ে যাবে, যখন তার সন্তানাদি হবে তখন সে বহু হয়ে যাবে। এইভাবে সে বাড়তে বাড়তে অনুভব করবে সারা সংসারই তার আত্মা, সারা বিশ্ব তার আত্মা। সে বিস্তৃত হয়ে এক সর্বজনীন প্রেমে, অনন্ত প্রেমে পরিণত হবে। এই প্রেমই ঈশ্বর।

এইভাবে আমরা পরম ভক্তিতে উপনীত হই, যাকে পরাভক্তি বলা হয়। এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও প্রতীকাদির প্রয়োজন থাকে না। এই অবস্থায় যিনি পৌঁছেছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই তাঁর ভেতর রয়েছে। তিনি কিসের অন্তর্ভুক্ত হবেন? কারণ সকল গির্জা আর মন্দির তো তাঁর মধ্যে। তাঁর উপযুক্ত যথেষ্ট বিরাট গির্জা কোথায়? এমন লোক কতকগুলি সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। যার সঙ্গে তিনি এক হয়ে গেছেন, সেই অসীম প্রেমের সীমা কোথায়? যে সব ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করেছে, সেই সব ধর্মে আমরা দেখি প্রেমকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা। যদিও আমরা জানি এই প্রেমের অর্থ কী এবং দেখতে পাচ্ছি যে এই আসক্তিপূর্ণ ও আকর্ষণ-পূর্ণ জগতে সবই সেই অনন্ত প্রেমের প্রকাশ, যাকে বিভিন্ন দেশের সাধু মহাপুরুষরা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখতে পাই যে সেই প্রেমকে ব্যক্ত করার জন্য তাঁরা ভাষার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, এমন কি দেহগত ভাবগুলিকেও দিব্যভাবে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করেছেন।

হিব্রু রাজর্ষি ও ভারতীয় ঋষিরা এইভাবে সেই প্রেমের গান গেয়েছেন—'হে

প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বন! তোমার দ্বারা চুম্বিত হলে তোমার তৃষ্ণা যে চিরন্তন হয়ে ওঠে! সকল দুঃখ দূর হয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব ভুলে যাই, শুধু তোমার চিন্তাই জাগে।' এই হচ্ছে প্রেমিকের উন্মত্ততা, তখন সব বাসনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'কে মুক্তি চায়? কে পরিত্রাণ চায়? এমন কি পূর্ণত্বই বা কে চায়? কে স্বাধীনতা চায়?'—প্রেমিক বলেন।

'আমি সম্পদ চাই না, স্বাস্থ্য চাই না, সৌন্দর্য চাই না। বুদ্ধি কামনা করি না। জগতের সব কিছু অশুভের মধ্যেও আমার বার বার জন্ম হোক, আমি অভিযোগ করব না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যেন অনুরাগ থাকে, অহেতুক প্রেম থাকে।'

এই সঙ্গীতগুলিতে প্রেমের উন্মত্ততা ভাষা খুঁজে পেয়েছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে উচ্চতম, প্রবলতম, সর্বাপেক্ষা ব্যক্ত, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম, তাই গভীরতম ভগবৎ প্রেমের বর্ণনায় সেই প্রেমেরই ভাষ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধকের উন্মত্ত প্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিকরা উন্মত্ত হতে চান ঈশ্বর প্রেমের মদিরা পান করে, তাঁরা ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হতে চান। সকল ধর্মের সাধু মহাপুরুষরা যে প্রেমমদিরা প্রস্তুত করেছেন, যাকে নিজেদের হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত করেছেন, যা নিষ্কাম ভক্তদের সকল আশায় ঘনীভূত হয়েছে, সেই প্রেমের পেয়ালায় তাঁরা চুমুক দিতে চান। তাঁরা সেই প্রেম ছাড়া আর কিছু চান না। প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, আর কি চমৎকার এই পুরস্কার! এটিই একমাত্র বস্তু যা সকল দুঃখ দূর করে দেয়, এটিই একমাত্র পেয়ালা যাতে চুমুক দিলে ভবব্যাধি নিরাময় হয়। মানুষ দিব্যভাবে উন্মত্ত হয় এবং ভুলে যায় যে সে মানুষ।

সর্বশেষে আমরা দেখতে পাই যে, এইসব বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি পরিণামে একই বিন্দুতে পৌঁছয়—পূর্ণ মিলন। আমরা সর্বদা দ্বৈতবাদীরূপে সাধন শুরু করি। ঈশ্বর এক পৃথক সত্তা এবং আমি এক পৃথক সত্তা। দুজনের মধ্যে প্রেম এল, তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ভগবানও যেন মানুষের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। মানুষ জীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক ঈশ্বরের উপর আরোপ করে, যেমন পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক এবং সে চরম অবস্থায় পৌঁছয়, যখন উপাস্য বস্তুর সঙ্গে সে নিজে এক হয়ে যায়। 'আমিই তুমি, আর তুমিই আমি। তোমাকে উপাসনা করে আমি নিজের উপাসনা করি এবং নিজের উপাসনার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাকেই উপাসনা করি।' এইখানে আমরা দেখতে পাই, মানুষ যে ভাবটি নিয়ে শুরু করেছিল তার চরম পরিণতি। প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে 'ক্ষুদ্র অহং' বলে ভাবায় প্রেম হয়েছিল স্বার্থপরতা, শেষে এল আলোকের পূর্ণ প্রভা, তখন সেই অহং হয়ে গেল অসীম। প্রথমে যে ঈশ্বরকে কোন এক স্থানে অবস্থিত একজন বলে মনে হতো, তিনি যেন অনন্ত প্রেমে পরিণত হলেন। মানুষের নিজেরও রূপান্তর হলো। সে ঈশ্বর সামীপ্য লাভ করতে থাকে, বৃথা বাসনা বর্জন করতে থাকে, যাতে সে পরিপূর্ণ ছিল। বাসনার সঙ্গে স্বার্থপরতাও দূর হয়ে যায় এবং চরম শিখরে পৌঁছে সে দেখে যে, প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ—এক ও অভিন্ন।

উন্মুক্ত রহস্য

[৫ই জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রীঃ, লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত]

বস্তুকে স্বরূপে বাঝাবার চেষ্টা করতে আমরা যে পথেই যাই না কেন, গভীরভাবে বিশ্লেষণের ফলে আমরা দেখতে পাই যে, পরিণামে বস্তুটির এমন এক বিশেষ অবস্থায় আমরা পৌঁছই, যা আপাত স্ববিরোধী। তা আমাদের যুক্তির অগম্য হলেও সত্য। আমরা যে কোন বস্তুই ধরি না কেন, আমরা জানি সেটা সসীম। কিন্তু যেই আমরা সেটিকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করি, সেটি আমাদের বুদ্ধির অতীত হয়ে ওঠে; গুণের দিক দিয়ে, সম্ভাবনার দিক দিয়ে, শক্তির দিক দিয়ে, সম্পর্কের দিক দিয়ে আমরা তার অন্ত খুঁজে পাই না। সেটি অসীম হয়ে ওঠে। একটি সাধারণ ফুলের কথাই ধর! সেটি তো অত্যন্ত সসীম। কিন্তু কে বলতে পারে যে, সে ফুলের সম্বন্ধে সবকিছুই জানে? একটি ফুলের সম্বন্ধে জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছনো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ফুলটি অসীম হয়ে উঠল, অথচ তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু করার সময় সেটি সসীম ছিল। একটি বালুকণাকে ধর! বিশ্লেষণ কর! এটিকে সসীম বলে অনুমান করে নিয়েই আমরা শুরু করলাম, কিন্তু শেষে দেখা গেল তা নয়, এটি অসীম। তা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সসীম বলেই দেখি। ফুলকেও তেমনিভাবে সসীম পদার্থ বলে ধরা হয়।

ওই রকম হচ্ছে আমাদের অন্তরের ও বাহিরের সকল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা। আমরা সামান্য জিনিস মনে করে যা কিছু চিন্তা করতে শুরু করি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে গিয়ে অনন্তের গহ্বরে ডুবে যায়। অনুভূত বস্তুর মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমরা নিজেরাই। অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা ঐ একই ধাঁধায় পড়ি। আমাদের অস্তিত্ব আমরা দেখি যে আমরা সসীম জীব। আমরা জীবন ধারণ করি এবং মারা যাই। আমাদের দিগন্ত সংকীর্ণ। আমরা এখানে সীমাবদ্ধ, চারধারে জগৎ-সংসার দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রকৃতি মুহূর্তমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। আমাদের ক্ষুদ্র দেহ কোন রকমে সংযুক্ত আছে, এক মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হতে পারে। আমরা তা জানি। কর্মক্ষেত্রে আমরা কত শক্তিহীন! আমাদের ইচ্ছা প্রতি নিয়ত প্রতিহত হচ্ছে। আমরা কত কিছু করতে চাই আর কত সামান্যই আমরা করতে পারি। আমাদের বাসনা সীমাহীন। আমরা সব কিছুই কামনা করতে পারি, সব কিছু চাইতে পারি, আকাশের লুব্ধক নক্ষত্রে যাবার ইচ্ছা করতে পারি। কিন্তু আমাদের খুব অল্প বাসনাই পূর্ণ হয়। আমাদের দেহ আমাদের ইচ্ছার অন্তরায়। প্রকৃতি আমাদের ইচ্ছাপূরণের প্রতিকূল। আমরা দুর্বল। ফুলের সম্বন্ধে যা সত্য, বালুকণা সম্বন্ধে যা সত্য, বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যা সত্য, প্রতি চিন্তা সম্বন্ধে যা সত্য, আমাদের সম্বন্ধে তা শতগুণ বেশি সত্য। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা একই ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছি, আমরা হচ্ছি একাধারে অসীম ও সসীম। আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো! একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তরঙ্গটি হচ্ছে সমুদ্র, আবার অন্য দিক দিয়ে এটি সমুদ্র নয়। তরঙ্গের এমন কোন অংশ নেই,

যাকে তুমি বলতে পার না, 'এটিই সমুদ্র'। 'সমুদ্র' নামটা শুধু তরঙ্গ সম্বন্ধে নয়, সমুদ্রের সকল অংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তবুও তরঙ্গ সমুদ্র থেকে পৃথক। তেমনি অস্তিত্বের এই অসীম সমুদ্রে আমরা এক একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো। সেই সঙ্গে যখন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই, তখন তা পারি না—আমরা অসীম হয়ে পড়েছি।

মনে হয় আমরা যেন স্বপ্নে বিচরণ করছি। মনের স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে ঠিকই মনে হয়, কিন্তু যেই তুমি স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে, তখনই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন? স্বপ্ন মিথ্যা বলে নয়, কারণ স্বপ্ন আমাদের বিচারশক্তি, বুদ্ধিশক্তির অগোচর বলে। জীবনের অনুভূত প্রতিটি বস্তু এত বিরাট যে আমাদের বুদ্ধি তার তুলনায় কিছুই নয়। বুদ্ধিবৃত্তির নিয়মাধীন তারা হতে চায় না। বুদ্ধি তাদের চারধারে যে বন্ধন রজ্জু জড়াতে চায় তাতে তারা হাসে। বুদ্ধির এই নিগড়ে বন্ধন প্রচেষ্টা মানবাত্মার ক্ষেত্রে আরও সহস্রগুণ ব্যর্থ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে—'আমরা নিজেরাই'।

সব কিছু কত বিস্ময়কর! মানুষের চোখের দিকে তাকাও! কত সহজে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অথচ তোমার চোখ দেখতে পাচ্ছে বলেই প্রকাণ্ড সূর্যের অস্তিত্ব আছে। জগতের অস্তিত্ব আছে, কারণ তোমার চোখ প্রমাণ করছে তা আছে। সেই রহস্যের কথা ভাব! তীব্র আলোক বা ছোট কাঁটা তোমার চোখ নষ্ট করে দিতে পারে। অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বংসকারী যন্ত্র, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আশ্চর্যতম অস্তিত্ব—লক্ষ লক্ষ সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী প্রভৃতি সকলেরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে, প্রমাণিত হচ্ছে ওই দুইটি ক্ষুদ্র বস্তুদ্বারা। তারা বলে, 'প্রকৃতি, তুমি আছ'। আর আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতির অস্তিত্বে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে এই একই কথা।

এটি কী? দুর্বলতা কোথায়? শক্তিশালী কে? বড় কোনটি আর ছোট কোনটি? কোনটি উঁচু আর কোনটি নিচু? কারণ এই বিস্ময়কর অস্তিত্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, যেখানে ক্ষুদ্রতম অণুটিরও প্রয়োজনে আছে সমগ্র জগতের অস্তিত্বের জন্য। কে বড় আর কে ছোট? খুঁজে বের করা দায়! কেন? কারণ কেউই বড় নয় এবং কেউই ছোট নয়। সর্ব বস্তুই সেই অসীম সমুদ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের প্রকৃত সত্তা অসীম, যা কিছু বাইরে আছে সবই কিন্তু সেই অসীম। এই বৃক্ষটি অসীম, অমনি ধারা প্রতিটি বস্তু যা আমরা দেখি বা অনুভব করি—প্রতি বালুকণা, প্রতি চিন্তা, প্রতি জীব, প্রতি সত্তা স্বরূপত অসীম। অসীম হয়েও সসীম এবং সসীম হয়েও অসীম। এই হচ্ছে আমাদের সত্তার রহস্য।

এখন এসবই সত্য হতে পারে, কিন্তু অসীমের এই অনুভূতি বর্তমান অবস্থায় আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। এ নয় যে আমরা আমাদের অসীম প্রকৃতিকে ভুলে গেছি, কেউ তা কখনও পারে না। কেউ কি কখনও নিজের ধ্বংস কল্পনা করতে পারে? কে ভাবতে পারে সে মরে যাবে? কেউ পারে না। অসীমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কবোধ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে কাজ করে থাকে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ ভুলে যাই এবং তার ফলেই যত দুঃখ আসে।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা সামান্য বিষয়েই আঘাত পাই, ক্ষুদ্র বস্তুর দাসত্ব করি। দুঃখ পাই, কারণ আমরা মনে করি আমরা সসীম—ক্ষুদ্র সত্তা। তবুও আমরা যে অসীম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সব দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে, যখন আমরা তুচ্ছ বিষয়ে বিচলিত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের এই বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিত যে, আমরা অসীম। বস্তুত আমরা অসীমই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা এমন কিছু অন্বেষণ করছি যা অসীম, সর্বদা এমন কিছু খুঁজছি যা বন্ধনহীন, মুক্ত।

এমন কোন জাতি ছিল না, যাদের ধর্ম ছিল না বা কোন না কোন প্রকার ঈশ্বর বা দেবতাদের উপাসনা করত না। ঈশ্বর বা দেবতারা আছেন কিনা এটা প্রশ্ন নয়, কিন্তু এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়? সারা জগতের লোক ঈশ্বরকে দেখার বা খোঁজার চেষ্টা করে কেন? কেন করে? কারণ এই সমস্ত বন্ধন সত্ত্বেও, প্রকৃতির কঠোর নিয়মের শক্তি সত্ত্বেও—যে নিয়ম আমাদের নিষ্পেষিত করছে, কোনদিকে কখনও নড়াচড়া করতে দেয় না, যা কিছু করতে চাই, তাতেই নিয়মের বাধা, সর্বত্রই নিয়ম—তা সত্ত্বেও মানুষের আত্মা কখনও তার স্বাধীনতা বিস্মৃত হয় না এবং সর্বদাই সে মুক্তি খুঁজছে। এই মুক্তির সন্ধান করে সকল ধর্মই। মানুষ জানুক বা না জানুক, স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারুক বা না পারুক, এই মুক্তির ভাবটা তার মধ্যে আছে। এমন কি অতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ, অত্যন্ত অজ্ঞ মানুষও এমন কিছু খোঁজে যা প্রকৃতির নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। তারা কেউ দৈত্যের খোঁজ করে, কেউ ভূতের খোঁজ করে, কেউ ঈশ্বরের খোঁজ করে—যে প্রকৃতিকে বশে আনতে পারবে, যার কাছে প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী নয়, যার কাছে প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না। 'আহা, যদি এমন কেউ থাকে, যে নিয়মের নিগড় ভাঙতে পারে!' —এটি মানুষের অন্তরের কথা। আমরা সর্বদা তাঁকেই খুঁজছি, যিনি নিয়ম ভাঙতে পারেন। একটি ধাবমান ইঞ্জিন রেলপথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, একটা ক্ষুদ্র কীট সেই পথ থেকে সরে এল। আমরা দেখেই বলে উঠি, 'ইঞ্জিনটা জড়পদার্থ, একটা যন্ত্র; কিন্তু কীটটা সজীব।' কীটটা নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছিল। ইঞ্জিন যত প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী হোক, সেটা নিয়ম ভাঙতে পারে না। মানুষ যেদিকে চায় সেদিকে তাকে যেতে হয়, তার ব্যতিক্রম সে করতে পারে না। কিন্তু কীটটা ক্ষুদ্র হলেও নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে, বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে। নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এটাই তার মধ্যে ভাবী ঐশী সত্তার লক্ষণ।

চারদিকেই আমরা এই স্বাধীনতার দাবি দেখি, আত্মার মুক্তি প্রবণতা। এটি প্রতিফলিত হয়েছে প্রতি ধর্মেই ঈশ্বর বা দেবতাদের আকারে। তবু এটি সর্বৈব বাহ্যিক—তাদের জন্য যারা দেবতাকে কেবল বাইরেই দেখে। মানুষ প্রথমে নিজেকে তুচ্ছ ভাবত। তার ভয় ছিল সে কোনদিন মুক্ত হবে না, সেজন্য সে প্রকৃতির বাইরে কোন জনের খোঁজ করছিল, যে স্বাধীন। তারপর তার মনে হলো বাইরে এমন বহু বহু মুক্ত সত্তা আছেন, ক্রমশ মানুষ তাঁদের সকলকে একের মধ্যে

মিলিত করল—দেবাদিদেব, পরমেশ্বর। কিন্তু তাতেও মানুষ তৃপ্তি পেল না। সে সত্যের আর একটু কাছাকাছি এল এবং ক্রমশ দেখল যে, সে যাই হোক না কেন, যিনি সকল দেবতার দেবতা, সকল প্রভুর প্রভু, তাঁর সঙ্গে তার নিজের কিছু একটা সম্পর্ক আছে, যদিও সে নিজেকে বদ্ধ, দুর্বল, হীন ভাবে, তবু পরমেশ্বরের সঙ্গে সে কোনভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এইভাবে মানুষের দিব্যদৃষ্টি খুলল, চিন্তার উন্মেষ হলো, জ্ঞানের প্রসার ঘটল। মানুষ ক্রমশ সেই পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হতে লাগল এবং অবশেষে আবিষ্কার করল যে এক সর্বশক্তিমান মুক্ত আত্মাকে অনুসন্ধানের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে পরমেশ্বর ও নানা দেবতার মধ্যে এবং এই প্রতিফলন হচ্ছে তার নিজের সম্বন্ধে নিজের ভাবটি। তারপরে সে আবিষ্কৃত করল শুধু এটুকুই সত্য নয় যে 'ঈশ্বর মানুষকে নিজের অনুরূপ মতো গড়েছেন', এটাও সত্য যে, মানুষও ঈশ্বরকে নিজের অনুরূপ মতো গড়েছে। এটাই স্বর্গীয় মুক্তির ভাব আনল। সেই দিব্য সত্তা সর্বদা আমাদের মধ্যে বিরাজমান, আমাদের অত্যন্ত নিকটতম। তাঁকে আমরা এতকাল বাইরে খুঁজছিলাম, শেষে বুঝলাম তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে। তোমরা হয়তো সেই গল্পটা জান, একজন তার হৃৎস্পন্দনকে ভেবেছিল দ্বারে কারও করাঘাতের শব্দ, সে দরজা খুলল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না, তাই ঘরে ফিরে গেল। আবার তার মনে হলো দরজায় আঘাতের শব্দ শুনছে, কিন্তু এবারও কারুকে দেখতে পেল না। তখন সে বুঝল এটা তার নিজেরই হৃৎস্পন্দনের শব্দ, যা সে দরজায় আঘাত বলে ভুল করেছিল। সেইভাবে মানুষ তার অনুসন্ধানের শেষে বুঝল যে, সারাক্ষণ যে অসীম মুক্তির সন্ধান বাইরের প্রকৃতিতে আছে বলে কল্পনা করছিল, তা অন্তরেরই বস্তু। তা হচ্ছে সনাতন আত্মার আত্মা। এই সত্যস্বরূপ সে নিজেই।

এইভাবে অবশেষে সে বুঝতে পারে সত্তার আশ্চর্য দ্বৈতভাব। সে একাধারে অসীম ও সসীম। যিনি অসীম সত্তা, তিনিই তার সসীম আত্মা। অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম বুদ্ধির জালে জড়িত হয়ে আপেক্ষিকভাবে সসীম সত্তারূপে প্রকাশিত, কিন্তু বস্তুত তিনি অবিকৃতই থাকেন।

অতএব প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে: যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের ভেতরকার প্রকৃত সত্তা, তিনি নিত্য নির্বিকার সনাতন আনন্দময় ও চিরমুক্ত। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল।

অতএব এর মধ্যেই সব মৃত্যুর অবসান, অমৃতত্বের আবির্ভাব, সব দুঃখের অবসান। যিনি বহুর মধ্যে এক, যিনি পরিণামশীল জগতের মধ্যে অপরিণামী সত্তা, তাঁকে যিনি নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তিনিই শুধু শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন, অন্য কেউ নয়।

দুঃখ-দুর্দশার গভীর অন্ধকারে এই আত্মা আলোকরশ্মি প্রেরণ করে এবং মানুষ জেগে উঠে বুঝতে পারে যে, যা তার প্রকৃতই নিজস্ব, তা সে কখনও হারাতে পারে না। না, যা আমাদের সত্যিই নিজস্ব তা আমরা কোনকালে হারাতে পারি না। কে তার স্বরূপ হারাতে পারে? কে তার সত্তাকে হারাতে পারে? যদি আমি ভাল হই, তাহলে আমার সত্তাই প্রথমে স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই সদ্‌গুণে রঞ্জিত হয়ে

উঠে। যদি আমি মন্দ হই, তাহলে আমার সত্তাই প্রথমে স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই দোষে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সত্তাই আদিতে, মধ্যে ও অন্তে—সর্বদা বিদ্যমান। এটি কখনও ধ্বংস হয় না, সর্বদাই বিরাজমান।

অতএব সকলেরই আশা আছে। কেউই ধ্বংস হতে পারে না, কেউই চিরকাল হীন হয়ে থাকতে পারে না। জীবন এক ক্রীড়াক্ষেত্র, ক্রীড়া যতই স্থূল হোক না কেন। আমরা যতই আঘাত পাই না কেন, আত্মা কখনও আহত হয় না। আমরা সেইঅসীম আত্মা।

বৈদান্তিক বলেন, 'আমার কোনকালে ভয় নেই, সংশয় নেই। মৃত্যু কোনকালে আমার কাছে আসে না। আমার পিতা মাতা নেই, কারণ আমার কখনও জন্ম হয়নি। আমার শত্রুই বা কে? কারণ আমিই যে সব কিছু। আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ। আমি সেই, আমিই সেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য প্রভৃতি কুচিন্তা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ। সোঽহং, সোঽহং!'

এই চিন্তাই সকল ব্যাধির প্রতিষেধক, এই মৃত্যুদূরকারী অমৃত। আমরা এই জগতে আছি, আমাদের প্রকৃতি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই আমাদের বার বার বলতে দাও: 'আমি সেই, আমিই সেই। আমার ভয় নেই, সংশয় নেই, মৃত্যু নেই। আমি স্ত্রী নই, পুরুষ নই। আমার সম্প্রদায় নেই, বর্ণ নেই। আমার কী মত থাকতে পারে? কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি? কোন সম্প্রদায় আমায় ধরে রাখতে পারে? আমি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছি।'

দেহ যতই বিদ্রোহ করুক, মন যতই বিদ্রোহী হোক, গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে, অসহ যন্ত্রণার মধ্যে, চরম হতাশার মধ্যে ওই মন্ত্র আবৃত্তি কর, একবার, দুবার, তিনবার, বার বার। আলো দেখতে পাবে, ধীরে ধীরে তা আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

বহুবার আমি মৃত্যুর কবলে পড়েছি, অনাহারে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছি, অভুক্ত দেহে হাঁটতে হাঁটতে গাছের তলায় লুটিয়ে পড়েছি, মনে হয়েছে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়েছে, চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে, কিন্তু শেষকালে মন ওই মন্ত্রটিকে আঁকড়ে ধরেছে—'আমার ভয় নেই, মৃত্যু নেই। আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। আমি ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নেই আমায় ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মা, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি প্রকাশ কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার কর। উঠ, জাগ, থেম না!'

এই মন্ত্র জপ করতে করতে আমি নবজীবন লাভ করে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং আজ এখানে স্বশরীরে বর্তমান আছি। তাই জীবনে যখনই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করো, সব বিরোধীশক্তি বিলীন হয়ে যাবেই। কারণ এ সব তো স্বপ্ন। বাধাবিঘ্নগুলি যতই পর্বতপ্রমাণ হোক, সব কিছু যতই ভয়ঙ্কর ও নৈরাশ্যকর হোক,—এগুলি সবই মায়া। ভয় পেয়ো না, এগুলি অদৃশ্য হয়ে যাবে। ভেঙে চুরমার করে দাও দেখবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পদদলিত কর, দেখবে ধ্বংস হয়ে গেছে। ভীত হয়ো না! কতবার বিফল হয়েছ তা ভেব না। কিছু গ্রাহ্য করো না। কাল নিরবধি, অগ্রসর হও, বার বার তোমার শক্তি প্রকাশ করতে থাক, আলো আসবেই। জগতে জাত প্রত্যেকের কাছে তুমি প্রার্থনা করতে পার, কিন্তু কে তোমায় সাহায্য করবে? মৃত্যুর হাত কে এড়াতে পেরেছে? কে তোমায়

উদ্ধার করবে? নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে অপর কেউ সাহায্য করতে পারে না, বন্ধু! তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার পরম বন্ধু। তাই আত্মাকে জান, ওঠ, ভয় পেও না। সব দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে আত্মাকে প্রকাশ কর, প্রথমে তা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলে মনে হোক না কেন। তুমি সাহস লাভ করবে এবং শেষকালে সিংহের মতো গর্জন করে উঠবে, 'আমি সেই, আমিই সেই। আমি পুরুষ নই, স্ত্রীও নই; দেবতা নই, দানবও নই; কোন প্রাণী নই, বৃক্ষলতাদিও নই; আমি ধনী নই, দরিদ্রও নই; পণ্ডিত নই, মূর্খও নই। আমি যা হই তার তুলনায় ও সবই তুচ্ছ। কারণ আমি সেই, আমিই সেই। ওই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা দেখছ, আমিই জ্যোতিরূপে তাতে প্রতিভাত হচ্ছি। অগ্নির যে রূপ তা আমিই। বিশ্বে শক্তিরূপে আমিই। কারণ আমি সেই, আমিই সেই।'

'যে মনে করে আমি ক্ষুদ্র, সে ভুল করে, কারণ আমিই তো একমাত্র সত্তা যা বিরাজমান। আমি বলি সূর্য আছে, তাই সে আছে; জগৎ আছে, কারণ আমি ঘোষণা করি তা আছে। আমাকে ছাড়া তারা থাকতে পারে না, কারণ আমিই অস্তিত্ব, আমিই জ্ঞান, আমিই আনন্দ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ওই সূর্য যেমন আমাদের দৃষ্টি শক্তির কারণ, কিন্তু কারও চোখে দোষ থাকলে সূর্য তার দ্বারা দূষিত হয় না, তেমনি জগতের ভাল মন্দ আমায় প্রভাবান্বিত করে না। আমি সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করি, সকল বস্তুর মাধ্যমে কাজ করি, কিন্তু কর্মের দোষগুণ আমায় স্পর্শ করে না। কারণ আমি কোন কর্মের বা নিয়মের অধীন নই। কর্মের নিয়মের নিয়ন্ত্রণকারী আমি। আমি চিরকাল ছিলাম, চিরকাল আছি।'

'আমার প্রকৃত সুখ কোনকালে জাগতিক পদার্থে নেই,—পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততি বা কোন বস্তু আনন্দ দিতে পারে না। কারণ আমি যেন অসীম নীলাকাশ। কত বিচিত্র বর্ণের মেঘ তার বুকে ক্ষণিকের জন্য খেলা করে, দূরে চলে যায়, আকাশ সেই একই অপরিবর্তনীয় নীল থাকে। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ মুহূর্তের জন্য আমার আত্মাকে আবৃত করতে পারে, কিন্তু আমি সকল অবস্থাতেই আছি। এরা অনিত্য বলেই থাকে না। আমি নিত্য বলেই ভাস্বর। যদি দুঃখ আসে, আমি জানি তা সসীম, তাই তার মৃত্যু হবে। যদি অশুভ আসে, আমি জানি তা সসীম, তা চলে যাবে। একমাত্র আমিই অসীম, আমাকে কোনকিছু স্পর্শ করতে পারে না। আমি অনন্ত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় আত্মা।'—আমাদের এক কবি বলেছেন।

এস, আমরা জ্ঞানামৃত পান করি। এই অমৃত আমাদের অমরত্বে পৌঁছে দেবে, যা কিছু অক্ষয় তার পথ দেখাবে। মা ভৈঃ! বিশ্বাস করো না—আমরা পাপী, আমরা সসীম আমরা মরণশীল। এ সত্য নয়।

'এ শ্রবণ করবে, মনন করবে, ধ্যান করবে। হাত যখন কাজ করবে, মন যেন জপ করে—'আমি সেই, আমিই সেই।' এই চিন্তা কর, স্বপ্ন দেখ, যতক্ষণ না তোমার অস্থি-মজ্জায় মিশে যায়, যতক্ষণ না ক্ষুদ্রতার, দুর্বলতার, দুঃখের, অশুভের সব দুঃস্বপ্ন অদৃশ্য হয় এবং তখন পরম সত্য তোমার কাছে আর ক্ষণকাল লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

দিব্য-আনন্দের পথ

আজ রাত্রে আমি তোমাদের বেদ থেকে একটি গল্প বলব। বেদ হচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্র, এক বিশাল সাহিত্যসংগ্রহ, যার শেষাংশকে বলা হয় বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ। এতে সব তত্ত্বকথা আছে, বিশেষ করে দর্শনের কথা, যাতে আমরা আগ্রহী। এটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং তোমরা মনে রাখবে এটি হাজার হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল।

এক ব্যক্তি এক বিরাট যজ্ঞ করতে চেয়েছিল। হিন্দুদের ধর্মে যজ্ঞের এক বড় অংশ হচ্ছে দান। নানা ধরনের যজ্ঞ আছে। যজ্ঞে বেদী নির্মাণ করে অগ্নিতে আহুতি দানের সঙ্গে নানা মন্ত্র আবৃত্তি করা হয়। যজ্ঞ শেষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের দান করা হয়। প্রত্যেক যজ্ঞের বিভিন্ন ধরনের দানের নিয়ম আছে। একটি যজ্ঞে মানুষকে সর্বস্ব দান করতে হয়। এখন ওই ব্যক্তিটি ধনী হলেও কৃপণ ছিল, অথচ সে নাম-যশের লোভে সবচেয়ে বড় যজ্ঞটি করতে চেয়েছিল।

যজ্ঞ শেষে সর্বস্ব দানের পরিবর্তে সে তার কানা খোঁড়া বুড়ো গরুগুলি, যেগুলি আর দুধ দেয় না, সেগুলি দান করতে লাগল।

নচিকেতা নামে তার এক বুদ্ধিমান বালক পুত্র ছিল। সে পিতার এই হীন দানকর্ম দেখে বুঝল যে, এতে পুণ্যের বদলে পাপই হবে। সে সঙ্কল্প করল এর প্রতিকারের জন্য নিজেকে দান করার।

সে তাই পিতার কাছে গিয়ে বলল, 'আমায় কাকে দান করবে?'

পিতা কোন জবাব দিল না। বালক দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করল। বার বার এক প্রশ্ন করায় পিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে যমকে দান করব।'

বালকটি সোজা যমলোকে গেল। যম সে সময় বাড়ি ছিল না, তাই সে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

তিন দিন পরে যম ফিরে এসে তাকে বলল, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার পূজার যোগ্য অতিথি হয়েও তিন দিন আমার গৃহদ্বারে অনাহারে আছেন। আপনাকে প্রণাম করি। এই কষ্ট স্বীকারের প্রতিদানে আপনাকে আমি তিনটি বর দেব।'

বালকটি প্রথম বর চাইল, 'আমার ওপর আমার বাবার রাগ যেন চলে যায়।'

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা কয়েকটি যজ্ঞ সম্বন্ধে জানতে চাইল। তারপর তৃতীয় বরের বেলায় সে বলল, 'মানুষের মৃত্যুর পরে প্রশ্ন জাগে—তার কী হয়? কেউ বলে তার অস্তিত্ব থাকে না, কেউ বলে থাকে। অনুগ্রহ করে আমায় যথার্থ উত্তর বলে দিন। তৃতীয় বর আমি এটিই চাই।'

মৃত্যুরাজ যম উত্তর দিলেন, 'প্রাচীনকালে দেবতারা এই রহস্যভেদ করতে চেয়েছিলেন। এই রহস্য এত সূক্ষ্ম যে জানা খুবই কষ্টকর। অন্য কোন বর চাও, এটি চেয়ো না। শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। গবাদি পশু, অশ্ব প্রার্থনা কর, বিশাল

সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। এর উত্তরের জন্য আমায় অনুরোধ করো না। মানুষ জীবনকে উপভোগের জন্য যা কিছু কামনা করে, সেইসব প্রার্থনা কর, আমি প্রার্থনা পূর্ণ করব। কিন্তু এই রহস্য জানতে চেও না।'

বালকটি বলল, 'না মহাশয়, মানুষ সম্পদে তৃপ্ত হতে পারে না। আপনাকে যখন দেখতে হবে, মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন কি এই ধনসম্পদ থাকবে। আপনি যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন আমরা জীবিত থাকব। মর্ত্যবাসী কোন নশ্বর জীব জ্ঞানলাভের পরে, অবিনশ্বর অমর আপনার সঙ্গলাভের পরে, সঙ্গীত-সম্ভোগজনিত আনন্দের প্রকৃতি অবগত হওয়ার পরে, দীর্ঘ জীবনে আনন্দিত হবে? অতএব আমাকে বলুন ইহজগতের পরের রহস্যের কথা। আমি অন্য কিছু চাই না। নচিকেতা মৃত্যুর রহস্য জানতে চায়।'

মৃত্যুরাজ খুশি হলেন।

গত দু-তিনটি বক্তৃতায় মনকে প্রস্তুতকারী এই জ্ঞানের কথাই বলেছি। তাহলে এখানে তোমরা দেখছ যে, মানুষের প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে সত্য ছাড়া অন্য কিছু কামনা না করা, শুধু সত্যের জন্যই সত্যকে জানা। দেখলে এই ছেলেটি কী ভাবে যম তাকে যা কিছু দান করতে চেয়েছিল, তা প্রত্যাখ্যান করল; ক্ষমতা, ধনসম্পদ, দীর্ঘজীবন ও সবকিছু সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত একটি বিষয়ের জন্য,—শুধুমাত্র জ্ঞান, সত্য। এইভাবেই সত্যকে শুধু পাওয়া যায়। আর তাতেই মৃত্যুরাজ খুশি হলেন।

তিনি বললেন, 'দুটি পথ আছে—একটি উপভোগের, অন্যটি আনন্দের; একটি প্রেয়, অন্যটি শ্রেয়। এই দুটিই বিভিন্নভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আনন্দের পথে অগ্রসর হন, তিনি ঋষি হয়ে ওঠেন, আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, উপভোগের পথে যান, তিনি অবনত হয়ে পড়েন। নচিকেতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, তুমি বাসনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানাওনি। নানাভাবে আমি তোমায় উপভোগের পথের দিকে প্রলোভিত করেছি, তুমি সেগুলিতে সংযমের পরিচয় দিয়েছ। তুমি জেনেছ সম্ভোগের জীবনের চেয়ে জ্ঞান অনেক উচ্চ।

'তুমি বুঝেছ যে মানুষ অজ্ঞ হয়ে জীবনকে উপভোগ করে, তার সঙ্গে পশুর কোন প্রভেদ নেই। তবুও এমন অনেক আছে, যারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও অহঙ্কারের বশে নিজেদের বড় ঋষি বলে মনে করে এবং ভ্রান্তপথে ঘুরে বেড়ায়, এ যেন অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানো। নচিকেতা, এই সত্য তাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় না, যারা অজ্ঞ শিশুর মতো কয়েকটা মাটির ঢেলা নিয়ে ভুলে থাকে। তারা এই জগৎকে বোঝে না, অন্য জগৎকেও নয়। তারা এই জগৎকে অস্বীকার করে, অন্য জগৎকেও অস্বীকার করে এবং এইভাবে বার বার আমার অধীনে আসে। অনেকের এমন কি এই সত্য শোনার সুযোগই হয়নি, অনেকে আবার এটি শুনেও বুঝতে পারেনি, কারণ এই বিষয়ে শিক্ষককে অদ্ভুত হতে হবে এবং যাতে জ্ঞান দান করা হবে, তাকেও অদ্ভুত হতে হবে। এই বিষয়ে বক্তা যদি যথেষ্ট উন্নত না হন, তাহলে শতবার বলে ও শত-বার শুনেও সত্য আত্মাকে উদ্ভাসিত করবে না। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করো না, নচিকেতা। এই সত্য শুধু সেই হৃদয়েই উদ্ভাসিত হয়, যা পবিত্র হয়েছে। যাঁকে

বহু বাধা বিনা দেখা যায় না, যিনি লুকিয়ে আছেন হৃদয়ের গভীর গুহায় - সেই প্রবীণকে বাহ্যদৃষ্টিতে দর্শন করা যায় না, তাঁকে অন্তরের দৃষ্টিতে দেখলে সুখ ও দুঃখ দুই চলে যায়। যে এই রহস্য জানে, সে সব বৃথা বাসনা ত্যাগ করে এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করে। এইভাবে সে দিব্য আনন্দ লাভ করে।

'নচিকেতা, এই হচ্ছে দিব্য-আনন্দ লাভের উপায়। যিনি সকল পাপ-পুণ্যের পারে, সকল কর্তব্য-অকর্তব্যের পারে, যিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পারে, সে একমাত্র জ্ঞানী, যে এই সত্য জানে। যাকে সকল বেদ অনুসন্ধান করে, যাঁকে দর্শনের জন্য মানুষ সব কিছু তপস্যা করে, তাঁর নাম আমি তোমায় বলব : তা হচ্ছে ওঁ! এই সনাতন ওঁ হচ্ছেন ব্রহ্ম, তিনি অমর ; এই রহস্য যে জানে, সে যা কিছু বাসনা করে, তা পায়। নচিকেতা, এই হচ্ছে মানুষের আত্মা, যাঁকে তুমি জানতে চাও, তাঁর কখনও জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। যাঁর আদি নেই, চিরকাল বর্তমান, দেহ ধ্বংস হলেও যাঁর ধ্বংস নেই। যদি নিধনকারীভাবে সে নিহত করতে পারে এবং যদি নিহতভাবে সে হত হয়েছে, তাহলে দুজনেই ভ্রান্ত, কারণ আত্মা নিধনকারী নয়, নিহতও নয়। অণু হতে অসীম ক্ষুদ্রতর, বিরাটতম সত্তার চেয়ে অসীম বৃহৎ, সকলের প্রভু সকলের হৃদয়-গুহায় বাস করেন। যিনি পাপমুক্ত হন, তিনি তাঁকে তাঁর সকল গৌরবমণ্ডিত অবস্থায় তাঁরই কৃপাতে দেখতে সক্ষম হন। (আমরা দেখছি যে ঈশ্বর-উপলব্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের কৃপা।) উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি দূরে গমন করতে পারেন, শায়িতাবস্থায় সর্বত্র গমন করেন, পবিত্রকৃত ও সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যতীত কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারে না, যাঁর মধ্যে সকল পরস্পর বিরোধী গুণ মিলিত হয়। দেহহীন অথচ দেহবাসী, অস্পর্শিত অথচ বোধহয় সংযুক্ত, সর্বব্যাপী এই আত্মাকে জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব দুঃখ শূন্য হন। এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা, তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা বা অধিক শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় না। আত্মা যাকে খোঁজেন, তিনিই আত্মাকে পান, তাঁর কাছে আত্মা নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। যে সর্বদা অসৎ কর্ম করে, যার মন শান্ত নয়, যে ধ্যানে সক্ষম নয়, যে সর্বদা চঞ্চল ও বিরক্ত, সে হৃদয়ের গভীর গুহায় নিহিত আত্মাকে বুঝতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না। হে নচিকেতা, এই দেহ হচ্ছে রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্বসমূহ, মন বল্গা, বুদ্ধি সারথি ও আত্মা রথী। যখন সারথিরূপ বুদ্ধির সঙ্গে আত্মা যুক্ত হন এবং তার মাধ্যমে রথরশ্মিরূপ মনের সঙ্গে, আবার তার মাধ্যমে অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে তখন আত্মাকে বলা হয় ভোগকর্তা ; তিনি অনুভব করেন, কার্য করেন। যার মন বশে নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, তার ইন্দ্রিয়গুলিও নিয়ন্ত্রণে থাকে না, চালকের হাতে দুরন্ত অশ্বের মতোই। কিন্তু যার বিচারবুদ্ধি আছে, যার মন স্ববশে তার ইন্দ্রিয়গুলি উত্তম অশ্বের ন্যায় সর্বদাই সারথির নিয়ন্ত্রণাধীন। যার বিচারবুদ্ধি আছে, যার মন সর্বদা সত্যকে বুঝতে চায়, যে সদা পবিত্র, সেই সত্যকে পায়, যা লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না।• হে নচিকেতা, এটি খুবই কঠিন, পথ দীর্ঘ ও দুর্গম। যারা সূক্ষ্মতম অনুভূতি লাভ করেছে তারাই দেখতে পারে, তারাই জানতে পারে। তবুও ভীত হয়ো না। ওঠ, জাগ, লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেম না! ঋষিরা বলেন কাজটি অত্যন্ত কঠিন, শাণিত ক্ষুরের উপর দিয়ে হাঁটার মতো।

যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের পারে, যিনি অব্যয়, যার আদি অন্ত নেই, যিনি এমন কি বুদ্ধিরও অতীত, অপরিণামী, একমাত্র তাঁকে জানলে আমরা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হই।'

এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে যম পরম লক্ষ্যকে বর্ণনা করলেন। প্রথম তত্ত্ব যা আমরা পেলাম, তা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতি নানা তরঙ্গ যার মধ্যে এই পৃথিবীতে আমরা হাবু-ডুবু খাচ্ছি, তা জয় করা যায় সত্যকে জানলে? সত্য কী? যা অপরিণামী, জীবের আত্মা, বিশ্বের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মা। তারপর আবার বলা হলো যে, তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। জানা মানে শুধু বুদ্ধির গোচরভূত করা নয়, জানা মানে উপলব্ধি করা। বার বার আমরা শুনেছি যে এই আত্মাকে দর্শন করতে হবে, ধারণা করতে হবে। চোখ দিয়ে আমরা একে দেখতে পাই না, এর ধারণা অতি সূক্ষ্ম হতে হবে। এই দেয়াল ও বই সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করছি, তা স্থূল ধরণা, কিন্তু সত্যকে উপলব্ধি করার ধারণাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হতে হবে এবং এই জ্ঞানের সেটিই হচ্ছে সমগ্র রহস্য। তারপর যম বলছেন অত্যন্ত পবিত্র হতে হবে। অনুভূতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করার সেই হচ্ছে উপায়। তারপর তিনি অন্য উপায়গুলির কথা আমাদের বলেন। সেই সৎ-বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে বহু দূরে। ইন্দ্রিয় শুধু বাহ্যজগৎকেই দেখে, কিন্তু সৎ-বস্তু—আত্মা—অন্তর্জগতে দর্শনীয়। তাঁকে দর্শনের জন্য কোন গুণের প্রয়োজন হয় তা মনে রাখবে—সেই আত্মাকে জানার বাসনায় দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করা। প্রকৃতিতে আমরা যেসব সুন্দর বস্তু দেখি, তা খুবই ভাল, কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের উপায় সেগুলি নয়। আমাদের শিক্ষা করতে হবে দৃষ্টিকে কীভাবে অন্তর্মুখী করা যায়। বাহ্যদৃশ্য দর্শনে দৃষ্টির আগ্রহকে সংযত করা উচিত। যখন তুমি যানবহুল পথে হাঁট, তখন তোমার সঙ্গীর কথা শুনতে অসুবিধা হয়, কারণ গাড়িঘোড়ার গোলমাল। সেও তোমার কথা শুনতে পায় না অত গোলমালের জন্য। মন বাইরের দিকে চলেছে এবং তুমি তোমার পাশের মানুষের কথা শুনতে পারবে না। তেমনিভাবে এই পৃথিবী আমাদের চারধারে এত গোলমালের সৃষ্টি করে যে মন বাইরের দিকে আকর্ষিত হয়। আমরা আত্মাকে কেমন করে দেখব? এই বহির্মুখীতা বন্ধ করতেই হবে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী করার মানে হচ্ছে তাই এবং তখনই অন্তরস্থিত ঈশ্বরের মহিমা দৃষ্ট হবে।

এই আত্মা কী? আমরা দেখেছি তা বুদ্ধির অগোচর। ওই উপনিষদ থেকে আমরা জানছি এই আত্মা সনাতন ও সর্বব্যাপী; তুমি, আমি ও আমরা সকলে সর্বব্যাপী সত্তা এবং আত্মা হচ্ছে অপরিণামী। এখন এই সর্বব্যাপী সত্তা একটিমাত্রই হতে পারে। দুটি সমান সর্বব্যাপী সত্তা হতে পারে না। কী ভাবে হবে? দুটি বস্তু তো অসীম হতে পারে না। ফলে প্রকৃতই একটিমাত্র আত্মা আছে এবং তুমি, আমি ও সমস্ত জগৎ একই, তবে বহু বলে প্রতিভাত হয়। 'যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করে বহুভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, তেমনি একই আত্মা, সকলের আত্মা, বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করছে।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যদি এই আত্মা পূর্ণ, পবিত্র ও সমগ্র জগতের সত্তা হয়, তবে অপবিত্র দেহে, মন্দের দেহে ও ভালর দেহে প্রবেশ করে তার

কী হয়? কী করে তা পূর্ণ পবিত্র থাকে? 'একই সূর্য সকলেরই দৃষ্টির কারণস্বরূপ, কিন্তু কারও চোখে দোষ থাকলে সূর্যকে স্পর্শ করে না।' যদি কারও ন্যাবা থাকে সে সব কিছুই হলদে দেখে, তার দৃষ্টির কারণস্বরূপ হচ্ছে সূর্য, কিন্তু তার সব কিছু হলদে দেখার জন্য সূর্য দোষী নয়। সেই একই সত্তা যদিও প্রত্যেকের আত্মা, তবু বাইরের পবিত্র বা অপবিত্রতার দোষ তাকে স্পর্শ করে না। 'যিনি জগতের অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবাদদিগের মধ্যে চেতন, তাঁকে যে জ্ঞানীগণ আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁদেরই নিত্য শান্তি, অন্যের নয়, অপরের নয়। সেখানে সূর্য চন্দ্র তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নিই বা কোথায়? তাঁর আলোতে সকলে আলোকিত, তাঁর দীপ্তিতেই সব কিছু দীপ্তিমান। যখন হৃদয় আলোড়নকারী সকল বাসনা প্রশমিত হয়, তখনই মরণশীল অমর হয়ে ওঠে, তখনই ব্রহ্মলাভ হয়। যখন অন্তরের কুটিলতা দূর হয়, হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হয়, একমাত্র তখনই মর্ত্য অমর হয়। এই হচ্ছে পথ। এই অধ্যয়ন আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করুক, এ যেন আমাদের শক্তি দান করে, এ যেন আমাদের মধ্যে শক্তিস্বরূপ হয়; আমরা যেন পরস্পরকে ঘৃণা না করি; সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!'

বেদান্তদর্শনে এই চিন্তাধারা তোমরা দেখতে পাবে। এখানেই আমরা প্রথম এমন এক চিন্তা দেখলাম যা পৃথিবীর অন্যান্য সব চিন্তার থেকে পৃথক। বেদের প্রাচীন অংশে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মতোই অন্বেষণটা ছিল বহির্জগতে। কিছু পুরাতন গ্রন্থে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল,—'সৃষ্টির প্রারম্ভে কী ছিল? যখন অস্তি-নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন অন্ধকারকে অন্ধকার আবৃত করেছিল, কে এইসব সৃষ্টি করেছিল?' তাই অন্বেষণ শুরু হলো। বলা হতে লাগল দেবদূত, দেবগণ এবং যত রকমের কথা। পরে দেখি হতাশ হয়ে এদের সব পরিত্যাগ করা হয়েছে। সে যুগে সন্ধান বহির্জগতে চলেছিল এবং তাঁরা সঠিক উত্তর পেলেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে, যেমন আমরা বেদে পড়ি, তাঁদের অন্তর্জগতে অনুসন্ধান শুরু হলো স্বয়ম্ভু সত্তার জন্য। বেদের এক মূল তত্ত্ব হচ্ছে যে, গ্রহ-তারকায়, নীহারিকায় সমগ্র বাহ্যজগতে আমাদের অন্বেষণ বিফল, জীবন-মৃত্যুর রহস্য তাতে সমাধান হয় না। অন্তর্জগতের আশ্চর্য কলা-কৌশলকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাতেই জগতের রহস্য তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হলো, যা কোন গ্রহ তারকা সূর্য করতে সক্ষম হয়নি। মানবকে বিশ্লেষণ করতে হবে, মানবদেহকে নয়, মানবাত্মাকে। এই আত্মার মধ্যেই তাঁরা উত্তর পেয়েছিলেন। কী উত্তর তাঁরা পেয়েছিলেন? এই দেহের পশ্চাতে, এমন কি মনেরও পশ্চাতে এক স্বয়ম্ভু সত্তা আছে। তাঁর মৃত্যু নেই, জন্ম নেই। এই স্বয়ম্ভু সত্তা হচ্ছে সর্বব্যাপী, কারণ তার কোন রূপ নেই। যার কোন রূপ বা আকার নেই, যা দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, তা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে পারে না। কেমন করে পারে? সে যে সর্বত্র, বিভু, আমাদের সকলের মধ্যেই সমভাবে আছে।

মানুষের আত্মা কী? একদল আছেন যাঁরা বলেন যে, ঈশ্বর একটি সত্তা ছাড়া আরও অসংখ্য সত্তা আছে যারা ঈশ্বর থেকে মূলত, রূপগত ও অন্যান্য বিষয়ে পৃথক। এটি দ্বৈতবাদ। এটি খুব প্রাচীন ও স্থূল ধারণা। এর উত্তরে অন্যদল বলেন যে, আত্মা

অসীম দিব্য সত্তার এক অংশ। যেমন এই দেহটি এক ক্ষুদ্র জগৎ এবং এর পশ্চাতে হচ্ছে মন বা চিন্তা।এবং তার পিছনে আছে ব্যষ্টি সত্তা, তেমনিভাবে সমগ্র জগৎ হচ্ছে একটি দেহ, তার পেছনে আছে এক বিশ্বজনীন মন এবং তার পিছনে আছে বিশ্বজনীন আত্মা। যেমন এই দেহ হচ্ছে সেই বিশ্বজনীন দেহের অংশ, তেমনি এই মন হচ্ছে বিশ্বজনীন মনের অংশ, এবং মানুষের আত্মা হচ্ছে বিশ্বজনীন আত্মার অংশ। একে বলা হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; এখন আমরা জানি বিশ্বজনীন মন অসীম। অসীমের অংশ কী করে থাকতে পারে? একে খণ্ডিত বিভক্ত কেমন করে করা যাবে? খুব কাব্যময়ভাবে বলা যায় আমি সেই অসীমের এক স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু চিন্তাশীল মনের কাছে এটা অবাস্তব। অসীমকে বিভক্ত করার অর্থ কী? এটি কি কোন বস্তু জগতের পদার্থ যে যাকে তুমি পৃথক অংশে খণ্ডিত করতে পার? অসীমকে কখনও বিভক্ত করা চলে না। যদি তা সম্ভব, তাহলে সেটি আর অসীম থাকে না। তাহলে কী সিদ্ধান্ত হলো? উত্তর হচ্ছে, যে আত্মা বিশ্বজনীন তা হচ্ছ তুমি, তুমি তার একটি অংশ নও, তার সমগ্রই। তুমিই সমগ্র ঈশ্বর। তাহলে এই সব বৈচিত্র্যগুলি কী? আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যষ্টি আত্মা। তারা কী? যদি সূর্য লক্ষ লক্ষ জলবুদ্বুদে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহলে প্রতিটি বুদ্বুদ হচ্ছে সেই প্রতিমূর্তি—সূর্যের পূর্ণ প্রতিমূর্তি; কিন্তু সেগুলি শুধু প্রতিমূর্তিই, প্রকৃত সূর্য মাত্র একটিই। তাই এই আপাত আত্মা, যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে তা শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তার বেশি কিছু নয়। প্রকৃত সত্তা যিনি পিছনে আছেন, তিনি সেই এক ঈশ্বর। সেখানে আমরা সকলেই এক। জগতে আত্মারূপে একটিই আছে। তোমার মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে এবং তা হচ্ছে সেই একই। বিভিন্ন দেহে সেই একই আত্মা পৃথকরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আমরা তা জানি না, আমরা মনে করি আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে পৃথক এবং তাঁর থেকেও পৃথক। যতকাল আমরা এই ভাবি, ততকাল জগতে দুঃখ থাকবে। এটাই ভ্রম।

তারপর দুঃখের আর একটি বড় উৎস হচ্ছে ভয়। একজন মানুষ কেন অন্যের ক্ষতি করে? কারণ সে ভয় পায় যে সে যথেষ্ট উপভোগ করতে পারবে না। সম্ভবত একজন মানুষ ভয় পায় যে, সে যথেষ্ট অর্থ লাভ করবে না, সেই ভয়ই তাকে বাধ্য করে অন্যের ক্ষতি করতে, অন্যের চুরি করতে। একটি মাত্র সত্তা হলে ভয় থাকবে কী করে? আমার মাথায় যদি বজ্র পড়ে, আমিই তো সেই বজ্র, কারণ আমিই তো একমাত্র সত্তা। যদি মহামারী আসে, আমিই তো সেই; যদি বাঘ আসে, সে তো আমিই। যদি মৃত্যু আসে, সে তো আমিই। জীবন ও মৃত্যু দুই-ই তো আমি। আমরা দেখছি যে ভয় এই ধারণা থেকেই আসে যে, জগতে দুটি সত্তা আছে। আমরা সর্বদা এটি প্রচারিত হতে শুনেছি, 'পরস্পরকে ভালবাস'। কী জন্যে? নীতিটি প্রচারিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা এখানে পাচ্ছি। কেন আমি সকলকে ভালবাসব? কারণ তারা ও আমি এক। আমার ভাইকে আমি কেন ভালবাসব? কারণ সে ও আমি এক। সমগ্র জগতের এই হচ্ছে বন্ধন, এই একত্ব। আমাদের পদপ্রান্তে বিচরণকারী ক্ষুদ্র কীট হতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকলের দেহ

বিভিন্ন, কিন্তু আত্মা এক। সকল মুখে তুমি খাও, সকল হাতে তুমি কাজ কর, সকল চোখে তুমি দেখ। লক্ষ দেহের মধ্যে তুমি স্বাস্থ্য উপভোগ কর, লক্ষ দেহে তুমি ব্যাধি ভোগ কর। যখন এই ধারণা জন্মায় এবং আমরা এটি উপলব্ধি করি, দেখি, অনুভব করি, তখনই দুঃখ দূর হয় এবং সেইসঙ্গে ভয়ও। আমি কী করে মরতে পারি? আমার পরে কিছু নেই। ভয় থাকে না, তখনই শুধু আসে পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ প্রেম। সেই সর্বজনীন সমবেদনা, প্রেম, আনন্দ, যা অপরিণামী, মানুষকে সবকিছুর উপরে তুলে দেয়। এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কোন দুঃখ একে স্পর্শ করতে পারে না কিন্তু জগতের ক্ষুদ্র ভোগসুখ সর্বদা প্রতিক্রিয়া আনে। এর সকল কারণ হচ্ছে এই দ্বৈতভাব, এই ধারণা যে আমি জগৎ থেকে পৃথক, ঈশ্বর থেকে পৃথক। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে, 'আমিই তিনি, আমিই জগতের আত্মা, আমি চির আনন্দ চির মুক্ত'—অমনি প্রকৃত প্রেম আসে, ভয় অন্তর্হিত হয়, সব দুঃখ দূর হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

আমরা বলি, 'সেদিনটা বাস্তবিকই খারাপ, যেদিন ঈশ্বরের নাম শোনা যায় না। বাদলা দিন মোটেই খারাপ দিন নয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য খুব বড় ঋষি ছিলেন। তোমরা জান, ভারতবর্ষে শাস্ত্রে আছে যে, মানুষ বৃদ্ধ হলে সংসার ত্যাগ করবে। তাই যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'প্রিয়ে, আমার যা কিছু ধন-সম্পদ, বিষয়সম্পত্তি রইল, আমি চললাম।

মৈত্রেয়ী জবাব দিলেন, 'প্রভু, যদি ধনরত্নপূর্ণ সারা পৃথিবী আমি পাই, তা কি আমায় অমরত্ব এনে দেবে ?'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, তা দেবে না। তুমি ধনী হবে এই পর্যন্ত, ধনসম্পদ আমাদের অমরত্ব দান করতে পারে না।'

মৈত্রেয়ী বললেন, 'যার দ্বারা আমি অমর হতে পারি, তা পাওয়ার জন্য আমার কী করতে হবে ? যদি তুমি জান তো আমায় বল।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তুমি বরাবর আমার প্রিয় ছিলে, এই প্রশ্ন দ্বারা আরও প্রিয় হলে। এস, বস, আমি তোমায় বলব। কথাগুলো শোনার পর এই নিয়ে ধ্যান কর।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে স্বামী বলে নয়, আত্মা বলেই ; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসে। স্ত্রী বলেই কেউ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কারণ সে আত্মাকে ভালবাসে তাই স্ত্রীকে ভালবাসে। সন্তানদের কেউ তাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, তাই সন্তানদেরও ভালবাসে। অর্থকে কেউ অর্থের জন্য ভালবাসে না, সে আত্মাকে ভালবাসে তাই অর্থকে ভালবেসে থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোক ভালবাসে, তা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলেই লোকে ব্রাহ্মণকে ভালবেসে থাকে। ক্ষত্রিয়কে কেউ ক্ষত্রিয় বলে ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলেই তাকে ভালবাসে। এই জগৎকেও কেউ জগৎ বলে ভালবাসে না, আত্মা বলেই ভালবাসে। সেইভাবে দেবতা বলেই কেউ দেবতাদের ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলেই দেবতাদের ভালবাসে। বস্তুকে যে লোক ভালবাসে, তা বস্তুর জন্য নয়, আত্মার জন্যই। অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। হে মৈত্রেয়ী, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার উপলব্ধির দ্বারা এই সব জ্ঞাত হওয়া যায়।'

তাহলে আমরা কী পাই ? আমাদের সামনে দেখছি এক অদ্ভুত দর্শন। বলা হয়েছে যে, সব প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর খারাপ অর্থ হতে পারে। আমি নিজেকে ভালবাসি, সেই জন্যই অপরকে ভালবেসে থাকি। এটা হতে পারে না। বর্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁরা বলেন যে, স্বার্থই জগতের একমাত্র প্রেরণাদায়ক শক্তি। এ কথা এক হিসেবে সত্য, আবার অন্য হিসাবে ভুল। আমাদের এই 'আমি' হচ্ছে এর পিছনে যে প্রকৃত আমি আছে তার ছায়া মাত্র।

এই আমি ক্ষুদ্র বলে এর উপর ভালবাসা অন্যায় ও খারাপ বলে মনে হয়। বিশ্ব-আত্মার উপর অসীম ভালবাসা ক্ষুদ্র ও মন্দ বলে মনে হয়, কারণ তা সসীমভাবে দৃষ্ট হয়। এমন কি স্ত্রী যখন স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা না জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসে। এটা স্বার্থপরতারূপেই জগতে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে আত্মপরতা বা আত্মভাবেরই ক্ষুদ্র অংশ। যখনই কেউ ভালবাসে, তাকে সেই আত্মার মধ্যে দিয়েই ভালবাসতে হয়। এই আত্মাকে জানতে হবে। পার্থক্য কোথায়? যাঁরা আত্মার স্বরূপ না জেনে ভালবাসেন তাঁদের ভালবাসা স্বাধীন, তাঁরা ঋষি।

'ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা থেকে পৃথক দেখেন। ক্ষত্রিয় তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি ক্ষত্রিকে আত্মা থেকে পৃথক দেখেন। জগৎ তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা থেকে পৃথক দেখেন। দেবগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে ভালবাসেন আত্মা থেকে তাঁদের পৃথক জেনে। সকল বস্তুই তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাদের আত্মা থেকে পৃথক বলে জানেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই জগৎ, এই দেবগণ, যা কিছু আছে, সবই সেই আত্মা।'—প্রেম বলতে যা বোঝায় তাকে এই বলে তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

যখনই আমরা কোন বিশেষ বস্তুতে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করি, তখনই আমরা আত্মা থেকে তাকে পৃথক করে ফেলি। আমি কোন এক নারীকে ভালবাসি, যখনই সেই নারীকে বিশেষভাবে দেখি, আত্মার থেকে পৃথকভাবে দেখি, তখনই তার প্রতি আমার ভালবাসা শাশ্বত হল না, তার শেষ হবে দুঃখে। কিন্তু যখনই সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখন সেই প্রেম প্রকৃত প্রেম এবং তার পরিণাম কখনও দুর্দশাপূর্ণ নয়। সব বস্তুর ব্যাপারে এই একই কথা, যখনই তোমরা জগতের কোন বস্তুতে আসক্ত হও, তাকে জগতের সমগ্রতা বা আত্মা থেকে পৃথক কর, তখনই এক প্রতিক্রিয়া আসে। আত্মা ছাড়া যা কিছু আমরা ভালবাসি, তাতেই পরিণামে শোক-দুঃখ আছে। যদি আমরা সমস্ত বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভেবে ও আত্মরূপে উপভোগ করি, তাহলে কোন দুঃখ বা প্রতিক্রিয়া আসবে না। এটাই পূর্ণ আনন্দ। এই আদর্শে কী করে পৌছানো যায়?

যাজ্ঞবল্ক্য ওই অবস্থায় উপনীত হবার উপায় আমাদের বলেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম। আত্মাকে না জেনে এই জগতের প্রতিটি বিশেষ বস্তুকে আমরা কীভাবে আত্মা বলে গ্রহণ করব?

'যেমন ঢাকের বাজনার বেলায় আমরা দূরে থাকলে শব্দ শুনতে পাই না, শব্দকে জয় করতে পারি না; কিন্তু যেই আমরা ঢাকের কাছে আসি এবং তার উপর হস্ত স্থাপন করি, অমনি শব্দকে জয় করি। শঙ্খধ্বনি হলে আমরা সেই ধ্বনিকে ধরতে বা জয় করতে পারি না, যতক্ষণ না কাছে এসে আমরা শঙ্খটিকে ধরছি; তাহলেই তাকে জয় করা হয়।

'বীণা বাজতে থাকলে আমরা যদি তার কাছে আসি, তাহলে ধ্বনি যেখান থেকে উত্থিত হচ্ছে, তার কেন্দ্রে আমরা পৌছাই।

'যেমন কেউ ভিজা কাঠ জ্বালালে ধূম ও নানা প্রকার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি সেই মহান এক সত্তার নিঃশ্বাস হতে সমুদয় জ্ঞান নির্গত হয়েছে, সমস্তই তার নিঃশ্বাস স্বরূপ।

'যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয় ত্বক, যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, যেমন সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয় রসনা, যেমন সমস্ত রূপের একমাত্র আশ্রয় চক্ষু, যেমন সমস্ত শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমস্ত চিন্তার একমাত্র আশ্রয় মন, যেমন সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমস্ত কর্মের একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন একমুষ্টি লবণ সমুদ্রজলে দিলে গলে যায় এবং তা আমরা আর ফিরে পাই না, সমুদ্রজলের সর্বাংশে লবণ দ্রবীভূত হয়ে আছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না ; হে মৈত্রেয়ী, এই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি সব কিছু, তিনি চিরন্তন, তিনি অনন্ত। সমগ্র জগৎ তাঁর থেকে উত্থিত এবং পুনরায় তাতেই বিলীন হয়। তাঁকে জানলে আমরা জন্মমৃত্যুর পারে জ্ঞানাতীত অবস্থায় পৌঁছাই।'

আমরা এই ধারণা লাভ করলাম যে, আমরা সকলে স্ফুলিঙ্গের মতো তাঁর কাছ থেকে বেরিয়েছি এবং তাঁকে জানতে পেরে তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাই। আমরা বিশ্বজনীন, সার্বভৌম।

এই কথা শুনে মৈত্রেয়ী ভয় পেয়ে গেলেন, যেমন সর্বত্র লোকে ভয় পেয়ে থাকে। তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি আমাকে এখানে ঠিক বিভ্রান্ত করে দিলেন। আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলেন কোন দেবতা থাকবে না এই কথা বলে। সব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাবে। কাউকে জানার, কাউকে ভালবাসার, কাউকে ঘৃণা করার থাকবে না। আমাদের কী হবে?'

'মৈত্রেয়ী আমি তোমায় বিভ্রান্ত করতে চাই না কিংবা কথাটা এখানেই শেষ করতে চাই না। তুমি ভয় পেতে পার। যেখানে 'দুই' থাকে দ্বৈতাবস্থায়—একজন অন্যজনকে দেখে, একে অপরের কথা শোনে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অন্যজনের কথা ভাবে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হয়ে যায়, তখন কে কাকে দেখবে, কে কার কথা শুনবে, কে কাকে অভ্যর্থনা করবে, কে কাকে জানবে?

এই ধারণাটি দার্শনিক শোপেনহাওয়ার গ্রহণ করে তাঁর দর্শনে প্রতিধ্বনিত করেছেন। কার মাধ্যমে আমরা এই জগৎকে জানি? কার মাধ্যমে তাঁকে জানি? জ্ঞাতাকে কী করে জানব? কী উপায়ে আমরা জ্ঞাতাকে জানতে পারি? কী করে তা হতে পারে? কারণ তাঁর মধ্যে ও তাঁর মাধ্যমে আমরা সব কিছু জানি। কী উপায়ে তাঁকে আমরা জানতে পারি? কোন উপায়েই নয়, কারণ তিনিই হচ্ছেন সেই উপায়।

এত দূর পর্যন্ত এই ধারণা হলো যে, এই সমস্তই এক অনন্ত সত্তা। আর তাই হচ্ছে যথার্থ 'আমিত্ব', সেখানে কোন খণ্ডত্ব নেই, কোন ভাগ নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণাগুলি

অত্যন্ত নীচভাবের ও ভ্রমাত্মক। কিন্তু তবুও প্রতিটি ক্ষুদ্র আমিত্বের স্ফুলিঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই অনন্তই প্রতিভাত হচ্ছে। সবকিছুই আত্মার অভিব্যক্তি। কী করে একে লাভ করা যায়? যাজ্ঞবল্ক্যের মতো প্রথমেই আমাদের বলতে হবে, 'প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনতে হবে।' এইভাবে তিনি প্রথমে বিষয়টি বললেন, তারপরে বিচার করলেন এবং শেষে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে তাঁকে জানতে হবে, যাঁর মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সর্বশেষে এটির উপর ধ্যান করতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষুদ্র পরমাণু ও বিরাট বিশ্বের মধ্যে তুলনা করে দেখালেন তারা কীভাবে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সকলেই কত সুন্দর। 'এই পৃথিবী আনন্দপূর্ণ এবং প্রত্যেকের কল্যাণকামী এবং প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর কল্যাণকামী। সকলই সেই জ্যোতির্ময় আত্মার প্রকাশ।' জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন কি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, তারই প্রতিবিম্ব মাত্র। যা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, যখন এই প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট ছায়ামাত্র তখন তাকে অশুভ বলা হয়। ভাল ও মন্দ দুই দেবতা নেই। যখন তিনি কম অভিব্যক্ত, তখন তাকে তমঃ বা মন্দ বলে এবং যখন তিনি অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন তাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ভাল ও মন্দ শুধু মাত্রার তারতম্য, আত্মার বেশী অভিব্যক্তি বা কম অভিব্যক্তি। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ছেলেবেলায় কত জিনিস আমরা দেখি, যাকে ভাল বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মন্দ; আবার মন্দ বলে যা মনে হয়, তা বাস্তবিক ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়। এক-একটা ধারণা কেমন উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়। এককালে যা ভাল ভাবতাম, এখন আর তা ভাবি না। তাই ভাল ও মন্দ হচ্ছে শুধু সংস্কার, তাদের অস্তিত্ব নেই। পার্থক্য কেবল মাত্রার তারতম্য। সবই সেই আত্মার প্রকাশ। আত্মা সবকিছুতে প্রকাশ পাচ্ছে, যখন এই প্রকাশ খুব স্থূল হয়, আমরা বলি মন্দ আর যখন খুব সূক্ষ্ম হয়, আমরা বলি ভাল। যখন সব আবরণ সরে যায়, তখন এই আত্মা হচ্ছে সর্বোত্তম। তাই জগতে যা কিছু আছে, সেই সবকিছুকেই প্রথমে ভাল বলে ধ্যান করতে হবে, কারণ সবই হচ্ছে সেই সর্বোত্তম। ভাল আছে, মন্দও আছে এবং শীর্ষ বা কেন্দ্র হচ্ছে সেই পরমসত্তা। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি সর্বোত্তম। সর্বোত্তম একটিই হতে পারে; ভাল বহু হতে পারে, মন্দও বহু হতে পারে। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্যের নানা মাত্রা থাকতে পারে, কিন্তু সর্বোত্তম একটিই। সেই সর্বোত্তমকে যখন সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, তখন নানা ধরনের ভাল আমরা বলি এবং যখন স্থূল আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, আমরা মন্দ বলি। ভাল ও মন্দ সংস্কারের বিভিন্ন রূপ। এইগুলি দ্বৈত ভ্রম প্রসূত, এবং এর থেকেই নানা ধারণা, নানা ধরনের কথা মানুষের অন্তরের গভীরে গেঁথে বসেছে, নরনারীকে ভীতিগ্রস্ত করে স্বেচ্ছাচারীর মতো তারা বাস করছে। তারা আমাদের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর করে তোলে। আমরা অপরকে যত কিছু ঘৃণা করি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকেই এইসব ভাল ও মন্দ মূর্খোচিত ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার-বিবেচনা একেবারে ভুল হয়ে যায়। এই সুন্দর পৃথিবীকে আমরা নরক করে তুলি। কিন্তু যখন আমরা ভাল-মন্দের এই ভুল ধারণা ছেড়ে দিতে পারব, তখনই এই পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীকে বললেন :

'এই পৃথিবী সকলের কাছে আনন্দপূর্ণ (আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে 'মধু' শব্দটি) এবং সকলে পৃথিবীর কাছে মধু ; সকলে পরস্পরকে সাহায্য করে। আর সকল মধুরতা সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মার কাছ থেকে আসছে, যিনি এই পৃথিবীর মধ্যে আছেন।'

কার এই মধুরত্ব? তিনি ছাড়া কোন মধুরত্ব কী করে হবে? সেই এক মাধুর্য বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। যেখানেই কোন মানুষের ভেতর কোন প্রেম বা মধুরতা দেখা যায়, সাধুতেই হোক বা পাপীতে হোক, যোদ্ধাতেই হোক বা হত্যাকারীতে হোক, দেহে হোক বা মনে হোক বা ইন্দ্রিয়তেই হোক, সেখানেই তিনি আছেন। দৈহিক আনন্দ, মানসিক আনন্দ, আবার আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ছাড়া আর কী থাকতে পারে? কুড়ি হাজার দেবতা ও দৈত্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে এটা কি হতে পারে? শিশুসুলভ স্বপ্ন! নিম্নতম ইন্দ্রিয়সুখে তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দেও তিনি। তিনি ছাড়া কোন মধুরত্ব থাকতে পারে না। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন। যখন তুমি এই অবস্থায় পৌঁছবে, সকল বস্তুকে সমদৃষ্টিতে দেখবে, এমন কি মাতালের মদ্যপানের আনন্দের মধ্যে সেই মধুরত্বকেই শুধু দেখবে, তখন তোমার সত্যলাভ হয়েছে, তখনই শুধু তুমি বুঝবে আনন্দের মানে কী, শান্তির মানে কী, প্রেমের মানে কী। কিন্তু যতকাল তুমি বৃথা ভেদজ্ঞান রাখবে, বোকার মতো, শিশুর মতো সংস্কারগুলি রাখবে, ততকাল সবরকমের দুঃখ আসবে। সেই তেজোময় সত্তা, অমৃতময় সত্তা সারা পৃথিবীর মধ্যে আছেন, সবই তাঁর মধুরত্ব। তাঁর মধুরত্ব এই দেহে আছে, এই দেহটি যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ; দেহের সমস্ত শক্তির মধ্যে, সমস্ত উপভোগের মধ্যে তিনিই আছেন, তাই চক্ষু দর্শনসুখ উপভোগ করে, ত্বক স্পর্শসুখ। এই উপভোগগুলি কী? সেই তেজোময় যিনি দেহে আছেন, তিনিই আত্মা। এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই তার পক্ষে মধুময়, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

'এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ আর এই বায়ুর কাছেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় সত্তা বায়ুতে রয়েছেন, দেহেও রয়েছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

'এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজময় সত্তা সূর্যে রয়েছেন, তাঁকেই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকরূপে প্রতিফলিত করি। তাঁর প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কী হতে পারে? তিনি আমাদের দেহে রয়েছেন এবং তাঁরই প্রতিবিম্বের ফলে আমরা আলোক দেখতে পাই।

'এই চন্দ্র সকলের পক্ষে মধুস্বরূপ এবং চন্দ্রের পক্ষেও সকলে মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় সত্তা, যিনি চন্দ্রের আত্মাস্বরূপ, তিনিই আমাদের ভেতর মনরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

'এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও আছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম। সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম, সকল প্রাণীর রাজা।'

এই ধারণাগুলি মনুষ্যের পক্ষে খুব সহায়ক, এগুলি ধ্যানের উপযোগী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীকে ধ্যান কর, পৃথিবীকে চিন্তা কর। সেই সঙ্গে ভাব যে পৃথিবীতে যা আছে, আমাদের দেহেও তাই আছে এবং উভয়েই এক। দেহের সঙ্গে পৃথিবীকে একাত্ম কর, এবং দেহস্থ আত্মার সঙ্গে পৃথিবীর অন্তবর্তী আত্মার অভিন্নতা ভাব। বায়ুকে ও বায়ুর অন্তবর্তী আত্মাকে নিজের আত্মার সঙ্গে অভেদ ভাব। এ সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। এই একত্বকে উপলব্ধি করাই সকল ধ্যানের লক্ষ্য। এটাই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

বেদান্ত দর্শনের মতে বলা চলে মানুষ তিনটি পদার্থ দ্বারা গঠিত। একেবারে বাইরেরটি হচ্ছে দেহ, মানুষের স্থূলরূপ, যাতে আছে সংবেদনের যন্ত্রগুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি। চক্ষু দৃষ্টির উৎস নয়, শুধু যন্ত্র। তার পশ্চাতে আছে ইন্দ্রিয়। তেমনি কর্ণ শ্রবণের অঙ্গ নয়, যন্ত্রমাত্র, তার অন্তরালে আছে ইন্দ্রিয়, যাকে আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানে বলা হয় স্নায়ুকেন্দ্র। সংস্কৃতে দেহের এই অঙ্গগুলিকে বলা হয় ইন্দ্রিয়। যে স্নায়ুকেন্দ্র চক্ষুকে পরিচালিত করে, তা বিনষ্ট হলে চক্ষু আর দেখতে পায় না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই একই কথা। ইন্দ্রিয়গুলি আবার নিজেরা কিছু বোধ করতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হচ্ছে। সেই অন্যকিছু হচ্ছে মন। বহুবার তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, কোন চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকাকালে যদি ঘড়ি বাজে তো শুনতে পাও না। কেন? কান তো ঠিক ছিল, শব্দ তরঙ্গ তাতে প্রবেশ করেছিল এবং মস্তিষ্কে যথারীতি বাহিত হয়েছিল, তবুও তুমি শুনতে পাওনি, কারণ মন সেই ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। বাইরের বস্তুগুলির ধারণা ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, মন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলির উপর যেন এক প্রলেপ লাগিয়ে দেয়, তাকে বলে অহঙ্কার—'আমি'। মনে কর, যখন আমি কোন কাজে নিমগ্ন রয়েছি, এক মশা আঙুল কামড়ে দিল। আমি অনুভব করলাম না, কারণ আমার মন অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে ইন্দ্রিয়গুলির কাছে নীত ধারণার সঙ্গে আমার মন যখন যুক্ত হয়, এক প্রতিক্রিয়া জাগে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে আমি মশাটি সম্পর্কে সচেতন হই। কাজেই অঙ্গগুলির সঙ্গে মনের যুক্ত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, ইচ্ছার আকারে প্রতিক্রিয়ারও আসা দরকার। মনের যে বৃত্তি থেকে এই প্রতিক্রিয়া আসে,—এই জ্ঞান-বৃত্তি,—একেই 'বুদ্ধি' বলা হয়। প্রথমত একটি বাহ্যিক যন্ত্র চাই, তারপর ইন্দ্রিয়, তারপর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযুক্তি, তারপর বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া এবং যখন এই সবগুলি সম্পূর্ণ হবে, তখনই 'আমি ও বাহ্য বস্তু'র ধারণা জাগবে, অনুভূতি, জ্ঞান জন্মাবে। যে বহিরিন্দ্রিয়টি যন্ত্রমাত্র, সেটি দেহে অবস্থিত, তার পিছনে আছে সূক্ষ্মতর অন্তরিন্দ্রিয়, তারপর মন, তারপর বুদ্ধিবৃত্তি, তারপর অহংকার, যে বলে, 'আমি—আমি দেখি, আমি শুনি ইত্যাদি। সমগ্র কর্মধারাটি কিছু শক্তি দ্বারা নির্বাহ হয়, তাকে তোমরা প্রাণশক্তি বলতে পার; সংস্কৃতে তাদের বলা হয় 'প্রাণ'। মানুষের এই স্থূল অংশ, এই দেহ, যাতে বহিরিন্দ্রিয়গুলি অবস্থিত, তাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'স্থূল শরীর' বা 'স্থূল দেহ'। তারপর প্রথমে আসে অন্তরিন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, অহংকার। এই সব ও প্রাণ-শক্তিগুলি মিলে যে যৌগিক সত্তা গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর। এই শক্তিগুলি খুব সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গঠিত, এত সূক্ষ্ম যে এই দেহের কোন আঘাত তাদের ধ্বংস করতে পারে না। এই স্থূল দেহের সকল আঘাত সহ্য করে সূক্ষ্ম দেহ বেঁচে থাকে। আমরা যে স্থূল দেহ দেখি তা স্থূল পদার্থ দিয়ে গঠিত, কাজেই তা সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে, নিত্য নতুন হচ্ছে। কিন্তু

অন্তরিন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি ও অহংকার সূক্ষ্মতম পদার্থ দিয়ে গঠিত, এত সূক্ষ্ম যে তা যুগ যুগ ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে কোন কিছু দ্বারা তাদের বাধা দেওয়া যায় না, যে কোন বাধাকে তারা অতিক্রম করতে পারে। স্থূল দেহ যেমন অচেতন, সূক্ষ্ম দেহও তেমন, কারণ তা সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও তার এক অংশকে বলা হয় মন, অপর অংশকে বুদ্ধি, তৃতীয় অংশকে অহংকার, তবুও একদৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি তাদের কেউ 'জ্ঞাতা' হতে পারে না। তাদের কেউই অনুভবকর্তা হতে পারে না, সর্বপ্রকার কর্মের সাক্ষী বা কর্মের দ্রষ্টা হতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহংকারের সকল কর্মই অন্য কোন একজনের জন্য। এই সব কিছু সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত বলে স্বপ্রকাশ হতে পারে না। এগুলির দীপ্তি নিজেদের ভিতর থাকতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই টেবিলটির প্রকাশ কোন বাহ্য বস্তুর নিমিত্ত নয়। সুতরাং এদের সকলের পিছনে এমন একজন আছেন, যিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কৃতে তাঁকে বলা হয় আত্মা,—মানুষের আত্মা, মানুষের যথার্থ স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব কিছু দেখেন। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলি ধারণাগুলিকে গ্রহণ করে মনের কাছে প্রেরণ করে, মন প্রেরণ করে বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধি সেগুলি আয়নার মতো প্রতিফলিত করে এবং বুদ্ধির পিছনে হচ্ছে আত্মা, যিনি সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর আদেশ ও নির্দেশ দান করেন। এই সব যন্ত্রের চালক তিনি, তিনিই গৃহকর্তা, দেহ সিংহাসনে উপবিষ্ট নৃপতি। অহংকারবৃত্ত, বুদ্ধি-বৃত্ত, চিন্তা-বৃত্তি, ইন্দ্রিয়গুলি, যন্ত্রগুলি, দেহ—সকলেই তাঁর আদেশ পালন করে। তিনিই এই সব কিছুকে প্রকাশ করছেন। এই হচ্ছে মানুষের আত্মা। তেমনই-ভাবে আমরা দেখি, বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশে যা আছে, সমগ্র বিশ্বেও অবশ্যই তা হবে। সামঞ্জস্য যদি এই বিশ্বের বিধান হয়, তাহলে বিশ্বের প্রতিটি অংশ সামগ্রিক-ভাবে এই পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই আমরা মনে করি যে, যাকে আমরা বিশ্ব বলি, সেই স্থূল জড়রূপের পিছনে সূক্ষ্ম পদার্থের এক বিশ্ব নিশ্চয়ই আছে, যাকে আমরা চিন্তা বলি এবং তার আড়ালে নিশ্চয়ই আত্মা আছেন, যিনি এই সব চিন্তাকে সম্ভব করেন, যিনি আদেশ দান করেন, যিনি এই বিশ্ব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত জগৎপতি। প্রতি মন ও প্রতি দেহের অন্তরালে যে আত্মা আছেন, তাঁকে বলা হয় প্রত্যগাত্মা,—জীবাত্মা। আর এই বিশ্বের অন্তরালে এর চালক, শাসক ও নিয়ামক-রূপে যে আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর।

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে, এ সব জিনিস কোথা থেকে এল? উত্তর হচ্ছে—আসা বলতে কী বোঝায়? যদি এর অর্থ হয় যে শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা যায়, তবে তা অসম্ভব। এই সব সৃষ্টি, প্রকাশ কখনও শূন্য থেকে হতে পারে না। কারণ না থাকলে কোন কার্য হয় না, আর কার্য হচ্ছে কারণেরই পুনঃপ্রকাশ। এই হচ্ছে একটা গ্লাস। মনে কর একে আমরা খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ফেললাম, চূর্ণ করলাম, রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা গালিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেললাম। তাহলে কি এটা শূন্যে ফিরে যাবে? নিশ্চয়ই না। এর আকৃতিটি ভাঙবে, কিন্তু যে অণুগুলি দ্বারা গঠিত সেগুলি থাকবে; সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত হবে, কিন্তু থাকবে এবং

এটা খুবই সম্ভব যে সেগুলির দ্বারা আর একটি গ্লাস নির্মিত হতে পারে। একটি ক্ষেত্রে যদি এটা সত্য হয়, তাহলে সর্বক্ষেত্রেই তাই হবে। শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। আবার কোন কিছুকে শূন্যে বিলীন করাও যায় না। এটা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে পারে, আবার স্থূল থেকে স্থূলতর। বৃষ্টিকণা বাষ্পাকারে সমুদ্র থেকে গৃহীত হয়, বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে পর্বতে পৌঁছায়, সেখানে সে জলে পরিণত হয়ে শত শত মাইল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র-জননীর কাছে ফিরে যায়। বীজ বৃক্ষ উৎপন্ন করে। বৃক্ষ ধ্বংস হয়, রেখে যায় শুধু বীজ। সেই বীজ আবার আর একটি বৃক্ষরূপে দেখা দেয়, আবার পরিণত হয় বীজে; এই ভাবেই চলে। একটি পাখিকে দেখ, কেমন ডিম থেকে বেরিয়ে আসে, সুন্দর পাখিতে পরিণত হয়, বাঁচার পর মরে যায়, জীবদ্দশায় কয়েকটি ডিম পাড়ে, সেই ডিমে থাকে ভবিষ্যৎ পাখির জীবকোষ। ঠিক তেমনি জন্তুর বেলায়, মানুষের বেলায়। সব কিছুই শুরু হয় যেন কয়েকটি বীজ থেকে, কয়েকটি মূল, কয়েকটি সূক্ষ্ম আকার থেকে এবং যতই বাড়তে থাকে ততই স্থূল থেকে স্থূলতর হয়; তারপর আবার সেই সূক্ষ্ম আকারে ফিরে যায় এবং মিলিয়ে যায়। সারা বিশ্ব এইভাবে চলছে। এমন এক সময় আসে যখন সমস্ত জগৎ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় এবং অবশেষে যেন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তবুও কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বস্তুরূপে থেকে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, এই পৃথিবী ক্রমশ শীতল হচ্ছে এবং কালক্রমে অত্যন্ত শীতল হয়ে যাবে। তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত আবার আকাশে পরিণত হবে। তবু এর মূল উপাদান অণুগুলি থাকবে এবং তার থেকে আর এক পৃথিবী বেরিয়ে আসবে। আবার সেটিও অদৃশ্য হয়ে যাবে, নতুন আর একটি দেখা দেবে। অতএব এই পৃথিবী তার মূল কারণে ফিরে যাবে এবং তার উপাদানগুলি আবার একত্রিত হবে, আকার গ্রহণ করবে, যেমন ঢেউ উপরে ওঠে, নীচে নামে, ভেঙে যায়, আবার আকার গ্রহণ করে। এই কারণে ফিরে ও বাহির হয়ে আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকে সংস্কৃতে বলে 'সংকোচ' ও 'বিকাশ', যার অর্থ সঙ্কুচিত হওয়া ও প্রসারিত হওয়া। সমগ্র বিশ্ব যেন সঙ্কুচিত হয় তারপর আবার প্রসারিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাষায় বলা যায় সবকিছুই ক্রমসঙ্কুচিত ও ক্রমবিকশিত হয়। তোমরা ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনেছ, কেমন করে সব কিছু নিম্নতর রূপ থেকে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়। এটি খুবই সত্য। কিন্তু প্রত্যেক বিবর্তনের এক ক্রমসঙ্কোচন আছে। আমরা জানি এই বিশ্বে যে শক্তির লীলা চলছে, তার মোট পরিমাণ সব সময়েই এক এবং কোন পদার্থই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। কোনক্রমেই তুমি পদার্থের একটি অণু কমাতে পার না। তুমি এক বিন্দু শক্তি হ্রাস করতে বা বৃদ্ধি করতে পার না। মোট পরিমাণ সর্বদা একই থাকে। শুধু প্রকাশেরই পার্থক্য হয়—কখনও ক্রমসঙ্কোচন, কখনও বিবর্তন। তাই এই কল্পে যা ব্যক্ত, পূর্ব কল্পে তাই ছিল অব্যক্ত, আবার এই কল্প সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে অব্যক্ত হয়ে যাবে এবং তার থেকেই পরবর্তী কল্পের আবির্ভাব হবে। সমগ্র বিশ্ব এইভাবেই চলেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শূন্য থেকে কোন কিছু নির্মিত

হয়েছে, এই অর্থে 'সৃষ্টি' বলে কিছু নেই। তার চেয়ে বলা ভাল, সবকিছুর বিকাশ ঘটেছে এবং ঈশ্বর হচ্ছেন বিশ্বের বিকাশকর্তা। এই বিশ্ব যেন তাঁর ভেতর থেকে নিঃশ্বাসের মতো আসছে, আবার সঙ্কুচিত হয়ে তাঁর মধ্যেই মিশে যাচ্ছে, আবার তিনিই একে বাইরে নিক্ষেপ করছেন। বেদে খুব সুন্দর একটি উপমা দেওয়া হয়েছে,—'সেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসে একে প্রকাশ করছেন এবং প্রশ্বাসে একে বিলীন করছেন।' ঠিক যেমন এক ধূলিকণা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত ত্যাগ ও প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করতে পারি। খুব ভাল, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে,—প্রথম কল্পের বেলায় কী হয়েছিল? উত্তর হচ্ছে ;- প্রথম কল্পের অর্থ কী? প্রথম কল্প বলে কিছু ছিল না। সময়ের আদি বলে তুমি যদি কিছু ধর, তাহলে সময়ের ধারণাই নষ্ট হয়ে যায়। সময়ের যেখানে শুরু হয়েছিল সেরকম একটা সীমার কথা ভাবতে চেষ্টা কর, তোমাকে সেই সীমার ওপারের সময়ের কথাও ভাবতে হবে। স্থানের শুরুর কথা ভাবতে চেষ্টা কর, তোমাকে তার আগের স্থানের কথাও ভাবতে হবে। স্থান ও কাল দুটিই অসীম, তাই তাদের আদিও নেই, অন্তও নেই। ভগবান পাঁচ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন আর তখন থেকেই ঘুমচ্ছেন,—এই ধারণার চেয়ে আগের ধারণাটি ভাল। অপরপক্ষে, এই ধারণা ঈশ্বরকে শাশ্বত সৃষ্টিকর্তারূপে দেখায়। এখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে, পড়ছে এবং ঈশ্বর এই অনন্ত প্রবাহকে পরিচালিত করছেন। এই বিশ্ব যেমন অনাদি ও অনন্ত, ঈশ্বরও তেমনি। আমরা বুঝি যে এই হওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি বলি যে এমন এক সময় ছিল যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন আকারেই সৃষ্টি ছিল না; তাহলে তো ঈশ্বরও ছিল না, কারণ ঈশ্বর আমাদের কাছে এই বিশ্বের সাক্ষীরূপেই পরিচিত। কাজেই বিশ্ব যখন ছিল না, তখন তিনিও ছিলেন না। একটি ধারণা অন্যটির অনুসরণকারী। কার্যের ধারণা থেকেই আমরা কারণের ধারণা লাভ করি এবং কার্য যদি না থাকে, তাহলে কারণও থাকতে পারে না। স্বভাবতই ধারণা করা যায়—যেমন বিশ্ব হচ্ছে শাশ্বত, তেমন ঈশ্বরও শাশ্বত।

আত্মাও নিশ্চয় শাশ্বত হবে। প্রথমত আমরা দেখি আত্মা জড় নয়। এ স্থূল দেহ নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়, যাকে আমরা মন বা চিন্তা বলি। এটি পঞ্চ-ভৌতিক দেহ নয়, কিংবা খ্রীষ্ট ধর্মে যাকে 'আত্মিক দেহ' বলে তাও নয়। স্থূল দেহ ও আত্মিক দেহ দুই-ই পরিবর্তনশীল। স্থূল দেহ প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তনশীল ও মরণশীল, কিন্তু আত্মিক দেহ বহুকাল থাকে, যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন এটি বিলীন হয়ে যায়। যখনই মানুষের মৃত্যু হয়, তখনই তার স্থূল দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়। আত্মা কোন পরমাণু দ্বারা গঠিত নয় বলে অবিনশ্বর। ধ্বংস বলতে আমরা কী বুঝি? যে সব মূল উপাদান নিয়ে একটি বস্তু গঠিত, তাদের বিভাজনই ধ্বংস। যদি এই গ্লাসটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়, তাহলে বস্তুটির বিভাজন হবে এবং তাতেই গ্লাসটি ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস মানে আমরা বুঝি অণুগুলির বিভাজন। স্বভাবতই বলা যায় অণু দ্বারা যা গঠিত নয়, তার ধ্বংস হবে না, এমন কি বিভাজনও হবে না। আত্মা কোন পদার্থের দ্বারা গঠিত নয়। এ হচ্ছে অখণ্ড, এক। অতএব আত্মা অবিনশ্বর। সেই একই কারণে এর কোন আদি নেই। অতএব আত্মা অনাদি ও অনন্ত।

তিনটি সত্তা আছে। প্রথমে হচ্ছে প্রকৃতি, যা অসীম কিন্তু পরিবর্তনশীল। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু এর ভেতরে আছে নানাবিধ পরিবর্তন। এটি যেন হাজার বছর ধরে সমুদ্রের পানে প্রবাহিত এক নদীর মতন। সংদা একই নদী, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন ঘটছে, জলকণাগুলি প্রতিমুহূর্তে তাদের স্থান পরিবর্তন করছে। তারপর হচ্ছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয়, নিয়ামক। আর আছে আত্মা, ঈশ্বরের মতোই শাশ্বত অপরিবর্তনীয়, কিন্তু সেই নিয়ামকের অধীন। একজন প্রভু, অন্যজন দাস এবং তৃতীয়জন প্রকৃতি।

ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; কার্য সংগঠনের জন্যে কারণ উপস্থিত থাকবেই। শুধু তাই নয়, কারণই কার্যরূপে দেখা দেয়। গ্লাসটি নির্মিত হয়েছে নির্মাণকারী দ্বারা ব্যবহৃত কিছু উপাদান ও কিছু শক্তি থেকে। গ্লাসে আছে ওই শক্তি আর ওই উপাদান। ব্যবহৃত শক্তিই সংলগ্ন থাকার সংহতি-শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি সেই শক্তি সরে যায়, তাহলে গ্লাসটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে; উপাদান-গুলি নিঃসন্দেহে গ্লাসের মধ্যেই আছে, শুধু তাদের আকারের পরিবর্তন হয়েছে। কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়েছে। যেখানেই কার্য দেখতে পাবে, সেখানেই তাকে বিশ্লেষণ করলে সর্বদা কারণকে খুঁজে পাবে; কারণই নিজেকে কার্যরূপে প্রকাশ করে। অতএব, যদি ঈশ্বর এই বিশ্বের কারণ হন এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহলে ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে পরিণত হয়েছেন। যদি আত্মাগুলি কার্য হয় এবং যদি ঈশ্বর কারণ হন, তাহলে ঈশ্বরই আত্মারূপে পরিণত হয়েছেন। অতএব প্রতিটি আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। 'একই অগ্নি থেকে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তেমনি সেই শাশ্বত এক থেকেই এই বিশ্বের সকল আত্মা বের হয়েছে।'

আমরা দেখলাম শাশ্বত ঈশ্বর আছেন এবং শাশ্বত প্রকৃতিও আছে। আর আছে অসংখ্য শাশ্বত আত্মা। এই হচ্ছে ধর্মের প্রথম সোপান, একে বলে দ্বৈতবাদ। এই অবস্থায় মানুষ নিজেকে ও ঈশ্বরকে অনন্তকাল ধরে পৃথক দেখে, যখন ঈশ্বর এক স্বতন্ত্র সত্তা, মানুষ এক স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকৃতিও এক স্বতন্ত্র সত্তা। এই হলো দ্বৈতবাদ। এই মতে কর্তা ও কর্ম সর্ব বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী। মানুষ যখন প্রকৃতির দিকে দেখে, তখন সে কর্তা আর প্রকৃতি কর্ম। কর্তা ও কর্মের দ্বৈতভাব সে দেখে। সে যখন ঈশ্বরের দিকে দেখে, তখন ঈশ্বরকে দেখে কর্মরূপে আর নিজেকে কর্তারূপে। তারা সম্পূর্ণ পৃথক। এই হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দ্বৈতভাব। সাধারণত এই হলো ধর্মের প্রথম রূপ।

তারপর আসে আর একটি রূপ, যা এইমাত্র তোমাদের দেখালাম। মানুষ বুঝতে শুরু করল যে, যদি ঈশ্বর এই বিশ্বের কারণ হন এবং বিশ্ব কার্য হয়, তাহলে স্বয়ং ঈশ্বর এই বিশ্ব ও আত্মাসমূহে পরিণত হয়েছেন এবং মানুষ নিজেও পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের এক অংশ। আমরা ক্ষুদ্র সত্তারা সেই বিরাট অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র এবং সমগ্র বিশ্ব স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এই হচ্ছে পরবর্তী সোপান। সংস্কৃতে একে বলা হয় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। যেমন আমার এই দেহ আছে এবং এই দেহ আত্মাকে আবৃত করে আছে এবং এই দেহের মধ্যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে রয়েছে, তেমনি অসংখ্য আত্মা ও প্রকৃতি সমেত এই বিশ্ব যেন ঈশ্বরের দেহস্বরূপ। ক্রমসঙ্কোচনের সময় যখন আসে,

এই বিশ্ব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। স্থূল প্রকাশ যখন হয়, তখনও বিশ্ব ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। মানুষের আত্মা যেমন মানুষের দেহ ও মনের আত্মা, তেমনি ঈশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা। 'আমাদের আত্মার আত্মা' এই কথাটি প্রত্যেক ধর্মেই তোমরা সকলে শুনেছ। এর অর্থ এই যে, তিনি যেন তাদের সকলের মধ্যে বাস করেন, পরিচালিত করেন, তাদের সকলের নিয়ামক। প্রথম মতে—দ্বৈতবাদে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যষ্টি, অনাদি কাল ধরে ঈশ্বর ও প্রকৃতি থেকে পৃথক। দ্বিতীয় মতে—আমরা ব্যষ্টি, কিন্তু ঈশ্বর থেকে পৃথক নই। আমরা যেন এক বস্তুতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু, আর সেই বস্তুটি হচ্ছেন ঈশ্বর। ব্যক্তিরূপে আমরা স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বরে আমরা এক। আমরা সকলে তাঁর মধ্যেই আছি। আমরা সকলে তাঁরই অংশ, অতএব আমরা এক। তবুও মানুষে-মানুষে মানুষে-ঈশ্বরে এক দৃঢ় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে,—পৃথক অথচ পৃথক নয়।

তারপর আসে একটি আরও সূক্ষ্ম প্রশ্ন। প্রশ্নটি হচ্ছে—অসীমের কি অংশ থাকতে পারে? অসীমের অংশ বলতে কী বোঝায়? যদি বিচার কর, তাহলে দেখবে যে তা অসম্ভব। অসীমকে বিভক্ত করা যায় না, তা সর্বদা অসীমই থাকে। অসীমকে যদি ভাগ করা যেত, তাহলে প্রতি অংশই অসীম হতো। কিন্তু দুটি অসীম হতে পারে না। ধর যদি দুটি থাকত, তাহলে একটি অপরটিকে সীমিত করত এবং উভয়েই সসীম হয়ে যেত। অসীম একটিই এবং অবিভাজ্য। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো যে, অসীম এক, বহু নয় এবং সেই এক অসীম আত্মা হাজার হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে বহু পৃথক আত্মারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সেই একই অসীম আত্মা হচ্ছে এই বিশ্বের পটভূমি, তাকে আমরা ঈশ্বর বলি। সেই একই অসীম আত্মা হচ্ছে মানব মনের পটভূমি, তাকে আমরা বলি জীবাত্মা।

ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব

দুটি জগৎ আছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা এই দুটি থেকেই অনুভূতি দ্বারা সত্য লাভ করে থাকি। আভ্যন্তর অনুভূতিলব্ধ সত্যগুলি হচ্ছে —মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও ধর্ম; বাহ্য অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্য হচ্ছে জড় বিজ্ঞান। এখন এই উভয় জগতের অনুভূতির সঙ্গে যার সামঞ্জস্য আছে, তাই পূর্ণ সত্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ করবে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যগুলি, তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ করবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যগুলিকে। জড়বিজ্ঞানের সত্যের প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, এবং অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণ বহির্জগতে পাওয়া চাই। তবুও আমরা দেখি যে, বহু সত্য পরস্পরবিরোধী। পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগে অন্তর্বাদীরা প্রাধান্য লাভ করল, তারা বহির্বাদীদের সঙ্গে বিবাদ সুরু করে দিল। বর্তমানকালে বহির্বাদী, জড়-বিজ্ঞানীরা প্রাধান্য লাভ করেছেন, তাঁরা মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের বহু দাবি নস্যাৎ করেছেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি বুঝি যে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সারাংশের সঙ্গে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকৃত সারাংশের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

কোন এক ব্যক্তিকে সকল বিষয়ে বড় হবার শক্তি দেওয়া হয়নি। একটি জাতকে জ্ঞানের সকল বিভাগে গবেষণা করার সমান শক্তি দেওয়া হয়'ন। আধুনিক ইউরোপীয় জাতগুলি বহির্জগতের জড়বিজ্ঞানের গবেষণার পক্ষে খুবই শক্তিশালী, কিন্তু মানুষের অন্তর্জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণার পক্ষে তারা তত দক্ষ নয়। অন্যদিকে প্রাচ্যের লোকেরা বাহ্য জগৎ নিয়ে গবেষণায় তত দক্ষ ছিল না, কিন্তু অন্তর্জগতের গবেষণায় তারা খুবই দক্ষ। তাই আমরা দেখি যে প্রাচ্যবাসীদের পদার্থ বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের মিল নেই, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্যের মনোবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য নেই। প্রাচ্যের জড়বিজ্ঞানীদের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ উভয়েই দাবি করেন তাঁদের তত্ত্ব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই বলেছি, জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রেই হোক প্রকৃত সত্য স্ববিরোধী নয়, আভ্যন্তর সত্যগুলির সঙ্গে বাহ্য সত্যের সামঞ্জস্য আছে।

আমরা জানি ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্ ও পদার্থবিদ্দের মতবাদ কী এবং আমরা সকলে এটাও জানি যে তাঁরা ইউরোপের ধর্মতত্ত্বকে কী ভাবে হেয় করেছেন, কী ভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি ধর্মতত্ত্বের দুর্গের উপর বোমার মতো ফেটে পড়েছে এবং আমরা এটাও জানি যে ধর্মতত্ত্ববাদীরা সকল যুগেই কী ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছেন।

আমি এখানে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে প্রাচ্য জাতির মনোবিজ্ঞানের কী ধারণা তা আলোচনা করব। তোমরা দেখবে যে বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে তার কি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রয়েছে, যদি কোথাও অসামঞ্জস্যকর কিছু থাকে, তাহলে দেখবে তা আধুনিক বিজ্ঞানেই আছে, তাতে নেই।

ইংরাজীতে আমরা 'নেচার' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। প্রাচীন সাংখ্য-দার্শনিকরা একে দুটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করতেন,—প্রকৃতি, যা ইংরাজি নেচার শব্দটির সঙ্গে একার্থক, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম, 'অব্যক্ত'.—অভেদাত্মক, যার থেকে সর্ববস্তু উৎপন্ন হয়, যেমন অণু-পরমাণু, শক্তি, মন, চিন্তা ও বুদ্ধি। এটি বিস্ময়জনক যে, ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা বহু যুগ পূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে মন সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। দেহ যেমন প্রকৃতি থেকে উৎপাদিত হয়, মনও তেমনি ;—আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা এর চেয়ে আর বেশি কী দেখবার চেষ্টা করছেন? চিন্তাও তাই, আর আমরা ক্রমশ দেখব যে বুদ্ধিও তাই, এ সব কিছুই সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে প্রসূত।

সাংখ্য এই অব্যক্তের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। শক্তিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সত্ত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ, তৃতীয়টি তমঃ। তমঃ সর্বনিম্ন শক্তি, এটি আকর্ষণের ; রজঃ তার চেয়ে উচ্চতর, এটি বিকর্ষণের ; আর সর্বোচ্চ শক্তি সত্ত্ব, অন্য দুটির ভারসাম্যস্বরূপ, অর্থাৎ যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি দুটি সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন জগতে কোন সৃষ্টি বা আলোড়ন থাকে না। কিন্তু যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, ওই শক্তি দুটির একটি প্রবলতর হয়ে উঠে, তখনই গতির শুরু হয়, সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই ব্যাপার চক্রাকারে মাঝে মাঝেই ঘটে। অর্থাৎ বলা যায়, সাম্যাবস্থা বিঘ্নকারী সময় আসে, শক্তিগুলি বিভিন্নভাবে সম্মিলিত হতে থাকে এবং তখনই বস্তুগুলি বেরিয়ে আসে। এক সময়ে সকল বস্তুই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় ফিরে যেতে চায় এবং সময় আসে যখন সকল অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা বিঘ্নিত হয়, সকল বস্তুই বহির্দিকে প্রকাশিত হয় এবং আবার ধীরে ধীরে ঢেউয়ের মতো মিলিয়ে যায়। এই বিশ্বের সকল বস্তু সকল গতিই তরঙ্গের মতো ক্রমান্বয়ে উত্থান ও পতন।

দার্শনিকদের মধ্যে কয়েকজনের মতে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কিছুকালের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যদের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের অংশ বিশেষেই এই প্রলয়ের ব্যাপার ঘটে ; তার মানে আমাদের এই সৌরজগৎ লয় পেয়ে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ অন্য সৌরজগতে সেই সময়ে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটছে, তারা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হচ্ছে। আমি দ্বিতীয় মতটিরই পক্ষে অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যুগপৎ প্রলয় ঘটে না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলতে থাকে। যা হোক্ মূল কথাটি একই থাকে ; অর্থাৎ যা কিছু আমরা দেখছি,—সমস্ত প্রকৃতি—ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই পতনের অবস্থাকে, সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবর্তন, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাকে প্রলয় বলা হয়, এটি এক কল্পান্ত। বিশ্বের এই বিকাশ ও প্রলয়কে ভারতের ধর্মবিদ্‌রা ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস ত্যাগে জগৎ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর প্রশ্বাস গ্রহণে সেটি তাঁর কাছেই ফিরে যায়। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কী অবস্থা হয়? তখনও এর অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে, কারণরূপে—সাংখ্য-দর্শনে এই কথাই বলা হয়। দেশ-কাল-নিমিত্ত সেখানেও বর্তমান, তবে তা অত্যন্ত সূক্ষ্মতর রূপে অব্যক্তভাবে। কল্পনা কর সমস্ত জগৎ সঙ্কুচিত

হতে শুরু করল, আমরা সকলেই ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হলাম, এই পরিবর্তন আমরা মোটেই অনুভব করতে পারব না, কারণ আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই একই সময়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। সব কিছুই এইভাবে চলে আবার ব্যক্ত হতে লাগল, কারণ কার্য শুরু করল এবং এইভাবেই এটি চলতে থাকে।

বর্তমানকালে যাকে আমরা পদার্থ বলি, প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাকে ভূত বলতেন, স্থূল জড় হচ্ছে তা। তাঁদের মতে ওই ভূতগুলির একটি হচ্ছে শাশ্বত, অন্যগুলির কারণ-স্বরূপ, অন্য সব ভূত এই এক ভূত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই ভূতকে বলা হয় আকাশ। আজকালকার বিজ্ঞানীরা যাকে ঈথার বলেন, কিছুটা তার মতন, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। এই আদি ভূত আকাশের মতোই আছে আদি শক্তি, যাকে বলা হয় প্রাণ। প্রাণ ও আকাশ নানাভাবে মিলিত হয়ে অন্যান্য পদার্থ গঠন করে। কল্প শেষে সব কিছুই আকাশ ও প্রাণে ফিরে যায়। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে সৃষ্টি বর্ণনাকারী এক সুন্দর সূক্ত আছে, সেটি অত্যন্ত কাব্যময়;—'যখন সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না, যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কী ছিল?' উত্তর দেওয়া হয়েছে, —'তখন স্পন্দনহীন অস্তিত্ব ছিল।' প্রাণ ছিল, কিন্তু তাতে কোন গতি ছিল না। অব্যক্ত শব্দের অর্থ অপ্রকাশিত বা স্পন্দন রহিত। বহুকাল বিরতির পরে যখন নতুন কল্প শুরু হয় তখন পরমাণুতে স্পন্দন জাগে, প্রাণ ও আকাশের উপর আঘাতের পর আঘাত করে। পরমাণু ঘনীভূত হয়ে অণুতে পরিণত হয়, অণুগুলি ঘনীভূত হয়ে বিভিন্ন পদার্থ গঠন করে।

আমরা সাধারণত দেখি এই বিষয়গুলি খুব অদ্ভুত ইংরাজি অনুবাদ হয়ে থাকে। অনুবাদকরা দার্শনিক বা টীকাকারদের কাছে যান না এবং নিজে নিজে এগুলি বোঝার মতো বুদ্ধিও তাঁদের নেই। এক মূর্খ অল্প একটু সংস্কৃত শিখেই এক কঠিন গ্রন্থ অনুবাদ করে বসল। তারা ভূতের অনুবাদ করল বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি। যদি তাঁরা টীকাকারদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাহলে দেখতেন যে তাঁরা বায়ু ইত্যাদি বোঝাতে চাননি।

আকাশের উপর প্রাণের বারবার আঘাতে বায়ু বা স্পন্দনের উৎপত্তি হয়। এই বায়ু-স্পন্দন ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে সংঘর্ষজনিত উত্তাপের সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে তেজ। এই উত্তাপ শেষ হয় তরলতায়, তা হচ্ছে অপ্‌। তারপর তরল ঘনীভূত হয়। আমাদের ছিল আকাশ ও শক্তি, তারপর এল উত্তাপ, তারপর হলো তরল, তারপর তা ঘনীভূত হলো স্থূল পদার্থে এবং ঠিক এর বিপরীতভাবে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যাবে। কঠিন বস্তুগুলি তরলে পরিণত হবে, তারপর তেজোরাশিতে পরিণত হবে, সেটি ধীরে ধীরে শক্তিতে পরিণত হবে, তারপর সেই শক্তির স্পন্দন বা গতি রুদ্ধ হবে এবং এই কল্প ধ্বংস হবে। তারপর আবার এটি ফিরে আসবে এবং আবার আকাশে বিলীন হবে। আকাশের সাহায্য ছাড়া প্রাণ কোন কাজ করতে পারে না। আমরা গতি, স্পন্দন বা চিন্তা আকারে যা কিছু জানি তা সবই প্রাণের বিকার এবং জড় বা ভূত পদার্থ যা কিছু আমরা জানি, যা কিছু আকৃতিযুক্ত সবই আকাশের বিকার। প্রাণ একা থাকতে পারে না এবং কোন মাধ্যম ছাড়া কাজ করতে পারে না। যখন এটি শুদ্ধ প্রাণ, তখন আকাশে থাকে; যখন এটি প্রাকৃতিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়,

যেমন মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগা শক্তি, তখন এর ভূতের প্রয়োজন হয়, জড়বস্তু চাই। তোমরা কখনও জড় ছাড়া শক্তি বা শক্তি ছাড়া জড় দেখনি। যাকে আমরা জড় বা শক্তি বলি সেগুলি শুধু ওই দুটির স্থূল প্রকাশ, এই দুটিরই অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকেই বলা হয় প্রাণ ও আকাশ। প্রাণকে ইংরাজিতে বলা চলে 'লাইফ'—জীবনীশক্তি; কিন্তু একে শুধু মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে বা আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ভাবলে চলবে না। অতএব সৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন। সৃষ্টির আদি নেই, অন্তও নেই; চিরকাল ধরেই এটি চলছে।

এই প্রাচীন মতস্তত্ত্ববিদ্‌দের আর একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে সব স্থূল ভূতগুলি সূক্ষ্ম ভূত থেকে উৎপন্ন। যা কিছু স্থূল, তা কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তুর দ্বারা গঠিত, যাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'তন্মাত্রা',—সূক্ষ্ম কণিকা। আমি এক ফুলের গন্ধ শুঁকি। গন্ধ পেতে গেলে আমার নাকে কিছু আসা চাই। ফুলটি তো ওইখানে রয়েছে, সেটিকে তো আমার কাছে এগিয়ে আসতে দেখছি না। যেটি ফুল থেকে আমার নাকের সংস্পর্শে আসছে তাকেই বলা হয় তন্মাত্র, ফুলের অতি সূক্ষ্ম অণু। উত্তাপ, আলোক ও অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে ওই একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরমাণুরূপে বিভক্ত হতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি সেগুলি শুধু মতবাদমাত্র। আমাদের পক্ষে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, স্থূল সবকিছু অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা নির্মিত। প্রথমে আমরা পাই স্থূল ভূত, যা আমরা বাইরে অনুভব করি। তারপর সূক্ষ্ম ভূত, যার সঙ্গে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদির সংযোগ হচ্ছে। ঈথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করছে, তা আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবু জানি আলো দেখার আগে চক্ষুর স্নায়ুর সঙ্গে তার সংযোগ প্রয়োজন।

চক্ষু আছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র যদি নষ্ট হয় তাহলে চক্ষু থাকা সত্ত্বেও এবং বাহ্য জগতের ছবি চক্ষুর পর্দায় (retinal) পড়া সত্ত্বেও, চক্ষু দেখতে পাবে না। কাজেই চোখ হচ্ছে গৌণ একটি যন্ত্র, দর্শনের অঙ্গ নয়। দর্শনের অঙ্গ হচ্ছে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র। সেইভাবে নাসিকা হচ্ছে একটি যন্ত্র এবং তার পিছনে একটি অঙ্গ আছে। চক্ষুকর্ণাদি শুধু বাহ্যযন্ত্র। এদের পিছনে একটি অঙ্গ আছে, যাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'ইন্দ্রিয়', সেটিই হচ্ছে যথার্থ অনুভূতির স্থান।

অনুভূতির জন্য মনের এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ দরকার। সাধারণ অভিজ্ঞতার একটা কথা বলা যাক, যখন আমরা গভীরভাবে পাঠে নিমগ্ন থাকি তখন ঘড়ি বাজলে শুনতে পাই না কেন? কান তো রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে শব্দ মস্তিষ্কে পৌঁছেছে, তবু শোনা গেল না, কারণ মন শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

বিভিন্ন দেহযন্ত্রের জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে। কারণ একটি যদি সকলের কাজ করতে পারত, তবে আমরা দেখতাম যে, মন তার সঙ্গে যুক্ত হলে সব ইন্দ্রিয়গুলিই সমান সক্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় না, ঘড়ির দৃষ্টান্ত থেকে আমরা তা দেখেছি। যদি সব যন্ত্রের জন্য একটি ইন্দ্রিয় থাকত, তবে আমরা একই সময়ে দেখতে শুনতে ও গন্ধ পেতে পারতাম, একই সময়ে এটা না করাটাই তখন অসম্ভব হতো। অতএব প্রত্যেকটির

জন্য পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় বা স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানও এটি প্রমাণ করে। অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখা ও শোনা সম্ভব, কিন্তু তার কারণ মন উভয় কেন্দ্রেই নিজেকে আংশিকভাবে যুক্ত করে চলে।

এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্মিত? আমরা দেখছি যে, যন্ত্রগুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি—স্থূল ভূতে নির্মিত। ইন্দ্রিয় বা স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও ভূতে নির্মিত। যেমন দেহ স্থূল ভূতে নির্মিত হয়েছে প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল শক্তিতে পরিণত করার জন্য, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি আকাশ, বায়ু, তেজ ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভূতে নির্মিত হয়েছে প্রাণকে সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করার জন্য। ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণের কার্যাবলী, মন ও বুদ্ধি সংযুক্ত হয়ে মানুষের সূক্ষ্মদেহ নির্মাণ করে, যাকে বলা হয় লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। এই লিঙ্গ শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আকার আছে, কারণ যা কিছু জড় তার নিশ্চয় আকার থাকবে।

ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে বৃত্তিযুক্ত চিত্ত বা মানস আছে, তা হচ্ছে মনের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা। যদি তুমি পুকুরে একটি ঢিল ছোঁড়, প্রথমে তাতে স্পন্দন হবে, তারপর তার থেকে বাধা বা প্রতিক্রিয়া হবে। মুহূর্তের জন্য জল স্পন্দিত হবে, তারপর তা ওই ঢিলটির উপর প্রতিক্রিয়া করবে। তেমনি চিত্তের উপর যখন কোন বাহ্যবস্তুর আঘাত আসে, প্রথমে তা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে মানস বলা হয়। মন এই স্পন্দনকে আরও ভেতরে নিয়ে যায়, বিচারবৃত্তি বুদ্ধির কাছে পৌঁছে দেয়, বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া হয়। বুদ্ধির পিছনে আছে অহংকার, অহংজ্ঞান, আত্মসচেতনতা, যা বলে, 'আমি হই'। অহংকারের পিছনে মহৎ, বুদ্ধিতত্ত্ব, প্রকৃতির অস্তিত্বের সর্বোচ্চ রূপ। প্রত্যেকটি হচ্ছে পূর্বেরটির পরিণাম। পুকুরের বেলায় প্রতিটি আঘাত যা আসে, তা বহির্জগৎ থেকে, কিন্তু মনের বেলায় যে আঘাত আসে, তা বহির্জগৎ থেকে আসতে পারে কিংবা অন্তর্জগৎ থেকেও। বুদ্ধির পশ্চাতে আছে পুরুষ, মানুষের আত্মা, শুদ্ধ, পূর্ণ, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং তাঁর জন্যই এই সকল পরিণাম।

পুরুষ এই সকল পরিবর্তন দেখছেন। তিনি স্বয়ং কখনও অশুদ্ধ নন। কিন্তু বৈদান্তিকরা যাকে অধ্যাস বা প্রতিবিম্ব বলেন, তার জন্যই তাঁকে অশুদ্ধ বলে বোধ হয়। যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সামনে লাল বা নীল ফুল আনলে হয়, সেটিকে লাল বা নীল দেখাবে ফুলের বর্ণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, প্রকৃতপক্ষে স্ফটিকের কোন বর্ণ নেই। আমরা ধরে নেব পুরুষ বা আত্মা অনেক এবং প্রতি আত্মাই শুদ্ধ ও পূর্ণ। নানা রকমের স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে। প্রকৃতি কেন এসব করছে? প্রকৃতির এই সব পরিবর্তন আত্মার বিকাশের জন্য, এইসব সৃষ্টি আত্মার উপকারের জন্য, যাতে সে মুক্ত হতে পারে। মানুষের সামনে জগৎ প্রপঞ্চরূপ বৃহৎ গ্রন্থ উন্মুক্ত রয়েছে, যা পাঠ করে সে বুঝত যে সে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আমাকে এখানে অবশ্য বলতে হবে যে আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ আপনারা যে অর্থে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন সেই

অর্থে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। আমাদের মনোবিজ্ঞানীদের পিতাস্বরূপ কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর ধারণা যে, সগুণ ঈশ্বরের একেবারেই প্রয়োজন নেই, প্রকৃতি একাই সব কিছু সৃষ্টিকর্ম করার পক্ষে যথেষ্ট। যাকে 'কৌশলবাদ' (Design Theory) বলা হয়, তা তিনি খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই মতবাদের মতো ছেলেমানুষী মত আর পৃথিবীতে প্রচারিত হয়নি। তবে তিনি এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন আমরা সকলে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম করছি এবং যখন আমরা মুক্ত হব, তখন আমরা মানবাত্মারা কিছুকাল প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকতে পারি এবং আগামী কল্পের শুরুতে সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান পুরুষরূপে আবির্ভূত হয়ে সেই কল্পের শাসক হতে পারি। এই অর্থে আমাদের ঈশ্বর বলা চলতে পারে। তুমি, আমি ও অতি নগণ্য ব্যক্তিও বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হতে পারি। তিনি বলেন এমন ঈশ্বর অনিত্য, কিন্তু এক নিত্য ঈশ্বর—নিত্য সর্বশক্তিমান ও বিশ্বশাসনকর্তা—কখনই হতে পারে না। যদি তেমন কোন ঈশ্বর থাকে, তাহলে অসুবিধা এই হবে যে,—সেই ঈশ্বর হয় বদ্ধ, নয় মুক্ত। ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করবেন না, কারণ তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহলে তিনি সৃষ্টি করবেন না, কারণ তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা নেই, তিনি সর্বশক্তিমান নন। সুতরাং দুটি ক্ষেত্রেই দেখা গেল নিত্য সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকতে পারেন না। সেইজন্য কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে যেখানে ঈশ্বর শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝতে যে সব মানবাত্মা মুক্তিলাভ করেছে তারা।

কপিল সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নন। তিনি যতদূর বিশ্লেষণ করেছেন তা অতি অদ্ভুত। তিনি ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের জনকস্বরূপ; বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য দর্শনগুলি তাঁরই চিন্তার পরিণাম।

তাঁর দর্শন অনুযায়ী সকল আত্মাই তাদের মুক্তি ও তাদের স্বাভাবিক অধিকার —সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—ফিরে পেতে পারে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—এই বন্ধন কোথা থেকে এল? কপিল বলেন, এ অনাদি। কিন্তু যদি এ অনাদি হয়, তাহলে অনন্তও হবে এবং আমরা কখনও মুক্ত হতে পারব না। কপিল বলেন, যদিও এ অনাদি, তবু আত্মার মতো নিত্য অনাদি নয়। বলা চলে যে, প্রকৃতি (বন্ধনের কারণ) অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু আত্মা যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নয়, কারণ প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নেই। এটি যেন নদীর মতো, যা প্রতি মুহূর্তে নতুন জলরাশির দ্বারা দেহলাভ করছে, এই সমুদয় জলরাশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন ধ্রুব বস্তু নয়। প্রকৃতির অন্তর্গত সবকিছুরই সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আত্মার কখনও পরিবর্তন হয় না। তাই প্রকৃতির যখন সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে, তখন তার বন্ধন থেকে আত্মার মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অংশ যে নিয়মে নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডটিও সেই নিয়মে নির্মিত। অতএব আমার যেমন একটি মন আছে, তেমনই বিশ্ব-মনও আছে।

ব্যক্তিত্বে যেমন ব্রহ্মাণ্ডেও তেমন আছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল দেহ আছে, তার পিছনে বিশ্ব-সূক্ষ্ম দেহ তার পিছনে বিশ্ব-মন, তার পিছনে বিশ্ব-অহংকার, তার পিছনে বিশ্ব-বুদ্ধি। এ সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির বিকাশ, প্রকৃতির বাইরে এগুলি নয়।

আমরা পিতামাতার কাছ থেকে স্থূলদেহ ও আমাদের চেতনা লাভ করি। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) অনুযায়ী আমার দেহ আমার পিতামাতার দেহের অংশ। আমার চেতনা ও অহংকারের উপাদান আমার পিতামাতার উপাদানের অংশ। আমাদের পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অংশের সঙ্গে আমরা বিশ্বচেতনার অংশ থেকে নিয়ে যুক্ত করতে পারি। চেতনার অসীম ভাণ্ডার রয়েছে, যার থেকে আমরা প্রয়োজন মতো গ্রহণ করতে পারি। বিশ্বে অসীম মানসিক শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে, যার থেকে আমরা চিরকাল প্রয়োজন মতো গ্রহণ করে আসছি। কিন্তু বীজ পিতামাতার কাছ থেকে আসা চাই। আমাদের তত্ত্ব হচ্ছে বংশানুক্রমিকতা ও পুনর্জন্মবাদের সংমিশ্রন। বংশানুক্রিমকতার নিয়ম অনুযায়ী পুনর্জন্মগ্রণনকারী আত্মা মানুষ নির্মাণের উপাদান পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়।

কিছু ইউরোপীয় দার্শনিক ঘোষণা করেন যে, জগতের অস্তিত্ব আছে আমার অস্তিত্ব আছে বলেই এবং যদি আমার অস্তিত্ব না থাকত, তবে জগতেরও অস্তিত্ব থাকত না। কথনও কথনও এইভাবে বলা হয়,—যদি জগতের সব মানুষ মরে যায়, জীব বলে কিছু আর না থাকে, বুদ্ধি ও অনুভূতিসম্পন্ন সব সত্তা লোপ পায় তবে এই সমস্ত বিকাশও লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই মনস্তত্ত্ব জানেন না, যদিও নীতিটি জানেন, আধুনিক দর্শন এর শুধু আভাসই পেয়েছে। সাংখ্য দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটি বোঝা সহজ হয়। সাংখ্য মতে এমন কোন জড় বস্তু থাকতে পারে না, যার উপাদান আমার মনের কোন অংশ নয়। এই টেবিলটির স্বরূপ কী, তা আমি জানি না। এর এক ধারণা প্রথমে আমার চোখে আসে, তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ে যায়, তারপর মনে; মনে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়াকে আমি 'টেবিল' বলি। এটি সেই পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মতন, পুকুরও ঢিলের দিকে এক ঢেউ ছুঁড়ে দেয়, ওই ঢেউটিকে আমরা জানি। বাইরে যথার্থ কী আছে কেউ জানে না। যখন আমি কোন বহির্বস্তুকে জানতে চেষ্টা করি, তখন তাকে আমার দেওয়া উপাদানে পরিণত হতে হয়। আমি আমার নিজের মন থেকে চোখকে উপাদান দিয়েছি। বাইরে যা আছে তা উত্তেজক বা উদ্দীপক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণের দিকে আমি মনকে প্রক্ষেপ করি এবং সেই কারণটি দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার গ্রহণ করে। আমরা সকলে একই বস্তু কেমন করে দেখে থাকি ? কারণ আমাদের সকলের মধ্যেই বিশ্বমনের একই ধরনের অংশ আছে। যাদের একই ধরনের মন আছে, তারা একই ধরনের বস্তু দেখবে ; যাদের তা নেই, তারা একই রকম দেখবে না।

সাংখ্য-দর্শনের আলোচনা

সাংখ্য-দার্শনিকরা বলেন, প্রকৃতি অবিভক্ত এবং তার অন্তর্গত উপাদানগুলির সাম্যাবস্থাই তার লক্ষণ। এর থেকে স্বভাবতই পাওয়া যায় যে সাম্যাবস্থায় কোনরূপ গতি থাকতে পারে না। এই জগৎ প্রপঞ্চ বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরকম গতি ছিল না, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি ছিল অবিনশ্বর, কারণ পরিবর্তন বা অস্থায়ীত্বের মধ্যে দিয়েই আসে বিভাজন বা মৃত্যু। আবার সাংখ্যমতে পরমাণু জগতের আদি অবস্থা নয়। জগৎ পরমাণু থেকে সৃষ্ট হয়নি, পরমাণুরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হতে পারে। আদি ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয় এবং স্থূলতর ও বৃহত্তর পদার্থ হয়ে ওঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর পৌঁছেছে, তা ওই একই সিদ্ধান্তের দিকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈথার সংক্রান্ত আধুনিক মতে যদি তুমি বল ঈথার হচ্ছে পরমাণুপুঞ্জ, তাহলে সমস্যার কোন মীমাংসা হয় না। আরও স্পষ্ট করে এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য বলা যাক যে, বায়ু পরমাণু দ্বারা গঠিত। আমরা জানি ঈথার সর্বত্র আছে, ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, সর্বব্যাপী এবং ওই বায়ু পরমাণুগুলি যেন ঈথারে ভেসে বেড়াচ্ছে। আবার ঈথার যদি পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে দুটি ঈথার পরমাণুর মধ্যে অবকাশ থাকবে। এই অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? যদি ভাব, ওই অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ঈথার বিদ্যমান, তাহলে সেই সূক্ষ্মতম ঈথারের পরমাণুর মধ্যেও অবকাশ থাকবে, যাকে পূর্ণ করা প্রয়োজন। এইভাবে সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম ঈথারের কল্পনা করতে করতে সিদ্ধান্ত শেষ হবে না। একেই সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন, 'অনবস্থা দোষ'। অতএব পরমাণুবাদ শেষ সিদ্ধান্ত হতে পারে না। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাতে জগতে যা কিছু বিদ্যমান তার কারণগুলি আছে। কারণ বলতে কী বোঝায়? কারণ হচ্ছে ব্যক্ত অবস্থারই সূক্ষ্মতর অবস্থা,—যা ব্যক্ত হয় তারই অব্যক্ত অবস্থা। ধ্বংস বলে কী বোঝায়? ধ্বংস হচ্ছে কারণে ফিরে যাওয়া। ধর তোমার একটি মৃৎপাত্র আছে, তাতে অঘাত করলে, পাত্রটি ধ্বংস হলো। এর অর্থ হলো যে কার্যটি তার নিজস্ব প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করল: যে উপাদানগুলি দিয়ে মৃৎপাত্রটি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি তাদের আদিম অবস্থায় ফিরে গেল। ধ্বংসের এই ধারণা ছাড়া অন্য কোন ধারণা—যেমন সম্পূর্ণ বিনাশ,—একেবারে অসম্ভব। আধুনিক পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী এটা পরীক্ষা করে দেখানো যায় যে কপিল বহু যুগ আগে যা বলেছিলেন, 'কারণে লয় পাওয়া', ধ্বংসের ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক তাই। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন' ছাড়া ধ্বংসের আর কোন অর্থ নেই। তোমরা জান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কেমন ভাবে প্রমাণ করা যায় যে, জড়বস্তু অবিনশ্বর। আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থায় যদি কেউ বলে যে বস্তু বা এই আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে নিজেকেই হাস্যাস্পদ করবে। কেবল অশিক্ষিত মূর্খ লোকেরাই এমন ধারণার কথা

বলবে, আর আশ্চর্যের বিষয় যে আধুনিক জ্ঞান প্রাচীন দার্শনিকদের উপদেশের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাই হতেই হবে এবং সেটাই সত্যের প্রমাণ। প্রাচীন দার্শনিকরা মনকে ভিত্তি করে তাঁদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক অংশটি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানে তার ভৌতিক (physical) অংশ বিশ্লেষণ করে সেই সিদ্ধান্তে এসেছি। উভয় বিশ্লেষণই একই সত্যে পৌঁছেছে।

তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্য-দার্শনিকরা 'মহৎ' বলে থাকেন। আমরা একে 'বুদ্ধি' বলতে পারি, যার শব্দার্থ হচ্ছে মহৎ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন এই বুদ্ধি। একে অহং-জ্ঞান বলা যায় না, তাহলে ভুল হবে। অহং-জ্ঞান এই বুদ্ধি তত্ত্বের অংশ মাত্র। মহৎ বা বুদ্ধি তত্ত্ব সর্বজনীন। অহং-জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা সবই এর অন্তর্গত। কাজেই জ্ঞানের কোন একটি অবস্থা মহৎ সম্পর্কে প্রয়োগ করলে, তা যথেষ্ট হবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে, যেগুলি তোমরা দেখছ ও বুঝছ, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে কোন মানবীয় বোধশক্তি তা ধারণা করতে পারে না। এই পরিবর্তনগুলি একই কারণ থেকে হচ্ছে, সেই একই মহৎ এই উভয় প্রকার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এই মহৎ থেকে সমষ্টি অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এগুলি সবই জড়। জড় ও মনে মাত্রার তারতম্য ছাড়া কোন প্রভেদ নেই। একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা, এক আর একটিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে। মন মস্তিষ্ক থেকে পৃথক নয়—এই শিক্ষায় বিশ্বাস করলে বিজ্ঞানের সঙ্গে অনেক বিরোধ-বিতর্ক হতে বাঁচা যায়। অহং-তত্ত্বের আবার দু রকম পরিণাম হয়, তার মধ্যে এক রকম পরিণাম হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দু'ধরনের—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় কিন্তু চক্ষুকর্ণাদি নয়, তার চেয়ে সূক্ষ্মতর, যাকে তোমরা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বল। এই অহং-তত্ত্ব, এই ভূত বা জড়ের পরিণাম হয় এবং সেই উপাদান হতে ওই কেন্দ্রগুলি নির্মিত। সেই একই উপাদান থেকে আর এক রকম সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়,—তন্মাত্রা, সূক্ষ্ম জড় পরমাণু। সেই তন্মাত্রা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে আমাদের ধারণা ও অনুভূতি জাগে। এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। ওই তন্মাত্রাগুলি থেকে স্থূল জড়ের উৎপত্তি হয়,—জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যা কিছু আমরা দেখি ও অনুভব করি। আমি এই বিষয়টি তোমাদের মনে ভাল ভাবে ঢুকিয়ে দিতে চাই। এটি বোঝা বেশ কঠিন, কারণ পাশ্চাত্যদেশে মন ও জড় সম্বন্ধে ধারণাগুলি খুবই অদ্ভুত। আমাদের মগজ থেকে ওই সব ধারণা দূর করা কঠিন। ছেলেবেলা থেকে পাশ্চাত্যদর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমার নিজেরও এই তত্ত্ব বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল। এ সবই জাগতিক। ভেবে দেখ সব কিছুর প্রথম অবস্থায় এক সর্বব্যাপী অখণ্ড অবিভক্ত জড়রাশি রয়েছে। দুধ যেমন দইয়ে পরিণত হয়। সেটিও এই ভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রথম পরিবর্তনকে বলা হয়

মহৎ। এই মহৎ পদার্থ পরিবর্তিত হয় স্থূল পদার্থে, যাকে বলা হয় অহং। তৃতীয় পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বজনীন ইন্দ্রিয় ও বিশ্বজনীন সূক্ষ্ম পদার্থ এবং এইগুলি মিলিত হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতে পরিণত হয়, যাকে আমাদের চোখ-নাক-কান দেখে, শোঁকে, শোনে। সাংখ্যমতে এই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পরিকল্পনা। আর সমষ্টি বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা আছে, তা ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও নিশ্চয় থাকবে।

ব্যষ্টিরূপ একটি মানুষকে ধরা যাক। প্রথমত তার মধ্যে সাম্যাবস্থায় স্থিত প্রকৃতির অংশ রয়েছে। সেই জড় প্রকৃতি তার মধ্যে মহৎ রূপে পরিণত হয়েছে—সমষ্টি বা সর্বজনীন বুদ্ধিতত্ত্বের এক কণা। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বের এই কণা তার মধ্যে অহং-তত্ত্ব বা অহংকারে পরিণত হয়। এই অহংকার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রায় পরিণত হয়। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত হয়ে তার দেহ গঠন করে। এই বিষয়টি আমি তোমাদের কাছে পরিষ্কার করতে চাই, কারণ এটিই সাংখ্য দর্শনের প্রথম সোপান এবং তোমাদের এটি বোঝা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এটিই সারা জগতের দর্শনের ভিত্তি। জগতে এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নেই যা কপিলের কাছে ঋণী নয়। পিথাগোরাস ভারতে এসে এই দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত সেই থেকে হয়েছিল। পরে এটিই আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং তারও পরবর্তীকালে এটিই 'নস্টিক' দর্শনের ভিত্তি হয়। এটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল; এক ভাগ ইউরোপ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়েছিল এবং অন্য ভাগটি ভারতেই রয়ে গিয়েছিল; ব্যাসের বেদান্ত দর্শন এরই পরিণতি। কপিলের সাংখ্য দর্শনই পৃথিবীতে প্রথম যুক্তি বিচার দ্বারা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল। পৃথিবীর প্রত্যেক দার্শনিকের কর্তব্য কপিলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। তোমাদের মনে এই ধারণা আমি দৃঢ় করে দিতে চাই যে, দর্শন শাস্ত্রের মহান জনক বলে আমরা তাঁর উপদেশ শুনতে বাধ্য। শ্রুতিতেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির—এই প্রাচীনতম দার্শনিকের উল্লেখ আছে :—'হে প্রভু, আরম্ভকালে ঋষি কপিলকে তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ।' তাঁর ধারণাগুলি কত অপূর্ব! যোগীদের অসাধারণ ধারণাশক্তির প্রমাণের প্রয়োজন যদি হয়, তা হলে এই সব মানুষেরাই সেই প্রমাণস্বরূপ। তাঁদের কোন অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তবু তাঁদের ধারণাগুলি কত সূক্ষ্ম ছিল, তাঁদের বস্তুর বিশ্লেষণ কত নিভুল ও আশ্চর্যকর ছিল!

আমি এখানে শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের প্রভেদ দেখাব। শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা ব ইচ্ছা সব কিছুর কারণ। আমাদের বাঁচার ইচ্ছাই আমাদের ব্যক্ত করে তোলে, কিন্তু আমরা ভারতীয় দার্শনিকরা এটা অস্বীকার করি। ইচ্ছা স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে অভেদ। আমি যখন কোন বস্তু দেখি, সেখানে ইচ্ছা নেই; যখন তার সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছায় তখনই প্রতিক্রিয়া জাগে, সে বলে, 'এই করো' বা 'এই করো না' এবং অহং-বস্তুর এই অবস্থাকে বলা হয় ইচ্ছা। ইচ্ছার একটি কণাও প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইচ্ছার আগে বহু বস্তু আছে। ইচ্ছা শুধু অহং থেকে গঠিত কিছু একটা, অহং আবার তার

থেকে উচ্চতর বস্তু—মহৎ—থেকে উৎপন্ন। আবার মহৎ হচ্ছে অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার। বৌদ্ধদের ধারণা হচ্ছে যা কিছু আমরা দেখি তা হচ্ছে ইচ্ছা। মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ ভুল, কারণ ইচ্ছা মোটর-নার্ভের সঙ্গে একাত্ম। তুমি মানুষের মোটর-নার্ভ নষ্ট করে দাও যদি, তাহলে তার কোন রকম ইচ্ছা থাকবে না। এই বিষয়টি বোধহয় তোমাদের ভাল করেই জানা আছে, নিম্নতর প্রাণীদের নিয়ে বহু পরীক্ষার পর একটা জানা গেছে।

এবার এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব। মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব রয়েছে, সেই বিষয়টি ভালভাবে বোঝা দরকার। এই মহৎ আমরা যাকে অহংকার বলি তাতে পরিবর্তিত হয়, এই মহৎই শরীরের সব কিছু শক্তির কারণ। নিম্নতর জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা সবই এই মহতের অন্তর্গত। এই তিনটি অবস্থা কী? নিম্নতর জ্ঞানের অবস্থা আমরা পশুদের মধ্যে দেখতে পাই, যাকে আমরা বলি সহজাত-জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রায় অভ্রান্ত, কিন্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সহজাত-জ্ঞানে খুব কমই ভুল হয়। সহজাত জ্ঞানে একটি পশু কোনটি আহার্য শস্য আর কোনটি বিষাক্ত তা সহজে বুঝতে পারে, কিন্তু তার সহজাত-জ্ঞান খুবই সীমিত। কিন্তু যেই নতুন কিছু আসে, অমনি সে দিশাহারা হয়ে যায়। এটি যন্ত্রবৎ কাজ করে। তারপর আছে আমাদের সাধারণ জ্ঞান, এটি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। এই জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ এবং প্রায়ই ভুল করে, এর গতি মৃদু হলেও সুযোগ প্রচুর। একেই তোমরা বল যুক্তি। সহজাত-জ্ঞানের চেয়ে এর ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত, কিন্তু সহজাত-জ্ঞান যুক্তির চেয়ে বেশি অভ্রান্ত। মনের আরও উচ্চ অবস্থা আছে—জ্ঞানাতীত অবস্থা—এই অবস্থা লাভ করেন কেবল যোগীরা, যাঁরা চর্চা দ্বারা একে আয়ত্ত করেন। এটি অভ্রান্ত এবং যুক্তি-বিচারের চেয়ে এর ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। এটি সর্বোচ্চ অবস্থা। তাই আমাদের নিশ্চয় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মহৎ হচ্ছে এই জগতের যা কিছু—যা কিছু নানা রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছে, তার কারণস্বরূপ ; সহজাত-জ্ঞান, যুক্তি বিচারজনিত জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা এই তিনটিই মহতের অন্তর্গত—যে তিনটি অবস্থায় সমুদয় জ্ঞান অবস্থিত।

এখন একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসছে, যা সর্বদা জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তবে এখানে এত অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখি ততটুকুকেই বিশ্ব বলি এবং সেটি আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তি বিচারের জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়, তার বাইরে আমরা আর কিছু দেখতে পাই না। এখন এই প্রশ্নটিই একটি অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি এক বৃহৎ বস্তু থেকে সামান্য অংশ নিয়ে দেখি, স্বভাবতই তা অসম্পূর্ণ বলে বোধ হবে। এই জগৎকে অসামঞ্জস্যকর বলে মনে হয় কারণ আমরাই তাকে অমন করেছি। কেমন করে? যুক্তিবিচার কাকে বলে? জ্ঞান কী? জ্ঞান বস্তুগুলির সম্পর্ক খুঁজে বের করা। তুমি রাস্তায় গিয়ে এক মানুষ দেখলে এবং বললে, আমি জানি এটি একটি মানুষ ; কারণ তোমার মনে মানুষ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তা মনে পড়ল, তোমার চিত্তের সংস্কার। তুমি অনেক মানুষ দেখেছ

এবং প্রত্যেকেই তোমার মনে একটা দাগ কেটেছে। এই লোকটি দেখা মাত্র তুমি তোমার সংস্কারের ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে মেলালে এবং সেখানে এই ধরনের অনেক ছবি দেখতে পেলে, সেগুলির সঙ্গে মেলানোর পর যখন তুমি সন্তুষ্ট হলে, তখন এই নতুনটিকেও অন্যগুলির সঙ্গে সঞ্চিত করে রাখলে। যখন কোন নতুন সংস্কার আসে এবং তোমার মনের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক থাকে, তবে তুমি সন্তুষ্ট হও; এই সম্পর্ক স্থাপন বা সংযোগের অবস্থাকেই জ্ঞান বলা হয়। অতএব জ্ঞান হচ্ছে আমাদের পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতাকে এক খোপে পোরা। তোমাদের আগে থেকে এক জ্ঞান ভাণ্ডার না থাকলে যে নতুন কোন জ্ঞান হতে পারে না, এটা তার অন্যতম বড় প্রমাণ। তোমার যদি অভিজ্ঞতা না থাকে—কিছু ইউরোপীয় দার্শনিক যেমন ভাবেন—তোমার মন যদি 'অলিখিত এক ফলকস্বরূপ' হয়, তবে তুমি কোন জ্ঞানই লাভ করতে পার না, কারণ জ্ঞান হচ্ছে পূর্ব হতে যে সংস্কার-সমষ্টি অবস্থিত, তার সঙ্গে তুলনা করে নতুনকে গ্রহণ। নতুন সংস্কারকে মিলিয়ে দেখার জন্য এক জ্ঞান ভাণ্ডার চাই। মনে কর, এই ধরনের জ্ঞান ভাণ্ডার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করল, তার পক্ষে কোন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হবে। অতএব শিশুটির আগের থেকেই এক জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল এবং এইভাবে চিরকাল জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে এই যুক্তি খণ্ডন করার কোন পথ আমায় দেখিয়ে দাও। এটা গাণিতিক সত্যের মতোই। কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতেও অতীতের জ্ঞান ভাণ্ডার না থাকলে কোন রকম জ্ঞান লাভ হতে পারে না। তারা এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন যে শিশু জ্ঞান নিয়েই জন্মায়। এই পাশ্চাত্য দাশনিকরা বলেন যে, শিশুরা যে অভিজ্ঞতা নিয়ে জগতে আসে তা তাদের নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়, এ জ্ঞান তাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত, এটি বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ। শীঘ্রই তাঁরা বুঝতে পারবেন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিছু জার্মান দার্শনিক এই বংশানুক্রমিকতার ধারনার উপর সম্প্রতি তীব্র আঘাত শুরু করেছেন। বংশানুক্রমিকতার মত অসত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। এটি শুধু মানুষের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে, আমাদের উপর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের ব্যাখ্যা কি ভাবে করবে? বহু কারণের ফলে এটি কার্য হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মধ্যে একটি। আমরা নিজেদের পারিপার্শ্বিকতা নিজেরা গড়ে তুলি, আমাদের অতীত যেমন ছিল, বর্তমানকেও তেমনি দেখব। অর্থাৎ আমরা অতীতে যেমন ছিলাম, তার ফলে বর্তমানে যেমন হবার তেমন হয়েছি। মাতাল মানুষ যেমন স্বভাবতই শহরের খারাপ অঞ্চলের দিকে আকর্ষিত হয়।

তোমরা বুঝলে জ্ঞান বলতে কী বোঝায়। জ্ঞান হচ্ছে পুরানো সংস্কারগুলির সঙ্গে নতুন সংস্কারকে এক খোপে পোরা, এক নতুন ধারণাকে চিনে নেওয়া। চিনে নেওয়া বলতে কী বোঝায়? আগের থেকে যে সদৃশ সংস্কারগুলি আছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার। জ্ঞান বলতে এ ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। যদি তাই হয়, তাহলে কিছু জানতে হলে সদৃশ বস্তুগুলির সব আমাদের দেখতে হবে। তাই নয় কি? ধর তুমি একটা প্রস্তরখণ্ড নিলে, তাঁর সঙ্গে মিল খোঁজার জন্য তার সদৃশ সমস্ত প্রস্তরখণ্ড-গুলি তোমায় দেখতে হবে। কিন্তু সারা বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করতে হলে

আমরা তা করতে পারি না, কারণ আমাদের মনের খোপে একটিমাত্র ধারণাই আছে, ওই ধরনের বা ওই শ্রেণীর অন্য কোন ধারণা নেই, অন্য কিছুর সঙ্গে আমরা এর তুলনা করতে পারি না। এর সদৃশ কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত জগতের এই অংশটুকু আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর নতুন বস্তু। তাই আমরা এর সঙ্গে লড়াই করি, একে মনে করি ভয়ংকর, মন্দ; কখনও কখনও আমরা একে ভাল মনে করতে পারি, কিন্তু একে সর্বদাই ভাবি অসম্পূর্ণ। জগৎকে তখনই জানা যাবে, যখন আমরা এর অনুরূপ কোন বস্তু পাব। আমরা একে চিনতে পারব যখন আমরা এই বিশ্বের ও ক্ষুদ্র অহং-জ্ঞানের পারে যাব, তবেই এই বিশ্বের ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাব। যতকাল আমরা তা না করতে পারছি, ততকাল দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলেও আমরা এই বিশ্বের ব্যাখ্যা খুঁজে পাব না, কারণ জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে সদৃশ দ্রব্যের আবিষ্কার, আর আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র এই বিশ্বের একটিমাত্র আংশিক ধারণাই আমরা পাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ওই একই রকম। ঈশ্বরের যা কিছু আমরা দেখি তা আংশিক, যেমন জগতের শুধু একটি অংশই দেখি, বাকি সবটুকুই মানুষের ধারণার বাইরে। 'সর্বব্যাপী আমি এত বিরাট যে, এই জগৎ পর্যন্ত আমার অংশ মাত্র।' এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখে থাকি এবং তাঁকে বুঝতে পারি না। তাঁকে ও এই জগৎকে বোঝার একমাত্র উপায় যুক্তি-বিচারের পারে যাওয়া, অহং-জ্ঞানের পারে যাওয়া।

যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা—এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই শুধু সত্য লাভ করিবে।'

'শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ শাস্ত্র প্রকৃতির তত্ত্ব পর্যন্ত, প্রকৃতি যে তিনটি গুণে নির্মিত, সেই পর্যন্ত শিক্ষা দিয়া থাকে।'

'যখন আমরা এইগুলির পারে চলে যাই, তখন আমরা সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার আগে নয়।

এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে গঠিত আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশকেই আমরা জানি, মাঝের অংশটুকু। আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমি জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না। আমরা শুধু সাধারণ জ্ঞানভূমিকে জানি। যদি কোন লোক বলে, 'আমি পাপী', সে অসত্য বিবৃতি দান করে, কারণ নিজেকে নিজেই জানে না। সে অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তি, নিজের সে একটি অংশমাত্রই জানে, কারণ তার জ্ঞানমাত্র একাংশ ব্যাপী। এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ওই একই কথা, যুক্তিবিচার দ্বারা এর একাংশ মাত্র জানা সম্ভব, তার সবটুকু নয়; কারণ নিম্নতর জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, জ্ঞানাতীত, ব্যষ্টি মহৎ, সমষ্টি মহৎ ও তার পরবর্তী সকল বিকার নিয়েই এই ব্রহ্মাণ্ড গঠিত।

কিসে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়? এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি সকল বস্তু, এমন কি সমস্ত প্রকৃতি হচ্ছে জড়, অচেতন। সব কিছুই বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণ ও অচেতন। যেখানেই নিয়ম আছে, সেখানেই প্রমাণিত হচ্ছে যে তার ক্ষেত্র হচ্ছে অচেতন। মন, মহৎ-তত্ত্ব, ইচ্ছা ও অন্য সব কিছুই হচ্ছে অচেতন। কিন্তু এগুলি এমন একজনের চিৎ

বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, যিনি এ সবের অতীত, যাঁকে সাংখ্য-দার্শনিকরা বলেন 'পুরুষ'। জগতের যা কিছু পরিবর্তনের সাক্ষীস্বরূপ কারণ হচ্ছেন এই পুরুষ। তার অর্থ এই পুরুষকে বিশ্বজনীন ভাবে গ্রহণ করলে তিনিই বিশ্বের ঈশ্বর। বলা হয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ কথা হিসেবে এটা খুবই ভাল, কিন্তু আমরা বুঝি এ কথা সত্য হতে পারে না। কেমন করে ইচ্ছা সৃষ্টির কারণ হবে? ইচ্ছা প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ প্রকাশ। তার পূর্বে অনেক বস্তু সৃষ্ট হয়েছে এবং সেগুলি কে সৃষ্টি করল? ইচ্ছা একটি যৌগিক বস্তু, আর যা কিছু যৌগিক, সে সবই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। তাই ইচ্ছা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করতে পারে না। তাই বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জগৎ সৃষ্টি করেছে এ কথা অর্থহীন। আমাদের ইচ্ছা আমাদের অহং-জ্ঞানের অল্পাংশ মাত্র জুড়ে আছে এবং মস্তিষ্কের সামান্য অংশ সঞ্চালিত করে। ইচ্ছা তোমাদের দেহকে পরিচালিত করছে না কিংবা এই বিশ্বকেও পরিচালিত করছে না। এই দেহকে যে শক্তি পরিচালিত করছে, তার মাত্র আংশিক প্রকাশ হচ্ছে ইচ্ছা। তেমনই ভাবে এই বিশ্বে ইচ্ছা আছে বটে, তবে তা হচ্ছে বিশ্বের একটি অংশমাত্র। সমগ্র বিশ্ব ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয় না। সেজন্যই ইচ্ছা-তত্ত্বের দ্বারা আমরা এর ব্যাখ্যা করতে পারি না। ধর, আমি মেনে নিলাম ইচ্ছা দেহকে পরিচালিত করছে, তাহলে যখন আমি দেখি আমি ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারছি না, তখন আমি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতে শুরু করি। সেটা আমারই দোষ, কারণ ইচ্ছা-তত্ত্বকে মেনে নেবার কোন অধিকার আমার নেই। সেইভাবে এই বিশ্বের বেলায় যদি মনে করি ইচ্ছাই একে চালিত করছে তবে প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তা না মিললে, সেটা আমারই দোষ। অতএব এই পুরুষ ইচ্ছা নন, বুদ্ধি নন, কারণ বুদ্ধি একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। মস্তিষ্কের অনুরূপ কোন জড় পদার্থ না থাকলে বুদ্ধি থাকতে পারে না। যেখানেই বুদ্ধি আছে সেখানেই আমরা যাকে মস্তিষ্ক বলি তার মতো কোন বস্তু থাকবে, যা ঘনীভূত হয়ে বিশেষ আকার গ্রহণ করে মস্তিষ্কের কাজ চালিয়ে যায়। অতএব যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই জড় পদার্থ কোন না কোন আকারে থাকবেই। কিন্তু বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ, তখন তাহলে এই পুরুষ কী? ইনি বুদ্ধি নন, ইচ্ছাও নন, কিন্তু এ সবেরই কারণ। তাঁর অস্তিত্বই এদের ক্রিয়াশীল ও পরস্পর মিলিত করায় এটি প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, এটি বুদ্ধি বা মহৎ নয়, কিন্তু আত্মা, শুদ্ধ, পুরুষ।

'আমি সাক্ষীস্বরূপ এবং আমার সাক্ষীস্বরূপ স্থিতিতে প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সব কিছু সৃজন করছে।'

প্রকৃতির এই চেতনা কী? আমরা দেখেছি বুদ্ধি হচ্ছে এই চেতনা, যাকে বলা হয় 'চিৎ'। পুরুষের মধ্যে এই চেতনার ভিত্তি রয়েছে, পুরুষের স্বভাব এটি। এর ব্যাখ্যা করা চলে না, কিন্তু আমরা যা কিছুকে জ্ঞান বলি, তার কারণ হচ্ছে এটি। এই পুরুষ সাধারণ জ্ঞান নয়, কারণ সেই জ্ঞান যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যা কিছু ভাল ও উজ্জ্বল তা ওই পুরুষের। পুরুষ জ্ঞান নয়, কিন্তু বুদ্ধির যা কিছু উজ্জ্বলতা তা ওই পুরুষের। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান বা জ্ঞানবান বলা যায়

না। ইনি এমন এক বস্তু যিনি থাকতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। আমাদের চারপাশে যা দেখি তা পুরুষের মধ্যে যে চিৎ আছে, তার সঙ্গে প্রকৃতির সংযুক্তি। জগতে যা কিছু সুখ আনন্দ ও শান্তি আছে তা সবই ওই পুরুষের; কিন্তু সেগুলি যৌগিক, কারণ তাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে।

'যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোন প্রকার আনন্দ, সেখানে সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে।'

'এই পুরুষ জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, যদিও তিনি বিশ্ব দ্বারা অস্পৃষ্ট ও তার সঙ্গে অসংস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন।'

তোমরা মানুষকে কাঞ্চনের পিছনে ধাবিত দেখছ, সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান, যদিও বহু পরিমাণ মলিন ধূলির সঙ্গে তা মিশ্রিত। যখন মানুষ সন্তানকে স্নেহ করে বা স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, তখন আকর্ষণী শক্তিটা কী? তাদের পিছনে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ। জড় মালিন্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তিনি আছেন। অন্য কিছু আকর্ষণ করতে পারে না। 'এই অচেতন জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন।' ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অতএব এর থেকে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, এই পুরুষ নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী। যা সর্বব্যাপী নয় তা অবশ্যই সসীম। সমস্ত সীমাবদ্ধতাই কারণের কার্যস্বরূপ, যা কার্যস্বরূপ তারই আদি ও অন্ত থাকবে। যদি পুরুষ সসীম হন, তবে তাঁর অন্ত বা বিনাশ ঘটবে, মুক্ত নন, চরমতত্ত্ব নন, কোন কারণের কার্যস্বরূপ। অতএব তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষ বহু আছেন, একটি নন, অসংখ্য। তুমি ও আমি দুজনেই পুরুষ, আমাদের প্রত্যেকেই পুরুষ। অনন্ত সংখ্যক বৃত্ত, প্রত্যেকেই সসীম, এই জগতের মধ্যে বিস্তৃত। তিনি মন নন, জড় নন, আমরা যা কিছু জানি সবই তাঁর প্রতিবিম্বস্বরূপ। আমরা নিশ্চিত যে, তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। প্রকৃতি তাঁর উপর নিজের ছায়া ফেলছে, জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া, কিন্তু তিনি স্বরূপত শুদ্ধ। এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম সাংখ্য-দর্শন অপূর্ব।

এবার এই মতের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলি আলোচনা করব। এই পর্যন্ত বিশ্লেষণ নিখুঁত, মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়। আমরা দেখলাম ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য-ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রাদিতে বিভক্ত করার পর সেগুলি যৌগিক, অহং-ইন্দ্রিয় ও জড় বিভক্ত করার পর দেখি সেটিও বস্তু, মহৎও বস্তু এবং শেষ পর্যন্ত পেলাম পুরুষকে। এই পর্যন্ত কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাংখ্যবাদীদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল?'—সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী এবং এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আমাদের আরও ভাল সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে এবং তা করতে গিয়ে আমরা অদ্বৈতবাদে উপনীত হই। আমাদের প্রথম আপত্তি হচ্ছে দুটি অসীম কী করে হবে? তারপর আমাদের যুক্তি হচ্ছে—সাংখ্য দর্শনে সামান্যীকরণ নিখুঁত নয়, সেজন্য আমরা নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনি। তারপর আমরা দেখব বৈদান্তিকরা এই সব বাধা অতিক্রম করে নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সকল গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায় সমস্ত একটি বাড়িকে সম্পূর্ণ সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।

সাংখ্য ও বেদান্ত

আমরা যে সাংখ্য-দর্শনের আলোচনা করছিলাম তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাদের আমি দেব। এই বক্তৃতায় তার ত্রুটি কোনগুলি এবং বেদান্ত কী ভাবে তা পূর্ণ করল, সেগুলি আমরা বুঝতে চাই। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতিই হচ্ছে চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, প্রেম, হিংসা, স্পর্শ, রস ও বস্তু প্রভৃতির বিকাশের কারণ। সব কিছুই প্রকৃতি থেকে হয়েছে। এই প্রভৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি গুণ নয়, উপাদান, যে উপাদান থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কল্পের আরম্ভে এগু'ল সাম্যাবস্থায় থাকে, সৃষ্টি আরম্ভ হলে এগুলি নানাভাবে মিলিত হয়ে বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বিকাশকে সাংখ্য বলে মহৎ বা বুদ্ধি। এর থেকে উৎপন্ন হয় অহং-জ্ঞান। সাংখ্য মতে এটি তত্ত্ব। অহং-জ্ঞান থেকে মনের উৎপত্তি হয় এবং জ্ঞান, কর্মেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাগুলির (শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির সূক্ষ্ম পরমাণু) উৎপত্তি হয়। অহং-জ্ঞান থেকেই সমস্ত সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব হয় এবং সূক্ষ্ম পরমাণু থেকে স্থূল পরমাণু উৎপন্ন হয়, যাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রাগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু সেগুলি যখন স্থূল কণায় পরিণত হয়, তখন আমরা তাদের দেখতে ও অনুভব করতে পারি। বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই ত্রিবিধ কার্য সমন্বিত চিত্ত-প্রাণ নামে শক্তিগুলিকে সৃষ্টি করে। প্রাণ যে শ্বাস-প্রশ্বাস এই ধারণা তোমাদের এখুনি ত্যাগ করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণের একটি কার্যমাত্র। প্রাণ বলতে বোঝায় স্নায়বিক শক্তিগুলি যারা সারা দেহকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করছে এবং চিন্তারূপে নিজেদের প্রকাশও করছে। প্রাণের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য করছে, বায়ু প্রাণের উপর নয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে প্রাণায়াম। এই গতির উপর কর্তৃত্ব করার জন্যে প্রাণায়াম অভ্যাস করা হয়, এর লক্ষ্য কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বা ফুসফুসকে শক্তিশালী করা নয়। সেটা হচ্ছে ডেলসার্ট ব্যায়াম, প্রাণায়াম নয়। এই প্রাণসমূহ জীবনী শক্তিরূপে সারা শরীরের উপর কার্য করছে, তারা আবার মন ও ইন্দ্রিয়দের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই পর্যন্ত বেশ ভাল। মনস্তত্ত্ব খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং এটি পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা। যেখানেই কোন দর্শন বা যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়, তা কিছু না কিছু কপিলের কাছে ঋণী। পিথাগোরাস ভারতবর্ষে এটি শিক্ষালাভ করেন এবং গ্রীসে এই শিক্ষা দান করেন। পরবর্তীকালে প্লেটো এর কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন এবং তারও পরে নষ্টিকরা এই চিন্তাধারা আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে এটি ইউরোপে আসে। যেখানেই মনস্তত্ত্ব বা দর্শন নিয়ে কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করা হয়েছে, দেখা যায় সেই চিন্তাধারার জনক হচ্ছেন কপিল নামধারী ব্যক্তিটি।

এত দূর পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে তাঁর মনস্তত্ত্ব অতি অপূর্ব, কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হব, ততই কোন কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের প্রভেদ হবে। আমরা দেখি যে কপিলের মূল নীতি হচ্ছে ক্রমবিকাশ বা পরিণাম। তিনি বলেন এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম, যেহেতু কারণ সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞা হচ্ছে, 'কার্য অন্যরূপে পরিণত কারণমাত্র এবং যেহেতু আমরা যত দূর দেখতে পাচ্ছি তাতে সমগ্র জগৎ ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে।' আমরা মৃত্তিকা দেখি, অন্যরূপে তাকে আমরা বলি একটি ঘট। মৃত্তিকা হচ্ছে কারণ আর ঘট হচ্ছে কার্য। এর পরে কার্য-কারণ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। এইভাবে সমগ্র জগৎ কোন উপাদান থেকে, প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং এই জগৎ তার কারণ থেকে মূলত ভিন্ন হতে পারে না। কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে চিন্তা বা বুদ্ধি পর্যন্ত কোনটিই 'ভোক্তা' বা 'প্রকাশক' নয়। একটি কাদার তাল যেমন, সমষ্টি মনও তেমনি। মনের স্বরূপত কোন চৈতন্য নেই, কিন্তু আমরা তার বিচার বুদ্ধি দেখি। অতএব তার পশ্চাতে নিশ্চয় কেউ আছেন, যার আলোক তার উপর পড়ে মহৎ, অহং-জ্ঞান ও নানা বস্তুরূপে প্রতীত হচ্ছে। তাঁকেই কপিল বলেন পুরুষ, বৈদান্তিকরা বলেন আত্মা। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নয়। তিনি অজড়, আর সমস্ত জগৎ প্রথমত জড়। আমি এক ব্ল্যাকবোর্ড দেখছি। প্রথমে বাইরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে ওই সংবেদন নিয়ে আসবে। ওই কেন্দ্র থেকে তা মনে গিয়ে এক ধারণা সৃষ্টি করবে। মন তাতে বুদ্ধির কাছে পৌঁছে দেবে, কিন্তু বুদ্ধি কোন কার্য করতে পারে না। তার পশ্চাতে যে পুরুষ আছেন, তিনিই কর্তা। এগুলি সবই ভৃত্যের মতো সংবেদন তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়, তিনি আদেশ দিলে প্রতিক্রিয়া হয়। পুরুষই ভোক্তা, যোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনে-বসা রাজা, মানবের আত্মা, তিনি অজড়। যেহেতু তিনি বড় নন, তাই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় যে তিনি অসীম, কোনরকম সীমাই তাঁর থাকতে পারে না। পুরুষদের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, আমাদের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী। কিন্তু শুধু সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহের মাধ্যমে পুরুষ কার্য করে থাকেন। মন অহং-জ্ঞান, স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি—এইগুলি দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত, যাকে খ্রীষ্টীয় দর্শনে বলা হয় মানুষের 'আধ্যাত্মিক দেহ'। এই দেহেই মুক্তিলাভ বা শাস্তিলাভ করে, স্বর্গে যায়, বার বার জন্ম গ্রহণ করে। কারণ আমরা প্রথম থেকেই দেখছি যে আত্মা বা পুরুষের পক্ষে আসা-যাওয়া অসম্ভব। গতি মানে আসা-যাওয়া, যা একস্থান থেকে অন্যস্থানে আসা যাওয়া করে তা সর্বব্যাপী হতে পারে না। এই পর্যন্ত আমরা কপিলের মনোবিজ্ঞান থেকে দেখলাম যে আত্মা অসীম, একমাত্র এটিই প্রকৃতির দ্বারা গঠিত নয়। একমাত্র তিনিই প্রকৃতির বাইরে, কিন্তু আপাত ভাবে তিনি প্রকৃতিতে আবদ্ধ মনে হয়। প্রকৃতি তাঁর চারধারে, তিনি নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভাবেন, 'আমি লিঙ্গ শরীর, আমি স্থূল শরীর, আমি স্থূল পদার্থ'। সেজন্যেই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুখদুঃখ নেই, তা আছে লিঙ্গ শরীরে ও স্থূল শরীরে।

ধ্যানাবস্থায় আমরা যে ভাব অনুভব করে থাকি, এটি প্রায় তাই। যোগীরা ধ্যানাবস্থাকে সবচেয়ে উচ্চ অবস্থা বলেন, সেটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কোন অবস্থা নয়, এই অবস্থায় তোমরা পুরুষের সর্বাপেক্ষা সান্নিধ্যে যেতে পার।

আত্মার সুখ-দুঃখ কিছু নেই, তিনি সর্ববস্তুর সাক্ষী, সব কর্মের চিরন্তন সাক্ষী, কোন কর্মের ফল গ্রহণ করেন না। সূর্য যেমন সকলের চোখের দৃষ্টির কারণ হলেও, চোখের কোন দোষের প্রভাব তার উপর পড়ে না, পুরুষও তেমন। যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সামনে লাল ফুল রাখলে লাল দেখায়, নীল ফুল রাখলে নীল দেখায় অথচ ওটি তার কোনটিই নয়, তেমনই পুরুষও সক্রিয় বা নিষ্ক্রীয় নন, তিনি দুটির পারে। আত্মার কাছাকাছি বর্ণনা করা যায় একমাত্র ধ্যানাবস্থার কথায়। এই হচ্ছে সাংখ্য দর্শন।

তারপর সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল প্রকাশ আত্মার জন্য, বিভিন্ন উপাদানের মিলন স্বতন্ত্র কারও জন্য। নানা রকম সংমিশ্রণ যাকে আমরা প্রকৃতি বলি—এই সব পরিবর্তন-পরম্পরা আত্মার ভোগের জন্য, তার মুক্তির জন্য, আত্মা সর্ব নিম্নাবস্থা থেকে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত সকল প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করে. তখন বুঝতে পারে কোনকালেই সে প্রকৃতিতে আবদ্ধ ছিল না, সে সর্বদা পৃথক ছিল, সে অবিনশ্বর, তার আসা-যাওয়া কিছু নেই, স্বর্গে যাওয়া ও আবার জন্মানো এ সব প্রকৃতির, তার নিজের নয়। এই ভাবে আত্মা মুক্ত হয়। সমস্ত প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কাজ করে। আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; এই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের মতে আত্মা বহু। অনন্ত সংখ্যক আত্মা আছে। কপিলে অন্য একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বিশ্বস্রষ্টা রূপে কোন ঈশ্বর নেই। প্রকৃতিই সকল বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট। কপিল বলেন, ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।

বেদান্ত বলে যে, আত্মা স্বভাবত পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ। কিন্তু এগুলি আত্মার গুণ নয়। সাংখ্যের সঙ্গে একমত যে, বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত ও প্রকৃতির মাধ্যমে তা আসে। বেদান্ত আরও বলে, বুদ্ধি একটি যৌগিক পদার্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের অনুভূতি নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। আমি ব্ল্যাকবোর্ড দেখছি। এর জ্ঞান কী করে হচ্ছে? জার্মান দার্শনিকরা বলেন ব্ল্যাকবোর্ড 'বস্তুটির স্বরূপ' (thing in itself) অজ্ঞাত, আমি কখনই সেটা জানতে পারি না। এই অজ্ঞেয় সত্তাকে 'ক' বলা যাক। এই 'ক' আমার মনের উপর কার্য করে, মনে প্রতিক্রিয়া হয়। মন একটি পুকুরের মতো। জলে এক ঢিল ছোঁড়, ঢিলের দিকে প্রতিক্রিয়ারূপ এক ঢেউ আসবে। এই ঢেউটি মোটেই ঢিলের মত নয়। ব্ল্যাকবোর্ড 'ক' এই ঢিলের মতই, যা মনে আঘাত করে এবং মন তার দিকে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তোলে এবং এই ঢেউটিকেই আমরা ব্ল্যাকবোর্ড বলে থাকি। আমি তোমায় দেখছি। তুমি স্বরূপত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তুমি সেই 'ক', তুমি আমার মনের উপর ক্রিয়া কর, মন সেই কার্যের দিকে এক তরঙ্গ তুলল, সেই তরঙ্গকেই আমরা অমুক পুরুষ বা অমুক স্ত্রীলোক বলি। এই অনুভূতির দুটি উপাদান—একটি

ভেতর থেকে ও একটি বাইরের থেকে আসছে এবং এই ছুটির মিশ্রণে—ক+মন—সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের বাহ্য-জগৎ। সব জ্ঞান হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মাছের ক্ষেত্রে হিসাব কষে দেখা হয়েছে যে তার লেজে আঘাত করার কতক্ষণ পরে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগে এবং সে কষ্ট অনুভব করে। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে ওই একই ব্যাপার। আমার মধ্যে প্রকৃত আত্মা যিনি আছেন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাঁকে 'খ' বলা যাক। যখন আমি নিজেকে 'অমুক' বলে জানি, তখন সেটা হচ্ছে খ+মন। ওই খ আমার মনে আঘাত করে। তাই আমাদের সমস্ত জগৎ হচ্ছে ক+মন (বাহ্য) ও খ+মন (আভ্যন্তর),—ক ও খ হচ্ছে বহির্জগৎ ও অন্তর জগতের বস্তুর স্বরূপ।

বেদান্ত মতে জ্ঞানের তিনটি মূল উপাদান হচ্ছে—আমি আছি, আমি জানি ও আমি সুখী। আমার কোন অভাব নেই, আমি শান্ত, কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারে না—এই তিনটি ধারণা আমাদের জীবনের মূল ভাব। এই ভাব সীমাবিশিষ্ট হয়ে অপর বস্তু সংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করে; তখন ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক আনন্দরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানতে হবে এবং প্রত্যেকেই আনন্দের জন্য ব্যাকুল। আনন্দের জন্য সকলে ভালবাসতে চায়। নিম্নতম থেকে উচ্চতম সকল সত্তা যাবৎ অস্তিত্বকাল ভালবেসে থাকে। আভ্যন্তরের বস্তুর স্বরূপ 'খ' ও মনের সংযোগের ফলে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রেম উৎপন্ন হয়, বৈদান্তিকরা বলেন—পূর্ণসত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ। সেই পূর্ণ সত্তা অসীম, অমিশ্র, অযৌগিক, অপরিণামী, মুক্ত আত্মা। সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যেন মলিন হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা বলি ব্যষ্টি সত্তা। সেটিই সীমাবদ্ধ হয়ে উদ্ভিদজীবন, পশুজীবন, মানবজীবনরূপে প্রকাশিত হয়, যেন অনন্ত স্থান ঘরের দেয়াল দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়েছে, পাত্রের মধ্যে বেষ্টিত হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান আমরা যেটুকু জানি তা নয়, সহজাত জ্ঞান নয়, বিচারবুদ্ধি নয়, সংজ্ঞা নয়। যখন জ্ঞানের অবনতি হয়, বিভ্রান্তি হয়, আমরা বলি সহজাত-জ্ঞান, তার চেয়ে অবনতি হলে আমরা বলি বিচারবুদ্ধি, আরও অবনতি হলে বলি সংজ্ঞা। সেই নিরপেক্ষ বা পরম জ্ঞানকে বলি বিজ্ঞান। এটি সহজাত-জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি বা সংজ্ঞা নয়। 'সর্বজ্ঞতা' বললে তার ভাব অনেকটা প্রকাশ পায়। এর কোন সীমা নেই, এতে কোন মিশ্রণ নেই। যখন সেই আনন্দ মেঘাবৃত হয় আমরা তাকে প্রেম বলি—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা কোন ভাবের প্রতি আকর্ষণ। এ হচ্ছে সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশমাত্র। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, আত্মার স্বরূপ, তাদের সঙ্গে আত্মার কোন প্রভেদ নেই। আবার ওই তিনটি হচ্ছে একই, একই বস্তুকে আমরা তিনটি বিভিন্নভাবে দেখি। তারা সমস্ত আপেক্ষিক জ্ঞানের পারে। আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্কের মাধ্যমে তার সহজাত জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এর প্রকাশের বিভিন্নতা নির্ভর করে যে মাধ্যমের দ্বারা প্রকাশিত হয় তার উপর। আত্মারূপে মানুষ ও নিম্নতম পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, শুধু পশুর মন

কম উন্নত বলে তার সহজাত জ্ঞান খুবই সীমিত। মানুষের মস্তিষ্ক সূক্ষ্মতর বলে প্রকাশও স্পষ্টতর, মহত্তম মানুষের পক্ষে এটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও একই কথা, যে অস্তিত্বকে আমরা জানি সেই সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব সেই প্রকৃত সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই প্রকৃত সত্তা আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও তাই। যাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি তা সেই আত্মার অনন্ত আনন্দের প্রতিবিম্ব। প্রকাশের সঙ্গে সসীমতা আসে, কিন্তু অব্যক্তভাব—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ—হচ্ছে অসীম, সেই আনন্দের কোন সীমা নেই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ তোমায় ভালবাসি, কাল তোমায় ঘৃণা করি। আজ আমার ভালবাসা বেড়ে উঠল, কাল কমে গেল। কারণ এটি প্রকাশ মাত্র।

কপিলের মতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে তাঁর ঈশ্বরের ধারণা। যেমন ব্যষ্টিবুদ্ধি থেকে শুরু করে ব্যক্তি দেহ পর্যন্ত প্রকৃতির সমস্ত বিকারের পিছনে এক পুরুষের প্রয়োজন, যিনি নিয়ন্ত্রণকারী ও শাসক, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টিবুদ্ধি, সমষ্টিমন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের পিছনে তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ও শাসক প্রয়োজন। এই জগৎ প্রপঞ্চ কী করে সম্পূর্ণ হবে যদি না তার পিছনে শাসক ও নিয়ন্ত্রণকারীরূপে এক সার্বিক পুরুষ না থাকে? যদি ব্রহ্মাণ্ডের পিছনে সর্বজনীন পুরুষকে অস্বীকার কর, তাহলে ওই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের—অন্তর্জগতের পিছনে যে পুরুষ আছেন তাকেও অস্বীকার করতে হবে। যদি এটি সত্য হয় যে ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমস্ত প্রকৃতির অতীত, যে পুরুষ কোন উপাদানে নির্মিত নন, তাহলে সেই একই যুক্তিসমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটবে। যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমস্ত বিকারের পিছনে রয়েছে, বেদান্ত তাঁকেই পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর বলে।

এবার আসছে আরও গুরুতর মত পার্থক্যের কথা। একজনের বেশি কি পুরুষ থাকতে পারেন? আমরা দেখেছি, পুরুষ হচ্ছেন সর্বব্যাপী ও অসীম। দুটি সর্বব্যাপী অসীম হতে পারে না। যদি 'অ' ও 'আ' দুটি অসীম বস্তু থাকে, অসীম 'অ' অসীম 'আ' কে সীমাবদ্ধ করবে, কারণ অসীম 'আ' অসীম 'অ' নয় এবং অসীম 'অ' অসীম 'আ' নয়। পরিচয়ের পার্থক্য মানে প্রভেদ এবং প্রভেদ মানে সীমা। অতএব 'অ' ও 'আ' পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করায়, অসীমত্ব হারায়। অতএব কেবল একটিমাত্র অসীম থাকতে পারে, তা হচ্ছে ওই পুরুষ।

আর একবার আমরা অজ্ঞাত বস্তু সূচক ক ও খ চিহ্ন দুটি নেব। আমরা আগেই দেখিয়েছি যাকে আমরা বহির্জগৎ বলি তা হচ্ছে ক+মন এবং অন্তর্জগৎ খ+মন। ক ও খ দুটি পরিমাণই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সমস্ত পার্থক্য হচ্ছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জন্য। এগুলি মন গঠনকার উপাদান। কোন মানসিকতা এদের ছাড়া সম্ভব নয়। কাল ছাড়া তুমি কিছু চিন্তা করতে পার না, স্থান ছাড়া তুমি কিছু কল্পনা করতে পার না, কারণ ছাড়া তোমার কিছুই থাকতে পারে না। এগুলি মনের রূপ, এগুলি সরিয়ে নাও, মনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। অতএব সব পার্থক্য মনেরই জন্য। বেদান্ত মতে মনের বিভিন্নরূপ আপাতভাবে 'ক' ও 'খ'কে সীমাবদ্ধ করেছে এবং তাদের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎরূপে প্রতীতি করাচ্ছে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' উভয়েই মনের পারে, উভয়েই গুণরহিত; অতএব উভয়েই এক। আমরা

ওদের উপর কোন গুণ আরোপ করতে পারি না, কারণ গুণ মন থেকেই জাত। যা নির্গুণ তা নিশ্চয়ই এক; 'ক' নির্গুণ, তা মন থেকেই গুণ নেয়। 'খ'ও তাই করে। অতএব এই 'ক' ও 'খ' এক। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক। বিশ্বে কেবল একটি আত্মাই আছে, একটি সত্তা আছে। সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখন তাকে বুদ্ধি, অহং-জ্ঞান, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। জগতের সব কিছু সেই একই সত্তা, শুধু বিভিন্নরূপে। যখন তার একটু অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে ধরা পড়ে, তখন তা রূপ গ্রহণ করে। ওই জাল সরিয়ে দেখ,—সবই এক। অতএব অদ্বৈত দর্শনে সমগ্র জগৎ সেই সত্তায় অবস্থিত, যাকে ব্রহ্ম বলা হয়। সেই সত্তা যখন জগতের পিছনে বিদ্যমান নয়, তখন বলা হয় ঈশ্বর। সেই একই সত্তা যখন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের দেহের পিছনে বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়, তখন বলা হয় আত্মা। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটিমাত্র পুরুষ আছেন, যিনি বেদান্তের ব্রহ্ম। ঈশ্বর ও মানুষের বিশ্লেষণে বোঝা যায় উভয়েই সেই এক। জগৎ হচ্ছে তুমি স্বয়ং, অবিভক্ত তুমি, সারা জগতের মধ্যে রয়েছ।

'সকল হস্তে তুমি কাজ কর, সকল মুখে আহার গ্রহণ কর, সকল নাসিকায় তুমি শ্বাস ফেল, সকল মনে তুমি চিন্তা কর।'

সকল জগৎ তুমি। এই জগৎ তোমার দেহ। অব্যক্ত ও ব্যক্ত জগৎ তুমিই। তুমি জগতের আত্মা আবার তুমিই দেহ। তুমি ঈশ্বর, তুমি দেবতা, তুমি মানুষ, তুমি পশু, তুমি উদ্ভিদ, তুমি খনিজ, তুমি সব কিছু, সব কিছুর প্রকাশ তুমিই। যা কিছু বিদ্যমান তা তুমি। তুমি অসীম। অসীমকে বিভক্ত করা যায় না। তার কোন অংশ থাকতে পারে না, কারণ প্রতিটি অংশ হবে অসীম, তাহলে অংশ সমগ্রের সমান হবে, যা অসম্ভব। অতএব তুমি যে শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক এটা কখনও সত্য হতে পারে না, তা হচ্ছে দিবা স্বপ্ন। এটা জান এবং মুক্ত হও। এই হচ্ছে অদ্বৈত-বাদের সিদ্ধান্ত।

'আমি দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই, মনও নই। আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; আমি সেই তিনি।'

এই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যা কিছু বিচার বুদ্ধি সবই অজ্ঞান। আমার জন্য আবার কী জ্ঞান? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমার জীবন কোথায়, আমিই তো প্রাণস্বরূপ। আমি নিশ্চিত জানি যে আমি জীবিত, কারণ আমিই জীব ন, সেই এক সত্তা; এমন কোন বস্তু নেই যা আমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত নয়, আমার মধ্যে নেই বা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমি পঞ্চভূতরূপে প্রকাশিত, কিন্তু আমি মুক্ত সত্তা। কে মুক্তি চায়? কেউ না। যদি তুমি ভাব তুমি বদ্ধ, তাহলে বদ্ধ থাকবে, নিজের বন্ধন নিজে নির্মাণ কর। যদি তুমি জান যে তুমি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। মুক্তিই সমস্ত প্রকৃতির চরম লক্ষ্য।

ভারতবর্ষ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত একটি ভাষণের রিপোর্ট ১৮৯৪ সালের ৫ই এপ্রিলের বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ নীচে দেওয়া হল :

স্বামী বিবেকানন্দ সম্প্রতি ডেট্রয়েটে এসেছেন এবং এখানে প্রবল প্রভাব ফেলেছেন। তাঁর ভাষণ শুনতে সর্ব শ্রেণীর লোক জড়ো হয়েছেন, তাঁর যুক্তিতে ও তাঁর চিন্তার সুস্থতায় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা বিশেষত আগ্রহ বোধ করেছেন। তাঁর শ্রোতৃবর্গকে ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট জায়গা একমাত্র অপেরা হাউসেই ছিল। তিনি অতি চমৎকার ইংরেজি বলেন এবং তিনি যেমন সুশ্রী তেমনি ভাল। তাঁর ভাষণের রিপোর্ট ডেট্রয়েটের সংবাদপত্রগুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকাশ করেছে। ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজের একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : অনেকেরই মনে হবে যে স্বামী বিবেকানন্দের গতকাল সন্ধ্যায় অপেরা হাউসের বক্তৃতা ডেট্রয়েটে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতার চেয়েও ভাল হয়েছে। এই হিন্দুর গত রাতের বক্তৃতার গুণ হল তার স্বচ্ছতায়। তিনি এক ধরনের ক্রিশ্চান ধর্ম ও আর এক ধরনের ক্রিশ্চান ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানেন ও শ্রোতাদের বলেন যে একটা অর্থে তিনি নিজেও ক্রিশ্চান, কিন্তু অন্য অর্থে নয়। তিনি এক ধরনের হিন্দুধর্ম ও অপর ধরনের হিন্দু ধর্মের মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানেন, এর মধ্যে দিয়ে তিনি একথাই বলতে চান যে কেবল উন্নততর অর্থেই হিন্দু হিসাবে অভিহিত হওয়া তাঁর ইচ্ছা। স্বামী বিবেকানন্দের একথা সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে : "আমরা ক্রাইস্টের দূত চাই। এ রকম লোক শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে ভারতে আসুন। ক্রাইস্টের জীবন আমাদের মধ্যে নিয়ে আসুন, তা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করুক। তাঁর কথা ভারতের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি কোণে প্রচারিত হোক।"

যখন প্রধান প্রশ্নটি সম্পর্কে কোনও লোক এতটা সুস্থতা দেখান, তখন আর যা কিছু তিনি বলেন তাকে গৌণ খুঁটিনাটির মধ্যে ফেলা যায়। যে লোকেরা গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাবৃত পর্বতমালা ও ভারতের প্রবাল উপকূলের আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন একজন পৌত্তলিক যাজক এসে তাঁদের কাছে আচরণ ও জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে ভাষণ দেবেন এ একটা অপরিসীম অপমানকর দৃশ্য; তবে হতমান বোধ করা পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্কারের পক্ষে একটা অত্যাবশ্যক শর্ত। ক্রিশ্চান ধর্মের স্রষ্টার গৌরবময় জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা বলার পর বিদেশে সে জীবনের প্রতিনিধিত্ব করার যাঁরা দাবি করেন তাঁদেরকে যেভাবে তিনি উপদেশ দিয়েছেন তা দেওয়ার তাঁর অধিকার আছে। হাজার হলেও তাঁর কথাগুলির মধ্যে নাজারেথেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় যখন তিনি বলেন : "আপনাদের থলি সোনা রূপা দিয়ে, পিতল দিয়ে ভর্তি করবেন না, ভ্রমণের ফর্দ ভরবেন না, দুটো কোট, কি জুতো বা এমন কি

বাইবেলের লাইনও ভরবেন না; কারণ শ্রমজীবীকে তার আপন যোগ্যতাতেই চেনা যায়।" বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগেকার ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে যাদের আদৌ পরিচয় আছে তাঁরা আমাদের পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী মনোভাবের প্রতি—অথবা বিবেকানন্দ যার নাম দিয়েছেন "দোকানদারি মনোভাব"—যে সব আমরা এমন কি আমাদের ধর্ম নিয়েও করে থাকি, তার প্রতি প্রাচ্যবাসীদের অবিমিশ্র ঘৃণা আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন।

মিশনারিদের পক্ষে এ একটা প্রশ্ন যা অগ্রাহ্য করলে তাদের চলবে না। যাঁরা প্রাচ্যের পৌত্তলিকতার জগতের ধর্মান্তর ঘটাবেন তাদের নিজেদের প্রচারের উপযুক্ত জীবন-যাপন করতে হবে, এই পৃথিবীর রাজত্ব ও তার সকল গৌরবকে তুচ্ছ করতে হবে।

ভ্রাতা বিবেকানন্দ ভারতকে নৈতিক বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করেন। শৃঙ্খলিত হলেও ভারতের আধ্যাত্মিকতা টিঁকে আছে। বিবেকানন্দের ডেট্রয়েটের সাম্প্রতিক ভাষণগুলিতে প্রদত্ত ধারণার কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হচ্ছে। এখানে বক্তা তাঁর আলোচনার অত্যুচ্চ নৈতিক সুর তুলে ধরেছেন একথা বলে যে তাঁর দেশের মানুষের বিশ্বাস সমস্ত নিঃস্বার্থতা ভাল, আর সমস্ত স্বার্থপরতা মন্দ। সারা সন্ধ্যা ধরে তিনি এর উপর জোর দিয়েছিলেন, আর একেই তাঁর ভাষণের মূল কথা বলা যায়: "হিন্দু বলে নিজের ঘর তৈরি স্বার্থপরতা, তাই সে ঘর বানায় ভগবানের উপাসনার জন্য ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য। খাবার তৈরি করা স্বার্থপরতা, কাজেই সে দরিদ্রের জন্য খাদ্য বানায়; ক্ষুধার্ত অপরিচিত লোক যদি এসে খাদ্য চায় তবে তাকে খাইয়ে তবে সে নিজে খায়; আর দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই মনোভাব বিরাজিত। যে কোনও লোক খাদ্য ও আশ্রয় চাইতে পারে, তার জন্য সকল গৃহে অবারিত দ্বার।

"জাতিভেদের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নেই। মানুষের বৃত্তি বংশপরম্পরাগত, ছুতোর ছুতোর হয়েই জন্মেছে; স্বর্ণকার স্বর্ণকার হয়ে; শ্রমিক শ্রমিক হয়ে; পুরোহিত পুরোহিত হয়ে।

"দুটি দান বিশেষ সমাদর পায়, বিদ্যা দান ও জীবন দান। তবে বিদ্যা দান সর্বাগ্রগণ্য। কেউ একজনের জীবন বাঁচাতে পারে, তা খুব ভাল; কেউ অপরকে জ্ঞান দান করতে পারে, তা আরও ভাল। অর্থের জন্য শিক্ষা দান খারাপ, আর এ যে করে তার মাথায় অপযশের বোঝা চাপে, বিদ্যা যেন ব্যবসায়ের সামগ্রী, বিদ্যার সঙ্গে সে সোনার বিনিময় করে। সরকার শিক্ষকদের মাঝে মাঝে উপহার দেন, আর তার নৈতিক প্রভাব তথাকথিত কিছু সভ্য দেশে এই একই পরিস্থিতিতে যা হত তার চেয়ে ভালই হয়।" বক্তা এ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সর্বত্র জিজ্ঞাসা করেছেন 'সভ্যতার' সংজ্ঞা কি, আর এ প্রশ্নটা তিনি অন্য অনেক দেশেই করেছেন। কখনও কখনও জবাব এসেছে "আমরা যা, তাই-ই সভ্যতা"। এই সংজ্ঞার সঙ্গে তিনি দ্বিমত হয়েছেন। কোনও জাতি সমুদ্র শাসন করতে পারে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, জীবনের উপযোগঘটিত সমস্যাগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে যতদূর সম্ভব

বিকশিত করতে পারে, তবু সে একথা উপলব্ধি না করতে পারে যে সর্বোচ্চ ধরনের সভ্যতা প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির মধ্যে, যে ব্যক্তি নিজেকে জয় করতে শিখেছেন তার মধ্যে। এই অবস্থা পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় বেশি দেখা যায় ভারতে, কারণ সেখানে পার্থিব পরিস্থিতি আধ্যাত্মিকের কাছে গৌণ, আর সেখানে ব্যক্তি জীবন্ত প্রত্যেক জিনিসে আত্মার প্রকাশের দিকেই নজর দেন, প্রকৃতিকেও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই অনুশীলন করেন। সেই কারণেই যাকে অকরুণ ভাগ্য বলে মনে হয় তার খোঁচা দুর্দম ধৈর্য নিয়ে সহ্য করার মত নম্র স্বভাব, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা আর অন্য যে কোনও জাতির চেয়ে বেশি জ্ঞান। সেই কারণেই এমন একটি দেশ ও জাতির অস্তিত্ব যার থেকে প্রবাহিত হচ্ছে এক অবিশ্রান্ত স্রোত, যন্ত্রণাদায়ক পার্থিব বোঝা ঘাড় থেকে নামানোর আশায় দূর-দূরান্তের চিন্তাবিদ্‌দের মনোযোগ যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এই ভাষণের ভূমিকাতে একথা বলা হয়েছিল যে বক্তাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে। এর অনেকগুলির জবাব তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেওয়াই পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু তিনটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মঞ্চ থেকে জবাব দেওয়ার জন্য, তার কারণ বোঝা যায়। সে প্রশ্নগুলি হল: "ভারতের লোক কি শিশুদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়?" "তারা কি জগন্নাথের রথের চাকার তলায় নিজেদের জীবন পাত করে?" "তারা কি বিধবাদের তাঁদের স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারে?" নিউইয়র্কের রাস্তায় ইণ্ডিয়ানদের দৌড়ে বেড়ান বা অনুরূপ আরও যে সব গালগল্প আমেরিকা সম্বন্ধে এখনও ইউরোপের বহু লোকের মধ্যে চালু আছে, বিদেশে একজন আমেরিকান সেই সব প্রশ্নের জবাব যেভাবে দিতেন, প্রথম প্রশ্নের জবাব বিবেকানন্দও সেইভাবেই দিলেন। এ প্রশ্নটি এতই হাস্যকর যে এর জবাব গুরুগম্ভীরভাবে দেওয়া যায় না। কিছু সহৃদয় কিন্তু অজ্ঞ লোক যখন জিজ্ঞাসা করল যে কেবল বাচ্চা মেয়েদেরই কেন কুমীরের মুখে দেওয়া হয়, তখন তিনি ঠাট্টা করে জবাব দিলেন যে কারণ বোধ হয় তারা নরম বেশি, কোমল বেশি, কাজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের নদীর বাসিন্দাদের চিবোতে সুবিধা হয়। জগন্নাথের কাহিনী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বক্তা পবিত্র পুরীধামে রথযাত্রা উৎসবের প্রাচীন আচার ব্যাখ্যা করলেন, আর মন্তব্য করলেন যে হয়তো দড়ি ধরার ও রথ টানার দুরন্ত আগ্রহে কোনও কোনও তীর্থযাত্রী পা পিছলে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। এইরকম কিছু দুর্ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন বিকৃতি করা হয় যে অন্যান্য দেশের ভাল লোকেরা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন যে লোকেরা বিধবাদের পোড়ায়। তবে একথা সত্য যে বিধবারা নিজেরা পুড়ে মরেছেন। সামান্য যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে ধর্মীয় গুরুরা তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন, কারণ এঁরা আত্ম-হত্যার সর্বদা বিরোধী। যেখানে ভক্তিমতী বিধবারা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্য জেদ করেছেন সেখানে তাঁদের অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলা হয়েছে। এতে তাঁরা আগুনের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে যদি হাত পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত টিঁকে গিয়েছেন, তাহলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আর কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু

ভারতই একমাত্র দেশ নয় যেখানে প্রেমময়ী নারী প্রেমাস্পদকে অনুসরণ করে সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলোকে গিয়েছেন, এই ধরনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা সব দেশেই হয়েছে। যে কোনও দেশের পক্ষে এগুলি ধর্মোন্মত্ততার বিরল দৃষ্টান্ত, অন্যত্রও যেমন বিরল, ভারতেও তেমনি। বক্তা আবার বললেন "না, ভারতে লোকে বিধবাদের পুড়িয়ে মারে না, আর তারা কোনওদিন ডাইনিকেও পুড়িয়ে মারেনি।" শেষের কথাটা নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম দোষারোপ। হিন্দু সন্ন্যাসীর দর্শনের কোনও ব্যাখ্যার চেষ্টা করার এখানে দরকার নেই, কেবল একটি কথা বললেই হবে যে এর সাধারণ ভিত্তি হল অসীমত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক আত্মার সংগ্রাম। একজন বিদ্বান হিন্দু এ বছরে লোয়েল ইনস্টিটিউট কোর্সের উদ্বোধন করেছিলেন। মিস্টার মজুমদার যা শুরু করেছিলেন ভ্রাতা বিবেকানন্দ সুযোগাভাবে তা শেষ করতে পারেন। এই নতুন আগন্তুক নিঃসন্দেহে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যদিও হিন্দু দর্শনে অবশ্য ব্যক্তিত্বকে বিবেচনার মধ্যে আনার কথা নয়। পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন-এ বিবেকানন্দকে কর্মসূচীর সমাপ্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হত যাতে লোকেরা অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত থাকে। একটা গরম দিনে যখন একজন একঘেঁয়ে বক্তা অনেক লম্বা বক্তৃতা দিতেন ও লোকে শয়ে শয়ে উঠে বাড়ি যেতে শুরু করত, সভাপতি উঠে ঘোষণা করতেন যে সমাপ্তি আশীর্বাদের আগে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেবেন। তখন তিনি সেই শত শতকে দিব্যি শান্তিতে ধরে রাখতেন। হল অব কলম্বাস-এ ছড়িয়ে থাকা চারহাজার লোক পনের মিনিট বিবেকানন্দর কথা শোনার আশায় হাসিমুখে বসে দু-এক ঘণ্টা অন্যদের বক্তৃতা শুনত। সভাপতি শ্রেষ্ঠকে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়ার পুরানো নিয়মটি জানতেন।

ভারতের কলা সম্পর্কে

সানফ্রান্সিসকোর ওয়েণ্ডটে হলের শ্রোতৃবর্গের কাছে স্বামী বিবেকানন্দকে পরিচিত করান হল "ভারতে কলা ও বিজ্ঞান" বিষয়ে আলোচনার সূত্রে। স্বামীজী শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষণের শেষে বহু প্রশ্ন থেকেই তা বোঝা গেল।

স্বামীজীর বক্তব্যের মধ্যে ছিল :

বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় গোড়ায় সরকার ছিল বরাবর যাজকদের হাতে। সমস্ত বিদ্যাও যাজকদের কাছ থেকে উদ্গত হত। যাজকদের পর হাত বদল হত, সরকারে ক্ষত্রিয়রা অর্থাৎ রাজকুলের লোকেরা প্রধান হত ও সামরিক শাসন বিজয়ী হত। বরাবর এই হয়ে এসেছে। পরিশেষে আসত বিলাস-ব্যসনের প্রভুত্ব, তার অধীনে জনসাধারণ ডুবে যেত, অপেক্ষাকৃত প্রবল ও আরও বর্বর জাতিদের আধিপত্যের খপ্পরে পড়ত।

পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকে ভারত প্রজ্ঞার দেশ বলে অভিহিত হত। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ কখনও অপর জাতিকে জয় করতে বেরোয়নি। ভারতের লোকেরা কখনও যোদ্ধা ছিল না। আপনাদের পাশ্চাত্য বাসীদের মত তারা মাংস খায় না, কারণ মাংস যোদ্ধা তৈরি করে; জন্তুর রক্ত আপনাদের চঞ্চল করে তোলে, তারপর আপনাদের কিছু একটা করার ইচ্ছা হয়।

এলিজাবেথের সময়কার ইংল্যাণ্ড ও ভারতের তুলনা করুন। আপনাদের জাতির পক্ষে তখন কি অন্ধকার যুগ, আর আমরা তখনও পর্যন্ত কত আলোকপ্রাপ্ত ছিলাম। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি বরাবরই কলায় তেমন পারদর্শী ছিল না। তাদের চমৎকার কাব্য আছে—উদাহরণস্বরূপ সেক্সপীয়ারের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি চমৎকার! কেবল শব্দকে ছন্দে গাঁথা ভাল নয়। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য জিনিস নয়।

ভারতে সঙ্গীত বহুযুগ আগেই পুরো সপ্তস্বরে, এমন কি অর্ধ ও এক-চতুর্থাংশ স্বরেও বিকশিত হয়েছিল। ভারত সঙ্গীতে, এবং নাটকে ও ভাস্কর্যেও অগ্রগামী ছিল। এখন যা কিছু হচ্ছে তা কেবল অনুকরণের প্রয়াস। ভারত এখন সব কিছু নির্ভর করে আছে একটি প্রশ্নের উপর : জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজন কত কম।

আত্মিক বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি

পশ্চিমে থাকাকালীন বিবেকানন্দ খুব বেশি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেননি। একবার লণ্ডনে "আত্মিক ব্যাপার কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব"? এই বিষয়ে বক্তৃতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিতর্কে গিয়েছিলেন। এই বিতর্ক চলাকালে তিনি একটি মন্তব্য শুনেছিলেন। পশ্চিমে এ রকম কথা এই প্রথম শুনলেন না এই উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন :

একটা বিষয়ের উপর আমি মন্তব্য করতে চাই। আমাদের কাছে একটা ভুল কথা বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোকদের আত্মা আছে বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন না। এ কথা বলতে আমি খুবই দুঃখিত যে ক্রিশ্চানদের মধ্যে এ একটা পুরানো ভুল, আর মনে হয় যে তাঁরা সেটা পছন্দই করেন, মানব-চরিত্রের এ একটা বৈশিষ্ট্য যে মানুষ যাদের পছন্দ করে না তাদের সম্বন্ধে খুব খারাপ কথা বলতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাক যে আমি মুসলমান নই—আর সে কথা আপনারা জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধর্ম অধ্যয়ন করার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, কোরানে এমন একটি শব্দও নেই যাতে বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। বরং কোরান কার্যত বলেছে যে তাদের আত্মা আছে।

এখানকার আলোচ্য বিষয়বস্তু অর্থাৎ আত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার বলার বিশেষ কিছু নেই। কারণ প্রথমত, প্রশ্ন হল যে আত্মিক ব্যাপারকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায় কিনা। এই প্রমাণ করা বলতে আপনারা কি বোঝেন? প্রথমত, বিষয়গত ও বিষয়ীগত দিকের প্রয়োজন আছে। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, যা আমাদের কাছে এত পরিচিত ও যে বিষয়ে আমরা এত পড়েছি, তার কথা ধরা যাক। এ সম্পর্কে এ কথা কি সত্য যে এমন কি সাধারণ কোন বিষয়েও পৃথিবীর যে কোনও লোক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বুঝতে সক্ষম? একজন চাষাকে ধরে আপনার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখান। সে এর কি বুঝবে? কিছু না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোঝানোর জন্য আগে তার বেশ কিছু প্রশিক্ষণের দরকার হবে। তার আগে সে কিছুই বুঝবে না। পথে বিরাট বাধা। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যদি অর্থ হয় কতকগুলি তথ্যকে এমন স্তরে নামিয়ে আনা যা সকলের পক্ষে সর্বজনিক ও বোধগম্য হয়—তাহলে এ জগতে কোনও বিষয়ে তেমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকতে পারে বলে আমি মানি না। যদি তাই হত তবে আমাদের সব বিশ্ববিদ্যালয়, সব শিক্ষা বৃথা হয়ে যেত। জন্মেই যদি আমরা বৈজ্ঞানিক সব কিছু বুঝতে পারি তবে আর আমরা শিক্ষিত কেন? এত পড়াশোনা কেন? তা হলে তো এর কোনও দরকারই নেই। কাজেই, স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মানে যদি এই হয় যে আমরা বর্তমানে যে স্তরে রয়েছি সেই স্তরে সমস্ত জটিল তথ্যকে নামিয়ে আনতে হবে, তবে তা উদ্ভট কথা। অন্য একটা অর্থ বোধহয় সঠিক হবে, তা হল আরও জটিল তথ্যকে প্রমাণের জন্য কতকগুলি তথ্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত করতে হবে। আরও কিছু জটিল ব্যাপার আছে যা আমরা অপেক্ষাকৃত কম জটিল তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করি ও হয়তো তার

কাছাকাছিও পৌঁছই ; এইভাবে সেগুলিকে ক্রমশ আমাদের বর্তমান সাধারণ চেতনার স্তরে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু এমনকি তাও খুব জটিল, খুবই কঠিন, এবং এর জন্যও প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও বিপুল পরিমাণ শিক্ষা। কাজেই আমি যা বলতে চাই তা হল আত্মিক ব্যাপারের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা পেতে হলে ওই ব্যাপারগুলির পক্ষে নিখুঁত সাক্ষ্য হলেই কেবল আমাদের চলবে না, উপরন্তু তা যারা দেখতে চায় তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দরকার। এ সব ধরে নিলে আমাদের সামনে উপস্থাপিত যে কোনও ব্যাপারে প্রমাণ অথবা প্রমাণ-খণ্ডন সম্পর্কে আমরা হাঁ কি না বলার অবস্থায় পৌঁছব। কিন্তু আমার মতে তার আগে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার অথবা মানবসমাজে সংঘটিত সবচেয়ে ঘন ঘন উল্লেখিত ব্যাপারও বিনা প্রস্তুতিতে প্রমাণ করা বাস্তবিকই খুব কঠিন। তারপর, ধর্ম স্বপ্নেরই ফল এই অবিমৃষ্যকারী ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলতে চাই যে যাঁরা এ সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করেছেন তাঁরা তা ভাবুন, কিন্তু তা নেহাৎই অনুমান হবে। ধর্ম স্বপ্নেরই ফল বলে যে ব্যাখ্যা এত সহজে করা হয় সেটাই ঠিক বলে ধরে নেওয়ার আমাদের কারণ নেই। তা হলে এমনকি অজ্ঞেয়বাদীদের অবস্থান গ্রহণ করাও সত্যিই সহজ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত বস্তুকে এত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমনকি বর্তমান কালেও অপরাপর বহু অপূর্ব ব্যাপার ঘটছে, এসব সম্পর্কেও তদন্ত করতে হবে। আর শুধু করতে হবে তাই নয়, বরাবরই তা করা হচ্ছে। অন্ধ বলে সূর্য নেই। তাতে প্রমাণ হয় না যে সূর্য নেই। বহু বছর আগেই এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে। সমগ্র মানব-জাতি শত শত বছর ধরে স্নায়ুগুলির সূক্ষ্ম ক্রিয়া-কলাপ আবিষ্কারের পক্ষে উপযুক্ত যন্ত্র হিসাবে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলেছে ; বহু বছর আগে তার নথিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এই সব বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আর এখনও অনেক স্ত্রী-পুরুষ আছেন যাঁরা এই সব ব্যাপারে জীবন্ত প্রমাণ। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে সমগ্র বিষয়টির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকি আছে, এই সব জিনিসের মধ্যে ভুল ও অসত্য অনেক ব্যাপার আছে ; কিন্তু কোন বিষয়ে তা নেই ? যে কোনও একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের কথা ধরুন ; দু-তিনটি এমন তথ্য আছে যা বিজ্ঞানীরা অথবা সাধারণ মানুষেরা সন্দেহাতীত সত্য বলে মনে করেন, কিন্তু বাকি সব হল অন্তঃসারশূন্য অনুমান। এখন অজ্ঞেয়বাদী তাঁর নিজের বিজ্ঞানে একই পরীক্ষা করে দেখুন যেটা তিনি যা বিশ্বাস করেন না তার সম্পর্কে করেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেকেরই ভিত্তিমূল নড়ে যাবে। অনুমানের উপর নির্ভর আমাদের করতেই হবে, আমরা যেখানে রয়েছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না ; মানবাত্মার তাই হল স্বাভাবিক গতি। আমরা এদিকে অজ্ঞেয়বাদী হতে পারি না, আবার সেই সঙ্গে এখানে কিছু সন্ধান করেও ফিরতে পারি না ; আমাদের বেছে নিতে হবে। আর এই কারণেই আমাদের নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, যা অজ্ঞেয় বলে মনে হয় তা জানার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ; আর এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে।

তাই আমার মতে আমি আসলে বক্তার চেয়ে এক পা এগিয়ে যাচ্ছি, আর এই মতামত উপস্থিত করছি যে অধিকাংশ আত্মিক ব্যপার—কেবল আত্মা নামান ও

টেবিল-ঠকঠকের মত ছোট ছোট জিনিস নয়—ওগুলো তো ছেলে-খেলা, টেলিপ্যাথির মত ছোট জিনিস কেবল নয়, বাচ্চাদেরও তা করতে দেখেছি—বেশির ভাগ আত্মিক ব্যাপার যাকে শেষ বক্তা উচ্চতর ভবিষ্যদর্শন বলে অভিহিত করেছেন, তবে আমি বরং যাকে মনের অতি-চেতন স্তর আখ্যা দিতে চাই, সেগুলি উচ্চতর মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রথম সোপান মাত্র। প্রথম যা দেখতে হবে তা হল মন ওই অবস্থায় উঠতে পারে কিনা? তাঁর থেকে আমার ব্যাখ্যা অবশ্যই কিছু ভিন্ন হবে। কিন্তু আমরা যখন শর্তাবলী ব্যাখ্যা করব তখন হয়তো আমরা একমত হবে পারব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন যেমন আছে তা মৃত্যুর পরের চেতনার সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা দেখলে বর্তমান চেতনা মৃত্যুর পরেও থাকে কিনা সে প্রশ্নের উপর বেশি কিছু নির্ভর করে না। চেতনা ও অস্তিত্ব এক সঙ্গেই বিরাজমান থাকে এমন নয়। আমরা সকলেই নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে আমার নিজের দেহের ও আমাদের সকলের দেহের খুব কম অংশ সম্বন্ধেই আমরা সচেতন এবং দেহের বেশির ভাগ অংশ সম্পর্কেই আমরা সচেতন নই। তা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও লোকই তার মস্তিষ্ক সম্পর্কে সচেতন নয়। আমার মস্তিষ্ক আমি কখনও দেখিনি ও আমি তার সম্পর্কে সচেতন নই। তা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব আছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আমরা যা চাই তা চেতনা নয়, চাই এমন কিছুর অস্তিত্ব যা এই স্থূল পদার্থ নয়; এবং যে জ্ঞান এমনকি এই জীবনেও লভ্য, এবং যে কোনও বিজ্ঞান যতটা প্রমাণ করতে পারে ততটা পর্যন্ত প্রমাণিত ও লব্ধ হয়েছে, সে জ্ঞান সত্য। এসব জিনিস আমাদের তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করতে হবে। আর এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদেরকে আর একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উপর জোর দিতে চাই। এ কথা স্মরণে রাখা ভাল যে অনেক সময়ে আমরা এ বিষয়ে প্রতারিত হই। কিছু কিছু লোক কোনও একটা তথ্যের প্রমাণ আমাদের সমাজে হাজির করেন যা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পক্ষে সাধারণ নয়, কিন্তু আমরা ওই তথ্য প্রত্যাখ্যান করি, কারণ আমরা বলি যে সেগুলিকে আমরা সত্য বলে দেখতে পাই না। বহু ক্ষেত্রে তথ্য সঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আমরা একথা বিবেচনা করতে ভুলে যাই যে প্রমাণাদি বোঝার মত যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা; আমাদের দেহ ও আমাদের মনকে সেই সব প্রমাণ আবিষ্কারের পক্ষে উপযুক্ত করে তুলেছি কিনা।

ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তা

[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিনের ক্লিনটন অ্যাভিনিউয়ের পাউচ ম্যানসনের আর্ট গ্যালারিতে ব্রুকলিন এথিকাল সোসাইটির উদ্যোগে প্রদত্ত ভাষণ]

ভারতের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র অর্ধেক হলেও জনসংখ্যা ২৯ কোটি, ভারতে তিনটি ধর্ম তাঁদের প্রভাবিত করে : ইসলাম, বৌদ্ধ ও হিন্দু। প্রথমোক্তটির অনুসরণকারীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি, দ্বিতীয়টির প্রায় ৯০ লক্ষ (জৈনসহ), আর তৃতীয়টিকে অনুসরণ করে প্রায় ২৬ কোটি লোক। হিন্দু ধর্মের প্রধান দিকগুলি ধ্যান-ভিত্তিক [illegible]-ভিত্তিক দর্শনের উপর এবং বিভিন্ন বেদে উল্লিখিত সেই সব নীতিশাস্ত্রগত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিসর অসীম ও অস্তিত্ব শাশ্বত। এর কখনও শুরু ছিল না, আর শেষও নেই। বস্তুর জগতে আত্মার শক্তিরও সসীমের রাজ্যে অসীমের ক্ষমতার অসংখ্য প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু অসীম আত্মা নিজে স্বয়ং—বিরাজমান, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। কালের গতি শাশ্বতের ঘড়িতে কোনও ছাপ ফেলে না। এর অতীন্দ্রিয় লোক যা মানবিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ বাইরে, তাতে অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। বেদ শিক্ষা দেয় যে মানুষের আত্মা অমর। দেহকে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের বিধান মেনে চলতে হয় ; যার বৃদ্ধি আছে স্বভাবতই তার ক্ষয়ও আছে। কিন্তু অন্তর্বাসী আত্মা অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার কোনও শুরু ছিল না, শেষও হবে না। হিন্দু ও ক্রিশ্চান ধর্মের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে ক্রিশ্চান ধর্ম শিক্ষা দেয় প্রতিটি মানবাত্মার শুরু জগতে জন্মগ্রহণ থেকে, আর হিন্দুধর্ম বলে মানুষের আত্মা শাশ্বত সত্তারই একটি কণা, আর স্বয়ং ভগবানের যেমন শুরু নেই, এরও তেমনি। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তিত্ব থেকে অন্য ব্যক্তিত্বে গমনের মধ্যে এর অসংখ্য প্রকাশ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ নিখুঁত হয়ে উঠবে, তারপর আর কোনও পরিবর্তন হবে না।

এ কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাই যদি হবে তবে কেন অতীত জীবনের কোনও কথা আমাদের মনে থাকে না ? আমাদের ব্যাখ্যা হল : চেতনা মন সমুদ্রের কেবল উপরিভাগের নাম, তার গভীরে সঞ্চিত রয়েছে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা, প্রীতিকর ও বেদনাদায়ক সবই। মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষা হল স্থায়ী কিছু একটা খুঁজে বের করা। মন ও দেহ, বস্তুত প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে। কিন্তু আমাদের আত্মার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হল এমন একটা কিছু খুঁজে বের করা যার পরিবর্তন হয় না, যে স্থায়ী নিখুঁতত্বের স্তরে পৌঁছেছে। আর এই হল মানবাত্মার অসীমে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষা! আমাদের নৈতিক ও মননগত বিকাশ যত সূক্ষ্ম হবে, অপরিবর্তনশীল শাশ্বতর জন্য এই আকাঙ্ক্ষা তত তীব্রতর হবে।

আধুনিক বৌদ্ধরা শিক্ষা দেন যে যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নয় তার অস্তিত্ব নেই এবং মানুষ একটি স্বাধীন সত্তা এ কথা মনে করা বিভ্রান্তি। অপরপক্ষে, ভাববাদীরা দাবি করেন যে প্রতিটি ব্যক্তি একটি স্বাধীন সত্তা এবং তার মানসিক উপলব্ধির বাইরে

বহির্জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই সমস্যার নিশ্চিত সমাধান এই যে প্রকৃতি স্বাধীনতা ও পরাধীনতার, বাস্তবতা ও ভাববাদের একটা সংমিশ্রণ। আমাদের মন ও দেহ বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল, এবং এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের চরিত্র অনুযায়ী এই নির্ভরতার হের ফের হয়। কিন্তু অন্তর্বাসী আত্মা মুক্ত, ভগবানের মত মুক্ত এবং মন ও দেহের বিকাশের স্তর অনুযায়ী আত্মা তাদের কম বেশি মাত্রায় পরিচালিত করতে সক্ষম।

মৃত্যু কেবল পরিস্থিতির পরিবর্তন। আমরা একই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, আগের মতই একই বিধানের অধীনে চলি। যারা পরপারে চলে গিয়েছে এবং সৌন্দর্যে ও প্রজ্ঞায় উন্নতির উচ্চ স্তরে উঠেছে, তারা হল সর্বজনিক বাহিনীর অগ্রগামী দল, এই বাহিনী তাদের অনুসরণ করছে। সর্বোচ্চের আত্মা সর্বনিম্নের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত, সকলের আত্মার মধ্যে অসীম নিখুঁতত্বের বীজ রয়েছে। আমাদের আশাবাদী স্বভাবকে জাগিয়ে তোলা উচিত এবং সকলের মধ্যেই যে শুভ আছে তা দেখার চেষ্টা করা উচিত। যদি বসে থাকি এবং দেহ ও মনের খুঁত নিয়ে বিলাপ করি তাতে কোনও লাভ হয় না; প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করার জন্য বীরোচিত প্রয়াসই কেবল আত্মাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। জীবনের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক অগ্রগতির বিধানগুলি শেখা। ক্রিশ্চানরা হিন্দুদের কাছ থেকে শিখতে পারেন, হিন্দুরা ক্রিশ্চানদের কাছ থেকে শিখতে পারেন। প্রত্যেকেই জগতের প্রজ্ঞায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

সন্তানসন্ততিদের একথা ভাল করে শেখান যে প্রকৃত ধর্ম ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়, কেবল অনিষ্ট থেকে বিরত থাকার মধ্যে ধর্ম নিহিত নয়, নিহিত মহৎ কাজ ক্রমাগত করার মধ্যে। মানুষের শিক্ষা বা গ্রন্থপাঠ থেকে প্রকৃত ধর্ম আসে না, এ হল বিশুদ্ধ ও বীরোচিত ক্রিয়ার উত্তরফল হিসাবে আমাদের ভিতরকার আত্মার জাগরণ। এ জগতে জাত প্রতিটি শিশু পূর্বজন্মগুলি থেকে সঞ্চিত কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে, তার মানসিক ও দৈহিক কাঠামোয় এই অভিজ্ঞতার ছাপ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সকলকেই অধিকার করে থাকে যে স্বাধীনতার অনুভূতি তা দেখিয়ে দেয় যে মন ও দেহ ছাড়া আরও কিছু আমাদের মধ্যে আছে। ভিতরে রাজত্ব করে যে আত্মা সে স্বাধীন এবং সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আমরা যদি মুক্ত না হই তা হলে জগৎকে উন্নততর করার আশা আমরা কি করে করি? আমাদের মত হল যে মানবিক প্রগতি হল মানবাত্মার কর্মের ফল। জগৎ যা ও আমরা নিজেরা যা, তা হল আত্মার মুক্তির ফল।

আমরা এক ভগবানেই বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের সকলের পিতা, যিনি সর্বত্র-বিরাজমান ও সর্বশক্তিমান, যিনি তাঁর সন্তানদের অসীম ভালবাসা দিয়ে পরিচালিত করেন ও রক্ষা করেন। ক্রিশ্চানদের মত আমরাও একজন ব্যক্তিগত ভগবানে বিশ্বাস করি; কিন্তু আমরা আরও এগিয়ে যাই, আমরা বিশ্বাস করি যে আমরাই তিনি! বিশ্বাস করি যে আমাদের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত, ভগবান আমাদের ভিতরে আছেন, আর আমরা ভগবানের মধ্যে আছি। আমরা বিশ্বাস করি সকল ধর্মেই সত্যের বীজ আছে, আর হিন্দু তাদের সকলকেই প্রণাম জানায়; কারণ এ জগতে সত্য বিয়োগের দ্বারা মেলে না, যোগের দ্বারা মেলে। বিভিন্ন

ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ ফুলের তোড়া বেঁধে আমরা ভগবানকে দিই। ভগবানকে ভালবাসতে হবে ভালবাসার জন্যই, পুরস্কারের আশায় নয়। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হবে, পুরস্কারের আশায় নয়। সৌন্দর্যের জন্যই সুন্দরের উপাসনা করতে হবে, পুরস্কারের আশায় নয়। এই ভাবে হৃদয়ের পবিত্রতার ভিতরেই আমরা ভগবানকে দেখব। বলিদান, নতজানু হওয়া, অস্ফুট প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ধর্ম নয়। এগুলি ভাল হতে পারে যদি কেবল সুন্দর ও বীরোচিত কর্মের সাহসিক অনুষ্ঠানে আমাদের উদ্দীপিত করতে পারে এবং দিব্য নিখুঁতত্ব লাভের দিকে আমাদের চিন্তাকে তুলে ধরতে পারে।

ভগবান আমাদের সকলের পিতা একথা যদি আমরা প্রার্থনায় স্বীকার করি অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ভাইয়ের মত ব্যবহার না করি, তাতে কি লাভ? গ্রন্থ কেবল আমাদের উচ্চতর জীবনে পথনির্দেশ করতে পারে, কিন্তু অবিচল পদক্ষেপে সে পথে না এগোলে কোনও সুফল ফলে না। প্রতিটি মানবিক ব্যক্তিত্বকে কাঁচের তৈরি ভূ-গোলকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রত্যেকেরই কেন্দ্রে রয়েছে একই বিশুদ্ধ নির্মল আলোক—দিব্য সত্তা থেকে নিঃসৃত আলোক, কিন্তু কাঁচের রং ও ঘনত্ব বিভিন্ন রকম, কাজেই প্রেরিত আলোকরশ্মি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় শিখার সমতা ও সৌন্দর্য একই, আপাত বৈষম্য কেবল তার প্রকাশের পার্থিব মাধ্যমের খুঁতের দরুন। সত্তার স্তরের দিক থেকে আমরা যত উচ্চ থেকে উচ্চতরে উঠি, মাধ্যম তত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

মহাদূত খ্রীষ্ট

[১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে প্রদত্ত]

সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে, আর একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়। আবার একটা তরঙ্গ ওঠে, হয়তো আগেরটির চেয়ে বৃহত্তর; আবারও পড়ে অমনি আবার ওঠার জন্যই ক্রমাগত সামনে এগোয়। ঘটনাবলীর গতিপথেও আমরা উত্থান ও পতন লক্ষ্য করি, সাধারণত আমরা উত্থানের দিকেই নজর রাখি, পতনের কথা ভুলে যাই। কিন্তু দুইয়েরই প্রয়োজন আছে, দুই-ই মহৎ। এই হল জগতের স্বভাব। আমাদের চিন্তা জগতেই হোক, সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জগতেই হোক বা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই হোক, উত্থান-পতনের এই একই গতির পরম্পরা চলছে। তেমনি ঘটনার গতিপথেও মহা সমারোহে বহু উদারনৈতিক আদর্শ দেখা দেয়, তোড়ে এগিয়ে যায়, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, আত্মস্থ হয়, যেন অতীতকে রোমন্থন করে,—মানিয়ে নেয়, শক্তি সঞ্চয় করে, আর একবার উত্থানের, এক বৃহত্তর উত্থানের উপযুক্ত শক্তি সমাবেশ করে।

জাতিগুলিরও ইতিহাস বরাবর এমনই হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আমরা যাঁর কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই মহাত্মা, সেই মহাদূত তাঁর জাতির ইতিহাসের এমন একটা সময়ে এসেছিলেন যাকে বিরাট পতনের কাল বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর কর্ম ও বাণীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লিখিত বিবরণ যেটুকু পাওয়া গিয়েছে আমরা এখানে ওখানে তার সামান্য আভাসমাত্র পাই, কারণ, একথাটা যথাযথভাবেই বলা হয়ে থাকে যে এই মহাত্মার সমস্ত কর্ম ও বাণী যদি লিখিত থাকত, তাহলে তা সমগ্র জগৎ ছেয়ে ফেলত। তাঁর তিন বছরের ধর্ম প্রচার যেন একটি ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত যুগ, যার উদ্ঘাটনে নশ বছর লেগেছে, কে জানে আরও কতকাল লাগবে! আপনার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ কেবল একটুখানি কর্মশক্তির প্রাপক। টেনেটুনে যতখানি বাড়ান যায় ততটা বাড়িয়েও এটুকু ব্যয় করার পক্ষে, কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, বড় জোর কয়েক বছরই যথেষ্ট, তারপর আমরা চিরতরে বিগত। কিন্তু এই যে মহামানব এসেছিলেন তাঁকে লক্ষ্য করুন; শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ কেটে গিয়েছে, তবু জগতের জন্য যে কর্মশক্তি তিনি রেখে গিয়েছিলেন তার উপর এখনও টান পড়েনি, তার পূর্ণ প্রসারণও এখনও হয়নি। যত যুগ যায় এতে আরও নতুন প্রাণশক্তির যোগ হয়।

এখন খ্রীষ্টের জীবনে যা দেখছেন তা হল সমগ্র অতীতের জীবন। এক হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনই অতীতের জীবন। জাতির এই অতীত তার কাছে আসে বংশপরম্পরায়, পরিবেশের মারফৎ, শিক্ষার মারফৎ, তার নিজের পুনর্জন্মের মারফৎ। এক হিসাবে প্রত্যেক আত্মার উপরই পৃথিবীর অতীত, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রয়েছে। বর্তমানে আমরা অনন্ত অতীতের হাতে একটা ফল ছাড়া, একটা ফলাফল ছাড়া আর কি? দুর্দম বেগে সম্মুখে ধাবমান, বিরাম বিহীন শাশ্বত ঘটনা-স্রোতে আমরা ভাসমান

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ ছাড়া আর কি ? তবে আপনি আমি কেবল সামান্য বস্তু, বুদ্‌বুদমাত্র। জগৎ সমুদ্রে সর্বদা কিছু অতিকায় তরঙ্গ ওঠে, আর আপনার আমার মধ্যে অতীত জাতির জীবনের কেবল একটুখানি মূর্ত হয়েছে, কিন্তু এইসব মহাপুরুষদের মধ্যে যেন সমগ্র অতীতই মূর্ত হয়ে ওঠে, আর তাঁদের হস্ত থাকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। তাঁরা হলেন ইতস্তত বিন্যস্ত পথচিহ্ন, যা মানবতার জয়যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে ; তাঁরা সত্যই সুবিশাল, জগত জুড়ে তাঁদের ছায়া পড়ে, তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। ওই মহাদূতই বলেছিলেন "কেউ কখনও ভগবানকে দেখেছি পুত্রের মারফৎ ছাড়া।" এ কথা সত্যি। আর পুত্রের মধ্যে ছাড়া ভগবানকে কোথায় দেখব ? একথা সত্যি যে আপনি, আমি ও আমাদের মধ্যে দরিদ্রতম এমন কি হীনতমও ভগবানকে মূর্ত করে, এমন কি ভগবানকে প্রতিফলিতও করে। আলোর অনুকম্পন সর্বত্র, সর্বত্র-বিরাজমান, কিন্তু আলো দেখতে হলে আগে আমাদের প্রদীপটি জ্বালতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র-বিরাজমান ভগবানকে ততক্ষণ দেখা যায় না যতক্ষণ না তিনি পৃথিবীর এই সব অতিকায় প্রদীপের দ্বারা প্রতিফলিত হন, অর্থাৎ এইসব প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ, মানুষ ভগবান, অবতার, মূর্তিমান ভগবানের দ্বারা প্রতিফলিত হন।

আমরা সকলেই জানি ভগবানের অস্তিত্ব আছে, তবু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। ওই সব মহান আলোকদূতদের মধ্যে একজনকে ধরুন, ভগবানের যে সর্বোচ্চ আদর্শ আপনি আঁকতে পেরেছেন তার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তুলনা করুন, দেখবেন আপনার ভগবান আদর্শের অনেক নীচে পড়ে রয়েছেন আর প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা ছাড়িয়ে উঠছে। মূর্তিমান ভগবানরা বাস্তবে যা রূপায়িত করেছেন ও দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করেছেন আপনি কল্পনাতে পর্যন্ত ভগবানের উচ্চতর আদর্শ তৈরি করে তুলতে পারবেন না। কাজেই তাঁদের ভগবান হিসাবে পূজা করা কি অন্যায় ? এই মানুষ-ভগবানদের পদতলে পড়ে তাঁদেরই জগতে একমাত্র দিব্যসত্তা হিসাবে পূজা করা কি পাপ ? ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ধারণার চেয়ে আসলে, বাস্তবে যদি তাঁরা উচ্চতর হন তা হলে তাঁদের পূজা করায় ক্ষতি কি ? ক্ষতি তো নেই-ই, বরং এটাই পূজার একমাত্র ইতিবাচক ও সম্ভবপর উপায়। সংগ্রামের দ্বারা, বিমূর্ততার দ্বারা, অথবা পছন্দসই অন্য যে কোনও পদ্ধতির দ্বারাই আপনি চেষ্টা করুন না কেন, যতক্ষণ আপনি মানুষের জগতের একজন মানুষ ততক্ষণ আপনার জগত মানবিক, ধর্ম মানবিক, আপনার ভগবানও মানবিক। আর তা হতেই হবে। যে ভাব কেবল একটা বিমূর্ততা, যাকে ভাল করে ধরা যায় না, কোনও একটা নির্দিষ্ট মাধ্যমের মারফৎ ছাড়া যার কাছে পৌছান কঠিন, তাকে ছেড়ে

বাস্তবে বিরাজমান বস্তুকে গ্রহণ করার মত বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন নয় কে? কাজেই ভগবানের এই সব অবতার সর্বকালে, সর্ব দেশে পূজিত হয়েছেন।

এখন আমরা ইহুদীদের অবতার খ্রীষ্টের জীবনী নিয়ে একটু অনুশীলন করব। খ্রীষ্ট যখন জন্মালেন তখন ইহুদীরা সেই অবস্থায় ছিল যাকে আমি বলি দুই তরঙ্গের মধ্যবর্তী পতনের অবস্থা; একটা রক্ষণশীলতার অবস্থা; এমন একটা অবস্থা যেখানে মানব মন এগিয়ে যেতে যেন সাময়িকভাবে ক্লান্ত এবং ইতিমধ্যে যা পাওয়া গিয়েছে তাই নিয়েই ব্যস্ত; এমন একটা অবস্থা যখন জীবনের মহৎ, সাধারণ ও বৃহত্তর সমস্যাবলীর চেয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে, খুঁটিনাটিতে মনোযোগ অধিকতর নিবিষ্ট; এগিয়ে যাওয়ার বদলে বরং একটা জড়তার অবস্থা; কর্মের চেয়ে বরং যন্ত্রণাভোগের অবস্থা। খেয়াল করবেন এই অবস্থাকে আমি নিন্দা করছি না। একে সমালোচনা করার আমাদের অধিকার নেই, কারণ এই পতন যদি না হত তাহলে নাজারেথের যিসাস-এর মধ্যে মূর্তিমন্ত পরবর্তী উত্থান অসম্ভব হত। ফ্যারিজি ও সাদ্দুসি-রা কপট হয়ে থাকতে পারে, তারা অকর্তব্য করে থাকতে পারে; তারা এমনকি ভণ্ড হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তারা যাই হয়ে থাকুক না কেন এই উপাদানগুলিই ছিল কারণ মহাদূত যার কার্য। ফ্যারিজি ও সাদ্দুসি-রা ছিল একপ্রান্তে সেই উদ্দীপক যা অপর প্রান্ত দিয়ে নাজারেথের যিসাসের সুবিপুল মস্তিষ্ক হিসাবে বেরিয়ে এসেছিল।

প্রচলিত প্রথার প্রতি, সঙ্কেত সূত্রের প্রতি, ধর্মের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির প্রতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ নিয়ে কখনও কখনও হাসি-ঠাট্টা করা যায়, কিন্তু এগুলির ভিতরে শক্তি আছে। অনেক সময়ে তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে আমরা অনেক শক্তি হারাই। বস্তুত ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি উদারনীতিবাদীর চেয়ে বলশালী। কাজেই ধর্মোন্মাদের পর্যন্ত একটা মস্ত বড় গুণ আছে, সে কর্মশক্তিকে—বিপুল পরিমাণ কর্মশক্তিকে সংরক্ষণ করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেমন জাতির ক্ষেত্রেও তেমন; কর্মশক্তি আহরিত হয় সংরক্ষণের জন্য। বহিঃশত্রু দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত, রোমানদের দ্বারা, মনন জগতে গ্রীক প্রবণতার দ্বারা, পারশ্য, ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আগত তরঙ্গের দ্বারা একটি কেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য তাড়িত—শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে পরিবেষ্টিত এই জাতি একটা সহজাত, রক্ষণশীল, বিপুল শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—যা তার বংশধরেরা আজ পর্যন্তও হারায়নি। এই জাতিকে বাধ্য করা হয়েছিল জেরুজালেম ও ইহুদী ধর্মের উপর তার সমস্ত কর্মশক্তি ও মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে। কিন্তু যে শক্তি একবার আহরিত হয় তা কেবল সঞ্চিত হয়ে থাকতে

পারে না, তার ব্যয় হতে হবে ও আত্ম-সম্প্রসারণ হতে হবে। পৃথিবীতে কোনও শক্তিকেই একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে রাখা যায় না। শক্তিকে এত বেশি দিন জমিয়ে রাখা যায় না যাতে পরবর্তীকালে সে সম্প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা হারায়।

ইহুদী জাতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত এই কর্মশক্তি পরবর্তীকালে ক্রিশ্চান ধর্মের উত্থানের ভিতরে প্রকাশিত হল। আহরিত স্রোতোধারাগুলি এক দেহে সঞ্চিত হল। ক্রমে ক্রমে সকল ক্ষুদ্র ধারা একত্র হয়ে এক উত্তাল তরঙ্গে পরিণত হল, যে তরঙ্গের শীর্ষে দণ্ডায়মান নাজারেথের যিসাস-এর চরিত্র। অতএব প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষই তাঁর আপন কালের, তাঁর জাতির অতীতের সৃষ্টি; তিনি নিজেই ভবিষ্যতের স্রষ্টা। বর্তমানের কারণ হল অতীতের কার্য এবং ভবিষ্যতের কারণ। মহাদূতের এই হল অবস্থান। তাঁর জাতির যা মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ, যুগ যুগ ধরে তাঁর জাতি যে তাৎপর্য, যে জীবনের জন্য সংগ্রাম করেছে সে সব তাঁর মধ্যে মূর্তি ধরে, আর তিনি নিজে হন ভবিষ্যতের উদ্দীপনা– শুধু নিজের জাতির পক্ষে নয়, পৃথিবীর অসংখ্য অন্যান্য জাতির পক্ষেও।

আমাদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নাজারেথের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমার মতামত হবে প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অনেক সময়ে অবশ্য আপনারা ভুলে যান যে নাজারেথ নিজেই ছিলেন প্রাচ্যবাসীদের মধ্যেকার এক প্রাচ্য-বাসী। তাঁকে নীল চোখ ও হলদে চুল দিয়ে আঁকার জন্য আপনাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও নাজারেথ তবুও প্রাচ্যবাসী। যে সব উপমা, যে সব রূপক বাইবেল রচনায় ব্যবহার করা হয়েছে,—যে সব দৃশ্য, ঘটনাস্থল, দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠী, কাব্য ও প্রতীক তাতে আছে, সবই প্রাচ্যের পরিচায়ক; যথা: উজ্জ্বল আকাশ, উত্তাপ, সূর্য, মরুভূমি, তৃষ্ণার্ত মানুষ ও প্রাণী, কুয়োর জল আনতে আসা কলসী মাথায় নরনারী, হলধর চাষী, চতুর্দিককার চাষ-আবাদ, জল তোলার জাঁতাকল ও চাকা, উদূখল, জাঁতা ইত্যাদি। এ সবই এখনও এশিয়ায় দেখা যায়।

এশিয়ার কণ্ঠস্বর ছিল ধর্মের কণ্ঠস্বর। ইউরোপের কণ্ঠস্বর হল রাজনীতির কণ্ঠস্বর। যে যার নিজ ক্ষেত্রে মহান। ইউরোপের কণ্ঠস্বর হল প্রাচীন গ্রীসের কণ্ঠস্বর। গ্রীক মনের কাছে তার আশু সমাজই ছিল সর্বেসর্বা, তার বাইরের সব বর্বর। গ্রীকরা ছাড়া আর কারও বাঁচার অধিকার ছিল না। গ্রীকরা যা করে তা ন্যায্য ও সঠিক; জগতে আর যা কিছু আছে তা ন্যায্য বা সঠিক নয়, তাই তাকে বাঁচতে দেওয়াও উচিত নয়। কাজেই অনুভূতির দিক থেকে গ্রীক মন নিতান্ত মানবিক, একান্ত স্বাভাবিক, সুগভীর ভাবে শৈল্পিক। গ্রীক সম্পূর্ণত এ জগতেই বাস করে। স্বপ্ন দেখার মাথাব্যথা তার

নেই। তার কাব্য পর্যন্ত ব্যবহারিক। তার দেবদেবীরা কেবল মানব সত্তাই নয়, নিতান্ত মানবিকও বটে; তাঁদের প্রবল ভাবাবেগ ও অনুভূতি আমাদের যে কোনও কারও মতই সমান মানবিক। সে সুন্দরকে ভালবাসে, কিন্তু খেয়াল করবেন তা সব সময়ে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য, যথা: পাহাড়ের, তুষারের, ফুলের সৌন্দর্য, মূর্তি ও দৈহিক গঠনের সৌন্দর্য, মানুষের মুখের, তার চেয়ে বেশি মনুষ্যদেহের সৌন্দর্য—এই সবই গ্রীকরা ভালবাসত। আর গ্রীকরা যেহেতু পরবর্তী সমস্ত ইউরোপীয়আনার শিক্ষক ছিল, কাজেই ইউরোপের কণ্ঠস্বর ছিল গ্রীক।

এশিয়ায় ধরনটা অন্য। ভাবুন একবার সুবিপুল, সুবিশাল এই মহাদেশের কথা, যার পর্বতশৃঙ্গ মেঘলোক ভেদ করে প্রায় আকাশ-নীলের চন্দ্রাতপ ছোঁয়; মাইলের পর মাইল জুড়ে বিরাজ করে মরুভূমি যেখানে এক বিন্দু জল পাওয়া যায় না, একটা ঘাসের শীষ গজায় না; যার অরণ্যানি অসীম, যার বিশাল বিশাল নদনদী সমুদ্র অভিমুখে ধাবমান। এই সমস্ত পরিবেশে সুন্দর ও গরিমময়ের প্রতি প্রাচ্যের ভালবাসা অপর একটা দিক ধরে বিকশিত হল। সে অন্তর্লোকে দৃষ্টি দিল, বাইরে নয়। এখানেও প্রকৃতি-তৃষ্ণা আছে, একই ক্ষমতা-লোলুপতাও আছে; সর্বোৎকৃষ্টের জন্য একই তৃষ্ণা আছে; গ্রীক ও বর্বর সম্বন্ধে ওই একই ধারণা আছে, তবে এখানে সব হচ্ছে একটা বৃহত্তর পরিসরে। এশিয়াতে এখনও পর্যন্ত জন্ম, গায়ের রং বা ভাষা নিয়ে কোন জাতি হয় না। এখানে জাতি তৈরি করে ধর্ম। আমরা সবাই ক্রিশ্চান; আমরা সবাই মুসলিম; আমরা সবাই হিন্দু; আমরা সবাই বৌদ্ধ। বৌদ্ধ চৈনিকই হোক আর পারশিকই হোক তারা মনে করে যে তারা ভাই, কারণ তারা একই ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মই মানবজাতির গ্রন্থি, তার ঐক্য। আবার এই কারণেই প্রাচ্য মানব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চায়, জন্ম থেকেই স্বপ্ন দেখে। নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, পাখির গান, সূর্য-চন্দ্র-তারকার ও সমগ্র জগতের সকল সৌন্দর্য আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাচ্য মনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। প্রাচ্যের মানুষ স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন দেখতে চায়। বর্তমানকে সে ছাড়িয়ে যেতে চায়। বর্তমান যেন তার কাছে কিছুই নয়। যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য মানবজাতির দোলনা হয়ে আছে, এখানে দেখা দিয়েছে ভাগ্যের নানা উত্থান-পতন—রাজ্যের পর রাজ্য এসেছে, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য এসেছে, মানুষের ক্ষমতা, গৌরব, সম্পদ সব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে: ক্ষমতা ও বিদ্যার গোল গোথা (সমাধি ক্ষেত্র)। এই হল প্রাচ্য: বহু ক্ষমতা, বহু রাজত্ব, বহু বিদ্যার গোল গোথা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে পার্থিব বস্তুকে প্রাচ্য মন তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে ও স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু দেখতে চায় যা বদলায় না, যা মরে না, এমন কিছু যা এই দুঃখ ওমৃত্যুর জগতেও শাশ্বত,

প্রশান্ত সুখময়, অমর। প্রাচ্যদেশীয় কোনও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ এই আদর্শগুলি বারংবার তুলে ধরতে কখনও ক্লান্তিবোধ করেন না, আর প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের কথা বলতে গেলে এ কথাটা আপনাদেরও মনে পড়বে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত মহাদূতই ছিলেন প্রাচ্য দেশীয়।

কাজেই জীবনের এই মহাদূতদের জীবনে আমরা দেখি যে প্রথম মন্ত্র হল: "এ জীবন নয়, উচ্চতর কিছু"; আর প্রাচ্যের যথার্থ সন্তান হিসাবে এ বিষয়ে তিনি ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন। আপনারা পাশ্চাত্যের লোকেরা আপনাদের নিজ বিভাগে, যথা সামরিক ব্যাপারে, রাজনৈতিক মহলগুলিকে সামলানোর ও অন্যান্য কিছু ব্যাপারে ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন। প্রাচ্যের লোকের হয়তো এসব বিষয়ে ব্যবহারিক বোধ নেই, কিন্তু তার আপন ক্ষেত্রে সে ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন; ধর্মে তার ব্যবহারিক বোধ আছে। কেউ যদি একটা দর্শন প্রচার করে আগামী কাল শত শত লোক পাওয়া যাবে যারা নিজেদের জীবনে তা বাস্তব করে তুলতে যথাসাধ্য সংগ্রাম করবে। কেউ যদি প্রচার করে যে এক পায়ে দাঁড়ালে মুক্তিলাভ হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে পাঁচশ লোক পাবে যারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আপনি একে হাস্যকর বলতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন, এর পিছনে আছে তার দর্শন—ওই সুগভীর ব্যবহারিক বোধ। পাশ্চাত্যে মুক্তির পরিকল্পনাগুলি মননগত ব্যায়াম—এ সব পরিকল্পনা কখনও পুরো করা হয় না, কখনও ব্যবহারিক জীবনে নিয়ে আসা হয় না। পাশ্চাত্যে যিনি যত কথার ওস্তাদ তিনি তত বড় শিক্ষক।

কাজেই আমরা দেখি প্রাচ্যের যথার্থ সন্তান নাজারেথের যিসাস ছিলেন অত্যন্ত ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন। আধুনিক কালের পাশ্চাত্যের যে ফ্যাশান সেই পাঠ্যের অত্যাচারের দরকার নেই, দরকার নেই পাঠ্যকে টেনেটুনে এতদূর বাড়ানোর যার পর আর সে বাড়তে পারবে না। পাঠ্য তো ভারতীয় রবার নয়, আর রবারের পর্যন্ত সীমা আছে। বর্তমান কালের ইন্দ্রিয়াভিমানকে পরিতুষ্ট করার জন্য ধর্ম তৈরি করা নয়। দেখুন, সকলেই আসুন সৎ হই। আমরা যদি আদর্শকে অনুসরণ করতে না পারি, আসুন, আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, আদর্শের যেন অধঃপতন না ঘটাই; তাকে যেন নীচে টেনে না নামাই। পশ্চিমের লোকেরা খ্রীষ্টের জীবনের যে বিভিন্ন রকম বিবরণ দেয় তা দেখে অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করতে হয়। আমি জানি না তিনি কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না! কেউ তাঁকে মস্ত রাজনীতিবিদ্ বানাবে, আর কেউ হয়তো তাঁকে বিরাট সামরিক সৈন্যাধ্যক্ষ বানাবে; আবার অন্য কেউ হয় তো মহান দেশপ্রেমিক ইহুদী বানাবে; এই রকম আরও কত কি হবে। বইতে কি এমন কিছু আছে যাতে এই রকম সব অনুমান চলতে পারে? কোনও মহাগুরুর জীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল ভাষ্য হল তাঁর নিজের জীবন। "শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের পাখির বাসা আছে, কিন্তু মানব-সন্তানের মাথা গোঁজার জায়গা নেই।" খ্রীষ্ট মুক্তির এই একমাত্র পথনির্দেশ করেছিলেন; তিনি আর কোনও পথ দেখাননি। আসুন, হার মেনে স্বীকার করে নেওয়া যাক আমরা তা করতে পারব না। "আমি ও আমার" সম্বন্ধে আমাদের এখনও মায়া আছে।

আমরা চাই সম্পত্তি, অর্থ, সম্পদ। ধিক আমাদের! আসুন আমরা দোষ স্বীকার করে নিই, আর মানবতার এই মহাগুরুর উপর কলঙ্ক লেপন বন্ধ করি। তাঁর কোনও পারিবারিক বন্ধন ছিল না। আপনারা কি মনে করেন যে এই মানুষটির কোনও শারীরিক বাসনা ছিল? এই আলোক-পুঞ্জ, এই ভগবান ও মানবোর্দ্ধ সত্তা কি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন জন্তুদের ভাই হওয়ার জন্য? তবু লোকে তাঁর জবানিতে কত রকমের প্রচার চালায়। তাঁর কোনও যৌন ধারণা ছিল না। তিনি ছিলেন একটি আত্মা, আত্মা ছাড়া কিছু নয়, মানবতার কল্যাণের জন্য কেবল একটা দেহকে চালু রাখা এ আদর্শ আমাদের আয়ত্তের অনেকটা বাইরের হতে পারে। তাতে ঘাবড়াবেন না, আদর্শে টিকে থাকুন। আসুন স্বীকার করা যাক যে এই আমাদের আদর্শ, কিন্তু এখনও আমরা তাতে পৌঁছতে পারছি না।

জীবনে তাঁর অন্য কোনও বৃত্তি, অন্য কোনও চিন্তা ছিল না ওই একটি ছাড়া যে তিনি আত্মা। তিনি ছিলেন দেহহীন, শৃঙ্খলহীন, বন্ধনহীন আত্মা। কেবল তাই নয়, তাঁর অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ইহুদী হোক আর অন্য জাতীয় হোক, ধনী হোক আর দরিদ্র হোক, সাধু হোক আর পাপী হোক, প্রতিটি নরনারীই তাঁরই মত এই অমর আত্মার মূর্ত প্রকাশ। কাজেই তাঁর সমস্ত জীবন তাঁর একটা কাজই দেখিয়ে গিয়েছে, সে হল নিজেদের আধ্যাত্মিক চরিত্র উপলব্ধি করার জন্য তাদের কাছে তাঁর আহ্বান। তিনি বললেন: এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বপ্ন ছেড়ে দাও যে তোমরা নীচ, তোমরা দরিদ্র। মনে কর না যে তোমরা দাসের মত পদদলিত ও অত্যাচারিত, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে কখনও নিপীড়িত করা যায় না, কখনও পদদলিত করা যায় না, কখনও যন্ত্রণা দেওয়া যায় না, কখনও হত্যা করা যায় না। তোমরা সব ভগবানের সন্তান, অমর আত্মা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "একথা জান যে স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই আছে।" "আমি ও আমার পিতা একই।" সাহস করে উঠে দাঁড়িয়ে কেবল এ কথা বলা নয় যে "আমি ভগবানের সন্তান," এ কথাও কি বলতে পারবে না অন্তরে অন্তরে আমিও উপলব্ধি করব যে "আমি ও আমার পিতা একই"? নাজারেথের যিসাস এই-ই বলেছিলেন। তিনি কখনও এই জগৎ ও এই জীবনের কথা বলেননি। এর সঙ্গে তাঁর অন্য কোনও সম্পর্ক নেই একটি ছাড়া, তা হল জগৎটা এখন যেমন আছে তিনি তাই ধরে তাকে একটা ঠেলা দিতে চান, ততক্ষণ সামনে এগিয়ে দিতে চান যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের প্রদীপ্ত আলোকে পৌঁছয়, যতক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্র উপলব্ধি করে, যতক্ষণ না মৃত্যু অদৃশ্য হয়, দুঃখ নির্বাসিত হয়।

তাঁর সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন গল্প আমরা পড়েছি; আমরা পণ্ডিতদের ও তাঁদের রচনাগুলিকে ও উচ্চতর সমালোচনাকে জানি; অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে যা করা হয়েছে তা জানি। আমরা এখানে এ আলোচনা করতে আসিনি যে নিউ টেস্টামেন্টের কতখানি সত্য, আমরা এ আলোচনাও করতে বসিনি যে সে জীবনের কতখানি ঐতিহাসিক। নিউ টেস্টামেন্ট তাঁর জীবনের পাঁচশ বছরের মধ্যে লিখিত হয়েছিল কিনা তাতে কিছু আসে যায় না, এমন কি সে জীবনের কতখানি সত্য ছিল তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু এর পিছনে কিছু আছে, এমন কিছু যার আমরা অনুকরণ

করতে চাই। একটা মিথ্যে বলতে হলে আপনাকে একটা সত্যের অনুকরণ করতে হবে, আর সত্য একটা প্রকৃত তথ্য। যার কখনও অস্তিত্ব ছিল না এমন কিছুকে আপনি অনুকরণ করতে পারেন না। আপনি এমন কিছুকে অনুকরণ করতে পারেন না যা আপনি কখনও উপলব্ধি করেননি। কিন্তু একটা নিউক্লিয়াস নিশ্চয়ই ছিল, একটা বিপুল ক্ষমতা যা নেমে এসেছিল, আধ্যাত্মিক ক্ষমতার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি—আমরা তার কথাই বলছি। এ আছে। কাজেই আমরা পণ্ডিতদের সমালোচনায় ভীত নই। আমাকে যদি একজন প্রাচ্যবাসী হিসাবে নাজারেথের যিসাসকে উপাসনা করতে হয় তবে আমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে, সে তাঁকে ভগবান হিসাবে পূজা করা, আর কিছু নয়। আপনারা কি বলতে চান যে ওভাবে পূজা করার আমাদের কোনও অধিকার নেই? আমরা যদি তাঁকে আমাদের স্তরে নামিয়ে আনি ও মহাপুরুষ হিসাবে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করি তা হলে আমরা উপাসনা করতে আদৌ যাব কেন? আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে "মহা-আলোকের এই মহৎ সন্তানেরা, যাঁরা সেই মহা-আলোককে প্রকাশ করেন ও যাঁরা নিজেরাও মহা-আলোক, পূজিত হলে তাঁরা যেন আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যান, আর আমরাও তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে যাই।"

কারণ, আপনারা দেখুন, মানুষ তিন উপায়ে ভগবানকে উপলব্ধি করে। প্রথমে অশিক্ষিত লোকের অপরিণত বুদ্ধি ভগবানকে দেখে সুদূরে, স্বর্গে কোনখানে বিচারক হিসাবে সিংহাসনে আসীন। তাঁকে সে দেখে আগুন হিসাবে, সন্ত্রাস হিসাবে। এ ভাল, কারণ এর ভিতর মন্দ কিছু নেই। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে মানবজাতি ভুল থেকে সত্যে যায় না, সত্য থেকে সত্যে যায়; আপনাদের যদি আরও ভাল লাগে তো বলতে হয় নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যায়, কিন্তু কখনও ভুল থেকে সত্যে যায় না। ধরুন আপনি এখান থেকে রওনা হয়ে সরল রেখায় সূর্যের দিকে চললেন। এখান থেকে সূর্যের আকার ছোট দেখায়। ধরুন আপনি দশ লক্ষ মাইল এগোলেন, সূর্য অনেক বড় দেখাবে। প্রতি স্তরেই সূর্য ক্রমশ আরও বড় হয়ে উঠবে। ধরুন বিভিন্ন অবস্থান থেকে একই সূর্যের বিশ হাজার ছবি তোলা হয়েছে, এই বিশ হাজার ছবি পরস্পর থেকে নিশ্চয়ই পৃথক হবে। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা যাবে যে সবগুলিই একই সূর্যের ছবি? কাজেই উঁচু বা নীচু, ধর্মের সকল রূপই সেই শাশ্বত মহা-আলোক সত্তা অভিমুখে, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের অভিমুখে বিভিন্ন স্তর। কেউ একটা নিম্নতর দর্শন পায়, কেউ উচ্চতর দর্শন পায়—এই যা তফাৎ। সেই কারণেই সারা পৃথিবীর চিন্তা-বিরহিত জনতার ধর্ম বরাবর হয়েছে ও হবে এমন

এক ভগবানকে ঘিরে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বিরাজিত, যিনি স্বর্গে বাস করেন, সেখান থেকেই শাসন করেন, মন্দকে শাস্তি ও ভালকে পুরস্কার দেন ইত্যাদি। মানুষ আধ্যাত্মিক দিক থেকে যত এগোল তত সে অনুভব করতে লাগল যে ভগবান সর্বত্র-বিরাজিত, তিনি তার মধ্যেও নিশ্চয়ই আছেন, তিনি নিশ্চয়ই সব জায়গাতেই আছেন, তিনি সুদূর ভগবান নয়, স্পষ্টতই সকল আত্মার পরমাত্মা। আমার আত্মা যেমন দেহকে নাড়ায়, তেমনি ভগবান আমার আত্মাকে নাড়ান। আত্মার মধ্যে আত্মা। আর অল্প কিছু ব্যক্তি, যাঁরা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছেন ও যথেষ্ট পবিত্র, তাঁরা আরও এগিয়ে গিয়েছেন, ও শেষ পর্যন্ত ভগবানকে পেয়েছেন। নিউ টেস্টামেণ্টে বলা হয়েছে "পবিত্র-হৃদয়রা সুখী, কারণ তারা ভগবানকে দেখতে পাবে।" আর তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন যে তাঁরা ও পিতা একই।

আপনারা দেখতে পাবেন নিউ টেস্টামেণ্টে মহাগুরু এই তিন স্তরেরই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যে সাধারণ প্রার্থনা (Common Prayer) শিখিয়েছিলেন সেটা লক্ষ্য করুন: "স্বর্গে বিরাজমান আমাদের পিতা, তোমার নাম জ্যোতির্ময় হোক," ইত্যাদি—একেবারে সরল প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। আর একটা উচ্চতর মহলকে, যারা আর একটু এগিয়েছে তাদেরকে তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শিক্ষা দিলেন: "আমি আমার পিতার মধ্যে, তুমি আমার মধ্যে, আমি তোমার মধ্যে।" মনে আছে সে কথা? তারপর ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করল তিনি কে, তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি ও তাঁর পিতা একই; ইহুদীরা মনে করল এ ঈশ্বর-নিন্দা। সে কথা বলতে তিনি কি বুঝেছিলেন? আপনাদের পুরানো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষেরাও একথা বলেছিলেন, "তোমরাও দেবতা এবং তোমরা সেই সর্বোচ্চের সন্তান।" একই, তিন স্তর লক্ষ্য করুন। দেখবেন প্রথমটা দিয়ে শুরু করা ও শেষটা দিয়ে শেষ করা আপনাদের পক্ষে সহজ।

মহাদূত এসেছিলেন পথ দেখাতে: যে আত্মা রূপের ব্যাপার নয়, নানা রকম বিড়ম্বনা ও দর্শনের জটিল সমস্যাবলীর ভিতর দিয়ে আত্মাকে জানা যায় না। আপনি যে শিক্ষা পাননি, জীবনে যে কোনও বই পড়েননি, তা বরং ভাল। মুক্তির জন্য এ সবের প্রয়োজন নেই– সম্পদ নয়, পদ বা ক্ষমতা নয়, এমন কি বিদ্যাও নয়; যা প্রয়োজন সে হল একটা জিনিস—পবিত্রতা। "পবিত্র-হৃদয়রা সুখী", কারণ আত্মা আপন স্বভাবে আপনি পবিত্র। অন্য রকম হবে কি করে? এ যদি ভগবান হয় তো ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। বাইবেলের ভাষায় "এ ভগবানের নিঃশ্বাস"। কোরানের ভাষায় "এ ভগবানের আত্মা"। আপনারা কি বলতে চান যে ভগবানের আত্মা কখনও

অপবিত্র হতে পারে? কিন্তু হায়, যেন বহু শতাব্দীর ধুলো-ময়লায় আচ্ছন্ন হয়ে, আমাদের নিজেদেরই ভালমন্দ ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তাই-ই হয়েছে। নানাবিধ কর্ম সেগুলি সঠিক ছিল না, সেগুলি সত্য ছিল না, সেগুলি ওই আত্মাকেই বহু শতাব্দীর অজ্ঞতার ধুলো-ময়লায় আচ্ছন্ন করেছে। প্রয়োজন শুধু এই ধুলো-ময়লা ঝেড়ে ফেলার, সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ঝকঝক করবে। "পবিত্র-হৃদয়রা সুখী, তারা ভগবানকে দেখবে।" "স্বর্গরাজ্য তোমারই মধ্যে।" নাজারেথের যিসাস জিজ্ঞাসা করেন ভগবানের রাজ্য খুঁজতে কোথায় যাচ্ছ, যখন সে এখানেই, তোমারই মধ্যে। আত্মাকে সাফ কর, সে এখানে আছে। সে ইতিমধ্যেই তোমার। যা তোমার নয় তা পাও কি করে? আপন অধিকারেই সে তোমার। তোমরা অমরত্বের উত্তারাধিকারী, শাশ্বত পিতার সন্তান।

এই হল মহাদূতের মহাশিক্ষা, আর একটা শিক্ষা হল সর্বত্যাগ, যা সকল ধর্মের ভিত্তি। আত্মাকে পবিত্র করবেন কি করে? সর্বত্যাগের দ্বারা। একজন ধনীলোক যিসাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল "হে প্রভু, শাশ্বত জীবন লাভের জন্য আমি কি করব?" যিসাস তাকে বলেছিলেন "তোমার একটি বস্তুর অভাব আছে; ফিরে যাও, যা কিছু আছে বিক্রি কর ও দরিদ্রকে দাও, স্বর্গে ধনরত্ন পাবে, তারপর এস, তোমার প্রাপ্য যন্ত্রণা ভোগ কর ও আমায় অনুসরণ কর।" এই শুনে সে বিষাদাচ্ছন্ন হল ও দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার বহু সম্পত্তি ছিল। আমরা সবাই মোটামুটি ওই রকম। আমাদের কানে দিবারাত্র সেই স্বর বাজছে। আনন্দ ও সুখের মধ্যে, সমস্ত পার্থিব বস্তুর মধ্যে আমরা যেন অন্য সবকিছু ভুলে যাই। তারপর মুহূর্তের ছেদ হয়, সে স্বর কানে ভেসে আসে "তোমার যা কিছু আছে সব ছেড়ে আমায় অনুসরণ কর"। "যে কেউ প্রাণ বাঁচাবে সে তা হারাবে, যে কেউ আমার জন্য তার প্রাণ হারাবে, সে তা খুঁজে পাবে।" "কারণ যে কেউ তাঁর জন্য এ জীবন দেয় সে শাশ্বত জীবন পায়। আমাদের সমস্ত দুর্বলতার মধ্যেও মুহূর্তের ছেদ হয়, তখন সে স্বর ধ্বনিত হয় "তোমার যা কিছু আছে সব ছেড়ে আমায় অনুসরণ কর, দরিদ্রকে সব দিয়ে আমায় অনুসরণ কর"। এই এক আদর্শ তিনি প্রচার করেন, আর পৃথিবীর সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষ এই আদর্শই প্রচার করেছেন, তা হল সর্বত্যাগ। সর্বত্যাগ মানে কি? যে নৈতিকতায় একটিই আদর্শ আছে, তা হল নিঃস্বার্থপরতা। "নিঃস্বার্থ হও। এই আদর্শ নিখুঁত, স্বার্থশূণ্যতা। কারও যদি ডান গালে আঘাত আসে তো বাঁ গালও ফিরিয়ে ধরে।" কারও কোট যদি অন্য কেউ নিয়ে যায় তো সে অন্য আচ্ছাদনও দান করে দেয়।

আমাদের উচিৎ আদর্শকে টেনে না নামিয়ে যত ভাল করে সম্ভব কর্ম করা।

এই হল আদর্শ। যখন একজন মানুষের মধ্যে আর স্বার্থ নেই; কোনও সম্পত্তি নেই, "আমি" বা আমার বলতে কিছু নেই, নিজেকে যেন ধ্বংস করছে এমনভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে—তখন তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান, কারণ তার আত্ম-ইচ্ছা দূর হয়েছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়েছে। সেই হল আদর্শ মানব। আমরা এখনও সে স্তরে পৌছতে পারিনি; তবু আসুন আমরা আদর্শকে পূজা করি, ধীরে ধীরে দ্বিধাগ্রস্ত পদে হলেও আদর্শে পৌছতে চেষ্টা করি। কাল হতে পারে বা হাজার বছর পরেও হতে পারে, কিন্তু এ আদর্শে পৌছতেই হবে। কারণ এ কেবল লক্ষ্য নয়, উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থ হতে পারা, নিখুঁতভাবে নিঃস্বার্থ হওয়াই মুক্তি, কারণ তার মধ্যেকার মানুষটা মরে যায়, থাকেন কেবল ভগবান।

আর একটা কথা। মানবতার সকল শিক্ষকই নিঃস্বার্থ। ধরুন নাজারেথের যিসাস যখন শিক্ষা দিচ্ছেন তখন একটি লোক এসে বলল "আপনার শিক্ষা চমৎকার, আর আমি বিশ্বাস করি যে নিখুঁত হওয়ার এই-ই পথ, আমি এ পথ অনুসরণ করতে রাজী আছি; কিন্তু আমি আপনাকেই ভগবান কর্তৃক জন্ম দেওয়া একমাত্র সন্তান হিসাবে পূজা করতে রাজী নই।" নাজারেথের যিসাস কি জবাব দিতেন? "বেশ ভাই, আদর্শ অনুসরণ কর ও নিজের পথে এগিয়ে যাও। শিক্ষার জন্য আমাকে তুমি কৃতিত্ব দিলে কিনা তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি দোকানদার নই। ধর্ম নিয়ে আমি বাণিজ্য করি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিই, সত্য কারও সম্পত্তি নয়। সত্যের কেউ পেটেণ্ট নিতে পারে না। সত্য স্বয়ং ভগবান। এগিয়ে যাও।" কিন্তু শিষ্যরা আজকাল যা বলে তা হল: "তুমি শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ কর কিনা কিছু আসে যায় না, মানুষটা'কে কি তুমি কৃতিত্ব দাও? প্রভুকে যদি কৃতিত্ব দাও, তা হলে তুমি বেঁচে যাবে, তা নইলে তোমার মুক্তি হবে না।" এইভাবে প্রভুর সমস্ত শিক্ষাকে অধঃপাতে দেওয়া হচ্ছে, সমস্ত সংগ্রাম ও লড়াই লেগে গিয়েছে মানুষটির ব্যক্তিত্ব নিয়ে। তারা জানে না যে এ তফাতটা আমদানি করে তারা এক হিসাবে সেই মানুষটিকেই অপমান করছে যাঁকে তারা সম্মান দেখাতে চায়—অপমান করছে সে মানুষটিকেই যিনি এ রকম ধারণা শুনলে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতেন। পৃথিবীতে একজন লোকও যদি তাঁকে মনে না রাখত তাতে তাঁর কি আসে যেত? তাঁর কাজ ছিল বার্তা পৌছে দেওয়া, আর তিনি তা দিয়েছেন। আর তাঁর যদি বিশ হাজার জীবন থাকত পৃথিবীর দরিদ্রতম মানুষটির জন্য তিনি তার সবগুলিই বিসর্জন দিতেন। দশ লক্ষ নিন্দিত সামারিটানের জন্য যদি তাঁকে দশ লক্ষ বার নিপীড়িত হতে হত, আর তার প্রত্যেকের মুক্তির জন্য তাঁর জীবন বিসর্জনই যদি একমাত্র শর্ত হত, তা হলে তিনি

নিজের জীবন দিতেন। আর এ সবই করতেন নিজের নাম একজনের কাছেও জ্ঞাত হওয়ার ইচ্ছা না নিয়ে। ভগবান যেভাবে কাজ করেন ঠিক তেমনি অজ্ঞাতভাবে, নীরবে কাজ করতে যেতেন। কিন্তু শিষ্য কি বলবে? সে বলবে আপনি নিখুঁত হতে পারেন, নিখুঁতভাবে নিঃস্বার্থ হতে পারেন, কিন্তু যদি আমাদের গুরুকে, আমাদের সন্তকে কৃতিত্ব না দেন, তো কোনও লাভ নেই। কেন? এই কুসংস্কার, এই অজ্ঞতার উৎস কি? শিষ্য ভাবে ভগবান বুঝি নিজেকে একবারই প্রকাশ করতে পারেন। এখানেই সমস্ত ভুল নিহিত। মানুষের মধ্যে দিয়েই ভগবান আপনাকে দেখা দেন। কিন্তু গোটা প্রকৃতিতে দেখা যায় যে একবার যা ঘটে, তা নিশ্চয়ই আগেও ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা বিধি-শাসিত নয়, আর তার মানে হল যে একবার যা ঘটে তা চলতে বাধ্য ও তা নিশ্চয়ই আগেও ঘটেছিল।

ভারতের লোকেরও ভগবানের অবতার সম্বন্ধে এই একই ধারণা। তাঁদের এক মহান অবতার কৃষ্ণ, যাঁর মহাবাণী ভগবদ্গীতা আপনারা কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারেন, তিনি বলেন "যদিও আমি অজ্ঞাত, অপরিবর্তনীয়-প্রকৃতি ও সত্তাদের প্রভু, তথাপি আমার প্রকৃতিকে দমন করে আমার আপন মায়ার সাহায্যে আমি আবির্ভূত হই। যখন ধর্মে গ্লানি দেখা দেয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হব।" যখনই জগৎ পতিত হয়, ভগবান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, তা তিনি মাঝে মাঝে ও জায়গায় জায়গায়। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যখনই দেখবে অপরিসীম ক্ষমতা ও পবিত্রতাসম্পন্ন কোনও মহাত্মা মানবতাকে উন্নত করতে চেষ্টা করছেন, তখনই জানবে তিনি আমারই মহিমায় জন্ম নিয়েছেন, তাঁর ভিতর দিয়ে আমিই কাজ করছি।

কাজেই, আসুন, কেবল নাজারেথের যিসাসের মধ্যেই নয়, তাঁর আগে যে সব মহাত্মা এসেছিলেন, পরে যাঁরা এসেছেন ও ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই আমরা ভগবানকে দেখি। আমাদের পূজা অবাধ ও মুক্ত। তাঁরা সবাই একই অসীম ভগবানের প্রকাশ। তাঁরা সবাই পবিত্র ও নিঃস্বার্থ; তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন এবং আমাদের জন্য, অর্থাৎ হতভাগ্য মানবদের জন্য জীবন দিয়েছেন। আমাদের সকলের জন্যও পরে যারা আসবে তাঁদের জন্যও তাঁদের প্রত্যেককে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

একদিক দিয়ে আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ, পৃথিবীর বোঝা নিজস্কন্ধে বহন করছেন। একজনও পুরুষ, একজনও স্ত্রীলোক দেখেছেন যাঁরা নিজ নিজ জীবনের ক্ষুদ্র বোঝা নীরবে, ধৈর্যসহকারে বহন করছেন না? প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষরা বিরাট পুরুষ, তাঁরা বিশাল পৃথিবীকে নিজেদের স্কন্ধে বহন করেছিলেন। তাঁদের তুলনায় আমরা নিঃসন্দেহে বামন, তবু আমরাও সেই কাজ করছি; আমাদের ক্ষুদ্র আওতায়, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র ক্রস বহন (যন্ত্রণা সহ্য) করছি। যে এমন কি নিতান্ত মন্দ, নিতান্ত অপদার্থ, তাকেও তার ক্রস বহন করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমস্ত ভুল সত্ত্বেও, আমাদের সমস্ত মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজ সত্ত্বেও কোথাও একটা স্বর্ণসূত্র আছে, যার দ্বারা আমরা ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত। নিশ্চয়ই জানবেন যে মুহূর্তে সেই দিব্য স্পর্শ হারাব তৎক্ষণাৎ ধ্বংস আসবে। আর যেহেতু কাউকেই ধ্বংস করা যায় না কাজেই আমরা যতই নীচ ও অধ্যপতিত হই না কেন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে বরাবরই একটি ক্ষুদ্র আলোক-চক্র থাকে যা সব সময়েই দিব্য সত্তার স্পর্শ পায়।

অতীতের সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ যাঁদের শিক্ষা ও জীবন আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যাই তাঁদের বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাস হোক, যেখানেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করে থাকুন, তাঁদের সকলকে আমরা প্রণাম জানাই। সমস্ত ঈশ্বর-কল্প নরনারী, যাঁরা মানবজাতিকে সাহায্য করার জন্য কাজ করছেন, তাঁদের জন্ম, গাত্রবর্ণ বা জাতি যাই হোক না কেন, তাঁদের আমরা প্রণাম করি। আমাদের উত্তরপুরুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার জন্য ভবিষ্যতে যাঁরা আসছেন সেই সব জীবন্ত ভগবানদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম জানাই।